জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর—১৯৬৯

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাসিক লেখক সূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর ১৯৬৯

চিত্র-সূচী

বিবিধ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাবিংশ বর্ষ | জুলাই, ১৯৬৯ | সপ্তম সংখ্যা

ধাতু-নিষ্কাশন শিল্পে জীবাণুর প্রয়োগ

সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

মানবজাতির কল্যাণে জীবাণুর অবদানের কথা আমাদের অজানা নয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত ধাতুশিল্পে তাদের প্রয়োগের কথা যতটুকু জানা গেছে, তা সকলের নিকট সুপরিচিত নয়। তবে মানব-কল্যাণে বিজ্ঞান যেরূপ দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে, তাতে আশা করা যায় যে, জীবাণুতত্ত্ববিদ (Microbiologist) ও ইঞ্জিনীয়ারদের যৌথ প্রচেষ্টায় ধাতু-নিষ্কাশনের কাজে জীবাণুর ব্যবহারিক প্রয়োগের কথা শীঘ্রই শোনা যাবে। আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে জীবাণুকে ধাতু-নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহার করবার প্রভূত চেষ্টা চলছে। আমাদের দেশে এখনও এই বিষয় প্রায় অজ্ঞাতই রয়েছে।

জীবাণুর দ্বারা ধাতুর আকরিক থেকে ধাতু-নিষ্কাশন পদ্ধতি ধাতুবিদ্যার যে শাখার অন্তর্ভুক্ত, তাকে বলা হয় হাইড্রোমেটালার্জি (Hydrometallurgy) অর্থাৎ ধাতুর আকরিকের

জলীয় প্রলম্বন (Acqueous slurry) থেকে ধাতু-নিষ্কাশন পদ্ধতি।

বিজ্ঞানীরা যে সব জীবাণু ধাতু-নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহারের উপযোগী বলে দেখেছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যাক্টিরিয়াগুলি হচ্ছে—থায়োব্যাসিলাস থায়োঅক্সিড্যান্স (Thiobacillus thiooxidans), ফেরোব্যাসিলাস ফেরোঅক্সিড্যান্স (Ferrobacillus ferrooxidans), থায়োব্যাসিলাস ফেরোঅক্সিড্যান্স (Thiobacillus ferrooxidans), ফেরোব্যাসিলাস থায়োঅক্সিড্যান্স (Ferrobacillus thiooxidans) ও থায়োব্যাসিলাস কন্‌ক্রিটি ভোরাস (Thiobacillus concretivorous)। এই সব ব্যাক্টিরিয়া অটোট্রফিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরাই বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইড, অজৈব লবণ ও জল থেকে প্রস্তুত করতে পারে। জীবাণু যে প্রক্রিয়ায় ধাতুর আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন করে, তাকে বলা হয় মাইক্রোবায়োলজীয় পরিস্রাবণ (Microbiological leaching) অর্থাৎ আকরিকের বিভিন্ন পদার্থের মিশ্রণ জীবাণুযুক্ত দ্রবণের দ্বারা ধাতুগুলিকে দ্রবীভূত করে অন্য অদ্রবণীয় পদার্থ থেকে পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতিতে আকরিক থেকে ধাতু-নিষ্কাশনের হার নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে :

(১) যে আকরিক থেকে নিষ্কাশিত করতে হবে, সেই আকরিক কণাগুলির কেলাসের গঠন (Crystal structure) ও আকারের উপর।

(২) ধাতু-নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত উষ্ণতা।

(৩) আকরিকের জলীয় প্রলম্বনের pH অর্থাৎ তার অম্লতা (Acidity)।

(৪) প্রলম্বনের মধ্যে পরিচালিত বায়ু-প্রবাহ।

(৫) ইনোকিউলামের (Inocculum) আকার। ইনোকিউলাম বলতে পুষ্টিকর দ্রবণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জীবাণু, যা ধাতু-নিষ্কাশনের কাজ করবে তাকেই বোঝায়।

(৬) অতিবেগুনী রশ্মির উপস্থিতি। এই বিষয়গুলির উপর লক্ষ্য রেখে Bryner প্রমুখ বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, নিম্নলিখিত সর্বোত্তম অবস্থায় আকরিক থেকে ভাল ধাতু নিষ্কাশন করা যায় :

(ক) আকরিকের আকার—৩২৫ মেস (Mesh) অর্থাৎ প্রতি ইঞ্চিতে ৩২৫টি ছিদ্রযুক্ত ছাঁকুনীর মধ্য দিয়ে চলে যায় এমন আকার,

(খ) নিষ্কাশনের সময়ে উষ্ণতা ৩৪°-৩৫° সে.।

(গ) আকরিক প্রলম্বনের pH ২ থেকে ৩-এর মধ্যে।

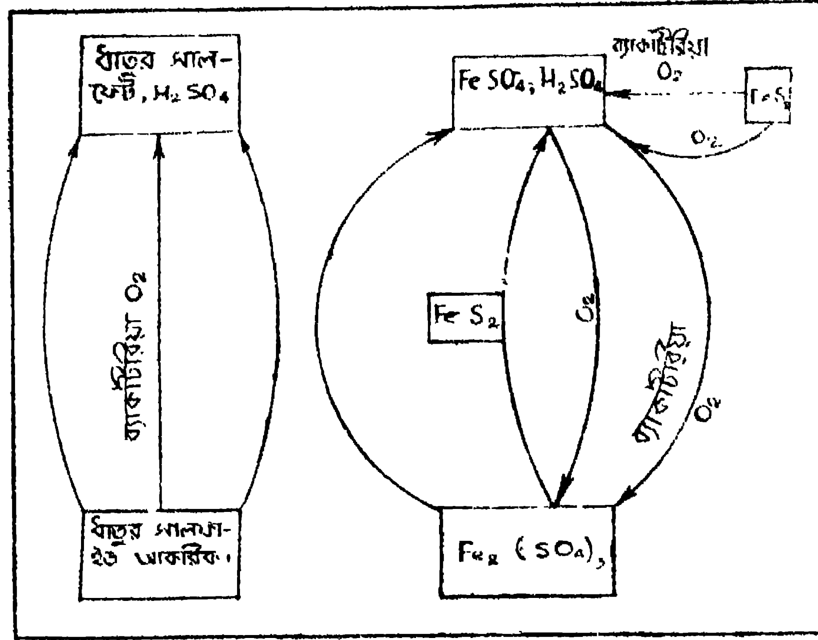
(ঘ) প্রলম্বনে দ্রুত বায়ু চালনা করা।

(ঙ) বড় আকারের ইনোকিউলাম।

(চ) সূর্যালোকের অনুপস্থিতি।

Bryner, Anderson, Duncan প্রমুখ বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধাতুর সালফাইড আকরিকের উপর উপরিউক্ত বিভিন্ন ব্যাক্টিরিয়ার ক্রিয়া করিয়ে বিভিন্ন ধাতু নিষ্কাশনে সক্ষম হয়েছেন। বিভিন্ন ধাতুর আকরিক থেকে জীবাণুর দ্বারা ধাতু নিষ্কাশনের কৌশলটি ১নং চিত্রানুযায়ী প্রকাশ করা যায়

Bryner ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা যে যন্ত্রের সাহায্যে এইভাবে ধাতু নিষ্কাশন করেন, সেই ঢালা হয়। এই দ্রবণের সংযুক্তি ধাতু-নিষ্কাশনে ব্যবহৃত ব্যাক্টিরিয়ার উপর নির্ভর



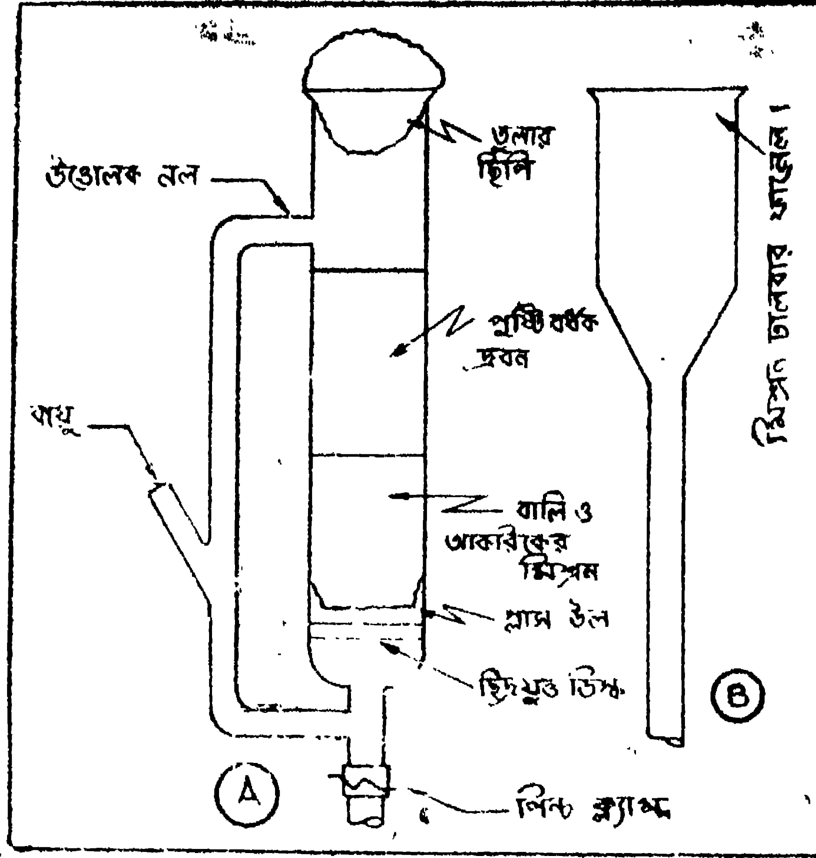
১নং চিত্র

যন্ত্রের নাম পারকোলেটর (২নং চিত্র)। এই পারকোলেটর যন্ত্রটি একটি ৪০ মি. মি. ব্যাস-বিশিষ্ট ও ৪০০ মি. মি. একটি কাচের নল। বিজ্ঞানীরা কয়েকটি পারকোলেটর পাশাপাশি যুক্ত করে একটি ব্যাটারী প্রস্তুত করেন। এই ব্যাটারীতে যেভাবে ধাতু নিষ্কাশন করা হয়, তা এখানে বলা হচ্ছে—

পারকোলেটরে অবস্থিত ছিদ্রযুক্ত ডিস্কের উপর কিছু গ্লাস উল রেখে তার উপর ১০০ গ্র্যাম বালি এবং ৫ গ্র্যাম সালফাইড আক-রিকের (যা থেকে ধাতু নিষ্কাশন করতে হবে) মিশ্রণ ঢালা হয়। এই মিশ্রণ ঢালবার পূর্বে মিশ্রণটিকে ২৫০ সি. সি. আয়তনবিশিষ্ট ফ্লাস্কে অল্প পরিমাণ পাতিত জলের সঙ্গে মিশ্রিত করবার পর ফানেল B-এর সাহায্যে ও একটি ওয়াস বটল্ থেকে সরু জলধারার সাহায্যে একে পার-কোলেটরে ঢালা হয়। তারপর পারকোলেটরে ১০০ সি. সি. ব্যাক্টিরিয়ার বৃদ্ধিসহায়ক দ্রবণ করে। দ্রবণগুলি ঢালবার পর পারকোলেটরকে ১৪০° সি. উষ্ণতায় ৩০ মিনিট ধরে ষ্টেরিলাইজ অর্থাৎ জীবাণুমুক্ত করা হয়। তারপর এতে ৫ সি. সি. ইনোকিউলাম ঢালা হয়। এই ইনোকিউলামের মধ্যে থাকে ধাতু-নিষ্কাশক ব্যাক্টিরিয়া। ইনোকিউলাম ঢালবার পর ৭ দিন অন্তর পারকোলেটর থেকে কিছু দ্রব্য বের করে নিয়ে তাতে দ্রবীভূত ধাতুর পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। প্রায় ৬ সপ্তাহ পরে যখন দ্রবীভূত ধাতুর পরিমাণ স্থির অবস্থায় আসে, তখন প্রথম পারকোলেটরের সক্রিয় ব্যাক্টিরিয়ার কাল্চার থেকে ৫ সি. সি. নিয়ে দ্বিতীয় পারকো-লেটরে ঢালা হয়। তারপর এই পারকোলেটরে আগের পন্থা অবলম্বন করা হয়। এখানেও দ্রবীভূত ধাতুর পরিমাণ যখন স্থির অবস্থায় আসে, তখন এথেকে ৫ সি. সি. ব্যাক্টিরিয়ার কাল্চার নিয়ে তৃতীয় পারকোলেটরে ঢালা হয়। এই ভাবে ব্যাটারীর অন্যান্য পারকো

লেটরগুলিতেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে

Malanf ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এইভাবে বিভিন্ন ধাতুর সালফাইড আকরিক ব্যবহার করে এবং মাইক্রোবায়োলজীয় পদ্ধতিতে অনেক ধাতু নিষ্কাশন করে যে ফল পেয়েছেন, তা এখানে দেওয়া হলো।

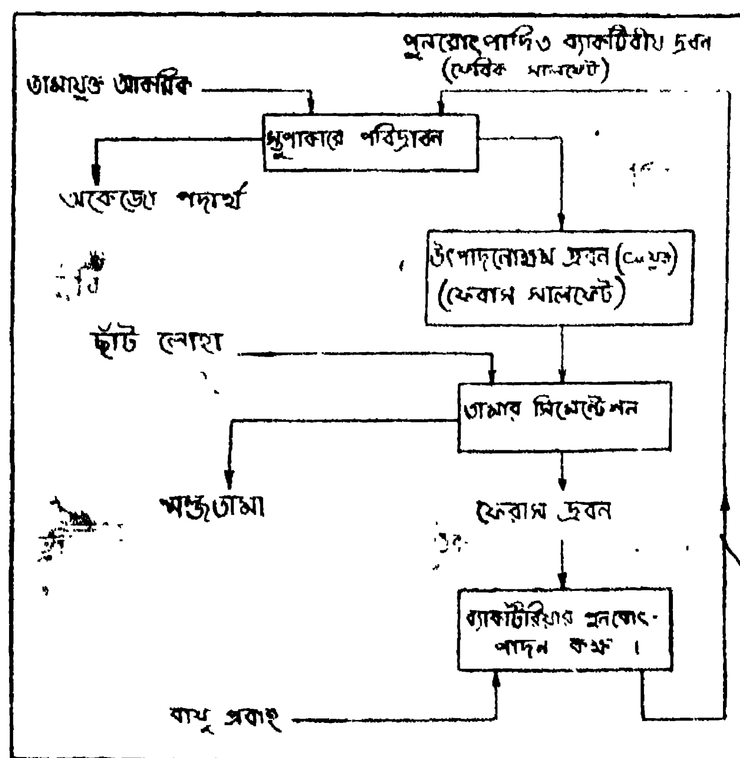


২নং চিত্র
পারকোলেটর।

পরিস্রাবিত আকরিক	পরিস্রাবক দ্রবণ	পরিস্রাবণ সময়	নিষ্কাশিত ধাতুর শতকরা পরিমাণ Cu	Fe	Zn	Mn
চালকোপাইরাইট আকরিক	পুনরোৎপাদিত দ্রবণ (Recycled solution)	৬৫ দিন	৯.২			
বিশুদ্ধতর চালকোপাইরাইট আকরিক	,,	৪০৮ দিন	৪৭.৯			
চালকোপাইরাইটযুক্ত খনিজ ,,	,,	২৮৭ ,,	৬৪.৬			
চালকোসাইট যুক্ত ,,	,,	১০৫ ,,	৯৫			
তামাযুক্ত ,,	,,	৪১ ,,	৯৫			

পরিস্রাবিত আকরিক	পরিস্রাবক দ্রবণ	পরিস্রাবণ সময়	নিষ্কাশিত ধাতুর শতকরা পরিমাণ			
			Cu	Fe	Zn	Mn
তামাযুক্ত	,, সাংশ্লেষিক দ্রবণ (Synthetic solution)	১১৩ দিন	১৯·৪	৩·৮		
স্ফ্যালেরাইট	,, ,,	৩৩১ ,,			১৯·৬	
স্ফ্যালেরাইট ও পাইরাইট	,, ,,	৩৩১ ,,		১০০	৪৮·৬	
তামাযুক্ত মলিবডেনাইট	,, ,,	১২৩ ,,	২৮·২	৯৮		<০·১

বিজ্ঞানী Zimmerly তাম্রযুক্ত আকরিক থেকে নিম্নলিখিতভাবে (৩নং চিত্র) তামা নিষ্কাশন করেন। এই ঘূর্ণন-পদ্ধতির (Recycling process) দ্বারা মলিবডেনাম, জিঙ্ক, ক্রোমিয়াম ও টাই-

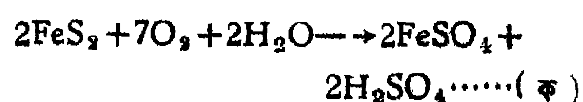


৩নং চিত্র

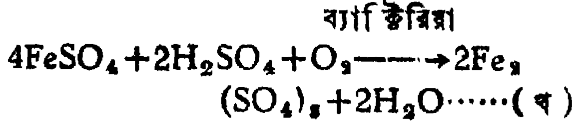
টেনিয়াম ধাতুর আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন করা যায়। বিজ্ঞানী Andsley ও Daborn এইভাবেই ইউরেনিয়ামযুক্ত পর্তুগীজ পাই-রাইটিস থেকে ইউরেনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন করেন।

এইভাবে জীবাণুর দ্বারা ধাতু-নিষ্কাশনের কাজে যে সকল রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়, সেগুলি নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করা যায়।

(১) পাইরাইট আকরিক থেকে ফেরিক-সালফেট উৎপাদন

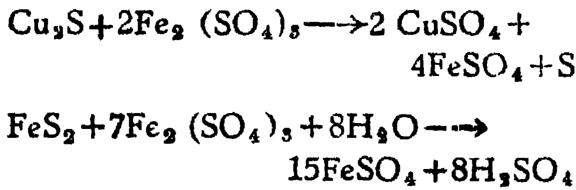


$$2FeS_2+7O_2+2H_2O \longrightarrow 2FeSO_4+2H_2SO_4 \cdots\cdots (ক)$$



$$4FeSO_4 + 2H_2SO_4 + O_2 \xrightarrow{\text{ব্যাক্টিরিয়া}} 2Fe_2(SO_4)_3 + 2H_2O \cdots\cdots (\text{খ})$$

এই (খ) নং সমীকরণটি অনুঘটকের অনুপস্থিতিতে সংঘটিত হতে অনেক সময় লাগে, কিন্তু থায়োব্যাসিলাস শ্রেণীর ব্যাক্টিরিয়া এই বিক্রিয়াটি তাড়াতাড়ি ঘটিয়ে দেয়। এই ফেরিক সালফেটই ধাতুর সালফাইড আকরিককে জারিত করে আনুষঙ্গিক ধাতুর সালফেট উৎপন্ন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ফেরিক সালফেট বিজারিত হয়ে ফেরাস সালফেট হয়।



$$Cu_2S + 2Fe_2(SO_4)_3 \longrightarrow 2CuSO_4 + 4FeSO_4 + S$$

$$FeS_2 + 7Fe_2(SO_4)_3 + 8H_2O \longrightarrow 15FeSO_4 + 8H_2SO_4$$

এইভাবে উৎপন্ন ফেরাস সালফেটকে জীবাণুগুলি শক্তিপ্রদানকারী বস্তু হিসাবে ব্যবহার করে নিজেদের বংশবৃদ্ধি ঘটায় এবং সেই সঙ্গে (খ) নং সমীকরণ অনুযায়ী ফেরাস সালফেটকে ফেরিক সালফেটে পরিণত করে। এই ফেরিক সালফেট আবার ধাতু-নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

উল্লিখিত উপায়ে ধাতু-নিষ্কাশনের পদ্ধতিটি খুবই মন্থর এবং এতে নিষ্কাশনের পরিমাণও খুব বেশী নয়। কাজেই বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেন, কিভাবে উৎপন্ন ধাতুর পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় এবং সেই সঙ্গে পদ্ধতিটিকেও খুব তাড়াতাড়ি করা যায়। এই কাজে বিজ্ঞানী Duncan, Trussell ও অন্যান্য কয়েক জন লক্ষ্য করেন যে, থায়োব্যাসিলাস ফেরোঅক্সিড্যান্সকে ধাতু-নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহার করে যদি একে সরাসরি আকরিক স্ফটিকের ল্যাটিসের (Crystal lattice) উপর ক্রিয়া করানো যায়, তবে ধাতুর পরিস্রবণের বেগ (Leaching rate) অনেক বেড়ে যায়। এর প্রধান কারণ হলো আকরিকের সঙ্গে জীবাণুর অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযোগ। এছাড়াও ১৯১৬ সালে Jone, Starkey ও Federic নামক বিজ্ঞানীরা দেখেছিলেন যে, যদি মাইক্রোবায়োলজীয় পরিস্রাবণ পদ্ধতিটি ধাতুকণার উপরিতলের সক্রিয় পদার্থের উপস্থিতিতে নাড়াবার ব্যবস্থা করা হয়, তবে নিষ্কাশনের বেগ আরও বেড়ে যায়। এই উপরিতলের সক্রিয় পদার্থগুলি অ্যানায়নিক (Anionic), উদাহরণ—ডুপোনল ৮০, পেট্রোওয়েট R প্রভৃতি); ক্যাটায়নিক (Cationic), উদাহরণ—ট্রাইটন X-১০০, নাকানল NR প্রভৃতি অথবা আয়নবিহীন (Nonionic), উদাহরণ—ট্রাইটন X-১০০ টুইন ২০, ৪০, ৬০ প্রভৃতি হতে পারে। ধাতুর প্রকৃতি ও ব্যাক্টিরিয়ার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে ধাতু-নিষ্কাশনে কি ধরণের উপরিতলের সক্রিয় পদার্থ ব্যবহার করতে হবে, তা নির্ধারণ করতে হয়। বিজ্ঞানী Andsley ও Daborn দেখেছেন যে, থায়োব্যাসিলাস ফেরোঅক্সিড্যান্স জীবাণু, টুইন ২০ ও বায়ু-প্রবাহের সাহায্যে চালকোপাইরাইট আকরিক থেকে ২৪ দিনে শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী তামা নিষ্কাশিত করা যায়।

উপরিতলের সক্রিয় পদার্থের উপস্থিতি ও নাড়াবার ব্যবস্থার প্রয়োগে মাইক্রোবায়োলজীয় পরিস্রাবণ পদ্ধতিতে ধাতু-নিষ্কাশনের বেগ ও নিষ্কাশিত ধাতুর পরিমাণ বর্ধিত হয় বলে শিল্প-জগতে মাইক্রোবায়োলজীয় পরিস্রাবণ পদ্ধতিতে ধাতু-নিষ্কাশন বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে।

এইভাবে ধাতু-নিষ্কাশন পদ্ধতির প্রধান সুবিধা হলো এই যে, পদ্ধতিটির কৌশল খুব সরল এবং রাসায়নিক পদ্ধতিতে অম্লাত্মক ফেরিক সালফেট দ্রবণ দিয়ে ধাতুর সালফাইড আকরিক থেকে ধাতু পরিস্রাবিত করতে যে খরচ হয়, জীবাণুর সাহায্যে সেই একই কাজ করতে খরচ অনেক

কম হয়। রাসায়নিক পদ্ধতিতে ফেরিক সাল-ফেটের পুনরুদ্ধার বেশ কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়-বহুল, কিন্তু মাইক্রোবায়োলজীয় পরিস্রাবণ-পদ্ধতিতে এই কাজ সহজেই প্রায় বিনা খরচে করা যায়। এই সকল দিক বিচার করে এই পদ্ধতিটির উপর গুরুত্ব দেওয়া খুবই প্রয়োজন। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে শিল্প-জগতে এই পদ্ধতিটি বিশেষ সমাদৃত হবে।

একালের এক দুঃসাহসিক অভিযান

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

দেখি নাই কভু, শুনি নাই কানে—এমন তরণী বাওয়া। পৃথিবীর দুটি মানুষ চাঁদের ভেলায় করে ভেসে পড়লেন মহাসমুদ্রে, মহাসমুদ্র মানে মহাকাশে, দু-দুবার চাঁদের দশ মাইলের মধ্যে গিয়ে তাকে ভাল করে দেখলেন, তারপর নির্বিঘ্নে ফিরে এলেন মূল মহাকাশযানে, সেখান থেকে আবার পৃথিবীর কোলে।

দুঃসাহসিক মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে এ এক নতুন বিস্ময়। অ্যাপোলো-১০ নতুন সাফল্যের গৌরবে দীপ্ত হয়ে মানুষের মনের মহাকাশকেও দীপ্ত করে তুলেছে। তিন মার্কিন মহাকাশচারী, যাঁরা মানবীয় প্রতিভা, কৌতূহল ও দুঃসাহসিকতার এক নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন, তাঁরা যে সমগ্র বিশ্ববাসীর হর্ষোৎফুল্ল বিস্ময় এবং শ্রদ্ধার দ্বারা অভিনন্দিত হবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

রবিবার ১৮ই মে, বেলা ১২টা ৪৯ মিনিটে (ভারতীয় সময় রাত্রি ১০-১৯ মিঃ)—ফ্লোরিডার উপকূলবর্তী কেপ কেনেডিতে ৩৬৩ ফুট উঁচু স্যাটার্ন-৫ রকেটের ইঞ্জিনগুলি ঘোররবে গর্জন করে উঠলো। টমাস পি. ষ্ট্যাফোর্ড, ইউজিন এ. সারনান এবং জন ডাব্লিউ. ইয়ং—এই তিন জন আরোহী নিয়ে ৩,০০০ টন ওজনের অতিকায় রকেটটি ধীরে ধীরে অবস্থান স্থল ছেড়ে উঠলো। তার দেহের চেয়ে দ্বিগুণ লম্বা এক অগ্নিশিখার বিপুল ধাক্কায় সে মেঘ ফুঁড়ে আকাশে উঠলো। তারপর দক্ষিণ দিকে মুখ ঘুরিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই চলে গেল দৃষ্টির অন্তরালে।

জ্বালানী শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের রকেটটি খসে পড়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দ্বিতীয় পর্যায়ের রকেটটিও এমনি করে খসে পড়ে গেল। এরপর তৃতীয় পর্যায়ের রকেটটিকে খানিকক্ষণ জ্বালিয়ে অ্যাপোলো-১০কে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা হলো। পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব হলো ১০১ থেকে ১০২.৩ মাইলের মধ্যে। সব সমেত সময় লাগলো মাত্র ১১ মিনিট।

এর পরের খবর—মহাকাশচারীরা পূর্ব পরিকল্পনা মত ভারতীয় সময় রাত্রি ১টা ৫৩ মিনিটে তৃতীয় পর্যায়ের রকেট চালু করে চাঁদের দিকে তাঁদের পথ সুনির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। তৃতীয় পর্যায়ের রকেটের কাজ শেষ, তাই সেটা আপনা থেকে খসে পড়ে গেল। অ্যাপোলো-১০ ঘণ্টায় ২৪,১৯৬ মাইল বেগে ছুটে চললো চাঁদের দিকে। তখন মহাকাশচারীদের সামনে রূপালী চাঁদ আর নীচে সুন্দর পৃথিবী।

চাঁদে যাবার পথে প্রায় ২০ হাজার মাইল দূরে গিয়ে পৃথিবীকে যেমনটি দেখা গেল, তারই রঙীন ছবি মহাকাশচারীরা পাঠালেন। পৃথিবীর

মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে টেলিভিশনে এই প্রথম দেখলো পৃথিবীর রঙীন ছবি—নীল সমুদ্র, ধূসর মাটি, দূরবিস্তৃত পর্বতমালা, সুবিস্তৃত সবুজ প্রান্তর ··· আকাশে ভেসে-চলা পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। অন্তহীন শূন্যতার পটভূমিকায় পৃথিবী, অবর্ণনীয় কৃষ্ণতার মাঝে ভেসে-থাকা পৃথিবী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইউরোপ পর্যন্ত নিশ্ছিদ্র মেঘের আবরণে ঢাকা···সুমেরু ও কুমেরু শ্বেত মুকুট ধারণ করে প্রতীক্ষা করছে।

রঙীন টেলিভিশনে আরও একটি ছবি দেখা গেল—রকি পর্বতমালার ওধারে দিনের শেষে সূর্য অস্ত যাচ্ছে—সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার। চলতি পথে মহাকাশযানের একপাশে সূর্যরশ্মি বর্ষিত হবে অবিরল ধারায়, তাই সে দিকটা ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। আবার যে দিকটা থাকবে ছায়ার মধ্যে, সে দিকটা ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এই বিপর্যয় এড়াবার জন্যে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে অ্যাপোলো-১০ তার যাত্রাপথে ঘণ্টায় প্রায় দু-বার করে ক্রমাগত ঘুরতে থাকে। এর ফলে তাপটা সমানভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

মহাকাশযান নির্ভুল পথে চাঁদের দিকে এগিয়ে চললো। কিন্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে চলতে গিয়ে তার গতিবেগ ক্রমশঃ কমতে লাগলো, যেমন চড়াই পথে ওঠবার সময় গাড়ীর গতিবেগ ক্রমশঃ কমে আসে। এমনি করে এক সময় যানটি গিয়ে হাজির হলো সেই জায়গায়, যেখানে পৃথিবী এবং চাঁদের আকর্ষণ সমান হয়ে গেছে। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব ২,০০,০০০ মাইল, আর চাঁদ থেকে প্রায় ৩০,০০০ মাইল। এরপর থেকেই চাঁদের অভিকর্ষের টানে মহাকাশযানের গতিবেগ আবার ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। এইভাবে চলতে চলতে শেষে ধনুকের মত বাঁকা একটি পথে ঘুরে গিয়ে হাজির হলো চাঁদের ওপিঠে। তখন তার গতিবেগ দাঁড়িয়েছে ঘণ্টায় ৫,৭০০ মাইল। বুধবার, ভারতীয় সময় রাত্রি ২টা ১৫ মিনিটে উল্টো দিকে রকেট চালিয়ে অ্যাপোলোর গতিবেগ কমিয়ে দেওয়া হলো, সুরু হলো চন্দ্র-প্রদক্ষিণ। এই কক্ষপথ হলো উপবৃত্তাকার, দূরত্ব ৭০ মাইল থেকে ১৯৬ মাইল পর্যন্ত। আরও দু-বার রকেট জ্বালিয়ে কক্ষপথ বৃত্তাকার করে নেওয়া হলো। তখন তার দূরত্ব হলো প্রায় ৭০ মাইল।

কিন্তু বুধবার শেষ রাত্রেই একটা গুরুতর সমস্যা দেখা দিল। অ্যাপোলো-১০-এর কম্যাণ্ড মডিউল বা মূল মহাকাশযান থেকে লুনার মডিউল বা চাঁদের ভেলাকে বিচ্ছিন্ন করতে গিয়ে দেখা গেল, সংযোগকারী সুড়ঙ্গ থেকে অক্সিজেন বের করে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অথচ তা না করে বিচ্ছিন্ন হতে গেলে চন্দ্রযানটি ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে থাকবে। সে অবস্থায় ধ্বংস অনিবার্য। সমগ্র পরিকল্পনাটিই বানচাল হয়ে যাবার উপক্রম। এখন উপায়?

এই গুরুতর সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হলো হাউষ্টনে—পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে। সেখানকার কর্মীরা তক্ষুনি হাজির হলেন কম্পিউটারের সামনে। এই সমস্যার সমাধান কি হতে পারে, তা জানতে চাইলেন যান্ত্রিক মস্তিষ্কের কাছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সঠিক জবাবটি চলে গেল চাঁদের আকাশে মহাকাশচারীদের কাছে। আর সেই নির্দেশমত যন্ত্রপাতি ঠিক করে নিতে পুরা পনেরো মিনিট সময়ও লাগলো না। কি অদ্ভুত কারিগরী কুশলতা!

বৃহস্পতিবার রাতে, চন্দ্র প্রদক্ষিণের দশম বারের বার প্রথমে সারনান তারপর স্ট্যাফোর্ড প্রায় তিন ফুট লম্বা ঐ সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে চাঁদের ভেলার মধ্যে প্রবেশ করেন। তারপর তাঁরা যখন চাঁদের ওপিঠে, পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার নাগালের

বাইরে, তখন চাঁদের ভেলাটি মূল মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সুরু হলো একালের এক দুঃসাহসিক অভিযান। ইয়ং একলা রইলেন মূল মহাকাশযানে সদা-সতর্ক প্রহরীর মত, হঠাৎ প্রয়োজন হলে মহাকাশচারীদের উদ্ধার করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে।

ঘুরতে ঘুরতে চাঁদের এপিঠে চলে আসা মাত্র সারনান খবর পাঠালেন—আমরা এখন পরস্পর থেকে ৩০-৪০ ফুট দূরে রয়েছি। প্রায় ৪০ মিনিট রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষার পর তাঁদের পৃথক অবস্থানের কথা জানতে পেরে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে উল্লাসের ঝড় বয়ে গেল।

এদিকে মাকড়সার মত দেখতে, অত্যন্ত দুর্বল এবং পল্‌কা এই চাঁদের ভেলায় করে তাঁরা তখন মহাকাশে ভেসে চলেছেন। দেখতে দেখতে তাঁরা নেমে গেলেন চাঁদের দশ মাইলের মধ্যে। উদ্দেশ্য, চাঁদকে আরও ভাল করে দেখবেন।

চাঁদের মৃত আগ্নেয়গিরির ভিতরে বড় বড় পাথরের চাঁই দেখে তাঁরা তো বিস্ময়ে হতবাক। চাঁদের দিগন্তে পৃথিবীর উদয় দেখে তাঁরা আনন্দে আত্মহারা।

এক সময় সারনান চীৎকার করে উঠলেন—আমরা ঠিক সেখানে, আমরা ঠিক তার উপরে। আমরা তার উপরে এসে পড়েছি। ঐ যে মাস্‌কেলীন, একেবারে আমাদের সামনে।

মাস্‌কেলীন একটি বড় জ্বালামুখ। জুলাই (১৯৬৯) মাসে দু-জন মহাকাশচারী চাঁদের শান্ত সাগরের (Sea of tranquility) যেখানে অবতরণ করবেন বলে স্থির করেছেন, তারই কাছে এটি অবস্থিত।

ষ্ট্যাফোর্ড বললেন—এর মধ্যে আর আশে-পাশে চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে বড় বড় পাথরের চাঁই।

তবে মহাকাশচারীরা জানালেন যে, অবতরণের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত জায়গাটি বেশ সমতল। কিন্তু আরও পূর্ব দিকে অপর একটি নির্বাচিত জায়গায় দেখা গেল অসংখ্য পাথরের চাঁই ইতস্ততঃ পড়ে আছে।

তাই দেখে ষ্ট্যাফোর্ড বললেন—ওই পাথরের চাঁইগুলি তুলে নিয়ে আমাদের দেশের (টেক্‌সাসের) গাল্‌ভেস্‌টন উপসাগরটা ভরে ফেলতে পারি।

অবশ্য দ্বিতীয়বার ঐ জায়গাটির উপর দিয়ে ভেসে যাবার সময় ভাল করে দেখেশুনে তিনি বললেন—না, শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ জায়গা খালি পড়ে আছে।

মহাকাশচারীরা আরও জানালেন যে, সাধারণভাবে বাদামী আর ধূসর দু-রকম রং তাঁরা দেখেছেন। জ্বালামুখের কিনারা ধবধবে সাদা, আর তলাটা কালো। আর পাথরের চাঁইগুলির এক-একটি খুবই বড়, ব্যাস অন্ততঃপক্ষে ১০০ ফুট।

সাইড উইণ্ডার রিল নামক একটি ক্যানিয়ন (দীর্ঘ এবং সরু পার্বত্য খাদ) সম্পর্কে ষ্ট্যাফোর্ড বললেন—এর তলদেশ চ্যাপ্টা এবং সমতল। আর দু-ধার গোল হয়ে উপরের দিকে উঠে এসেছে।

সারনান বললেন—সবচেয়ে ভাল বর্ণনা যা দিতে পারি, তা হলো এই যে, এটি হলো একটি শুক্‌নো নদী, হুবহু মেক্সিকো বা অ্যারিজোনার যে কোন একটি শুক্‌নো নদীর মত।

দ্বিতীয় বার পরিক্রমা শেষে মহাকাশচারীরা চাঁদের ভেলার নীচের অংশটি (Descent stage) খুলে ফেললেন আর নিজেরা চলে এলেন উপরের অংশে (Ascent stage)। কারণ, ভবিষ্যতে মহাকাশচারীরা এই অংশে চড়েই চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে মূল মহাকাশযানে উঠে আসবেন। কিন্তু এই

সময় সামান্য একটু ভুলের জন্যে দেখা দিল দারুণ এক দুর্বিপাক। হঠাৎ চাঁদের ভেলাটি প্রচণ্ড বেগে ঘুরপাক খেতে সুরু করলো।

সারনান চীৎকার করে উঠলেন—এই, এটা নিশ্চয়ই চাঁদের মাটিতে ভেঙ্গে পড়বে। ঘাবড়ে গিয়ে গালাগালি সুরু করে দিলেন।

ষ্ট্যাফোর্ড পাশেই বসেছিলেন, তিনি কিন্তু নির্বিকার। ধীরেসুস্থে এগিয়ে গিয়ে সুইচ-বোর্ডের হাজার বোতামের মধ্যে একটি টিপে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভেলাটি স্থির হয়ে গেল।

চাঁদের ভেলা মূল মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রায় আট ঘণ্টা ধরে মহাকাশে ভেসে বেড়ালো, মানুষের চন্দ্রে পদার্পণের পথ সুগম করে দিল।

এবারে ঊর্ধ্বারোহণের রকেট চালু করে উপরের কক্ষপথে উঠে আসতে হবে। সেখানে গিয়ে মূল মহাকাশযানের সঙ্গে মিলতে হবে, নতুবা মহাকাশেই হবে তাঁদের অনন্ত নির্বাসন। আর এজন্যে তাঁদের ঠিক ২৬ ডিগ্রী কোণ সৃষ্টি করে উঠতে হবে, এক ডিগ্রী এদিক-ওদিক হলেও চলবে না।

ষ্ট্যাফোর্ড বোতাম টিপলেন এবং দেখতে দেখতে নির্ভুল গতিতে উঠে এলেন উপরের কক্ষপথে। তারপর চাঁদের ভেলা আবার মূল মহাকাশযানের সঙ্গে মিলিত হলো। দুটিতে জোড়বেঁধে আবার চন্দ্র-প্রদক্ষিণ সুরু করলো।

কিন্তু এই মিলন ঘটলো চাঁদের ওপিঠে, বেতার সংশ্রব বর্জিত আকাশে। কাজেই দুটিতে জোড়বেঁধে যখন আবার এপিঠে চলে এলো, তখনই শুধু পৃথিবীর মানুষ এই সুসংবাদ জানতে পারলো। এতক্ষণে সবাই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলো।

এদিকে ভেলাটি অ্যাপোলোর দেহে তার মাথাটি ঢুকিয়ে দিতেই তাঁরা দুজন ক্যামেরা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিসহ সুড়ঙ্গপথে মূল মহাকাশযানে চলে এলেন—প্রথমে ষ্ট্যাফোর্ড তারপর সারনান।

ইয়ং বললেন—যন্ত্রটি সত্যিই চমৎকার!

চাঁদের ভেলা তার কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করেছে। একে আর কম্যাণ্ড মডিউলের মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর কোন অর্থ হয় না। অতএব নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ী ভেলাটিকে ভাসিয়ে দেওয়া হলো মহাসমুদ্রে; অর্থাৎ তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো মহাকাশের অসীম শূন্যতার মাঝে অনন্তকালের নির্বাসনে। নতুবা ভবিষ্যতে মানুষের চাঁদে যাওয়া-আসার পথে সে এক অবাঞ্ছিত উপদ্রব হয়ে থাকতো।

অ্যাপোলো-১০-এ চড়ে তাঁরা ক্রমাগত চন্দ্র-প্রদক্ষিণ করে চলেছেন। উদ্দেশ্য, চাঁদকে আরও ভাল করে দেখা এবং আরও অনেক ছবি নেওয়া।

এক সময় তাঁরা খবর পাঠালেন—আমরা সুখী, কিন্তু তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত।

একটু পরেই তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। আগের দিন খুব খাটুনি গিয়েছিল। তাই আশা করা গিয়েছিল যে, তাঁরা বেশ খানিকটা ঘুমোবেন। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে তাঁরা অনেক আগেই উঠে পড়লেন এবং খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলেন। ভারতীয় সময় রাত্রি সাড়ে বারোটায় খবর এলো তাঁরা ভাল আছেন। ২১তম আবর্তনে তাঁরা এখন চাঁদের ছবি তুলতে ব্যস্ত।

অভিযান শেষ, এখন ঘরে ফেরবার পালা। ক্রমাগত আড়াই দিন ধরে চন্দ্র প্রদক্ষিণ করবার পর ৩১তম আবর্তনে ২ মিনিট ৪৪ সেকেণ্ড রকেট ইঞ্জিন চালিয়ে অ্যাপোলোর গতিবেগ ঘণ্টায় ৩,৬৮০ থেকে ৬,১৩৫ মাইলে তোলা হলো। এর ফলে পৃথিবীতে ফেরবার পথে যাত্রা সুরু হলো।

সর্বশেষ সংবাদ—নির্ভুল পথে এগিয়ে এসে তাঁরা এক সময় পৃথিবীর অভিকর্ষের এলাকায় প্রবেশ করলেন। তখন থেকে মহাকাশযানের গতিবেগ ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। অ্যাপোলো-১০ যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের শেষ সীমায় এসে পৌঁছুলো তখন তার গতিবেগ দাঁড়িয়েছে ঘণ্টায় ২৪,৭৬০ মাইল। এই প্রচণ্ড গতিবেগ থাকায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবার সময় অ্যাপোলো-১০কে এমনভাবে পরিচালিত করা হলো, যাতে প্লাস্টিকজাতীয় তাপ-প্রতিরোধক আবরণসহ ক্যাপ্সুলের চ্যাপ্টা দিকটা থাকে পৃথিবীর দিকে। বাইরের উষ্ণতা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো ৩,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, কিন্তু তখন কেবিনের ভিতরে তাপমাত্রা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রইলো। কি অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক কুশলতা!

এরপরে মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যেই ক্যাপ্সুলটি বিরাট এক প্যারাস্যুটে ভর করে ধীরে ধীরে (ঘণ্টায় প্রায় ২২ মাইল বেগে) পূর্ব-নির্দিষ্ট সময়ে (সোমবার, ভারতীয় সময় রাত্রি ১০টা ২২ মিনিটে) সামোয়া দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি প্রশান্ত মহাসাগরের এক সুনির্দিষ্ট জায়গায় নির্বিঘ্নে নেমে এলো। সমুদ্র তখন শান্ত ছিল, আর আকাশে ছিল ভোরের আলো।

এর প্রায় তিন মাইলের মধ্যেই উদ্ধারকারী জাহাজ প্রিন্সটন অপেক্ষা করছিল। সেখান থেকে একটি হেলিকপ্টার ছুটে গেল ক্যাপ্সুলটির কাছে। সেখান থেকে বেতারে জানানো হলো—Welcome back to earth.

ক্যাপ্সুলের ভিতর থেকে মহাকাশচারীর শান্ত স্বর ভেসে এলো—Okay rescue take your time and take it easy...we're right here and we want you to be good.

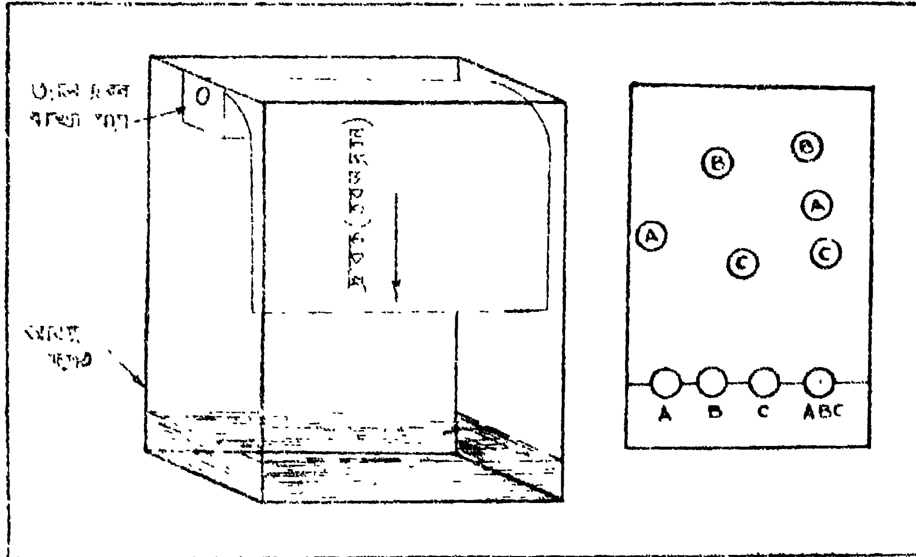
এরপর ক্যাপ্সুলের ঢাক্‌না খুলে মহাকাশচারীরা বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে হেলিকপ্টারে করে তাঁদের নিয়ে আসা হলো নিকটে অপেক্ষমান প্রিন্সটন জাহাজে। ভারতীয় সময় তখন রাত্রি এগারোটা।

ইতিহাসের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর এবং দুঃসাহসী অভিযানের প্রথম অধ্যায় আজ সমাপ্ত। চন্দ্রে অবতরণের সব রকম মহড়া সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। অভিযাত্রীরা ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং দুঃসাহসিকতার অগ্নিপরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। মানুষের বহুদিনের স্বপ্ন সফল হবার পথে, অর্থাৎ চন্দ্রে অবতরণের পথে আর কোনও বাধা নেই। আপাততঃ স্থির হয়েছে যে, আগামী ২০শে জুলাই তারিখেই পৃথিবীর মানুষ চাঁদের মাটিতে পা দেবে। আর পৃথিবীর সকল দেশের মানুষ অধীর আগ্রহে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করছে।

ক্রোম্যাটোগ্রাফি

রঞ্জন ভদ্র

১৯০৩ সালের কথা। রুশ দেশের উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ M. S. Tswett গাছের পাতাগুলিকে ডুবিয়ে দিলেন পেট্রোলিয়াম ইথার নামক এক প্রকার বর্ণহীন পদার্থের মধ্যে। দেখতে দেখতে বর্ণহীন ইথার সবুজ হয়ে গেল, পড়ে রইলো পাতার কঙ্কাল। এই সবুজ ইথার দ্রবণকে তিনি খড়ির গুঁড়া-ভর্তি সরু চোঙের মধ্যে ঢেলে দিলেন এবং দেখলেন দ্রবণটা ধীরে ধীরে নামছে ও তার মধ্যেকার পদার্থগুলি নির্দিষ্ট অঞ্চলে পৃথক হয়ে যাচ্ছে। ১নং চিত্রে দ্রবণটাকে ABC ABC দিয়ে বুঝানো হয়েছে এবং পর পর কেমন করে এর মধ্যেকার পদার্থগুলি ধীরে ধীরে পৃথক হয়ে যায় তার একটা ক্রমঅনুসারী অবস্থা দেখানো হয়েছে।



১নং চিত্র।

এইবার Tswett এই খড়ির গুঁড়ার স্তম্ভকে পিছন দিক থেকে অতি সন্তর্পণে ঠেলে বের করলেন এবং বিভিন্ন পদার্থের অঞ্চলগুলি কেটে দিলেন—যেন টুকরা কেকের মত। এবার তা-থেকে প্রত্যেক পদার্থ আলাদা করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ সুরু করলেন।

Tswett এই ভাবেই মিশ্রিত পদার্থ থেকে বিভিন্ন বস্তুগুলি পৃথক করবার যে এক যুগান্তকারী পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন—সে বিষয়ে তিনি তেমন সচেতন ছিলেন না। আবিষ্কারের পরেই আসেন প্রয়োগবিদেরা। কিন্তু এক্ষেত্রে Dr. A. J. P. Martin এবং Dr. R. L. Synge Tswett-এর সূচনাকে একটা সার্থক রূপ দিলেন। আর এইভাবে তাঁদের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর রসায়নবিদেরা, বিশেষ করে বিশ্লেষণকারী গবেষকেরা জানালেন সম্পূর্ণ অভিনব এই

পৃথকীকরণের পদ্ধতি — ক্রোম্যাটোগ্রাফির কথা।

Chromatography কথাটা এসেছে গ্রীক শব্দ থেকে। Chroma-এর অর্থ হলো রং এবং Graphein-এর অর্থ হচ্ছে লেখা বা আঁকা, অর্থাৎ এক্ষেত্রে একটা মিশ্রণের উপাদানগুলি প্রত্যেকে নিজস্ব রং ফুটিয়ে নির্দিষ্ট অঞ্চলে আলাদা হয়ে যায় এবং যা থেকে তাদের চেনা যায় ও আলাদা করা হয়। এই পদ্ধতিতে শুধু যে রঙীন পদার্থই আলাদা করা সম্ভব—এই ধারণা ভুল। বর্ণহীন পদার্থও আলাদা করে এর সাহায্যে তাদের পৃথকীকরণও সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে করা হয়ে থাকে।

এগুলি সবই সম্ভব করে তুলেছিলেন Dr. A. J. P. Martin এবং Dr. R. L. M. Synge। তাঁরা Tswett-এর মত একটা সরু কাচের নল নিয়ে সেটাকে খড়ির গুঁড়ার পরিবর্তে কাগজের গুঁড়া দিয়ে ভর্তি করলেন এবং তার উপর এমন একটা দ্রাবক ঢেলে দিলেন, যেটা কোন মিশ্রণের একটা উপাদানকে (মনে করা যাক উপাদান—ক) দ্রবীভূত করে। ঐ দ্রাবক চুঁইয়ে চুঁইয়ে নীচে নামবার সময় কাগজ ভিজিয়ে তার গায়ে আটকে থাকবে। এবার মিশ্রণটাকে ঢেলে দিলে ঐ বিশেষ উপাদান (ক) ঐ দ্রাবকে দ্রবীভূত হয়ে কাগজের গুঁড়ার গায়ে আটকে থাকবে। এবার মিশ্রণের অন্য উপাদান ধীরে ধীরে নামতে থাকবে। এখন আর একটা দ্রাবক তাঁরা বেছে নিলেন, যেটাতে ঐ মিশ্রণের দ্বিতীয় উপাদান (মনে করা যাক খ) দ্রবীভূত হয়। এবার এই দ্রাবক উপর থেকে ঢেলে দিলে দ্বিতীয় উপাদান (খ) দ্রবীভূত হয়ে বেরিয়ে আসবে অর্থাৎ মিশ্রণ থেকে একটা উপাদান পৃথক হয়ে যাবে। এবার প্রথম বারের দ্রাবক বেশী মাত্রায় ঢেলে দিলে উপাদান ক দ্রবীভূত হয়ে বেরিয়ে আসবে। এই ভাবে বিভিন্ন দ্রাবকের বিভিন্ন পদার্থকে দ্রবীভূত করবার যে বৈশিষ্ট্য আছে, সেটাকে এবং Tswett-এর মূলতত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে মিশ্রণ থেকে পদার্থগুলিকে আলাদা করা হলো একটা কাগজের গুঁড়ার কলামের সাহায্যে। তাই এটাকে বলা হয় ক্রোম্যাটোগ্রাফি।

Dr. Martin আরও দেখলেন যে, কাগজের গুঁড়া-ভর্তি কলামের পরিবর্তে শক্ত একটা মোটা কাগজের চাদর দিয়ে এই কাজটা বেশ সুন্দরভাবে করা যায়। এই বিশেষ ধরণের কাগজকে বলা হয় ক্রোমাটোগ্রাফিক পেপার। এর বড় বড় সিট থেকে ২০-২২ ইঞ্চি লম্বা এবং ১০-১২ ইঞ্চি চওড়া একটা অংশ কেটে নিয়ে চওড়া ধারের একদিক বরাবর প্রায় ইঞ্চিখানেক দূরে একটা লম্বা লাইন টানা হয়। এটাকে বলা হয় বেস লাইন। এর উপর কোন পদার্থের মিশ্রণ (অবশ্যই দ্রবণের অবস্থায়) থেকে এক ফোঁটা করে ঐ লাইনের উপর কয়েক মিলি-মিটার অন্তর দেওয়া হয় এবং সেটা শুকিয়ে গেলে ঐ জায়গায় আবার এক ফোঁটা দেওয়া হয়। এমনি করে প্রত্যেক বিন্দুবৎ জায়গায় প্রায় ০·০১ মিলিলিটার মিশ্রণ দেওয়া হয়। এটাকে ক্রোম্যাটোগ্রাফিতে বলা হয় Spot দেওয়া। এবার যদি ঐ বেস লাইনের ধারটাকে একটা নির্দিষ্ট তরল দ্রবণের বাষ্পে সম্পৃক্ত আবদ্ধ প্রকোষ্ঠে রাখা অনুভূমিক সরু চোঙাকৃতির তরলাধার থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে কৈশিক প্রক্রিয়ায় (Capillary action) ঐ তরল দ্রবণ কাগজের চাদর বয়ে ধীরে ধীরে নীচে নামতে থাকে। আর মিশ্রণের পদার্থগুলির দ্রাব্যতা ঐ তরলে বিভিন্ন হওয়ায় অগ্রসরমান তরল দ্রবণের অগ্রবর্তী প্রান্ত থেকে বিভিন্ন দূরত্বে ঐ পদার্থগুলিও ধীরে ধীরে নামতে থাকে। কিন্তু তাদের সঞ্চরণের মাত্রা দ্রাব্যতার প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল বলে বিভিন্ন দূরত্বে তারা পরস্পর

থেকে পৃথক হতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে তাদের ব্যবধান বাড়তে থাকে। তারপর সেগুলিকে নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে বের করে নিলেই সেগুলি পৃথক হয়ে গেল। নিম্নাভিমুখী ধারার সাহায্যে এইভাবে কাগজের সিট ব্যবহার করে যে ক্রোম্যাটোগ্রাফি করা হয়, তার নাম Descending paper chromatography বা নিম্নাভিমুখী পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি। ১নং চিত্রে এটা দেখানো হয়েছে। এখানে বেস লাইনের উপর A,B,C তিনটি পদার্থ আলাদা করে এবং ABC তিনটির মিশ্রণ দিয়ে মোট চারটি Spot দিয়ে আবদ্ধ প্রকোষ্ঠের সাহায্যে নিম্নাভিমুখী পেপার ক্রোম্যাটোগ্রাফি সম্পন্ন করবার পর কেমন অবস্থা হয়, সেটাও দেখানো হয়েছে। প্রকৃতি পক্ষে মিশ্রণের A, B, C-কে পৃথক Spot দেওয়া দরকার। এবার একটা অজানা মিশ্রণ থেকে A, B, C-এর অবস্থান জেনে পদার্থগুলি পৃথক করা ও তাদের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়ে থাকে।

এক্ষেত্রে এই পেপারগুলি একধারে পূর্বের চোঙা ভর্তি কাগজের গুঁড়া এবং ধারক চোঙ— এই দুইয়েরই কাজ করে। এখন কাগজটাকে উপর থেকে না ঝুলিয়ে যদি নীচ থেকে খাড়া দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় এবং তরল দ্রবণ রাখা পাত্রটি যদি নীচে রাখা হয়, তবে ঐ দ্রবণ ধীরে ধীরে কাগজ ধরে উপরে উঠবে। এর ফলে পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন পদার্থ বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছায় এবং পৃথক হয়ে যায়। তখন একে বলা হয় Ascending paper chromatography বা ঊর্ধ্বমুখী পেপার ক্রোম্যাটোগ্রাফি।

অনেক সময় এই ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নাভিমুখীর ন্যায় একমাত্র একমুখী প্রবাহ দিয়ে অনেক জটিল মিশ্রণের উপাদানগুলি পৃথক করা যায় না। কারণ কোন একক অভিমুখে মিশ্রণের অনেক উপাদান এত কাছাকাছি থেকে অগ্রসর হয় যে, তাদের পৃথকভাবে পাওয়া যায় না। তখন কোন কোন একমুখী প্রবাহের শেষে কাগজটি শুষ্ক করে পূর্বের অভিমুখের সঙ্গে লম্বভাবে তরল দ্রবণ প্রবাহিত হতে পারে এমনভাবে ঐ কাগজটির এক ধার তরল দ্রবণের আধারে রাখা হয়। এবার এই দিকের প্রবাহ শেষ হলে পদার্থগুলি এদিকে পরস্পর থেকে বেশ দূরে দূরে পৃথক হয়ে যায় এবং তখন তাদের সংগ্রহ করা হয়। এই ধরণের ক্রোম্যাটোগ্রাফিকে দ্বিমাত্রিক বা Two dimensional paper chromatography বলা হয়।

এখন কথা হলো যে, মিশ্রণের উপাদানগুলি পরস্পর থেকে আলাদা হবার পর যদি তারা বর্ণহীন হয় (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটা হয়) তবে তাদের অবস্থা কেমন করে জানা যাবে? এই সম্পর্কে কয়েকটি পদ্ধতি আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপাদানগুলি আলাদা হয়ে যাবার পর তাদের অবস্থান জানবার অন্যতম একটা উপায় হলো, ঐ উপাদানগুলির মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিশেষ বর্ণের সৃষ্টি করে, এমন রাসায়নিক দ্রব্য খুঁজে বের করা। তার পর ঐ রাসায়নিক দ্রব্যের দ্রবণ প্রস্তুত করে তার মধ্যে ক্রোম্যাটোগ্রাম করা হয়েছে যেটা, সেটাকে ডুবিয়ে দেওয়া অথবা ঐ রাসায়নিকের দ্রবণ ছিটিয়ে ক্রোম্যাটোগ্রাম করা কাগজটাকে ভিজিয়ে দেওয়া। এর ফলে ছোট ছোট জায়গা জুড়ে রঙীন অঞ্চলের (Spot) উদ্ভব হবে। এখন আর একখানা কাগজে ঐ একই মিশ্রণ দিয়ে ক্রোম্যাটোগ্রাম করে সেটাকে ঐ রঙীন অঞ্চলযুক্ত পূর্বের কাগজটার সঙ্গে মিলিয়ে উপাদানগুলির অবস্থান জানা যাবে এবং তাদের পৃথক করা যাবে।

অনেক সময় মিশ্রণের উপাদানগুলি প্রতিপ্রভ (Fluorescence) হয়ে থাকে। তখন ক্রোম্যাটো-

গ্রাম করবার পর কাগজটাকে অন্ধকার ঘরে রেখে অতিবেগুনী আলোর সামনে ধরলে পদার্থগুলির অবস্থান জানা যায় এবং সেখান থেকে পৃথক করা যায়।

আবার মিশ্রণের উপাদানগুলির মধ্যে তেজস্ক্রিয়তা থাকলে ক্রোম্যাটোগ্রাম শেষ হলে তাকে অন্ধকার ঘরে রেখে তার উপর আলোকচিত্রের প্লেট (Photographic plate) ধরা হয়। তারপর সেটাকে Develop করলে যে কালো অঞ্চল পাওয়া যায়, সেটাকে ক্রোম্যাটোগ্রাম কাগজের সঙ্গে মিলিয়ে নিলে পদার্থগুলির অবস্থা জানা যায়। এছাড়া গাইগার কাউন্টারের সাহায্যেও তাদের অবস্থান জানা যেতে পারে।

এইভাবে তরল মিশ্রণের উপাদান পৃথক হবার পর তাদের সনাক্ত করবার নানা পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে এখানে পেপার ক্রোম্যাটোগ্রাফির কথাই বলা হয়েছে। এছাড়া কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি, গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি, স্বল্পবেধী স্তর ক্রোম্যাটোগ্রাফিরও আজকাল বহুল প্রচলন হয়েছে।

কলাম ক্রোম্যাটোগ্রাফির কার্য-পদ্ধতি প্রকৃত পক্ষে এর আবিষ্কারের মধ্যেই বিধৃত। সেই Tswett-এর ব্যবহার করা সরু কাচের নল নিয়ে সেগুলি নানা জিনিষ দিয়ে প্যাক করা হয়; যেমন—সেলুলোজ পাউডার, সেফাডেক্স পাউডার, আয়ন-বিনিময় রেজিন গুঁড়া, চারকোল, অ্যালুমিনা পাউডার ইত্যাদি। এগুলি দিয়ে ভর্তি করাকে কলাম প্যাকিং বলে। এই কাজটা একটু দক্ষতার সঙ্গে করতে হয়—কেন না, কলাম প্যাকিং-এর উপরেই মূলতঃ এই পদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করে। Dr. Martin এবং Dr. Synge-এর কাগজ-ভর্তি কলাম-এর মধ্য দিয়ে যে পদার্থ পৃথকীকরণের কথা বলা হয়েছে, কার্যতঃ তাই করা হয়। তার নীচ থেকে যে বিভিন্ন পদার্থের দ্রবণ পাওয়া যায়, তাকে বিভিন্ন অংশে অর্থাৎ ২ মিলিলিটার পরিমিত অংশে একটানা সংগ্রহ করে যাওয়া হয়। আর ঐ অংশগুলি থেকে সামান্য পরিমাণ নিয়ে রাসায়নিক পরীক্ষা করে কোন্ অংশে কি পৃথক হয়েছে বের করা হয়। কোন একটা পদার্থের পৃথকীকরণের প্রকৃতিটা অনেকটা তরঙ্গের মত হয় অর্থাৎ একটা পদার্থের অস্তিত্ব প্রথমে কোন এক অংশে ধরা পড়লে তার পরের অংশগুলিতে তার মাত্রা বেড়ে এক সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছায় এবং তার পরের অংশগুলিতে আবার কমতে থাকে। আর যে অংশে সর্বোচ্চ মাত্রা পাওয়া যায়, তাই প্রকৃত পক্ষে ঐ বিশেষ উপাদানের বিশুদ্ধ অংশ। এইভাবে ঐ উপাদান পৃথক হয়ে যায়।

এরপর এলো থিন্‌লেয়ার ক্রোম্যাটোগ্রাফি এবং গ্যাস ক্রোম্যাটোগ্রাফি। থিন্‌লেয়ার কথাটাকে স্বল্পবেধী স্তর হিসাবে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

নিউ ইয়র্ক সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Dr. Ernest Borek Dr. Martin এবং Dr. Synge-এর হাতে ক্রোম্যাটোগ্রাফির যে চরম সাফল্য আসে, তার সম্পর্কে বলেছেন—

Martin and Synge came to the rescue of every one of us who struggled in biology with chemical tools and who raged in frustration at the inadequacy of the analytical methods which could not reach down to the low levels in which many biologically important substances are present in the cell.

এঁদের এই কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৫২ সালের রসায়নবিদ্যায় এই দুই মনীষীকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

তাঁদের আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে জীব-বিজ্ঞানের গবেষণায় এক বিপ্লবের সূচনা হলো। কেন না

জীবকোষে এত সব জটিল পদার্থ এত সামান্ত পরিমাণে থাকে, যার অস্তিত্ব জানা ও পৃথকীকরণ ক্রোম্যাটোগ্রাফির সাহায্য ছাড়া অসম্ভব। এর ফলে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জীব-বিজ্ঞানে কয়েকটি বিস্ময়কর অধ্যায়ের সংযোজন হলো।

এর অন্ততম হলো Dr. Sanger-এর আবিষ্কার। তিনি প্রথম পৃথিবীকে জানালেন যে, প্রোটিনের মূল উপাদান অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি প্রোটিন অণুর মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ক্রম-অনুযায়ী সজ্জিত। এর জন্তে তিনি বেছে নিয়েছিলেন ইনস্থলিন নামক অপেক্ষাকৃত ছোট একটি প্রোটিন অণু। তিনি তাকে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় খণ্ড-বিখণ্ড করে প্রত্যেক খণ্ডে অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিমাণ, জাতি এবং সংযোগ সবই বের করলেন ক্রোম্যাটোগ্রাফির সাহায্যে। এটা প্রোটিন, তথা জীবনের মূল উপাদানের প্রকৃতি ও গঠন জানবার একটা নতুন পথের সন্ধান দিল। এর জন্তে তিনিও নোবেল পুরস্কার পেলেন।

এমনিভাবে ক্রোম্যাটোগ্রাফি শুধু বিস্ময়কর আবিষ্কারের অংশীদারই হয় নি, নানা রকম রোগ, Intermediate Metabolism এবং দৈহিক নানা গ্রন্থি ও অংশবিশেষের কার্য ও তার পরিণতির স্বরূপ জানতে ক্রোম্যাটোগ্রাফি নানা ভাবে সাহায্য করছে।

একবার আমেরিকার একদল ডাক্তার দেখলেন যে, কিছু শিশু বড় হবার সময় ধীরে ধীরে বুদ্ধিহীন এবং মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ছে! তাঁরা এবার ঐ শিশুদের রক্ত ও মূত্রের ক্রোম্যাটোগ্রাম করে দেখলেন যে, এর কারণ তাদের রক্তে ও মূত্রে অস্বাভাবিক মাত্রায় Phenylalanine-এর উপস্থিতি। এখন তাদের এই Phenylalanine শূন্ত খাস্থ খাওয়ালে ঐ অসুস্থতা থেকে তারা একেবারে মুক্ত হয়। রক্তের মধ্যে বহু জৈব পদার্থ আছে, যার Phenylalanine-এর মত অ্যামিনো অ্যাসিডের মাত্রার তারতম্য বোঝা ও তার অস্তিত্ব নির্ণয় করা হয়তো একমাত্র ক্রোম্যাটোগ্রাফির মাধ্যমেই সম্ভব।

শুধু যে রোগের কারণ নির্ণয়ে ক্রোম্যাটোগ্রাফি এক অপূর্ব পদ্ধতি তা নয়, সুস্থ শরীরে বিভিন্ন বস্তুর, বিশেষ করে নানা রকম খাস্থ ও তাথেকে উৎপন্ন জৈব পদার্থের এবং গ্রন্থি-নিঃসৃত নানা রসের ক্রিয়া-বিক্রিয়া জানা চিকিৎসাবিস্থার অন্ততম বিচার্য—কেন না, স্বাভাবিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ব্যত্যয় ঘটলে তবেই নানা রকমের বিকৃতি আসে এবং তাথেকে উদ্ভব হয় নানারকম ব্যাধির।

এমনিভাবে ক্রোম্যাটোগ্রাফি যখন বিজ্ঞানের রহস্থলোকের বহু বিস্ময়কে সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত করছিল, তখনই—এই বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অন্ততম নতুন দুই অধ্যায়ের সূচনা হয়। এদের একটি পারমাণবিক বিজ্ঞান (Nuclear science) এবং অন্যটি আণবিক বংশতত্ত্ব (Molecular genetics)। এই দুয়ের প্রাণবিন্দু হচ্ছে তেজস্ক্রিয় মৌলের পৃথকীকরণ এবং Deoxyribonucleic acid বা সংক্ষেপে DNA-এর গঠন ও তার কার্যনীতি জানা। এই সম্পর্কে ক্রোম্যাটোগ্রাফির ভূমিকা যে কি, সেটা পরিষ্কার হয়ে যায় যখন জানা যায়—

Dr. Waldo Cohn......worked on the Manhattan Project, which developed the atom bomb......studied the separation of elements by......ion-exchange chromatography. When the Manhattan Project achieved its goal, Dr. Cohn and his method suffered technological unemployment,...... Dr. Cohn decided to apply

his tool to nucleic acid chemistry (DNA chemistry)...... fundamental contribution Dr. Cohn made was the elucidation of how necleotides are strung together......

সুতরাং আর কোন সন্দেহই থাকে না যে, পরমাণু বোমা থেকে জীবের বংশগতির ধারক ও বাহক DNA অণুর প্রকৃতি ও কাজ সম্পর্কিত রহস্য উদ্ধারে ক্রোম্যাটোগ্রাফির কি অপূর্ব ভূমিকা। বস্তুতঃ পক্ষে ক্রোম্যাটোগ্রাফি তাই বিভিন্ন সময়ে বহু নোবেল পুরস্কার-বিজয়ীকে তাঁদের সাফল্যের পথে অভাবনীয় সাহায্য করেছে।

পদার্থ-বিশ্লেষণের পদ্ধতি উদ্ভাবনের ইতিহাসে ক্রোম্যাটোগ্রাফি এক অনবদ্য আবিষ্কার। আগামী দিনের মানুষ হয়তো আরও অনেক চমকপ্রদ সাফল্যের অধিকারী হবে—কেন না, বিশেষ করে Biological science অর্থাৎ জীব-বিজ্ঞান এখনও বহু রহস্যের মধ্যে ঢাকা রয়েছে। মানুষের প্রচেষ্টা একদিন সে সব রহস্যের মধ্যে নিহিত সত্যকে খুঁজে বের করবে এবং ক্রোম্যাটোগ্রাফি এই সাফল্যের অংশীদার হয়ে থাকবে।

ফটোগ্রাফি

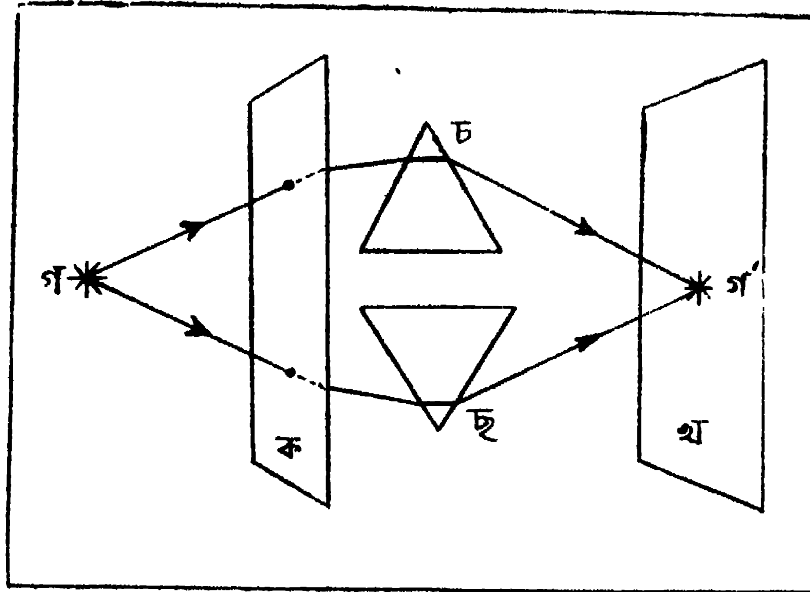
মঞ্জুয়া বিশ্বাস

যে কোন পরিবর্তনশীল ঘটনাকে ভবিষ্যতের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখবার প্রচেষ্টায় মানুষ ফটোগ্রাফির উদ্ভাবন করেছিল। ফটোগ্রাফি বর্তমানে আর উদ্ভাবনের প্রথম দিনটির রূপে নেই, এখন আমরা ফটোগ্রাফির স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপকেই দেখি।

ফটোগ্রাফি সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমে ক্যামেরার কার্যনীতি সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ষোড়শ শতাব্দীতে ইতালীয় বিজ্ঞানী পোর্টা তাঁর দরজা-জানলা বন্ধ ঘরে বসে এক অদ্ভুত ঘটনা লক্ষ্য করেন। জানলার ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে যে সূর্যরশ্মি ঘরের ভিতর এসে পড়েছিল, তা উল্টো দিকের দেয়ালে বাইরের দৃশ্য অবিকল উল্টো-ভাবে চিত্রিত করেছিল। এই ব্যাপারটাকে তিনি ক্যামেরা অবস্কিউরা আখ্যা দেন। এই শব্দটা থেকেই বর্তমানের ক্যামেরা কথাটার উৎপত্তি। আমরা জানি কোন উজ্জ্বল বস্তু থেকে নির্গত আলোকরশ্মি যদি অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে, তবে যেহেতু আলো একই মাধ্যমে সরলরেখায় চলাচল করে, সেহেতু ছিদ্রের উল্টো দিকে প্রকোষ্ঠের দেয়ালে ঐ বস্তুর একটা উল্টো আকৃতি পাওয়া যাবে। এই দেয়ালে একটা ফটোগ্রাফিক প্লেট রেখে ঐ উজ্জ্বল বস্তুর ছবি তোলা যায়। এই ফটো-গ্রাফিক প্লেট সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে। এই ছবির স্পষ্টতা নির্ভর করে মুখ্যতঃ আলোর তীব্রতা ও ছিদ্রের সূক্ষ্মতার উপর। ছিদ্রের আকার যখন অপেক্ষাকৃত বড় হয়, তখন এই ছিদ্র কয়েকটা ক্ষুদ্র ছিদ্রের সমষ্টি বলে প্রত্যেকটা আলাদা ছিদ্রের জন্যে আলাদা আলাদা ছবি বা প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয়। এই প্রতিবিম্বগুলির একটা অপরটার উপর পড়ে আসল ছবিটাকে অস্পষ্ট করে তোলে।

এখন আমরা যে সব ক্যামেরা ব্যবহার করি, সেগুলি উপরিউক্ত নীতিকে ভিত্তি করেই

আরও উন্নততর প্রণালীতে তৈরি করা হয়েছে। উপরে প্রতিবিম্বের যে অস্পষ্টতা সম্বন্ধে বলা হলো, সেই অস্পষ্টতা দূর করবার জন্যে লেন্সের ব্যবহার প্রচলিত হয়। অবশ্য লেন্স ব্যবহারের আগে একটা ক্ষুদ্র ছিদ্রের বদলে ফটোগ্রাফির প্লেটের উল্টো দিকের দেয়ালে উপরে ও নীচে দুটি ছিদ্রের ব্যবস্থা ছিল। উপরের ছিদ্র দিয়ে যে প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হতো, তাকে একটা প্রিজ্‌মের সাহায্যে নীচের দিকে বাঁকিয়ে প্লেটের মাঝামাঝি জায়গায় কেন্দ্রীভূত করবার ব্যবস্থা ছিল, বিপরীতক্রমে নীচের ছিদ্র দিয়ে যে প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হতো, তাকে আর একটা প্রিজ্‌মের (এই প্রিজ্‌মের শীর্ষবিন্দু আগের প্রিজ্‌মের শীর্ষবিন্দুর উল্টোদিকে অবস্থিত) দিয়ে উপরের দিকে বাঁকিয়ে প্লেটের মাঝখানে কেন্দ্রীভূত করা হতো (১নং চিত্র)। এর ফলে দুটি ছিদ্রের দ্বারা গঠিত প্রতিবিম্ব দুটি পরস্পরের উপর আপতিত হয়ে প্রতিবিম্বকে স্পষ্ট করে তুলতো। উপরিউক্ত প্রিজ্‌ম দুটির বদলে একটা উত্তল লেন্স ছিদ্র দুটির সামনে রেখে একই ফল পাওয়া যায় বলে এর পরবর্তী সময়ে প্রিজ্‌মের বদলে লেন্সের ব্যবহারই প্রচলিত হলো (২নং চিত্র)। দুটি প্রিজ্‌মের বদলে একটা লেন্স ছিদ্রের সামনে রেখে একই ফল পাওয়া যায়। তার কারণ, লেন্সের উপর ও নীচের অর্ধাংশ পর্যায়ক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রিজ্‌মের কাজ করে। এই কারণেই ক্যামেরায় লেন্স ব্যবহার করা হয়। লেন্সের ক্ষমতার উপর ছবির ভালমন্দ বহুল পরিমাণে নির্ভর করে।



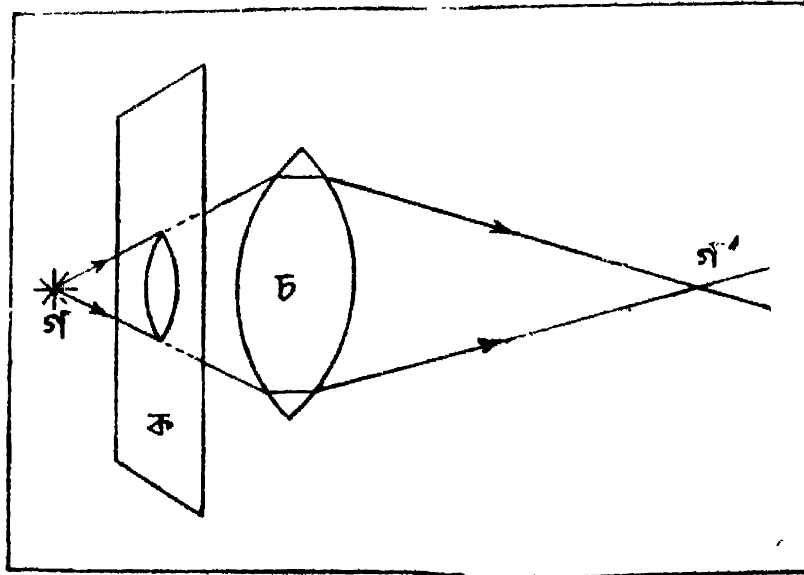
১নং চিত্র

চিত্রে গ ও গ' যথাক্রমে স্বচ্ছ বস্তু ও পর্দায় প্রাপ্ত প্রতিবিম্ব। গ থেকে নির্গত আলোক ক পর্দার ছিদ্র দুটির মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে প্রিজ্‌ম চ ও ছ-এর দ্বারা বিচ্যুত হয়েছে এবং খ পর্দায় স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব গ' তৈরি করেছে।

মানুষের চোখে আইরিশ যেমন আলোর প্রবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে, ক্যামেরাতেও সেই রকম আলোক-নিয়ন্ত্রণকারী আইরিশ থাকে, যেটাকে বলা হয় অ্যাপারচার। দৃশ্য বস্তুর উপর আলোর তীব্রতা যখন প্রকট, তখন অ্যাপারচারকে নিয়ন্ত্রিত করে ক্যামেরায় আলোর প্রবেশকে বাধা দেওয়া হয়, যাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আলো প্লেটের

উপর পড়ে ছবিকে নষ্ট করে না দেয়। ক্যামেরার লেন্সকে প্রয়োজনমত এগিয়ে বা পিছিয়ে দৃশ্য বস্তুকে স্পষ্ট করা হয় অর্থাৎ ফোকাসে আনা হয়। চোখের পাতার মত ক্যামেরার শাটার প্রয়োজনমত খুলে ক্যামেরায় আলো ঢুকতে দেওয়া হয়।

আগে যে ফটোগ্রাফির প্লেটের কথা বলা হয়েছে, এবার সেই ফটোগ্রাফির প্লেট ও তার উপর আলোর ক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। সিলভার বা রূপার সঙ্গে ক্লোরিন, ফ্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিনের সংযোগে যে সব যৌগিক পদার্থ তৈরি হয়, তাদের বলা পরিষ্কার বর্ণহীন তরল পাওয়া যায়, তার তরল অংশ শুকিয়ে নিলে সিলভার নাইট্রেটের স্বচ্ছ দানা পাওয়া যায়। এর সঙ্গে ক্লোরিন, ব্রোমিন ইত্যাদির সংযোগের ফলে সিলভার হ্যালাইড তৈরি হয়। এই সব হ্যালাইড অংশ জলে দ্রবীভূত না হবার জন্যে এদের সাহায্যে খুব মসৃণ প্রলেপ দেওয়া যায় না। এই কারণে বর্তমানে প্লেটের উপর প্রথমে জিলাটিনের প্রলেপ দিয়ে পরে সিলভার-লবণের প্রলেপ দেওয়া হয়। জিলাটিনের প্রয়োগে সিলভার-লবণের আস্তরণ দেবার কাজে সুবিধা হয়। তাছাড়াও এর উপস্থিতির জন্যে সিলভার-লবণের আলোর



২নং চিত্র

১নং চিত্রের প্রিজ্‌ম্ দুটির বদলে একটা উত্তল লেন্স চ-এর দ্বারা প্রতিবিম্বের গঠন-নীতি দেখানো হয়েছে।

হয় সিলভার হ্যালাইড। এই সিলভার হ্যালাইডের উপর আলোর একটা বিশেষ ক্রিয়া আছে। আলো যখন সিলভার হ্যালাইডের উপর এসে পড়ে তখন আলোর ক্রিয়ায় এই সব হ্যালাইড থেকে সিলভার পরমাণু মুক্ত হয়ে যায়। নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে রূপার ক্রিয়ায় যে সংস্পর্শে সক্রিয়তা বেড়ে যায়। সেলুলয়েড প্লেটের উপর অবদ্রব মাখাবার সময় যাতে ফেনা না হয়, সে উদ্দেশ্যে অবদ্রবের সঙ্গে অ্যালকোহল মেশানো হয়। কাচ ও সেলুলয়েড স্বচ্ছ বলে আলোকরশ্মি অবদ্রব ভেদ করে কাচ বা সেলুলয়েডের পিছনের তল থেকে প্রতিফলিত

হয়ে ফিরে আসবার পথে অবদ্রবের উপর অনাবশ্যক ক্রিয়া করে। এই প্রতিফলন বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে অবদ্রবের উল্টোদিকে কাচ বা সেলুলয়েডের গায়ে বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থের প্রলেপ দেওয়া থাকে।

ক্যামেরায় এক্সপোজার দিলে অর্থাৎ অ্যাপারচারের মাধ্যমে আলোককে ক্যামেরার ভিতরে প্রবেশ করতে দিলে ফটোগ্রাফিক প্লেটের (এর উপর বস্তুর উল্টো প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় বলে একে বলা হয় নেগেটিভ) উপর আলো এসে পড়ে। বিভিন্ন সিলভার হ্যালাইডের মধ্যে ফটোগ্রাফিক প্লেটের অবদ্রব হিসাবে সিলভার ব্রোমাইডের ব্যবহারই বেশী। আপতিত আলোকের ক্রিয়ায় সিলভার-লবণের সিলভার পরমাণু ও ব্রোমিন পরমাণু আলাদা হয়ে যায়। দৃশ্যবস্তুর দেহ থেকে প্রতিফলিত আলোর তীব্রতার পার্থক্য অনুযায়ী ফটোগ্রাফিক প্লেটের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন পরিমাণে সিলভার পরমাণু মুক্ত হয়। এর পর যখন ফিল্মটাকে পরিস্ফুটনের জন্যে (অর্থাৎ আলোর ক্রিয়ায় বস্তুর যে অদৃশ্য ছবি তৈরি হয় তাকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে) ডেভেলপিং সলিউশনে ডুবানো হয় তখন এই সলিউশনের রাসায়নিক উপাদানগুলির ক্রিয়ায় সিলভার পরমাণুগুলি ফিল্মের উপর শক্তভাবে এঁটে যায়। আলোর প্রভাবে অধিকাংশ সিলভার ব্রোমাইডই ভেঙে যায়, কিন্তু সামান্য যে কয়েকটা সিলভার ব্রোমাইডের অণু অবিভক্ত থাকে, সেগুলি ফিল্মটাকে নির্দিষ্ট সময় হাইপোর জলে (সোডিয়াম থায়োসালফেট, $Na_2S_2O_3, 5H_2O$) ডুবিয়ে রাখলে ধুয়ে বেরিয়ে আসে। হাইপোর দ্রবণ সাধারণতঃ খুব ঘন নেওয়া হয়, কেন না সিলভার ব্রোমাইডের সঙ্গে ময়লা হিসাবে সামান্য পরিমাণ সিলভার আয়োডাইড থাকে, যা কেবল মাত্র ঘন হাইপোর দ্রবণেই দ্রবীভূত হয়। শেষ পর্যন্ত ফিল্মে থাকে কালো রঙের বিশুদ্ধ সিলভার। এই কারণেই ডেভেলপিং-এর পর দেখা যায় ফিল্মের যেখানটায় খুব আলো পড়েছিল, সেখানটা খুব কালো আর যে সব জায়গায় আলো কম পড়েছিল, সে জায়গাগুলি স্বচ্ছ। এটাকেই বলা হয় নেগেটিভ। আসল বস্তুর ঠিক উল্টো অর্থাৎ আসল বস্তু যেখানে কালো, নেগেটিভে সেটাকে সাদা দেখায় এবং বিপরীতক্রমে আসল বস্তু যেখানে সাদা, নেগেটিভে সেটাকে কালো দেখায় বলেই একে নেগেটিভ বলা হয়। ডেভেলপিং ও হাইপোর জলে ধুয়ে স্থায়িকরণের (Fixation) পর নেগেটিভটাকে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নেওয়া হয়, কারণ হাইপোর সঙ্গে কিছু পরিমাণ দ্রবণীয় সিলভার থায়োসালফেট থাকে, যেটা ভালভাবে দ্রবীভূত না করলে ক্রমশঃ সিলভার সালফাইডে রূপান্তরিত হয় এবং ছবি অস্পষ্ট করে তোলে। ধোয়ার পর নেগেটিভ থেকে ফটোগ্রাফিক কাগজে ছবির পজিটিভ প্রিন্ট নেওয়া হয়, যেগুলিকে আমরা আলোকচিত্র বলি। নেগেটিভের যেখানে কালো, ফটোগ্রাফির কাগজে সেখানটা সাদা—বিপরীতক্রমে নেগেটিভের সাদা জায়গাটা ফটোগ্রাফির কাগজে কালো দেখায়। এর ফলে ফটোগ্রাফির কাগজে আমরা বিষয়বস্তুর সঠিক ছবিটা পাই। প্রিন্ট করবার সময় নেগেটিভটাকে আর একটা সিলভার ব্রোমাইড কাগজের উপর চাপিয়ে (অবদ্রব মাখানো দিক পরস্পরের সংযোগে রেখে) আলোর সামনে নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী রাখা হয়। নেগেটিভে যেখানে মুক্ত সিলভারের পরিমাণ বেশী, সেখান দিয়ে আলো নীচের ফটোগ্রাফির কাগজে যেতে পারে না, কাজেই সেখানটা সাদা থাকে। কিন্তু নেগেটিভের যেখানটা স্বচ্ছ সেখান দিয়ে আলো নীচের কাগজে যেতে কোন বাধা পায় না ও ডেভেলপ করবার পর সেই জায়গাটা কালো দেখায়। নেগেটিভে যেখানে কালো রঙের মুক্ত সিলভার

দেখতে পাওয়া যায়, আসল বস্তুর সেখানটা ও পজিটিভ প্রিন্টে সেখানটা সাদা। নেগেটিভের স্বচ্ছ অংশের কথাও অনুরূপভাবে চিন্তা করলে আমরা দেখি যে, পজিটিভ প্রিন্টে বস্তুর সঠিক ছবিই দেখতে পাওয়া যায়। নেগেটিভ থেকে লেন্সের সাহায্যে ইচ্ছামত বড় ছবি তৈরি করা যায়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় এনলার্জিং।

অনেক সময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে রঙীন ফিল্টার ব্যবহার করা হয়। প্রখর সূর্যের আলোয় ছবি তোলবার সময় ফিল্টার না দিয়ে ছবি তোলবার জন্যে বিভিন্ন রঙের পার্থক্য সঠিকভাবে বোঝা যায় না, কিন্তু ফিল্টার ব্যবহার করলে এই রঙের পার্থক্য ছবির মধ্যে ধরা পড়ে। ক্যামেরায় লেন্সের ক্ষমতা বেশী হলে নানা রকম ফিল্টার ব্যবহার করা যায়। সাধারণতঃ বিভিন্ন রঙীন ফিল্টারের মধ্যে পাত্‌লা হল্‌দে ফিল্টারের ব্যবহারই বেশী।

আগে আমরা যে ফটোগ্রাফির আলোচনা করেছি, তাতে শুধুমাত্র সাদা ও কালো রঙের মাধ্যমেই ছবিকে পরিস্ফুট করা যায়, কিন্তু সমস্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকেই শুধু মাত্র সাদা আর কালোর মাধ্যমে উপভোগ করা চলে না, তাই উদ্ভাবিত হলো রঙীন ফটোগ্রাফির। আমাদের দৃশ্য রংগুলির সবই তিনটি প্রধান রং অর্থাৎ নীল, সবুজ ও লালের যথোপযুক্ত সংমিশ্রণে গঠিত। রঙীন ফটোগ্রাফিতে যে ফিল্মগুলি ব্যবহার করা হয়, তাতে একটা স্তরের বদলে তিনটি বিভিন্ন স্তরে অবদ্রব মাখানো থাকে। সর্বপ্রথম স্তরের উপর নীল, দ্বিতীয় স্তরে সবুজ আর তৃতীয় স্তরে লাল আলো পড়লে এই স্তরগুলি প্রভাবিত হয়। প্রথম দুটি স্তরের মাঝখানে একটা শোষক স্তর থাকে, যেটা নীল আলো-কে দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করতে দেয় না। একেবারে শেষ স্তরের নীচে একটা অ্যান্টি-হেলেশন স্তর থাকে, যেটা অপ্রয়োজনীয় আলো-কে শোষণ করে, যাতে নীচের স্তর থেকে ফিরে যাবার পথে এই আলো ছবিকে ক্ষতিগ্রস্ত না করতে পারে। সূর্য থেকে নির্গত অতিবেগুনী বিকিরণ রঙীন চিত্রের পক্ষে ক্ষতিকারক। এই কারণে সূর্যালোকের তুলনায় কৃত্রিম আলোতে রঙীন ছবি তোলা শ্রেয়। রঙীন ফটোগ্রাফিতে কিভাবে আলো এই তিন স্তরের উপর কাজ করে এবং পরিস্ফুটন ইত্যাদির জটিলতর পদ্ধতি সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা সম্ভব নয়।

অল্প কথায় ফটোগ্রাফি নিয়ে মোটামুটি আলোচনা করা হলো। সভ্যতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উন্নততর রূপে ফটোগ্রাফিও সমান তালে এগিয়ে চলেছে। এতদিন পর্যন্ত আমরা শুধুমাত্র দ্বিমাত্রিক ছবি তুলতেই সক্ষম হয়েছি। কিন্তু বাস্তব বস্তুর মাত্রা তিনটি, যার একটি মাত্রার শুধুমাত্র আভাসটুকু আমরা ফটোর মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারি। কিন্তু বর্তমানে নব আবিষ্কৃত লেসার রশ্মির সাহায্যে কোন বস্তুর ত্রিমাত্রিক ছবি তোলাও সম্ভব হয়েছে। এই নতুন পদ্ধতির ফটোগ্রাফিতে বস্তুর চেহারা সম্পূর্ণভাবেই ফুটিয়ে তোলা যায় এবং তা কোন লেন্স ইত্যাদির সাহায্য ব্যতিরেকেই। এই নতুন পদ্ধতিকে বলা হয় হোলোগ্রাফি, যার বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে পূর্ণলেখন। বর্তমানে এই হোলোগ্রাফিকে চলচ্চিত্রে ব্যবহারের জন্যে প্রচুর চেষ্টা করা হচ্ছে। এই নব-আবিষ্কৃত ত্রিমাত্রিক ছবি ফটোগ্রাফির ভবিষ্যৎকে প্রচুর সম্ভাবনাময় করে তুলেছে।

উদ্ভিদের রোগ

নিশাংশু মুখোপাধ্যায়

১৯ শতকের আয়ার্ল্যাণ্ডের শস্যসম্পদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—গম ছেড়ে প্রায় সমগ্র দেশটাই আলুর চাষে লেগে গেছে। এক বিঘা জমিতে যত গম উৎপন্ন হয়ে থাকে, তার অনেক গুণ বেশী আলু ফলতে পারে—এটাই কি আলুর চাষের কারণ? কারণটা যাই হোক, ১৯ শতকের প্রথম দিকে মাঠগুলি সবুজ আলুর গাছে ছেয়ে গেল। এটা ১৮৪৪ সালের কথা। পরের বছরই এক কাণ্ড ঘটলো। সবুজ আলুর ক্ষেত এক সপ্তাহের মধ্যে দেখতে দেখতে শুকিয়ে পচে কালো হয়ে গেল, দুর্ভিক্ষ এলো—মানুষের ইতিহাসের বিশেষ পরিচিত আইরিশ ফ্যামিন। আইরিশরা না খেয়ে মরলো, দেশ ছেড়ে পালালো। সুদূর আমেরিকাতেও বিভিন্ন শহরে যে এত আইরিশ পুলিশ, তার কারণ এটাই। আয়ার্ল্যাণ্ডের এই দুর্ভিক্ষ একে কার্যতঃ ইংল্যাণ্ড থেকে আলাদাও করলো। আর এটা হলো শুধু আলুর একটা রোগের জন্যে—নাম "নাবি ধসা"। যে জীবাণু এটা ঘটালো সেটা অতি নিরীহ দেখতে ও ছোট—নাম ফাইটোপথরা ইনফেসটান্স (Phytopthora infestans)—একটা ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদাণু। ১৯৪৩ সালে বাংলা দেশে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তাতে চালের অভাবের একটা কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, ধান গাছের একটা রোগ ব্রাউন স্পট (Brown spot)। জীবাণুটা একজাতীয় ছত্রাক, নাম হেলমিন্থোস্পোরিয়াম ওরাইজি (Helminthosporium oryzae)। বাইবেলে দেখি—মানুষের প্রতি জেহোভার অভিশাপে আছে—ব্লাস্টিং, মিলডিউ, পঙ্গপাল ইত্যাদি। প্রথম দুটি গাছের রোগ। সলোমনকে প্রার্থনা করতে শোনা গিয়েছিল ব্লাস্টিং ও মিলডিউ থেকে মুক্তির জন্যে। রোমানরা তাদের রাষ্ট্ গড্ (Rust god)-এর কাছে প্রার্থনা করতো। রাষ্ট্ (Rust) একজাতীয় রোগ. বিভিন্ন উদ্ভিদের (গম, বার্লি ইত্যাদি) এই রোগ দেখা যায়। ছত্রাক জাতীয় জীবাণু এই রোগের কারণ আর রেবিগো মানুষের কল্পনা করা রাস্টের দেবতা। এথেকে বোঝা যাচ্ছে, সেই যুগের মানুষ গাছের রোগ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে কতটা সচেতন ছিল। ঐ রোগগুলিকে অবশ্য তারা ঈশ্বরের দেওয়া শাস্তি বলেই ভাবতো। এথেকে এই রোগগুলি যে কতটা পরিচিত ও ভয়ঙ্কর ছিল, তা সহজেই বোঝা যায়। অবশ্য তখনকার মানুষ নিশ্চয়ই জানতো না—এই রোগগুলি কি ভাবে হচ্ছে বা এর মূলে কোন জীবাণু থাকতে পারে। এগুলি মানুষ জেনেছে অনেক পরে।

জীবাণুর গতিবিধি সর্বত্র—বাতাসে, জলে, মাটিতে—এক-একটা জীবাণুর এক-এক রকম পরিবেশ পছন্দ। এরা ঘুরে বেড়ায় হাওয়ায়, জলে, প্লেনে, ট্রেনে, মানুষের হাতে-পায়ে-গায়ে ও চাষের যন্ত্র প্রভৃতিতে। আমেরিকায় চাষের জন্যে চেষ্ট্নাট নিয়ে যাওয়া হলো, কেউ জানলোই না যে, ওর মধ্যে লুকিয়েছিল এণ্ডোথিয়া প্যারাসিটিকা (Endothia parasitica) নামে এক প্রকার ছত্রাক জাতীয় জীবাণু। সেগুলি বাড়তে লাগলো মার্কিন দেশে সবার অলক্ষ্যে। কয়েক বছরের মধ্যে এমন অবস্থা হলো যে, মার্কিন সরকার কয়েকটা বড় বড় বাগান পুড়িয়েই দিল, যাতে অন্যগুলিকে অন্ততঃ এই সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচানো যায়।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি ইংল্যাণ্ডে চা আর কফি পানকারীর সংখ্যা ছিল সমান সমান। তখন সিংহল সবচেয়ে বেশী কফি উৎপাদন করতো, অর্থাৎ সিংহল আগে ইংরেজদের কফি বাগান ছিল বলা যায়। তারপর ভারত, মালয়, জাভা ও সিংহলে কফিতে ছত্রাক জাতীয় রোগ দেখা গেল। ছত্রাকটা হেমিলিয়া ভাস্টাট্রিক্স (Hemilia vastatrix)। রোগটা কফির প্রচুর ক্ষতি করলো—শোনা যায় এক বছরে নাকি পাঁচ লক্ষ ডলার। সেখানকার বাগিচা-মালিকেরা ধ্বংস হয়ে গেল। ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক উঠে গেল। সিংহল অন্য রাস্তা না পেয়ে চায়ের চাষ সুরু করলো। ইংরেজরাও চা পানে মন দিল। কারণ তারাই তখন সিংহলের শাসনকর্তা, কাজেই চা পাওয়ারও সুবিধা। কিন্তু চা পাতায় আবার অন্য এক ক্ষুদে ছত্রাকের আক্রমণ সুরু হলো। রোগটা হলো ব্লিস্টার ব্লাইট (Blister blight)।

এবার আমরা তণ্ডুল জাতীয় শস্যের কথায় আসি। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় মানুষ বিভিন্ন রকমের তণ্ডুল জাতীয় শস্য (গম, ভূট্টা, রাই, চাল) চাষ করে থাকে; যেমন—সাধারণতঃ আমেরিকার দক্ষিণের লোকেরা ভূট্টার রুটি খায় অথচ উত্তরের লোকেরা খায় গমের রুটি। দু-জায়গার বাসীন্দারাই তো আসতে এসেছিল ইংল্যাণ্ড থেকে, যেখানে তারা খেতো গমের রুটি। দক্ষিণের লোকেরা যে গম ছেড়ে ভূট্টা ধরলো, তার কারণ কি? কারণটা হলো, গমে রাষ্ট্ (Rust) রোগের আক্রমণ। দক্ষিণের আবহাওয়াটা এই রোগ আক্রমণের পক্ষে খুবই উপযোগী। আবার দেখছি, উত্তর ইউরোপের লোকেরা রুটি বলতে বোঝে গমের রুটি অথচ মধ্য ইউরোপের লোকেরা বোঝে রাইয়ের (Rye) রুটি। রুটি কথাটির অর্থ ইংল্যাণ্ডে আর ইটালীতে গমের রুটি, জার্মেনীতে রাইয়ের রুটি। এগুলিকে গমের রাষ্টের কীর্তি বলে ধরা হয়। গমটা সারা জগতের মানুষ সাধারণতঃ বেশী পছন্দ করে রুটি খাবার জন্যে। যেখানে লোকে ভূট্টা বা রাই খাচ্ছে, তখন বুঝতে হবে সেখানে গমের চাষ অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। আসলে বৃটেনে বৃষ্টি আছে, কিন্তু শীত বেশী বলে রাষ্ট্ কম। তাই গম চাষে বাধা নেই। মধ্য ইউরোপে বসন্তে স্যাঁতসেতে অথচ গরম আবহাওয়া, তাই গমে রাষ্টের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। মানুষকে বাধ্য হয়ে রাইয়ের চাষ করতে হয়েছে। আবার দক্ষিণ ইউ. এস. এ-তে ভূমধ্যসাগরীয় আবহাওয়া যে এলাকায়, সেখানে বসন্তকালটা গরম হলেও আবহাওয়া কিন্তু শুষ্ক, তাই রাষ্ট্ কম। টেক্সাস, ওকলাহামার লোকেরা তাই গমের চাষ করছে। রাষ্টের পক্ষে দরকার গরম অথচ স্যাঁতস্যাতে আবহাওয়া।

মধ্যযুগে মানুষেরই একটা ভীষণ রোগ দেখা দিল। রোগটার নাম সেণ্ট আণ্টনীস ফায়ার (St. Antony's fire)। এতে আঙ্গুলগুলি সব ফুলে উঠতে লাগলো আর ভীষণ ব্যথা, খুব বেশী জ্বর হতে লাগলো। মানসিক রোগও দেখা গেল, গর্ভবতী মেয়েদের অকালে গর্ভপাতও ঘটতে লাগলো। কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল, রাইয়ে আরগট্ (Ergot) নামে একটা রোগ হচ্ছে তখন। এর কারণ ছিল ক্লাভিসেপস্ পারপুরিয়া (Claviceps purpurea) নামে এক জাতীয় ছত্রাক। আর এই রোগগ্রস্ত রাই থেকে হচ্ছে এই সব রোগ। আরও খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, এই রোগগ্রস্ত রাইয়ে (এতে Ergot বা Sclerotia তৈরি হয়) আরগট্রিন (Ergotrin) নামে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে, যা এই সব রোগ উৎপত্তির জন্যে দায়ী। থুলিয়ার নামক এক উদ্ভিদরোগ-তত্ত্ববিদ এসবের খোঁজ নিয়ে বিপদ থেকে বাঁচালেন। এই রোগটা হঠাৎ কিছুদিন আগে উত্তর ভারতে বাজ্‌রায় দেখা গেছে, কিন্তু

এক্ষেত্রে বিপদ বেশী দূর এগোয় নি, কারণ মানুষ আগের অভিজ্ঞতা থেকেই সতর্ক হয়েছিল।

উদ্ভিদের রোগের মধ্যে কয়েকটা রোগ এক-একটা বাগানকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলেছে, যেমন—১। সিংহলে গত শতাব্দীর শেষে কফি রাষ্ট্ (Coffee rust) রোগ আরবীয় কফির চাষই প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে, ২। সিংহল এবং আরও কয়েক জায়গায় রবার চাষ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল শুধু দক্ষিণ আমেরিকার লিফ ব্লাইট (South American leaf blight) রোগটার জন্যে। তবে আজকাল জোড়কলম পদ্ধতিতে গাছ লাগিয়ে এই রোগের উপদ্রব কিছুটা কমানো সম্ভব হয়েছে, ৩। কেনিয়া সরকার নরম কাঠশিল্পের জন্যে সাইপ্রেস (Cypress macrocorpa) চাষ সুরু করেছিল। বছর কুড়ি নিশ্চিন্তে কেটে গেল। তারপর ভীষণভাবে আক্রমণ সুরু হলো ট্রাঙ্ক ক্যাঙ্কার (Trunk Cankar) রোগের, ৪। কলার চাষ সুমাত্রা, মধ্য আমেরিকা থেকে প্রায় উঠে যাচ্ছিল, যদি সিগাটোগা (Sigatoga) রোগটা ওষুধ ছড়িয়ে কমানো না যেতো, ৫। কলার পানামা রোগ (Panama) বহু ধনী চাষীকে পানামা এবং কোষ্টারিকা থেকে গৃহহারা করেছে।

একটা মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় আগাছা, রোগ আর পোকা—এই তিন শত্রু মিলে একটা শীতপ্রধান দেশেই গাছের ফলন প্রায় ২০% কমাতে পারে, আর এর মধ্যে শুধু রোগের জন্যে ৭%। আমাদের দেশের মত গ্রীষ্ম ও বর্ষাপ্রধান দেশের আবহাওয়ায় গাছের রোগ হওয়ায় এবং সেই রোগ মহামারীর আকার ধারণ করবার সম্ভাবনা যেমন বেশী, হয়ও তাই। তাই দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষেও যা ফলন হতে পারতো, তার একটা বিরাট অংশ শুধু রোগে নষ্ট হচ্ছে।

মানুষের সমাজের উপর উদ্ভিদের রোগগুলির অশেষ প্রভাব আর জীবাণুগুলি শুধু গাছের রোগ ঘটাতেই নয়—সব সময়েই আমাদের খাদ্যশস্য ধ্বংসের চেষ্টা করছে। এক রকম জীবাণু মাঠেই বীজকে আক্রমণ সুরু করে। এরা বীজের অঙ্কুরোদ্গমই হতে দেয় না। আর এক দল জীবাণু ছোট ছোট চারা অবস্থাতেই গাছকে মেরে ফেলে। উদ্ভিদ রোগতত্ত্বের ভাষায় যাকে বলা হয় চারাধসা রোগ (Seedling blight)। তারা বড় গাছের গোড়ায়, কাণ্ডে, পাতায়, ফুলে ও ফলে সর্বত্র আক্রমণ চালায়। রাস্তায় যখন গাড়ীতে করে ফসল নিয়ে যাওয়া হয়—একদল জীবাণু তার মধ্যেই আক্রমণ চালায় (Transit disease)। ভাঁড়ারে পৌঁছাবার পর এদের আক্রমণে ফসলের যে রোগ হয়, তাকে বলা হয় ষ্টোরেজ রোগ (Storgae disease)। এর পর হয় বাজারে রোগ (Market disease)। এমন কি, রান্নার পরেও এরা ছাড়ে না, যদিও এই শেষের জীবাণুগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। তাই এদের উদ্ভিদ রোগতত্ত্বের আওতায় আনা হয় না।

প্রথমেই বোঝা দরকার, উদ্ভিদ রোগটা সাধারণতঃ শ্রেণীর—একজনের নয়, তাই এখানে একটা গাছ তত মূল্যবান নয়, যতটা মূল্যবান একটা ক্ষেত বা বাগান। তাই একে বলা হয় প্ল্যান্ট পাবলিক হেল্‌থ সায়েন্স (Plant public health science)। এই কথাগুলি অবশ্য উদ্ভিদ রোগতত্ত্বের প্রয়োগের দিকের। কিন্তু বিজ্ঞানের দিক থেকে একটা গাছের মূল্যও কম নয়।

মানুষের রোগতত্ত্বের মত উদ্ভিদ-রোগতত্ত্বেও রোগটাই আসল, রোগ-বীজাণু বা রোগ উভয়ই আলাদাভাবে গৌণ। ১৮৬৬ সালে যেদিন আন্টন ডি. বারী (Anton de Bary) বলেছিলেন যে, একটা রোগ জীবাণুর (Pathogen) হাত রয়েছে এই রোগের পিছনে। এর আগে কিন্তু জীবাণুকেই বলা হতো রোগের ফল। ডি. বারীই

প্রথম বললেন, জীবাণু রোগের কারণ এবং এর ফলেই রোগতত্ত্ব-বিজ্ঞানের সুরু হয়েছিল।

আসলে কিন্তু উদ্ভিদের রোগটা কোন বিশেষ অবস্থা নয়। মানুষের যেমন জ্বর হয়, সেটা রোগ নয় রোগের একটা লক্ষণ মাত্র। গাছের বেলায়ও তেমনি, পাতার দাগটা (Leaf spot) রোগের লক্ষণ মাত্র। রোগটা হচ্ছে একটা অস্বাভাবিক, অবিচ্ছিন্ন অনিষ্টকর প্রক্রিয়া, যেটা রোগ-জীবাণুর দ্বারা বা তাদের ছাড়াও হতে পারতো। তা অবিচ্ছিন্ন ক্ষতিকর প্রক্রিয়া হতে হবে। এনিয়ে অবশ্য অনেক তর্ক আছে।

গাছের রোগগুলি প্রধানতঃ ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদের দ্বারাই হয়ে থাকে। এরা ক্লোরোফিল-বিহীন সুতার মত উদ্ভিদাণু। শুধুমাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই দেখা যায়। ইটালীয় বিজ্ঞানী ফন্টানা ১৭৬৬ সালে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে রাষ্ট্ রোগগ্রস্ত গমের পাতা দেখে বুঝতে পারেন নি যে, এরাই রোগের কারণ। দশ বছর পরে ফরাসী টাকশালের কর্মী টিলেট গমের স্মাট (Smut) রোগের কালো কালো গুঁড়া (Spores) নিয়ে নতুন ভাল গমের বীজের সঙ্গে মিশিয়ে নতুন গাছে স্মাট রোগের সৃষ্টি করেন। এটা কিন্তু পাস্তুরের ঐতিহাসিক আবিষ্কার। ভেড়ার দেহে জীবাণু ঢুকিয়ে অ্যানথ্রাক্স রোগ ঘটাবার ১০ বছর আগের ঘটনা। এখন দেখা যাচ্ছে যে, ছত্রাক যেন উদ্ভিদের জন্মশত্রু—এমন উদ্ভিদ বোধ হয় নেই, যাদের এরা আক্রমণ করে না।

যাই হোক, এই ছত্রাক বেশীর ভাগ উদ্ভিদ-রোগের কারণ হলেও উদ্ভিদ-রোগ আরও অনেক রকমের ব্যাক্টিরিয়া কর্তৃক উৎপন্ন হয়। পচা আলুর বেলায় উইল্ট (Wilt) জীবাণু সিউডোমোনাস (Pseudomonas) রোগগ্রস্ত গাছের আলুর মধ্যে থেকে যায়। লেবুর বেলায় সাইট্রাস ক্যাঙ্কার (Citrus canker) জীবাণু এবং অন্য জাতের নাম জ্যান্থোমোনাস (Xanthomonas) আর ধানের বেলায় জীবাণু জ্যান্থোমোনাস, কিন্তু উভয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রথমটাকে বলা হয় সাইট্রি (X-Citri), পরেরটাকে ওরাইজী (X-Oryzae)।

এর পরে যে রোগের নাম পাওয়া গেল তা ছত্রাক না ব্যাক্টিরিয়া, অথচ সংক্রামক রোগের মত এই গাছ থেকে ওই গাছে ছড়িয়ে যাচ্ছে। প্রথমে কিছু না জেনেই তার নাম দেওয়া হয়েছিল ভাইরাস (Virus) অর্থাৎ বিষ। ভাইরাস বোধ হয় জীব ও জড়ের মাঝামাঝি একটা বস্তু (Entity)—যে সবচেয়ে ছোট এবং নিজে নিজে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে। এগুলি এত ছোট যে, সাধারণ বা সবচেয়ে শক্তিশালী আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও দেখা যায় না। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই বস্তুটিকে ৩০,০০০ থেকে ৮০,০০০ গুণ বড় দেখা যায়। বাড়ীতে দেখি পেঁপে গাছটার পাতাগুলি কুকড়ে যাচ্ছে, কুঁমড়ো পাতায় হলদে ছোপ বা বেগুনের পাতা তুলসী পাতার মত ছোট হয়ে যাচ্ছে, ঢেঁড়সের পাতাগুলি হলদে হতে হতে সাদা হয়ে যায়—এমন কি, যা দু-একটা ছোট ঢেঁড়স হয় তাও সাদা। এসবই ভাইরাসদের কীর্তি। সব ভাইরাস এক নয়। এক এক জায়গায় এক এক জাতের ভাইরাস।

এরপর নিমাটোড (Nematode) নামে এক-জাতের সুতার মত প্রাণী আছে, সাধারণতঃ খালি চোখেই এদের দেখা যায়। এরা কয়েক জাতীয় উদ্ভিদে রোগের সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ এরা মাটিতে থাকে এবং গাছের শিকড় আক্রমণ করে। অনেক সময় গাছের উপরিভাগেও আক্রমণ চালায়। মাঠে টোম্যাটো ও পাট প্রভৃতি গাছের গোড়া, শিকড় ফুলে ওঠে, গাছটার উপরের দিকটায় আস্তে আস্তে বৃদ্ধি কমে যায় এবং ক্রমশঃ শুকিয়েও যায়।

ঐ ফুলো জায়গাগুলির মধ্যে এরা বাসা বাঁধে। এই রোগকে বলে রুট-নট (Root knot)।

যে সব রোগ ঘটাতে কোন জীবাণু লাগে না, তাদের এক কথায় ফিজিওলজিক্যাল ডিজিজ (Physiological Diseases) বলা হয়। এর মধ্যে গাছের খাদ্যবস্তু ও অন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির আধিক্য, স্বল্পতা, অসাম্য ইত্যাদি থাকে। গাছের প্রধান যথা—নাইট্রোজেন (N), ফস্ফরাস (P) ও পটাসিয়াম (K) এবং অন্য প্রয়োজনীয় পদার্থগুলির কম, বেশী বা অসমতা উদ্ভিদের স্বাস্থ্যের নির্ধারক। এছাড়া উদ্ভিদের কতকগুলি প্রয়োজনীয় ধাতব পদার্থ রয়েছে। সেগুলি একটু কম বা বেশী হলেই সর্বনাশ। তার ফলে নানা প্রকার স্বাস্থ্য-সমস্যা দেখা দেয়; যেমন—লেবুর ডাইব্যাকের (Dieback) অনেক কারণের মধ্যে একটা হচ্ছে, মাটিতে তামার (Cu) অভাব। এতে গাছ উপর থেকে আস্তে আস্তে কাঁটাসার হয়ে শুকিয়ে যায়।

এসব ছাড়া অধিক তাপ বা অতি ঠাণ্ডা, বেশী জল, কম অক্সিজেন (এই দুটি গাছের গোড়াতে হলে), তুষারপাত, বজ্রপাত, ইট-খোলা বা অন্য কোন কলকারখানার ধোঁয়া রোগ হতে পারে।

উদ্ভিদের হাজারো রকম রোগের প্রতিকার করা মানুষের আসল সমস্যা। মানুষ রাসায়নিক দ্রব্য ছড়িয়ে এবং রোগ-প্রতিরোধক জাতের গাছ লাগিয়ে চেষ্টা করছে এগুলিকে ঠেকাতে। এখন উদ্ভিদ-রোগ প্রতিরোধের জন্যে রোগ আসবার অপেক্ষায় বসে থাকলে চলে না। সম্ভাব্য রোগের কথা ভেবে চাষের বিভিন্ন স্তরে অর্থাৎ বীজ থেকে সুরু করে ফসল কাটবার আগে পর্যন্ত আমাদের জানা রোগগুলির প্রতিরোধের উপায় প্রয়োগ করতে হবে।

সোভিয়েট ও জাপানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে হেলিকপটার পর্যন্ত ব্যবহার করা হচ্ছে, প্রয়োজনমত উদ্ভিদ-রোগ প্রতিরোধক ওষুধ বড় বড় মাঠে ছড়াবার জন্যে। আকাশ থেকে খুব অল্প পরিমাণে ওষুধ সূক্ষ্ম কণিকায় ভেঙ্গে বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, অর্থাৎ প্রয়োজন মত চাষের প্রতিটি স্তরে সম্ভাব্য রোগের প্রতিরোধক ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

আজকে আমাদের পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ লোক ক্ষুধার্ত। চাষের জমি বাড়াবার সম্ভাবনাগুলিও কষ্টসাধ্য; অন্ততঃ বর্তমান ব্যবস্থাতে তো বটেই। একজন কৃষিবিদের কাছে এটাই মনে হবে যে, উৎপাদন বাড়াতে না পেরে মানুষের ক্রমবর্ধমান সংখ্যাকে খাদ্যাভাবের জন্যে দায়ী করা পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচায়ক। কারণ এখনও পৃথিবীর একটা বিরাট অংশের জমিতে উৎপাদন যতটা হতে পারে—হচ্ছে তার চেয়ে অনেক কম।

অধিক উৎপাদন করবার সমস্যা অনেক এবং বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থায় তার প্রভাব বিভিন্ন। এটাও সত্য যে, প্রধান সমস্যাটা জমির, যার উপরে চাষ হবে এবং সেইভাবে ভাবলে উদ্ভিদের স্বাস্থ্যরক্ষা তো দূরের কথা, সামগ্রিকভাবে ফসলের চাষ করবার সমস্যাটাও মূল সমস্যা নয় এবং আসেও অনেক পরে—এটা আমরা জানি। তবু এক জায়গায় যখন চাষ আরম্ভ হয়েছে, তখনকার সমস্যা হিসাবে উদ্ভিদের স্বাস্থ্যরক্ষাও একটি সমস্যা—অধিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে তার প্রতিকারের কথাও ভাবা দরকার।

সঞ্চয়ন

ব্রঙ্কাইটিসের নতুন ওষুধ

ব্রঙ্কাইটিস একটি অতি সাধারণ রোগ। পৃথিবীর সকল অঞ্চলে শিশু, বৃদ্ধ সকলেরই এই রোগ হতে পারে।

লণ্ডনের দু-জন কেমিষ্ট ২০ বছরের চেষ্টায় দুটি ওষুধের মিলনে এমন একটি নতুন ওষুধ উদ্ভাবন করেছেন, যা এই রোগের সকল পর্যায়ে রোগ নিরাময় করতে সক্ষম হবে বলে দাবী করা হয়েছে।

এই দু-জন কেমিষ্ট ডাঃ এস. বুশবি ও ডাঃ জি. হিচিং প্রায় ১,০০০ রকমের জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন। এমন কি, তাঁরা তাঁদের নিজদেহে ওষুধের প্রভাব পরীক্ষা করে দেখেছেন।

দুটি ওষুধের মিলনে প্রস্তুত ওষুধটির নাম সেপট্রিন। এটি খাবার জন্যে এবং শিশুদেরও বয়সানুপাতিক মাত্রায় এটি খাওয়ানো চলে। আসলে সেপট্রিন কোন নতুন ওষুধ নয়। দুটি জানা ওষুধের সম্মিলনে এটি তৈরি, যে দুটি ওষুধের একটির ব্যবহারে এই রোগ সারে না।

এযাবৎ ব্রঙ্কাইটিস রোগে ব্যবহৃত ওষুধগুলির কাজ ছিল রোগ-জীবাণুর বংশবৃদ্ধি রোধ করা এবং এভাবে রোগীর অবস্থা আর খারাপ হতে না দেওয়া। সেপট্রিন সম্বন্ধে দাবী করা হয়েছে যে, যে দুটি ওষুধের সম্মিলনে এটি প্রস্তুত, তাদের প্রত্যেকটি রোগ-জীবাণুর খাদ্যের সামনে স্বতন্ত্র অন্তরায় গড়ে তোলে এবং খাদ্যের অভাবে জীবাণুগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। জীবাণুগুলি একটি অন্তরায়কে এড়াতে সক্ষম হলেও আর একটিকে পারে না।

এপর্যন্ত পাওয়া খবরে জানা গেছে, ১০০টির মধ্যে ৮০টি ক্ষেত্রে ৫ দিনের মধ্যে রোগ নিরাময় হয়েছে। একজন ৭৩ বছরের রোগী দীর্ঘকাল ধরে এই রোগে ভুগছিলেন, তিনি এই ওষুধে আরোগ্য লাভ করেছেন।

সিয়েরা লিওন থেকে ৩২ বছরের এক মহিলা রোগী যখন লণ্ডনের হাসপাতালে এসে পৌঁছুলেন তখন তার ভীষণ জ্বর, কিন্তু মাত্র তিন দিন সেপট্রিন চিকিৎসার ফলে তাঁর জ্বর নেমে গেল।

দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা এই রোগে ভুগছেন এবং প্রতি শীতকালে হাসপাতালে কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন, তাঁদের কাছে সেপট্রিনের আবির্ভাব আশীর্বাদস্বরূপ।

রোগীর প্রয়োজন মেটাতে ওষুধটিকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেওয়া যেতে পারে বলে দাবী করা হয়েছে; অর্থাৎ ঐ জীবাণু থেকে অন্য যে সব রোগের উৎপত্তি হয়ে থাকে, তাতেও প্রয়োগ করা চলবে। এই বিষয়ে আরও গবেষণা চলছে।

সমুদ্রের রহস্য ও রত্ন সন্ধানে

আমেরিকান ও সোভিয়েট মহাকাশচারীদের কাহিনী পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষকে যেভাবে চমৎকৃত করেছে, সেভাবে কিন্তু এই পৃথিবীর বিস্তৃত অজানা অঞ্চল সমুদ্রে অভিযান মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি, যদিও তা এই গ্রহের প্রায় পাঁচ ভাগের চার ভাগ জুড়ে রয়েছে।

চন্দ্র থেকে প্রত্যাগত মহাকাশচারীদের এমন কোন আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করবার সম্ভাবনা খুব কম, যা মানুষের ব্যবসায়িক কাজে লাগবে। অন্য দিকে সমুদ্রের গর্ভে এমন সব সম্পদ রয়েছে, যা মানুষ এখনো পর্যন্ত কাজে লাগায় নি। মৎস্য শিকারের জন্যে তার বিশাল ও জটিল নৌবহর এবং সমুদ্র-গর্ভ থেকে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস আহরণের কথা ধরেও একথা বলা চলে।

সমুদ্র থেকে ভবিষ্যতে আমরা কি কি পেতে পারি এবং ভবিষ্যতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সমুদ্রের ভূমিকা কি হবে, সে সম্বন্ধে কিছু ধারণা পাওয়া যায় সম্প্রতি লণ্ডনে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট থেকে

বিভিন্ন তাপমাত্রা ও লবণ-ঘনত্বের সমুদ্র-জল প্রতিনিয়ত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হচ্ছে এবং বাতাসের সংস্পর্শে এসে আবহাওয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, যদি আমরা এই সব সমুদ্রস্রোতকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পারি, তাহলে আমরা আরো উন্নত ধরণের আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে সক্ষম হবো।

আবার সমুদ্রস্রোতেই এক জায়গার খাদ্যকণা অন্যত্র গিয়ে জমা হয় এবং হয়তো এভাবেই মৎস্যের জন্ম ও বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করে।

সমুদ্র-জলে লবণের অংশ ছাড়া আরও নানাবিধ উপাদান রয়েছে, সুতরাং সমুদ্র সংক্রান্ত রাসায়নিক গবেষণা মানুষের পরম উপকার করবে।

রিপোর্টটি দিয়েছেন বৃটিশ সরকার কর্তৃক গঠিত এক কর্মীদল। সরকার সমর্থিত নৌ-বিজ্ঞান ও কারিগরী গবেষণায় কাজ আরো উন্নত করবার উদ্দেশ্যে এই দলটি গঠিত হয়।

সমুদ্রের সবচেয়ে সহজলভ্য সম্পদ অবশ্য মাছ। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত এলাকায় মাছের চাষের অনেক অগ্রগতি ঘটেছে; যেমন—উপকূলবর্তী তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে গরম জল ছেড়ে যে কোন প্রকার শস্যের মতই এখন মাছের চাষ করা হয়ে থাকে। এভাবে অতি উচ্চমানের চিংড়ি, অয়েষ্টার প্রভৃতি এবং মাছ এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে যে, বৃটেন ভবিষ্যতে মাছ রপ্তানী করতে সক্ষম হবে বলে আশা করছে।

সমুদ্র থেকে এখন যে মাছ ধরা হয়, তা সমুদ্রের মৎস্য-সম্পদের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। বিশেষ ধরণের মাছের বংশবৃদ্ধির জন্যে পরিবেশের পরিবর্তন করা যেতে পারে। সমুদ্রের মাছকে খাদ্য হিসাবে সরবরাহ করবার কথা অনেক দেশই এখন ভাবছে। বর্তমান রিপোর্টে গলদা চিংড়ির জন্যে কৃত্রিম বাসস্থান তৈরির কথা বলা হয়েছে। এভাবে কোন বিশেষ এলাকায় গলদা চিংড়ির সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। কি ধরণের বাসা গলদা চিংড়ির পছন্দ—বিজ্ঞানীরা এখন তাই নিয়ে চিন্তা করছেন।

নর্থ সী থেকে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল পাওয়া গেছে এবং আরও অনুসন্ধানের কাজ চলছে।

বৃটেনের কন্টিনেন্টাল সেলফ-এর পরিমাণ মূল ভূখণ্ডের প্রায় চার গুণ। এই বিরাট জলমগ্ন ভূখণ্ডের ভৌগোলিক সমীক্ষার প্রয়োজনের কথা রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, গুরুত্বপূর্ণ একটি খনিজ সম্পদও যেন অনাবিষ্কৃত না থেকে যায়।

নর্থ সীর প্রাকৃতিক গ্যাসের পরেই প্রয়োজনের দিক থেকে সমুদ্র থেকে সংগৃহীত বালি ও উপলখণ্ডের বিষয়ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সব পদার্থের প্রায় ৭,০০০,০০০ টন বা মোট উৎপাদনের ১০ শতাংশ সমুদ্র থেকে আসে। এই বালি ও উপলখণ্ড বাড়ী তৈরির কাজে লাগে। তবে এভাবে সমুদ্র থেকে বালি সংগ্রহের ফলে হয়তো উপকূলভাগের ক্ষয় ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। এই সব প্রশ্নই বৈজ্ঞানিক-

দের বিবেচ্য। রিপোর্টে এই জন্তে সমুদ্র-গবেষণার সব দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মৎস্য-শিকার, খনিজ সম্পদ, উপকূল সংরক্ষণ, শিল্পমলের দ্বারা জল দূষিতকরণ ইত্যাদি ব্যাপারগুলি সবই গবেষণার বিষয়। সমুদ্র এখনো রহস্যময়। সমুদ্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজ করা—মহাকাশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজবার মতই রোমাঞ্চকর।

মানবদেহের তাপ কাজে লাগাবার অভিনব ব্যবস্থা

সারাদিনে এক-একটি মানুষের দেহ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে তাপ বিকিরিত হয়ে থাকে। সেই তাপকে কাজে লাগানো হয় না, সবটুকুরই অপচয় ঘটে, নষ্ট হয়ে যায়।

মানবদেহের এই তাপকে কল্যাণকর কাজে লাগাবার প্রশ্ন মানুষের মনে বেশ কিছুকাল আগেই জেগেছে। আমেরিকার পেনসিলভ্যানিয়া রাজ্যের জন্স টাউনের পিট্স্বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকবর্গের দেহের তাপ একটি অভিনব উপায়ে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা হয়েছে। তাদের দেহের এই তাপ ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের দশটি ভবনের শীতলতা দূর করা ও গরম রাখবার পক্ষে সহায়ক হয়েছে। এই ব্যবস্থায় কেবলমাত্র মানবদেহের তাপই নয়—ঘরের বৈদ্যুতিক আলো, রান্নাঘরের তাপ এবং জানালার মধ্য দিয়ে ঘরে যে সূর্যের আলো পড়ে, সেই সূর্যরশ্মির তাপকেও কাজে লাগাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

এই তাপ একটি কেন্দ্রে এসে সঞ্চিত হয় এবং সেই তাপ-ভাণ্ডার থেকে ভূগর্ভস্থিত নলের সাহায্যে তা বিভিন্ন স্থানে বণ্টন করা হয়। প্রচণ্ড শীতেও মানবদেহ থেকে সংগৃহীত তাপের সাহায্যে ঘরসমূহ গরম রাখা যায়।

মানবদেহের এই তাপ কাজে লাগাবার অভিনব ব্যাপারের উদ্ভাবক হচ্ছেন ওয়ারেন কার্টার। শীতল জল তাপ আত্মসাৎ করে—এই নিয়মকেই এখানে কার্যকরী করা হয়েছে।

মিঃ কার্টার এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলেছেন, যে গৃহে অনেক লোক রয়েছে, তাদের দেহের তাপ বায়ুতে সঞ্চারিত হচ্ছে। সেই তাপ ঐ গৃহের ছাদের উপর দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের মাধ্যমে সংগৃহীত হয় এবং সেই তাপকে প্রবাহিত করানো হয় ঠাণ্ডা জলভর্তি কতকগুলি নলের মধ্যে। এই সকল নলের সাহায্যে এই তাপ এসে সঞ্চিত হয় কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে এবং সংনমনের সাহায্যে তার তাপমাত্রা বাড়ানো হয় এবং অপকেন্দ্রিক পাম্পের সাহায্যে গরম জলবাহী নলের মাধ্যমে সেই তাপকে যেখানে প্রয়োজন সেখানে সরবরাহ করা হয়।

মিঃ কার্টার এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, সঞ্চিত তাপের যাতে অপচয় না ঘটে, তারই জন্তে প্রয়োজনমত তাপটুকু কাজে লাগাবার পর যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, তার জন্তে ইনসুলেটেড হট্ ওয়াটার ট্যাঙ্ক তৈরি করা হয়েছে। এই উষ্ণ জল-ভাণ্ডারের তাপ বিকিরিত হয় না। সপ্তাহান্তে ছুটির দিনে বা রাত্রিতে যখন এই প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট পরিমাণ তাপ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না, তখন এই সঞ্চিত ভাণ্ডারের তাপ কাজে লাগানো হয়।

তবে বিশেষ জরুরী অবস্থা দেখা দিলে বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যেও ঐ সকল নলের জলকে উত্তপ্ত করে চাহিদা মেটানো যেতে পারে।

এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় হিট রিক্লেম ব্যবস্থা। জল ঠাণ্ডা করবার একটি অপকেন্দ্রিক বা সেন্ট্রিফিউগ্যাল যন্ত্র রয়েছে এই পরিকল্পনার মূলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব কামরায় ক্লাস বসে, তারই একটিতে একতলায় মূল কারখানা ঘরে যন্ত্রটিকে স্থাপন করা হয়।

ঐ যন্ত্রটি ঐ সকল নলের জল থেকে তাপ সংগ্রহ করে এবং একটি কন্‌ডেন্‌সারে গিয়ে সেই তাপ জমা হয়। ফলে ঐ নলের প্রবাহিত জল ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে এবং সেই ঠাণ্ডা জলে আবার নতুন করে তাপ সঞ্চিত হয়।

তবে তাপ উদ্ধারের এই প্রক্রিয়াটি একেবারে অভিনব নয়। পাম্পের সাহায্যে তাপ সংগ্রহ করা যে সম্ভব, তা বিজ্ঞানীরা তাত্ত্বিক দিক থেকে ১৮৫২ সালেই উপলব্ধি করেছিলেন এবং ১৯৩২ সালে এই ধারণাকে কার্যকরী করা হয় প্রথম হিট পাম্প তৈরি করে।

কয়েক বছর আগে পর্যন্তও বাইরের বাতাস, জল—এমন কি, মাটি থেকে তাপ সংগ্রহ করা হতো। কিন্তু ১৯৫৮ সালে বিজ্ঞানীরা আরও সস্তায় তাপ সংগ্রহের পন্থা উদ্ভাবন করেন।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হচ্ছে, কোন গৃহের অভ্যন্তরস্থ তাপ সংগ্রহ করে তা বের করে দেওয়া। এই পরিকল্পনাকে যাঁরা রূপদান করেছিলেন, তাঁরা দেখলেন যে, এই তাপকে কাজে লাগানো যেতে পারে। তাঁরা তখন তাপ-নিষ্কাশন ব্যবস্থার সংস্কার করে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন এবং এক স্থানের তাপ সংগ্রহ করে অন্য স্থানে অর্থাৎ যে শীতল অঞ্চলকে গরম করবার প্রয়োজন—সেখানে প্রেরণের ব্যবস্থা করেন।

ক্যারিয়ার এয়ার কণ্ডিশনিং কোম্পানীর হারম্যান সি. হফম্যান বলেছেন যে, একটি বড় বাড়ীতে এই ভাবে তাপ কাজে লাগানো হচ্ছে। মিঃ কার্টার এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কিন্তু মানবদেহের তাপ কাজে লাগিয়ে দশটি ভবনকে গরম করবার ব্যবস্থা এর আগে উদ্ভাবিত হয় নি। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রূপায়ণের প্রাথমিক খরচও প্রায় তাই। তবে নতুন ব্যবস্থা চালু রাখবার খরচ মামুলী ব্যবস্থার তুলনায় প্রায় অর্ধেক এবং গরমের দিনে ঘর ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে উপরি খরচ পড়ে না।

একটা কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, গবেষণার ফলে দেখা গেছে, ছেলে বা মেয়ে যে যত বেশী পড়াশুনা করে, তার দেহ থেকে তত বেশী তাপ বিকিরিত হয়ে থাকে।

কৃষি বিভাগের প্রতি কয়েকটি কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

কৃষি বিভাগ বলিতেছেন যে, কৃষক সম্প্রদায় উন্নত কৃষি প্রণালীর প্রতি সচেতন হইয়াছেন, আমরা এই কথা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করতে পারি না। কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল কৃষক অবস্থাপন্ন অর্থাৎ যাঁহাদের জমাজমি অধিক, তাঁহারা উন্নত ধরণের কৃষির প্রতি আগ্রহশীল হইয়াছেন অর্থাৎ তাঁহারা উন্নত ধরণের বীজ, সার, ফসলের রোগ ও পোকা-মাকড়ের ঔষধাদি, উন্নত ধরণের হাতে-চালানো কৃষি-যন্ত্রাদি এবং জলসেচনের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু কৃষক সম্প্রদায়ের মোট সংখ্যার মধ্যে ইঁহাদের সংখ্যা শতকরা কত, তাহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। শতকরা সংখ্যা খুবই কম, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকদের অর্থাৎ যাঁহাদের জমির পরিমাণ অল্প এবং বর্গা চাষীদের সংখ্যাই বেশী। ইহারা উন্নত ধরণের কৃষি-প্রণালী অবলম্বন করিতে অসমর্থ। বিশেষতঃ তাঁহারা জলসেচনের কোন ব্যবস্থাই করিতে পারেন না। তাঁহারা কি টিউব ওয়েল ক্রয় করিয়া জমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা করিতে পারেন? গ্রামাঞ্চলে গেলেই এই কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, পরিসংখ্যান সংগ্রহ করিয়া সিদ্ধান্তে পৌঁছাইবার দরকার হইবে না। ইতিমধ্যেই দেখিতেছি যে, ব্যাঙ্ক কৃষক সম্প্রদায়কে অগভীর নলকূপ স্থাপন করিবার জন্য ঋণ দিতে অস্বীকার করিতেছেন, যদি সরকার জামিন না হন। সরকারও এই সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই। এই তো প্রকৃত অবস্থা! অথচ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষক ও ছোট ছোট বর্গা চাষীর উপরেই সামগ্রিকভাবে উন্নত ধরণের কৃষি-প্রণালী নির্ভর করে এবং সামগ্রিকভাবে দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হইতে পারে। আমি এক দীর্ঘ চিঠিতে (১৯৬৪ সালের ৩০ শে নভেম্বর) উপরিউক্ত বিষয়টির প্রতি American Ambassador Mr. Chester Bowles-এর মনোযোগ আকর্ষণ করি। তিনি তাঁহার ১৯৬৪ সালের ২১ শে ডিসেম্বর আমার চিঠির উত্তরে লেখেন—"I have sent your interesting letter of November 30, 1964. to several of our technical people for review and consideration. It seemed to me that your comment would be helpful to them in apprising the Indian agricultural situation. We have been aware of the fact that the case of the small Indian farmer requires special techniques of assistance and that these must be specially designed to meet his particular needs. Your letter clarifies this point very well indeed and also your point on the value of demonstration activities pitched directly at smaller cultivators. I believe the latter point too is finally achieving recognition. * * *

উপরিউক্ত চিঠির মোটামুটি অর্থ এই : তোমার ১৯৬৪ সালের ৩০ শে নভেম্বরের চিত্তাকর্ষক চিঠি আমি মন্তব্য ও মতামতের জন্য আমাদের বিশেষজ্ঞগণের নিকট পাঠাইয়াছি। আমার মনে হয় তোমার বক্তব্য ভারতীয় কৃষির অবস্থান নিরূপণ

করিবার জন্ত তাঁহাদের পক্ষে সহায়ক হইবে। আমরা জানি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকেরা বিশেষ ধরণের কলাকৌশলের সাহায্য চায় এবং তাঁহাদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত বিশেষ ধরণের কলা-কৌশলের প্রবর্তন আবশ্যক। বাস্তবিক তোমার চিঠিতে এই বিষয়টি অতি পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে এবং তুমি আরও পরিষ্কারভাবে বলিয়াছ যে, এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্ত প্রদর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার। আমি মনে করি এই বিষয়টি এখন স্বীকৃতি লাভ করিতেছে। * * *

ইহার পর চারি বৎসরের অধিক কাল কাটিয়া গিয়াছে। ছোট ছোট কৃষকদের জন্ত বিশেষ ধরণের কি কি কলা-কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে জানি না, গ্রামাঞ্চলে গিয়াও দেখিতে পাই না; বরং দেখি ছোট ছোট কৃষকেরা আগেও যেমন ছিলেন, বর্তমানে প্রায় সেই রকমই আছেন। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহারা সেই দেশীয় বীজ ব্যবহার করিতেছেন, দেশীয় প্রথায় চাষ-আবাদ করিতেছেন।

কৃষি বিভাগ মাঝে মাঝে ঘোষণা করেন—অমুক সালের মধ্যে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে। সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১৯৬৯-৭০ সালের শেষের মধ্যে দেশ খাদ্য সম্বন্ধে আত্মনির্ভরশীল হইবে। ইহাই হউক, ইহা আমরাও কামনা করি। কিন্তু কৃষি বিভাগের ঘোষণা কি কখনও বাস্তবে পরিণত হইয়াছে? ঐ একই ঘোষণার সঙ্গে কৃষি বিভাগ বলিয়াছেন যে, গত বৎসরের ১২৫০০০ একরের স্থানে এই বৎসর ২৫০,০০০ একরে বোরো ধানের চাষ করা হইবে, অর্থাৎ গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসর দ্বিগুণ পরিমাণ জমিতে বোরো ধানের চাষ হইবে। তাঁহাদের কথামত গত বৎসরের ১৯৫০০০ একরের স্থানে এই বৎসর ৩৫৩,০০০ একর জমিতে গমের চাষ করবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।* কৃষি বিভাগের পরিসংখ্যান লইয়া তর্ক-বিতর্ক করিতে চাহি না। কৃষি বিভাগের সহিত State Statistical Bureau-র পরিসংখ্যান সম্বন্ধে অমিল প্রায়ই দেখা যায়। দুইটিই সরকারী সংস্থা। এখন কথা হইতেছে, উপযুক্ত পরিমাণ জলসেচনের উপরেই বোরো ধান ও গম চাষের সফলতা নির্ভর করে। কৃষি বিভাগ কি উপযুক্ত পরিমাণ জলসেচনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন? জলের অভাবে বর্তমান বৎসরে অনেক স্থানেই গমের ফলন সন্তোষজনক হয় নাই। ইহাও জানি, জলের অভাবে হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া থানার অনেক স্থানে বোরো ধানের চাষ করা সম্ভব হয় নাই, অথচ ইহা দামোদর ক্যানেল অঞ্চল। সুতরাং জমির পরিমাণ ততটা বিবেচ্য নয়, যতটা বিবেচ্য ফসলের ফলন।

বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনের জন্ত জোরালো প্রচার কার্য চালান হউক, ইহাতে কাহারও কোন মতানৈক্য থাকিতে পারে না; কিন্তু তাহার সঙ্গে কতকগুলি সহজসাধ্য দেশীয় প্রণালীকে কিছুটা বৈজ্ঞানিকভাবে রূপায়িত করিয়া ঐগুলি কৃষকদের মধ্যে প্রচার করিতে দোষ কি? যেমন—(১) গর্তে গোবর সংরক্ষণ, (২) কম্পোষ্ট প্রস্তুত, (৩) সবুজ সারের ব্যাপক প্রচলন, (৪) মল-মূত্র ত্যাগের জন্ত Trenching ground-এর প্রচলন, (৫) গ্রামাঞ্চলে প্রত্যেক বাড়ীর পোড়ো জমিতে শাক-সব্জীর বাগানের প্রবর্তন। আরও অনেক এইরূপ সহজসাধ্য প্রণালীর কথা উল্লেখ করিতে পারি, কিন্তু তালিকা বড় হইয়া যাইবে এই ভয়ে করিলাম না। কংগ্রেসের শ্রীমতী আভা মাইতি গোবর সারকে স্বর্ণ সার বলিতেন—বাস্তবিক ইহা স্বর্ণ সার। ইহার তুলনায় কোন সারই স্থায়ী ফল দেয় না। এক-একটি ব্লকে ২।১টি গ্রামেও যদি সুষ্ঠুভাবে উপরিউক্ত সহজসাধ্য কৃষি-

*Statesman, ৩রা মে, ১৯৬৯

প্রণালী প্রবর্তিত হইত, তাহা হইলেও বলিতে পারিতাম কৃষি বিভাগ গ্রামের উন্নতি সম্বন্ধে আগ্রহশীল ও সচেষ্ট। কোথায় গেল বনমহোৎসব? কোথায় গেল Land Army? নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি বহু আড়ম্বরে, বহু ব্যয়ে ইহাদের প্রবর্তন করা হইয়াছিল। এইরূপ বহু উদাহরণ দিতে পারি, যেখানে গৌরী সেনের টাকার যথেষ্ট অপচয় হইয়াছে, কিন্তু স্থায়ী কোন ফল হয় নাই।

কৃষি বিভাগকে আর একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিতেছি। সেই কথাটি হইতেছে এই যে, সকল পরিকল্পনা, সকল প্ল্যান আমাদের লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকেরা যদি সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করেন, তবেই সামগ্রিকভাবে উন্নত কৃষি প্রবর্তিত হইবে এবং তবেই সামগ্রিকভাবে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু তাঁহাদের সামর্থ্য প্রধান বিবেচনার বিষয়। সুতরাং শস্যের ফলন নির্ধারণ করিবার সময় তাঁহাদের সামর্থ্যই মনে রাখিতে হইবে। যে কৃষকের পরিধানে বস্ত্র নাই, শীতের প্রকোপের সময় যাহার উপযুক্ত শীতবস্ত্র নাই, যাহার রোগের সময় চিকিৎসা, ঔষধ, পথ্যের ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা নাই, যাহার বাসস্থান জীর্ণ, চালে খড় নাই, দেওয়ালে মাটি নাই, সর্বোপরি যাহার দুই বেলা দুই মুঠা অন্ন জোটে না, যে ঋণে জর্জরিত, যাহার ন্যূনতম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নাই, যাহার পথে আরও বহু রকমের এইরূপ অন্তরায়, সে কি করিয়া শস্য উৎপাদনে চরম বা সর্বাধিক যত্ন লইবে? সুতরাং ফসলের ফলন নির্ধারণের সময় ইহাও কোমলতার সহিত বিচার করিতে হইবে, অর্থাৎ আশানুযায়ী সর্বাধিক ফলন হইতে কতক পরিমাণ বাদ দিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে একটি সত্য ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। একজন মজুর আমার গ্রামের বাড়ীর বাগানে কাজ করিতেছিল। আমার এক বন্ধু আমাকে দেখাইল যে, সে (মজুর) কাজ করিতেছে না, ফাঁকি দিতেছে। আমি বলিলাম 'একে তো ও (মজুর) খাদ্যাভাবে ক্লিষ্ট তাহার উপর মশারীর অভাবে ও (মজুর) প্রায় সারারাত ঘুমায় নাই। এই অবস্থায় ও (মজুর) এর চেয়ে আর কি বেশী কাজ করিবে? ও (মজুর) যে পরিমাণ কাজ করিতেছে ঐটাই ওর গড়পড়তা কাজের পরিমাণ ধরিয়া লইতে হইবে এবং সেই অনুসারে বাগান পরিষ্কার করিতে কত দিন লাগিবে এবং কত খরচ হইবে, তাহার হিসাব করিতে হইবে।

মহামান্য পোপ পল সম্প্রতি ভ্যাটিকানে (Vatican city) বলিয়াছেন—"দারিদ্র্য এবং আর্থিক উৎপীড়ন দূর করিতে হইবে। ইহা করিতে না পারিলে পৃথিবীর শান্তি অর্জন করা যাইবে না"। তিনি আরও বলিয়াছেন—শান্তির নূতন নাম হইতেছে উন্নয়ন (Development)। তিনি বলিয়াছেন "রাষ্ট্রবিপ্লব ব্যতিরেকে আর্থিক এবং সামাজিক সুবিচার লাভ করিতে হইবে। আর্থিক শোষণের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে এবং ক্লান্তিহীনভাবে যুদ্ধ চালাইতে হইবে এবং পৃথিবীর দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিতে হইবে; ইহা স্থগিত রাখা যায় না। বিনম্রভাবে এবং ভালবাসার সহিত এই কাজে অগ্রসর হইতে হইবে। শ্রমজীবীরা সামাজিক কল্যাণ এবং নিরাপত্তার বাহিরে পড়িয়া আছে, ইহাদের রক্ষা করিতে হইবে"।

পাঠকগণকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা যেন একবার চিন্তা করিয়া দেখেন আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকগণের প্রতি মহামান্য পোপের উপরিউক্ত উক্তিগুলি প্রযোজ্য কি না। রাষ্ট্রের কর্ণধারগণকে এবং কৃষি বিভাগের কর্তৃপক্ষদিগকেও বিনীতভাবে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন দেশের দরিদ্র, আর্থিক উৎপীড়িত এবং শোষিত ও সামাজিক অবিচারে

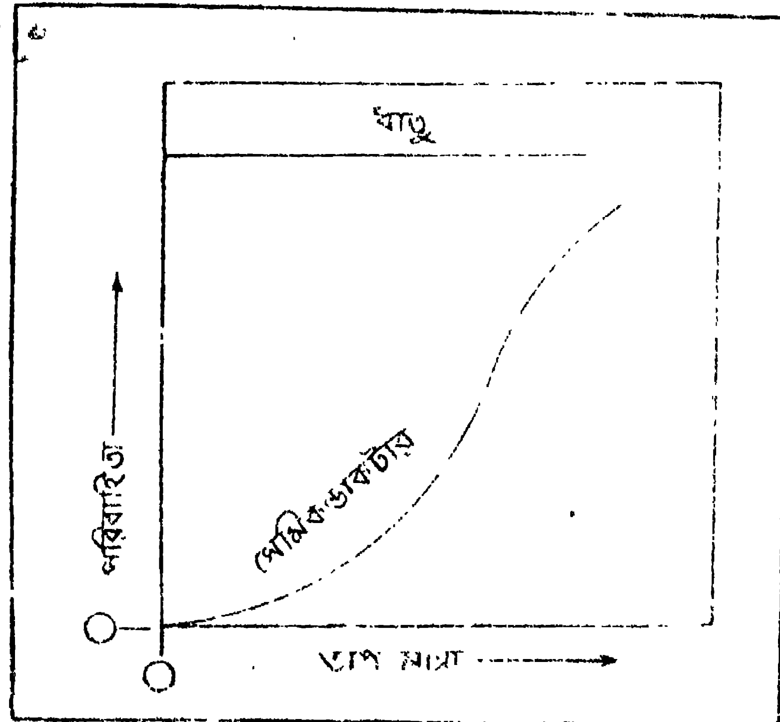
ক্লিষ্ট কৃষকদিগের জন্ত সহৃদয়তার প্ল্যান ও পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন।

দেশ ১৯৬৯-'৭০ সালের শেষের মধ্যে খাত্ত সম্বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে, কৃষি বিভাগের এই ঘোষণা সত্ত্বেও দেখিতেছি যে, স্থানে স্থানে চাউলের মূল্য উর্ধ্বগামী এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে বিদেশ হইতে খাত্তদ্রব্য আমদানী করা হইতেছে।

সেমিকণ্ডাক্টর

রবীন্দ্রনাথ মজুমদার

তড়িৎ-শক্তি আবিষ্কারের গোড়ার দিকেই বিভিন্ন পদার্থের তড়িৎ পরিবহনের ক্ষমতা বিচার করে সেগুলিকে পরিবাহী ও অপরিবাহী—প্রধানতঃ এই দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। কিন্তু কোন কোন পদার্থকে এই দুই বিভাগের কোনটাতেই ফেলতে না পারায় তাদের বলা হতো সেমিকণ্ডাক্টর বা অর্ধ-পরিবাহী।

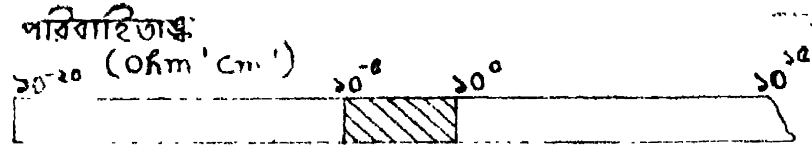


১নং চিত্র

আজকের দিনে সেমিকণ্ডাক্টরের এই সংজ্ঞা বড় বেশী ব্যাপক। আধুনিক সংজ্ঞানুযায়ী যে সব পদার্থের পরিবাহিতা তাপমাত্রা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে অর্থাৎ যাদের রোধ $\left(\text{পরিবাহিতা} = \frac{১}{\text{রোধ}}\right)$ তাপমাত্রা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়, কেবলমাত্র তাদেরই সেমিকণ্ডাক্টর বলা যাবে। চরম শূন্ত তাপমাত্রায়

(—২৭৩° সে.), তাদের পরিবাহিতাও শূন্য। সাধারণ ধাতুগুলি কিন্তু এই পর্যায়ে পড়ে না। তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে তাদের পরিবাহিতা কমতে থাকে, যদিও কমবার হার অত্যন্ত অল্প (চিত্র-১)।

কি জন্যে পদার্থের তড়িৎ-পরিবাহিতা, ধাতু কি জন্য সুপরিবাহী, কর্ক-গ্লাস-সিল্ক ইত্যাদি বস্তুই বা কেন অপরিবাহী, আবার সেমিকণ্ডাক্টরগুলির এই অদ্ভুত ধর্মই বা কেন—এইসব প্রশ্নের উত্তর বহুদিন থেকে বিজ্ঞানীরা খুঁজছেন এবং অনেক কিছু জানা গেলেও এই সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা এখনও মেটে নি।



২নং চিত্র

অপরিবাহী সেমিকণ্ডাক্টর ধাতবপরিবাহী

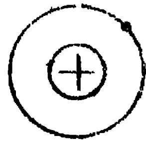
ধাতুর পরিবাহিতা যে তার মধ্যের অপেক্ষাকৃত মুক্ত ইলেকট্রনের জন্যেই—P. K. L. Drude এবং H. A. Lorentz-এর এই তত্ত্ব আজ সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু সেমিকণ্ডাক্টরের ক্ষেত্রে এরকম মুক্ত ইলেকট্রনের সম্ভাবনা আপাতদৃষ্টিতে নেই, তা সত্ত্বেও কেন তারা পরিবাহী (যদিও তাদের পরিবাহিতা ধাতুর চেয়ে অনেক কম—২ নং চিত্র) তা বুঝতে গেলে মৌলিক পদার্থের পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে কিছু অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

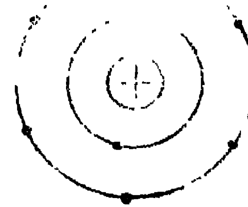
বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের জন্যে আমরা ধরে নিতে পারি, প্রত্যেক মৌলের পরমাণুগুলি তিন প্রকারের স্থায়ী কণা—ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের দ্বারা গঠিত। এদের মধ্যে প্রোটন ও নিউট্রনের ভর এক-একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সমান। কিন্তু সে তুলনায় ইলেকট্রনের ভর নগণ্য। নিউট্রন আধান-নিরপেক্ষ (Neutral) আর প্রোটন ও ইলেকট্রন যথাক্রমে একক ধনাত্মক এবং একক ঋণাত্মক আধানযুক্ত। যেহেতু স্বাভাবিক অবস্থায় যে কোন পরমাণুই আধান-নিরপেক্ষ, সেহেতু প্রতিটি পরমাণুতে প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান। এদের বিন্যাস সম্পর্কে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, প্রতিটি পরমাণুতে একটি করে কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াস আছে, যেখানে সবগুলি নিউট্রন ও প্রোটন একত্রে অবস্থিত এবং তার চারদিকে বিশেষ বিশেষ কক্ষপথে ইলেকট্রনগুলি প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণায়মান। কোন্ পরমাণুতে কতগুলি ইলেকট্রন আছে, তার উপর নির্ভর করে তাদের বিন্যাস নির্ধারিত হবে। শক্তির দিক থেকে বিচার করে দেখা গেছে, কোন স্তরে (n-তম) মোট যতগুলি ইলেকট্রন থাকতে পারে, তার সংখ্যা হলো $২ \times n^2$ — অর্থাৎ প্রথম স্তরে ২টি, দ্বিতীয় স্তরে ৮টি ইত্যাদি। ৩নং চিত্রের হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণুর গঠন থেকে স্পষ্টতর ধারণা করা যাবে।

কোন মৌলের যৌগ গঠনের ক্ষমতা নির্ভর করে সর্ববহিঃস্থ স্তরের (যোজ্যতা স্তর) ইলেকট্রনের সংখ্যার উপর। তাই এদের বলা হয় যোজ্যতা ইলেকট্রন। বিক্রিয়ার সময়ে বিভিন্ন পরমাণু পরস্পরের মধ্যে ইলেকট্রন আদান-প্রদান করে বা পরস্পর পরস্পরের ইলেকট্রন ভাগাভাগি করে

নিয়ে সর্ববহিঃস্থ স্তরে মোট আটটি ইলেকট্রন রাখতে চায়; কারণ সেই অবস্থাতেই তারা বেশী স্থায়ী হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—একটি হাইড্রোজেন পরমাণু যদি একটি ক্লোরিন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হতে চায়, তবে হাইড্রোজেন পরমাণুটি একটি ইলেকট্রন ক্লোরিনকে দেবে। ফলে হাইড্রোজেন ধনাত্মক ও ক্লোরিন ঋণাত্মক তড়িৎ সমন্বিত হবে। এভাবে ইলেক- পৃথক পৃথকভাবে যদি উভয় পরমাণুর অন্তর্গত মনে করা যায়, তবে উভয়েরই সর্ববহিঃস্থ স্তরে মোট ৮টি করে ইলেকট্রন হয় (চিত্র-৪)। এভাবে উৎপন্ন যৌগগুলিকে বলা হয় সমযোজী যৌগ (Covalent compounds)।

দেখা গেছে প্রায় সমস্ত সেমিকণ্ডাক্টর পদার্থই (যা মৌল ও যৌগ দুই-ই হতে পারে) সমযোজী। উদাহরণস্বরূপ জার্মেনিয়ামের কথা





৩নং চিত্র

হাইড্রোজেন পরমাণু
প্রোটন—১
নিউট্রন—০
ইলেকট্রন—১

অক্সিজেন পরমাণু
প্রোটন—৮
নিউট্রন—৮
ইলেকট্রন—৮

ট্রনের আদান-প্রদানের ফলে যে সব যৌগ গঠিত হয়, তাদের বলা হয় তড়িৎ-যোজী বা আয়নিক যৌগ (Electrovalent বা Ionic compounds)। কিন্তু যদি দুটি ক্লোরিন ধরা যাক। জার্মেনিয়াম স্ফটিক ঘনকাকৃতি (Cube) এবং ঘনক স্ফটিকগুলি চতুস্তলক (Tetrahedron) এককের দ্বারা গঠিত। প্রতিটি জার্মেনিয়াম পরমাণু অপর চারটি জার্মেনিয়াম



৪নং চিত্র

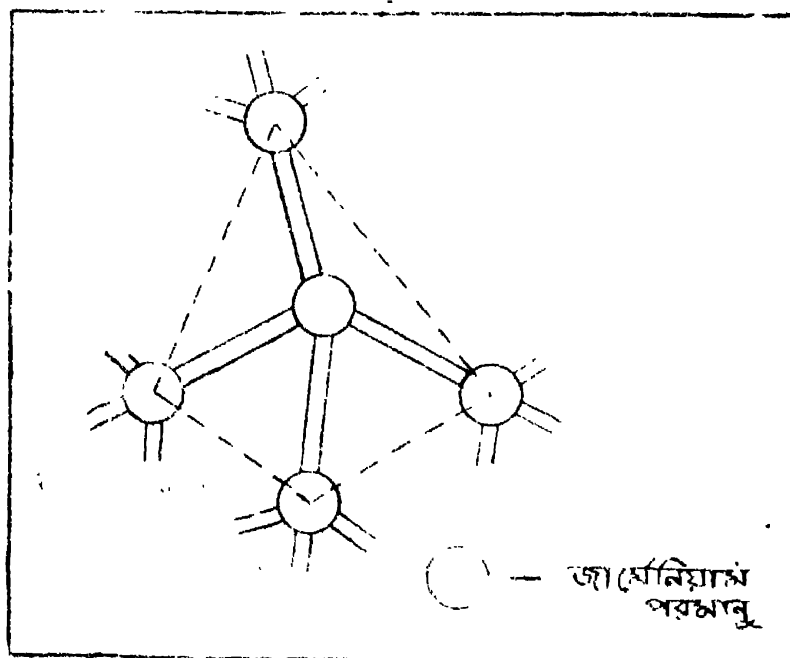
ক্লোরিন অণু (কেবলমাত্র বহিঃস্থ ইলেকট্রনগুলি দেখানো হয়েছে)

পরমাণু (ইলেকট্রন ১৭টি) মিলে একটি ক্লোরিন অণু গঠন করতে চায়, তবে তারা উভয়ে একটি করে ইলেকট্রন দিয়ে এক জোড়া ইলেকট্রনের একটি সেতু রচনা করে। এই ইলেকট্রন দুটিকে পরমাণুর সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত যে, তারা যেন একটি চতুস্তলকের চারটি শীর্ষে অবস্থিত (চিত্র-৫)। জার্মেনিয়াম পরমাণুতে প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা ৩২ এবং নিউট্রন আছে

৩২টি। সুতরাং তার পরমাণুর গঠন হবে চিত্র ৬-এর মত।

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, জার্মেনিয়াম (এবং তারই মত কার্বন, সিলিকন, টিন ও লেড) পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা এমন যে, বাইরের স্তরের ৪টি ইলেকট্রন যদি ৪-জোড়া ইলেকট্রন শূন্য তাপমাত্রায় তাদের ইলেকট্রনগুলি তাপীয় শক্তির প্রভাবে পরিবহন স্তরে উন্নীত হতে না পারায় তখন তাদের পরিবাহিতাও শূন্য। এই ধরণের সেমিকণ্ডাক্টরগুলিকে বলা হয় স্বভাবী সেমিকণ্ডাক্টর (Intrinsic Semiconductors)।

এছাড়া আর এক প্রকার সেমিকণ্ডাক্টর



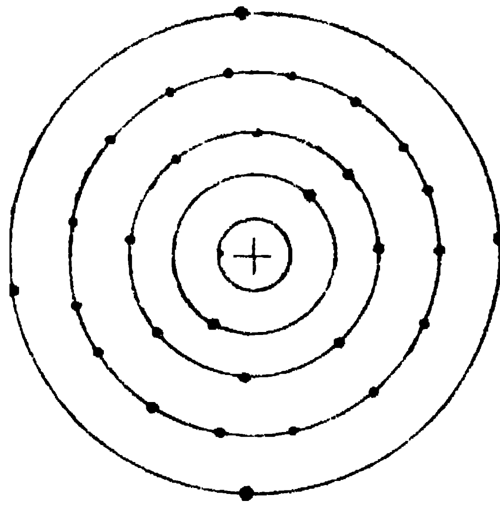
৭নং চিত্র

সেতু তৈরি করে সমযোজী যৌগগুলির মত, তবেই তাদের বাইরের স্তরে ইলেকট্রনের সংখ্যা ৮টি হবে। প্রকৃতপক্ষে জার্মেনিয়াম পরমাণুগুলি তাদের স্ফটিকে এভাবেই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত (চিত্র-৭)।

কতকগুলি সেমিকণ্ডাক্টর পদার্থ (যেমন—জার্মেনিয়াম, সিলিকন, লেড সালফাইড) উত্তপ্ত হলে তাদের যোজ্যতা-ইলেকট্রন শক্তি গ্রহণ করে যোজ্যতা স্তর থেকে পরিবহন স্তরে উন্নীত হয়। সে অবস্থায় তারা অপেক্ষাকৃত মুক্ত এবং বাইরের বিদ্যুৎ-চাপ প্রয়োগে তাদের সত্য সত্যই গতিশীল করা সম্ভব। অথচ চরম আছে, যারা তাদের পরিবহন ক্ষমতা লাভ করে অবিশুদ্ধতার জন্যে। এদের বলা হয় অস্বভাবী বা অবিশুদ্ধ (Extrinsic বা Impurity) সেমিকণ্ডাক্টর, মনে করা যাক জার্মেনিয়াম স্ফটিকে (চিত্র ৭) একটি জার্মেনিয়াম পরমাণু একটি আর্সেনিক পরমাণুর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে (উভয় মৌলের স্ফটিকের গঠন-রীতি একই রকম হলে এবং তাদের পরমাণুর আয়তনের বিশেষ তারতম্য না থাকলে এই ধরণের প্রতিস্থাপন সহজেই সম্ভব)। এখন আর্সেনিকের পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা ৩৩—অর্থাৎ জার্মেনিয়াম থেকে একটি বেশী, সুতরাং তার যোজ্যতা স্তরে পাঁচটি ইলেকট্রন

থাকবে। কিন্তু চারটি জার্মেনিয়াম পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার স্ফটিকের গঠন-বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখতে মাত্র চারটি ইলেকট্রনের প্রয়োজন। সুতরাং আর্সেনিকযুক্ত জার্মেনিয়ামে এই উদ্বৃত্ত ইলেকট্রনটি আধান-সংবাহকের (Charge carrier) কাজ করে জার্মেনিয়ামের পরিবাহিতায় সাহায্য করতে পারে।

অপর পক্ষে যদি জার্মেনিয়ামের একটি



৬নং চিত্র
জার্মেনিয়াম পরমাণু

পরমাণু একটি গ্যালিয়াম পরমাণুর (ইলেকট্রন-৩১) দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা সম্ভব হয়, তবে আগন্তুক পরমাণুতে জার্মেনিয়াম পরমাণুর চেয়ে একটি ইলেকট্রন কম থাকায় জার্মেনিয়াম স্ফটিকে একটি ইলেকট্রনের ঘাটতি তৈরি হবে। কোন ইলেকট্রন যোজ্যতা স্তর থেকে এই ঘাটতি পূরণ করতে হলে পিছনে আর একটি ধনাত্মক তড়িৎ-বিশিষ্ট ক্ষেত্র (Hole) তৈরি হবে এবং এমনি ভাবে এক-একটি ইলেকট্রনের এক-একটি Hole-এর সঙ্গে মিলিত হবার অর্থ—একটি Hole-এর গতিশীল হওয়া এবং সে জন্যে এরাও অস্বভাবী সেমিকণ্ডাক্টরের আধান-সংবাহক হতে পারে (চিত্র-৮)। যে সব অস্বভাবী সেমিকণ্ডাক্টরের পরিবাহিতা প্রধানতঃ Negative ইলেকট্রনের জন্যে, তাদের N-Type এবং যাদের পরিবাহিতা প্রধানতঃ Positive hole-এর জন্যে তাদের P-type সেমিকণ্ডাক্টর বলা হয়। নীচে কতকগুলি অতি পরিচিত সেমিকণ্ডাক্টরের নাম দেওয়া গেল—

মৌল—সিলিকন (Si), জার্মেনিয়াম (Ge), সেলেনিয়াম (Se), টেলুরিয়াম (Te)।

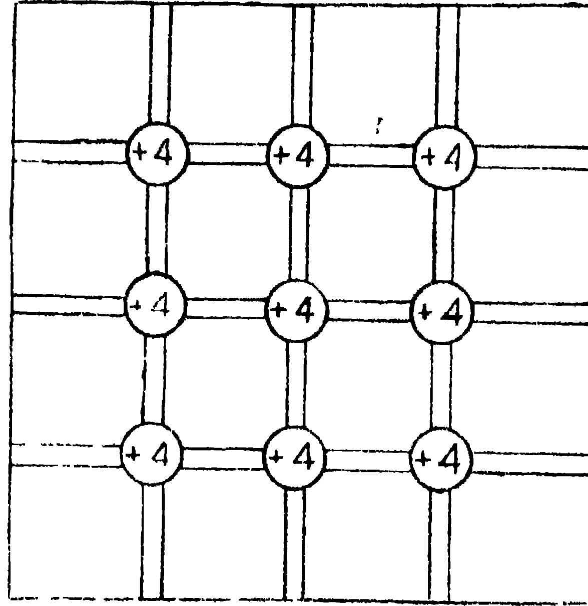
যৌগ—অক্সাইড—Al_2O_3, CdO, CuO, TiO_2, SnO_2, Cu_2O, NiO ইত্যাদি।

সালফাইড ও সেলেনাইড—PbS, CdS, ZnS, SnS, PbSe ইত্যাদি।

[Al — অ্যালুমিনিয়াম, Cd—ক্যাডমিয়াম, Cu—কপার, Ti —টাইটেনিয়াম, Sn — টিন, Ni—নিকেল, Pb—লেড, Zn—জিঙ্ক, O—অক্সিজেন এবং S—সালফার]

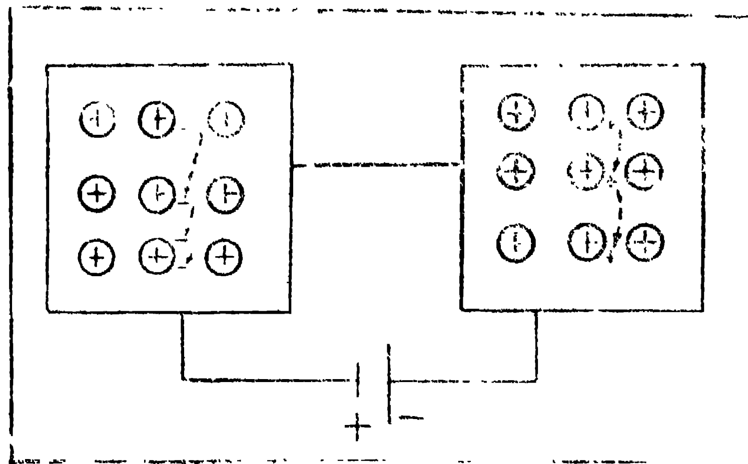
১৯৪৮ সালে বেল টেলিফোন লেবরেটরীতে সেমিকণ্ডাক্টর পদার্থের ট্র্যানজিষ্টরের ক্রিয়া আবিষ্কৃত হবার পর আজ সেমিকণ্ডাক্টরের নাম অশিক্ষিতদেরও কানে পৌঁছে গেছে। তখন থেকে এদের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে।

অত্যধিক সঙ্কেতের বিবর্ধন পাবার উপযোগী (Modulation) ইত্যাদি কাজের জন্যে আধুনিক কোন সেমিকণ্ডাক্টর ব্যবস্থাকে আমরা ট্র্যানজিষ্টর ইলেকট্রনিক যন্ত্রাদিতে (রেডিও, টেলিভিশন,



৭নং চিত্র

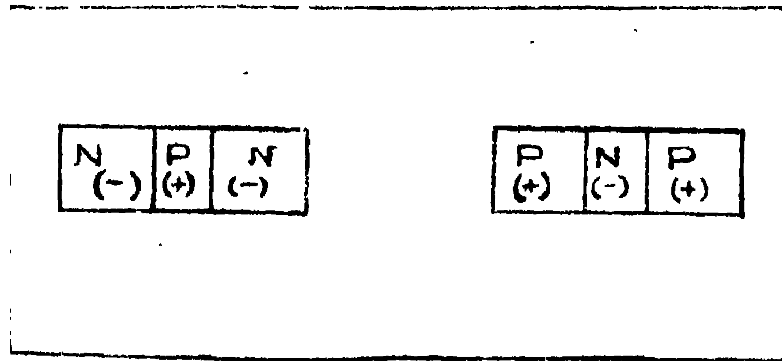
বলতে পারি। কিন্তু তড়িৎ-সঙ্কেতের বিবর্ধন কম্পিউটার ইত্যাদি) সেমিকণ্ডাক্টর নিত্য ছাড়াও পরিবর্তি তড়িৎ-প্রবাহের একমুখীকরণ নতুন উন্নতি আনছে।



৮নং চিত্র
আধান-সংবাহক ইলেকট্রন(−) ও hole (+)

(Rectification), তড়িচ্চুম্বকীয় সঙ্কেতের বেল টেলিফোন লেবরেটরীর প্রথম আবিষ্কৃত বিস্তার, কম্পাঙ্ক ইত্যাদির পরিবর্তন সাধন ট্র্যানজিষ্টর, যা Point Contact Transistor

নামে পরিচিত, এখন প্রায় অচল এবং তার স্থান অধিকার করেছে Junction Transistor —যাতে একটি মাত্র সেমিকণ্ডাক্টর স্ফটিকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় অবিশুদ্ধির প্রকৃতি ও পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে আধান-সংবাহক যথাক্রমে electron hole-electron বা hole-electron-hole রাখা হয়; অর্থাৎ এই সেমিকণ্ডাক্টর স্ফটিকটি প্রকৃত পক্ষে একটি N-P-N বা P-N-P সেমি-কণ্ডাক্টর একক (চিত্র-৯)।



৯নং চিত্র

আগে ট্র্যানজিষ্টরের কাজ চলতো ত্রিদ্বার ভাল্‌ব্‌ (Triode valve) নামক জটিলতর যন্ত্রের সাহায্যে। ত্রিদ্বার ভাল্‌ভের চেয়ে আকারে অনেক ছোট, দীর্ঘস্থায়ী এবং অনেক বেশী কার্যকরী সেমিকণ্ডাক্টর ট্রায়োড—তাই এটি সহজেই ত্রিদ্বার ভাল্‌বকে অপসারিত করেছে।

দেশে দেশে সেমিকণ্ডাক্টর সম্পর্কে গবেষণা এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে। অদূর ভবিষ্যতে আরও অনেক নতুন সেমিকণ্ডাক্টরের সন্ধানই শুধু পাওয়া যাবে না—আজকের অর্ধপরিচিত সমস্ত সেমিকণ্ডাক্টর সম্পর্কেও নতুন আলোকপাত সম্ভব হবে এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রাদিতে আসবে এমন পরিবর্তন, যা আরো বিস্ময়কর, আরো চমকপ্রদ এবং আরও অনেক বেশী কার্যকর হবে।

শুক্র-অভিযান

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সৌরজগতে আমাদের আবাসভূমি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি আছে যে গ্রহটি, আকৃতি ও প্রকৃতির দিক থেকে পৃথিবীর সঙ্গে যার সবচেয়ে বেশী মিল এবং কবি যাকে বলেছেন 'সূর্যবন্দনার প্রদক্ষিণ পথে তুমি পৃথিবীর সহযাত্রী'। আমাদের অতি পরিচিত সেই প্রভাতের শুকতারা, সন্ধ্যার সন্ধ্যাতারা বা শুক্রগ্রহের বুকে গত ১৬ই ও ১৭ই মে ধীরে ধীরে অক্ষতভাবে অবতরণ করেছে সোভিয়েট রাশিয়ার আন্তর্গ্রহ মহাকাশযান ভেনাস-৫ এবং ভেনাস-৬। এই বছরের (১৯৬৯) গত ৫ই ও ১০ই জানুয়ারী এই দুটি মহাকাশযান ভূপৃষ্ঠ থেকে শুক্র অভিমুখে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। যান দুটি চার মাসে মহাকাশে ৩৫ কোটি কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে শুক্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে। ইতিপূর্বে ১৯৬৭ সালের ১৮ই অক্টোবর সোভিয়েট মহাকাশযান ভেনাস-৪ শুক্রপৃষ্ঠে অক্ষত শরীরে প্রথম অবতরণ করেছিল। অবশ্য তার আগে আরও কয়েকটি রুশ ও মার্কিন মহাকাশযান শুক্রের দিকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তাদের কেউ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, আবার কেউ বা শুক্রের মাটি স্পর্শ করে ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। শুক্রপৃষ্ঠে সর্বপ্রথম গিয়ে পৌঁছায় রুশ মহাকাশযান ভেনাস-৩। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে সেটি কোন বেতার-সঙ্কেত পাঠাতে পারে নি।

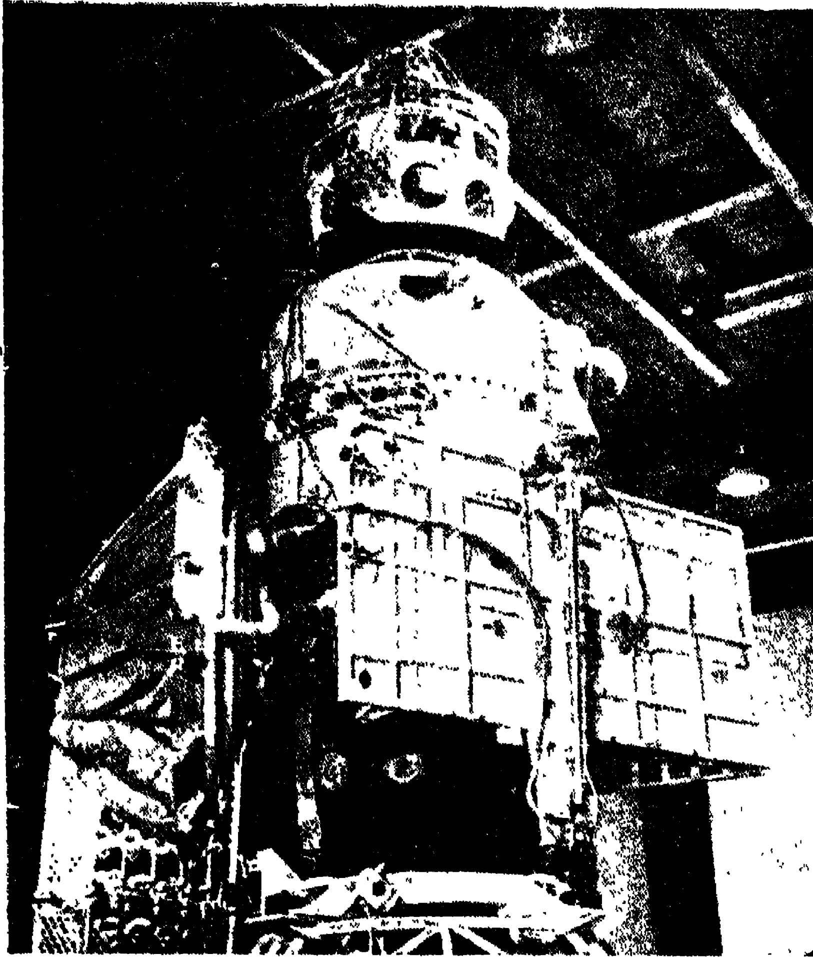
শুক্র অভিযানে সর্বপ্রথম সাফল্য অর্জন করে রুশ মহাকাশযান ভেনাস-৪। সেটি শুক্রপৃষ্ঠে প্রথম অক্ষতভাবে অবতরণ করে এবং শুক্রের আবহমণ্ডলের চাপ, ঘনত্ব, তাপমাত্রা এবং রাসায়নিক সংযুক্তির পরিমাপ করে। ১৯৬৭ সালের ১২ই জুন এটি ভূপৃষ্ঠ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং ১৮ই অক্টোবর শুক্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে। মার্কিন মহাকাশযান মেরিনার-৫ শুক্র অভিমুখে যাত্রা করে ঐ বছরের ১৪ই জুন এবং ১৯শে অক্টোবর শুক্র থেকে ৪ হাজার কিলোমিটার দূরত্বে উপস্থিত হয়।

যদিও শুক্র পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের গ্রহ, তবু এই গ্রহটি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অতি সীমিত। এর প্রধান কারণ হলো, শুক্রগ্রহ সব সময় গাঢ় মেঘাবরণে ঢাকা থাকে। ঘন বাষ্পপুঞ্জ এই গ্রহকে এমনভাবে ঢেকে রেখেছে যে, সূর্যের আলোও সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। আর সে জন্যেই শুক্রের টেলিভিশন ছবি তোলবার সম্ভাবনাও নেই।

শুক্রের কাছাকাছি মহাকাশযান পাঠাবার আগে পর্যন্ত দূরবীন ও আন্তর্গ্রহ রেডার পদ্ধতির সাহায্যে এই গ্রহটি সম্পর্কে তথ্যাদি সংগৃহীত হয়। এই সব পর্যবেক্ষণে অনেক কিছু জানা যায় বটে, কিন্তু এই সব তথ্যে গরমিল হবার সম্ভাবনাও ছিল অনেক। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে শুক্রপৃষ্ঠ পাথর, বালি বা ধুলায় পরিপূর্ণ। কারো মতে শুক্র হচ্ছে তেলের সমুদ্র, আবার কারো মতে শুক্রপৃষ্ঠ অতিকায় জৈব অণুর দ্বারা গঠিত। শুক্রপৃষ্ঠের সম্ভাব্য চাপ ৩০০ আবহমণ্ডল (পৃথিবীর তুলনায়) এবং তার বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ শতকরা ১ ভাগ থেকে ১০০ ভাগ পর্যন্ত হতে পারে বলে ধারণা ছিল। কিন্তু এই সব অনুমান কতদূর সত্য, তা প্রত্যক্ষভাবে যাচাই করবার সুযোগ এতদিন ছিল না। ভেনাস-৪ এবং মেরিনার-৫ মহাকাশযান প্রথম সে সুযোগ এনে দেয়। এরা শুক্রের

নিকট এসে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে। জানা যায়, শুক্রের আবহমণ্ডল এত ঘন ও গাঢ় যে, তা আলোকরশ্মি ও বেতার-তরঙ্গ অবরোধ করে রাখে। তার ফলে আলোক-রশ্মি ও বেতার-তরঙ্গ পৃষ্ঠদেশে পৌঁছবার বা মহাকাশে ছড়িয়ে পড়বার পরিবর্তে গ্রহটিকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর কোন অভিযাত্রী শুক্রগ্রহে উপস্থিত হলে আলোক সংক্রান্ত উঠে আছে বলে মনে হবে। শুক্রপৃষ্ঠে সূর্যাস্তের দৃশ্য হবে অদ্ভুত। শুক্রের প্রকৃত দিগন্তের নীচে সূর্য যখন নেমে যায়, তখন তার প্রতিফলিত আলোক উপরে উঠে আকাশের গায়ে ছোপের মত দেখায়।

শুক্রের বায়ুমণ্ডলের প্রধান উপকরণ হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড। সাম্প্রতিক সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা হিসাব করে

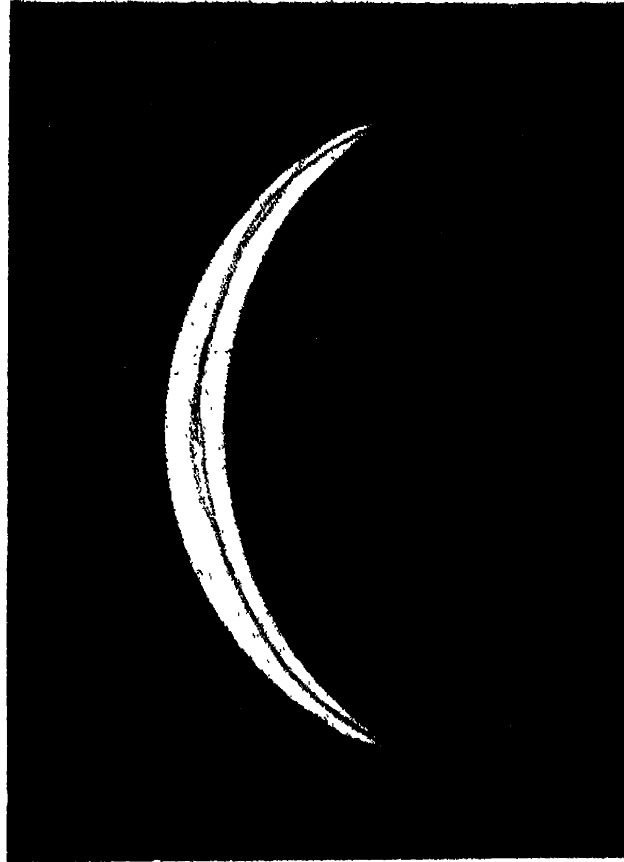


শুক্র-অভিযাত্রী রুশ আন্তর্গ্রহ ষ্টেশন ভেনাস-৪

কতকগুলি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করবে। শুক্রের আবহমণ্ডলের দ্বারা প্রতিফলিত আলো বেঁকে যাবার দরুণ তার মনে হবে, দিগন্ত রেখা উপরে উঠে গেছে। তার চারপাশে শুক্রপৃষ্ঠ উপরে দেখেছেন, কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ হচ্ছে শতকরা ৬৯ থেকে ৮৭ ভাগ। শুক্রের আবহমণ্ডলের বহিস্তম স্তরে হাইড্রোজেনের আধিক্য দেখা যায় এবং সেখানে অক্সিজেনের

কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। এই স্তরের তাপমাত্রা হচ্ছে ১০০° ডিগ্রী ক্যা:। সংগৃহীত তথ্য থেকে আরও জানা গেছে, শুক্রের দিন ও রাত্রি উভয় দিকেই একটি আয়নমণ্ডল আছে। সৌরবিকিরণের জন্যে শুক্রের আবহমণ্ডলের তড়িৎ-শূন্য অণু-পরমাণুর ভাঙনের ফলে ঋণাত্মক ইলেকট্রন হচ্ছে ৫১৮° ডিগ্রী ক্যা: এবং তার আবহমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর তুলনায় ২২ গুণ।

আগেই বলা হয়েছে, আকৃতি ও প্রকৃতিতে পৃথিবীর সঙ্গে শুক্রের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে শুক্রের সময় লাগে পৃথিবীর ২২৫ দিন। আকারে শুক্র



মাউন্ট উইলসন এবং প্যালোমার মানমন্দিরে
গৃহীত শুক্রগ্রহের চিত্র

ও ধনাত্মক আয়ন উৎপন্ন হওয়ায় এই আয়নমণ্ডলের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পৃথিবীর মত শুক্রের কোন চৌম্বক ক্ষেত্র বা ভ্যান অ্যালেন বলয়ের মত কোন বিকিরণ বলয়ের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় নি। ভেনাস-৪ কর্তৃক সংগৃহীত পরিমাপ থেকে জানা গেছে, শুক্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা পৃথিবীর চেয়ে সামান্যই ছোট—শুক্রের চেয়ে পৃথিবীর ব্যাস মাত্র ৫৬০ কিলোমিটার বেশী। ঘনত্ব ও ভরের দিক থেকেও এই দুই গ্রহের তফাৎ সামান্যই। জলের ঘনত্বকে যদি একক হিসাবে ধরা হয়, তাহলে পৃথিবীর ঘনত্ব হচ্ছে ৫'৫২ এবং শুক্রের ঘনত্ব ৫'১। বিজ্ঞানীরা

হিসাব করে দেখেছেন, পৃথিবীর ভরকে যদি ধরা হয় ১০০০, তাহলে শুক্রের ভর হবে ৮১৪।

শুক্রগ্রহের মেঘাবরণের রহস্য এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয় নি। শুক্রের আবহমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ খুব বেশী হবার কারণ সম্পর্কে গবেষকদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন, এই অত্যাধিক্যের কারণ হলো শুক্রগ্রহের পুরা জমি জুড়ে রয়েছে সমুদ্রের বিস্তার এবং তার শিলার মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডকে ঘনীভূত হতে বাধা দেয় এই সমুদ্র। শুক্রের এই মেঘাবরণ মানুষের পক্ষে তার আবহমণ্ডলকে ভালভাবে অনুশীলন করবার পথে বাধাস্বরূপ।

দেখা যাচ্ছে, মহাকাশে সরাসরি তথ্যানুসন্ধানী যান পাঠিয়ে শুক্রগ্রহকে কার্যকরীভাবে অনুশীলন করা গেছে। কিন্তু এখনও অনেক রহস্যের সমাধান করা হয় নি। এখন প্রধান কাজ হচ্ছে শুক্রের অতি উচ্চ তাপমাত্রার জন্যে কোন্ কোন্ ভৌত প্রক্রিয়া দায়ী, তা নির্ণয় করা। বিভিন্ন প্রকল্পের দ্বারা এর ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। যেমন—মেঘাবরণ শুক্রদেহের তাপকে রক্ষা করছে, আবহমণ্ডলের তাপ ও আগ্নেয়গিরির তাপের ভৌত মিশ্রণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উষ্ণতা ইত্যাদি।

রেডারের মাপজোক থেকে দেখা গেছে, শুক্রগ্রহ তার অক্ষদণ্ড ঘিরে খুব ধীরে ধীরে ঘুরপাক খায়। একবার পুরা পাক খাবার সময় হচ্ছে ২৫০টি পার্থিব দিনের সমান। কিন্তু শুক্রের মেঘাবরণের বর্ণালী-বিশ্লেষণ এবং ওই মেঘাবরণের গায়ে কতকগুলি কালো জায়গার ঘূর্ণন-গতি পর্যবেক্ষণ করবার ফলে জানা গেছে, ওই মেঘাবরণের এক পাক ঘুরে আসতে সময় লাগে পৃথিবীর ৪।৫ দিনের সমান।

এথেকে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, শুক্রের নিজের ঘূর্ণনের তুলনায় তার মেঘাবরণটি (অর্থাৎ তার আবহমণ্ডলের উপরিভাগ) ঘুরপাক খায় ৫০ থেকে ৬০ গুণ দ্রুতগতিতে আর তার ফলে আবহমণ্ডলের মেঘের স্তরে এক প্রচণ্ড গতিতে হাওয়া বয়ে যায়।

তথ্যানুসন্ধানী মহাকাশযান ভেনাস-৫ এবং ভেনাস-৬ যে সব তথ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে, তার বিশ্লেষণ করতে যথেষ্ট সময় লাগবে। যখন এই বিশ্লেষণের ফলাফল জানা যাবে, তখন শুক্রগ্রহের অনেক রহস্যই উন্মোচিত হবে বলে আশা করা যায়। শুক্রগ্রহে কোন জীবের অস্তিত্ব আছে কিনা, তার সন্ধানও হয়তো পাওয়া যাবে। তবে একটি বিষয়ে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে,আমরা ও আমাদের পুত্র-পৌত্রেরা—এমন কি, ভাবীকালের কোন মানবগোষ্ঠীই কোনদিন শুক্রের বুকে পদচিহ্ন আঁকতে পারবে না।

চাঁদের মানচিত্র ও পাহাড়

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর পারমাণবিক যুগে বসে ভাবতে অবাক লাগে, এই মাত্র কয়েক-শ' বছর আগেও বেশীর ভাগ মানুষই চাঁদকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতো। এমনি এক সময়ে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে (১৬১০ সালে) ইটালীর বিখ্যাত মনীষী গ্যালিলিও চাঁদকে অন্য এক দৃষ্টিতে দেখলেন। প্রকৃতপক্ষে নিজের তৈরি অপ্‌টিক টিউব বা সে যুগের টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে তিনিই প্রথম চাঁদের দিকে তাকালেন। শুধুমাত্র চাঁদের দিকে তাকিয়েই তিনি ক্ষান্ত হন নি, বস্তুতঃ চাঁদের প্রথম মানচিত্র তিনিই প্রস্তুত করেন। সেই মানচিত্রের গায়ে টেলিস্কোপে দেখা বিভিন্ন পাহাড়, পর্বত, আগ্নেয়গিরি সব কিছুই সাধ্যমত নিখুঁতভাবে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। এমন কি, কয়েকটি পাহাড়ের উচ্চতাও তিনি পরিমাপ করেছেন। তাঁর হিসাবে কয়েকটি পাহাড়ের উচ্চতা এভারেষ্টের চেয়েও বেশী দেখানো হয়েছে। অবশ্য একথা মানতেই হবে, চাঁদের আধুনিক মানচিত্রের সঙ্গে গ্যালিলিওর মানচিত্রের কোন তুলনাই চলে না। তবু চন্দ্রতত্ত্বের (Selenography) পথিকৃৎ হিসাবে তাঁর কথা আমাদের স্মরণে রাখতেই হবে।

প্রায় সমসাময়িক কালে গ্যালিলিওর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে স্যার উইলিয়াম লোয়ার ইংল্যাণ্ডের মাটি থেকে টেলিস্কোপের লেন্সে চোখ লাগিয়ে চাঁদের রহস্য সন্ধানে মনসংযোগ করেন। অবশ্য তাঁর চন্দ্রদর্শনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে গ্যালিলিওর কোন বিরোধ ঘটে নি। উপরন্তু চন্দ্রে কোন আবহমণ্ডলের (Atmosphre) অস্তিত্ব নেই, এই বৈজ্ঞানিক সত্যে এই দু-'জন বিজ্ঞানী উপনীত হতে পেরেছিলেন। কারণ দু-জনের কেউই চাঁদের গায়ে আবহমণ্ডলজনিত আলোর বিচ্ছুরণ দেখতে পান নি। পৃথিবীতে বসে ভাবতে সত্যই অবাক লাগে, চাঁদের বুকে দুপুরের প্রচণ্ড রোদের পর হঠাৎ কেমন করে ঘনিয়ে আসে নিশুতি, কালো রাত্রির অন্ধকার। ছায়া ছায়া অন্ধকার বা ফিকে তরল অন্ধকারের কোন স্থান নেই সেখানে।

এরপর ১৬৪৭ সাল নাগাদ হেভেলিয়াস নামে এক জ্যোতিবিদ গ্যালিলিওর মানচিত্র সংস্কার করে মোটামুটি বড় সাইজের (১ ফুট ব্যাস) উন্নততর আরেকটি মানচিত্র তৈরি করেন ও পাহাড়-পর্বত, আগ্নেয়গিরি ইত্যাদি প্রাকৃতিক স্থানগুলির নামকরণ করেন।

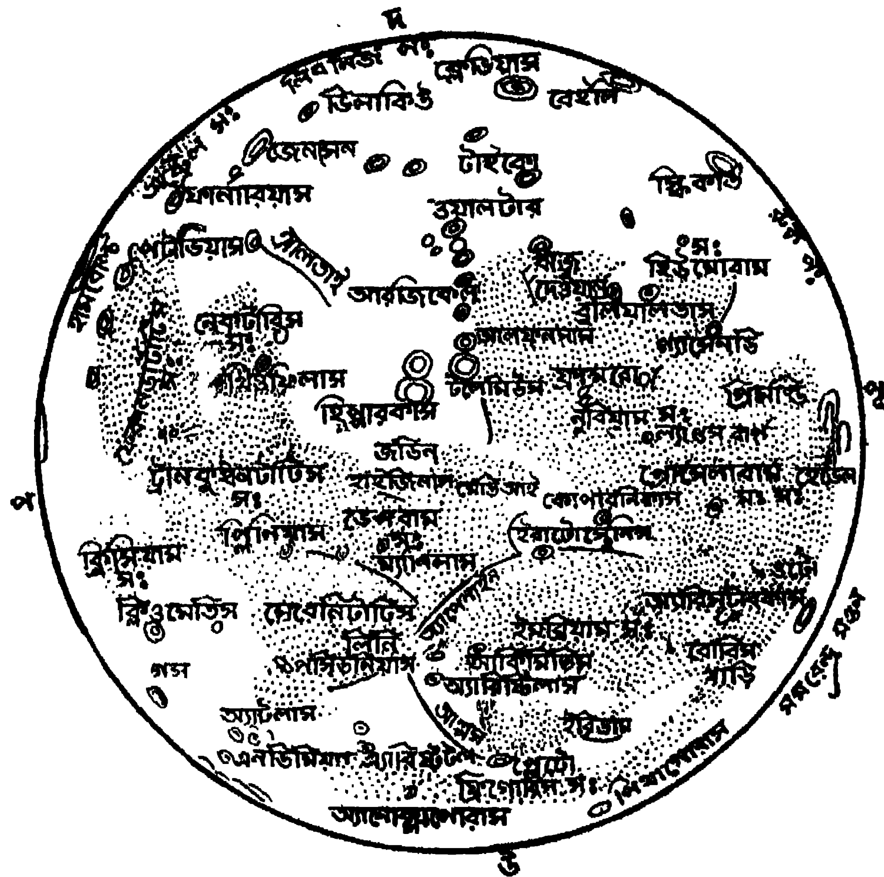
সত্য কথা বলতে কি, চাঁদ সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সূত্রপাত করেন জোহান স্ক্রোটার নামে একজন জার্মান। পেশায় ম্যাজিস্ট্রেট হলে কি হবে, অবসর সময়ে তাঁর একমাত্র নেশা ছিল টেলিস্কোপ লাগিয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকা। প্রায় এক নাগাড়ে তিরিশ বছর ধরে নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করে চাঁদ সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য তিনি উদ্‌ঘাটন করেন। চাঁদের গায়ে যে ফাটলগুলি দেখা যায়, এগুলি তাঁরই আবিষ্কার। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা, নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তাঁর গবেষণাগার অগ্নিদগ্ধ হয়ে ধ্বংস হবার ফলে চাঁদ সম্বন্ধে আবিষ্কৃত অনেক তথ্যই বহুকাল অজানা থেকে যায়।

এরপর বার্লিনের উইলহেস বিয়ার ও জোহান ম্যাড্‌লার প্রায় দশ বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় চাঁদের একটি আধুনিক মানচিত্র তৈরি করেন।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, এঁরা দুজনেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, চাঁদে জীবনের কোন অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। এঁদের এই প্রচারের ফলে চাঁদ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের উৎসাহে ভাটার টান পড়ে।

ও পিকেরিং। এমনিভাবে চাঁদের মানচিত্র ধীরে ধীরে আধুনিক ও নিখুঁত হতে লাগলো। চাঁদের বুকে পাহাড় আর খাদের চিহ্ন স্পষ্টতর হয়ে এল।

১৯৫৯ সালে আমেরিকার জি পি. কুইপার



দৃশ্যমান চন্দ্রপৃষ্ঠের মানচিত্র (প্যাট্রিক মুর অনুসারী মূল ল্যাটিন নামসহ)। ফুটকীর দ্বারা নীচু সাগরীয় অঞ্চল, বৃত্তের দ্বারা আগ্নেয়গিরি-গহ্বর এবং মোটা রেখার দ্বারা পর্বত দেখানো হয়েছে (সাঃ—সাগর, মঃ সাঃ—মহাসাগর, পঃ—পর্বত)।

ইতিমধ্যে ক্যামেরা আবিষ্কার হওয়ায় জ্যোতির্বিদদের কেউ কেউ টেলিফটো লেন্স লাগিয়ে চাঁদের ছবি তুলে রাখবার পরিকল্পনা করেন। বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে চাঁদের ফটো থেকে বাস্তবভিত্তিক মানচিত্র তৈরি করবার ব্যাপারে অগ্রণী হলেন লোওই, পিসিউ

ও তাঁর সহকর্মীদের প্রচেষ্টায় ফটোগ্রাফিক প্লেট থেকে চাঁদের প্রায় নিখুঁত মানচিত্র তৈরি হলো। এখানে একটি কথা বলা দরকার। চাঁদের যে দিকটা পৃথিবী থেকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে, তার ফটো তোলা তখনো পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। এদিকে অবশ্য চাঁদের মানচিত্রটিকে সর্বাধুনিক ও সর্বার্থ-

সাধক করে তোলবার প্রচেষ্টার কোন বিরতি ছিল না। ইদানীং কালে রাশিয়ান ও আমেরিকান উভয় মহলই ইতিমধ্যে চাঁদের সর্বাধুনিক ফটোগ্রাফিক মানচিত্র করে ফেলেছেন। চাঁদের যে দিকটা পৃথিবী থেকে সব সময় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে, রাশিয়ান লুনিক-৩-এর সাহায্যে চাঁদের সেদিকটার ছবি তুলে চাঁদের পূর্ণ মানচিত্র তৈরি করা সম্ভব হয়েছে

যে চাঁদকে ঘিরে কবির কল্পনা বাঙ্ময় হয়ে ওঠে, টেলিস্কোপের ভিতর দিয়ে তাকালেই চাঁদের সেই স্নিগ্ধ মনোরম রূপটি কোথায় মিলিয়ে যায়, কে জানে! এর বদলে ফুটে ওঠে কঠিন, কঠোর এক মূর্তি—পাহাড়, আগ্নেয়গিরিতে ঘেরা রুক্ষ প্রাণহীন মরু-প্রান্তর। চাঁদের বুকে একদিকে যেমন রয়েছে উঁচু পাহাড়ের সারি, অন্যদিকে তেমনি মুখ হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে আগ্নেয়গিরির (মতভেদ রয়েছে) অতলান্ত গহ্বর। ভোরের প্রথম আলোয় অন্ধকারের বুকে ঝিকমিক্ করতে থাকে চাঁদের উঁচু পাহাড়, যদিও আগ্নেয়গিরির অতল গহ্বরে কোন দিন সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না। এই সব অতল গহ্বরগুলিকে পৃথিবী থেকে চাঁদের মুখের কলঙ্ক বলে মনে হয়।

জে. ই. স্পার নামে এক প্রখ্যাত আমেরিকান ভূবিদ্ চন্দ্রতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করেছেন। তিনি চাঁদের বুকে উঁচু মালভূমির মত জায়গাগুলির নাম দিয়েছেন লুনারাইট (Lunarite), যাকে পৃথিবী থেকে উজ্জল আলোকিত বলে মনে হয়। আর অন্যদিকে নীচু উপত্যকা বা জলবিহীন সমুদ্র অঞ্চলকে লুনা বেস (Luna base) নামে অভিহিত করেছেন।

অধিকাংশ চন্দ্র-বিজ্ঞানী এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে, চাঁদকে মূলতঃ পাহাড়ী অঞ্চল বলে মনে করবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। বিশেষতঃ কয়েকটি পাহাড় তো চাঁদের আয়তনের তুলনায় খুবই উঁচু। সাম্প্রতিক কালের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, লিব্‌নিজ পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় ৩০,০০০ হাজার ফুটের কাছাকাছি; অর্থাৎ হিমালয়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী এভারেষ্ট শৃঙ্গের চেয়েও উঁচু, যদিও এই বিষয়ে সামান্য মতভেদ আছে। অবশ্য লিব্‌নিজকে বাদ দিলে ডরফেলস পাহাড়ের উচ্চতাও কম নয়। বিখ্যাত ভূবিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ ফিল্ডারের মতে, চাঁদের পাহাড়গুলি মোটামুটিভাবে দুটি নির্দিষ্ট সমান্তরাল শ্রেণীতে পরস্পর লম্বভাবে বিরাজ করছে। এই বিষয়ে আরও গবেষণা চালালে হয়তো চাঁদের বিভিন্ন যুগের বলের (Force) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিষয় অনুধাবন করা যাবে।

বিজ্ঞানীদের মতে, মোটামুটিভাবে চাঁদের গায়ে প্রায় গোটা নয় বড় সমুদ্র রয়েছে। সমুদ্র নাম হলে কি হবে, চাঁদের সমুদ্র-গহ্বরে কিন্তু এক ফোঁটা জলেরও চিহ্ন নেই। যেমন—বৃষ্টির সমুদ্র (Mare imbrium), বাষ্পের সমুদ্র (Mare vapoium), ঝঞ্ঝার মহাসমুদ্র, রামধনুর খাঁড়ি ইত্যাদি নামগুলি চাঁদের বুকে অত্যন্ত বেমানান, কারণ ওখানে বৃষ্টি, বাষ্প, ঝঞ্ঝা বা রামধনুর কোন অস্তিত্ব নেই। চারদিকে উঁচু পাহাড়ে ঘেরা অধিকাংশ সমুদ্রের আকার বৃত্তের মত।

চাঁদের গায়ে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে আগ্নেয়গিরির অগুণতি গহ্বর (Crater), যদিও সেগুলি আয়তনে পৃথিবীর যে কোন আগ্নেয়গিরির তুলনায় অনেক বড়। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের আগ্নেয়গিরির গহ্বরগুলিকে চাঁদে চালান করা সম্ভব হলে, চাঁদের দেশে এদের বেঁটে বামনের মত ছোট অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হবে। অথচ চাঁদের গহ্বরগুলির চারদিকে যে পাহাড়ের দেয়াল রয়েছে, সেগুলির উচ্চতা কোন কোন ক্ষেত্রে ১৫০০০ ফুটেরও বেশী। সাধারণতঃ আয়তনের তুলনায় এদের গভীরতা এমন কিছু নয়। বিখ্যাত

গহ্বরগুলির মধ্যে টাইকো, থিয়োফিলাস, প্লেটো, কোপারনিকাস, নিউটন, থেটিটাস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে বৃত্তাকারে পাহাড়ের দেয়াল দিয়ে ঘেরা চাঁদের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত টাইকোর ব্যাস প্রায় ৫৪ মাইল। আর ঘেরা দেয়ালের উচ্চতা কোথাও কোথাও ১২০০০ ফুটেরও বেশী।

চাঁদের গহ্বরগুলিকে বিশ্লেষণ করলে মোটামুটি দু-ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে কিছু কিছু গহ্বরের মধ্যে কেন্দ্রীয় পর্বতশৃঙ্গ রয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্তদের ক্ষেত্রে পর্বতশিখরের পরিবর্তে গহ্বরের সমস্ত স্থান জুড়ে মালভূমি বা অনুরূপ কিছু থাকলেও থাকতে পারে।

বিগত বহুদিন যাবৎ বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, চাঁদের বুকের গহ্বরগুলি আগ্নেয়গিরির মুখ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু চাঁদের এই গহ্বরগুলির সঙ্গে পৃথিবীর আগ্নেয়গিরিগুলির আয়তন ও অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে নানারকম অমিল লক্ষ্য করে ইদানীং বিজ্ঞানীরা এগুলির আগ্নেয়গিরিজনিত উৎপত্তি সম্বন্ধে গভীরভাবে সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। কোন কোন বৈজ্ঞানিক, বিশেষতঃ আর. বি. বলডুইন, এইচ. সি. ইউরি (নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত) জি. পি. কুইপার, ই. অপিক এবং টি. গোল্ড বলছেন, মহাকাশের বুক থেকে ছুটে আসা উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষে চাঁদের নরম বুকের অভ্যন্তরে বিস্ফোরণের ফলে বৃত্তাকার গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলিকেই আপাতদৃষ্টিতে আগ্নেয়গিরির মুখ বলে মনে হয়। কিন্তু আরেক দল বিজ্ঞানী, যেমন—ভি. এ. ফারসফ এবং জে. গ্রীন নানা যুক্তি সহকারে উল্কা-তত্ত্বকে অবাস্তব বলে আখ্যাত করেছেন। তাঁদের মতে, এগুলিকে আগ্নেয়গিরির মুখ (Crater) ছাড়া আর অন্য কোনভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আগ্নেয়গিরি-তত্ত্বে চাঁদের আপাতকঠিন ত্বকের গভীরে গলন্ত চট্‌চটে ম্যাগ্‌মার (Magma, আগ্নেয়গিরির লাভাজাতীয় বস্তু) অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়েছে। সুদূর প্রাগৈতিহাসিক অতীতে পৃথিবীর আকর্ষণে সমীপবর্তী চাঁদের কঠিন বুকে তরঙ্গায়িত হয়ে ফাটলের সৃষ্টি হয়। সেই ফাটলের মধ্য দিয়ে গলন্ত লাভা নির্গমনের ফলেই সৃষ্টি হয় বৃত্তাকার আগ্নেয়গিরি-গহ্বরের।

ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে কোপান কিন্তু বিতর্কের পথ পরিহার করে দুটি তত্ত্বকেই সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে চাঁদের কিছু কিছু গহ্বর উল্কার সংঘর্ষে সৃষ্টি হয়েছে, বাকীগুলিকে তিনি আগ্নেয়গিরির মুখ বলেই মনে করেন।

চাঁদের গহ্বরের সৃষ্টি সম্বন্ধে বিতর্ক এখন এমন পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে যে, স্পেনের বিখ্যাত বিজ্ঞানী এ. পালুজি বোরেল একে এক-শ' বছরের তর্কযুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। একটা কথা আজ স্বচ্ছ দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, বিজ্ঞানের অকল্পনীয় অগ্রগতি সত্ত্বেও চাঁদ সম্বন্ধে অনেক কিছু আজও অপরিচয়ের অবগুণ্ঠনে ঢাকা পড়ে আছে। প্রকৃতিকে জয় করবার অদম্য উৎসাহে চন্দ্র-অভিযান মানুষের ইতিহাসে চিরকাল অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তবু একথা আমাদের সবাইকে স্বীকার করতেই হবে—চাঁদের বুকে মানুষ পা রাখবার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হবে চন্দ্র-অভিযানের প্রথম পর্যায়। আর অন্যদিকে সুরু হবে চাঁদকে প্রত্যক্ষভাবে জানবার, বোঝবার ও কাজে লাগবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

ধাতু-আবরিত প্লাস্টিক

সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত

আজকালকার জিনিষপত্রের দাম অনেক বেশী তো বটেই, উপরন্তু অত্যন্ত খেলো। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে অবশ্য অবস্থাটা আরও কিছুটা জটিল বোধ হতে পারে। আমাদের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঐতিহ্যসম্পন্ন জরির কথাই ধরা যাক। আগের কালের অতুলনীয় জরির কাজ অন্ততঃ বিভিন্ন যাদুঘরে যাঁরাই দেখেছেন, তাঁরাই দুঃখ করেন আজকাল আর এসব জিনিষ হয় না। আজকালকার কাপড়ের জরি একেবারেই টেঁকে না, দু-দিনেই শেষ।

আগের কালের সেই আসল সোনা, রূপার জরির দাম আজ কে দেবে, তাই নকল জিনিষেই সস্তা দামে চাকচিক্য আনতে হয়, ব্যবসার দিকে নজর রেখে সেই নকল জরিরই নবতম রূপ হচ্ছে রোলেক্স বা লুরেক্স (Lurex)। লুরেক্স সাধারণতঃ দু-ভাবে তৈরি হয়। একটিতে রূপালী অ্যালুমিনিয়াম বা রঙীন অ্যালুমিনিয়ামের পাতের দু-পাশে দুটি প্লাস্টিকের আবরণ দেওয়া হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আবরণের কাজে সেলুলোজ অ্যাসিটেট বিউটাইরেট (Cellulose acetate-butyrate) প্লাস্টিক ব্যবহৃত হয়। অপর ক্ষেত্রে 'ভ্যাকুয়াম ডিপজিসন' পদ্ধতিতে অ্যালুমিনিয়ামের দ্বারা ধাতু-আবরিত টেরিলিন জাতীয় প্লাস্টিকের ফিতার উপর প্রয়োজনানুযায়ী এক দিকে বা দুই দিকেই ঐ জাতীয় প্লাস্টিকের আবরণ লাগিয়ে লুরেক্স প্রস্তুত হয়। লুরেক্সের দু-পাশেই প্লাস্টিকের আবরণ থাকায় ধাতুর ঔজ্জ্বল্য বহুদিন অম্লান থাকে। যাহোক, আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা প্লাস্টিকের উপর ধাতুর আবরণ দেবার আধুনিকতম পদ্ধতিগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

প্লাস্টিকের বিভিন্ন গুণ, যেমন—লঘুতা বা সহজেই জটিল আকৃতি দানের ক্ষমতা প্রভৃতির সঙ্গে ধাতুর বিশেষ গুণগুলি, যেমন—ঔজ্জ্বল্য, বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা ইত্যাদির সংমিশ্রণ ঘটাবার জন্যেই ধাতু-আবরিত প্লাস্টিকের উৎপত্তি। প্লাস্টিকের উপর ধাতুর আবরণ দেবার জন্যে বর্তমানে প্রধানতঃ দুটি পদ্ধতিরই বহুল প্রচলন। সেগুলি হলো—(১) 'ভ্যাকুয়াম ডিপজিসন' পদ্ধতি, (২) তড়িৎলেপন বা ইলেকট্রোপ্লেটিং পদ্ধতি।

'ভ্যাকুয়াম ডিপজিসন' পদ্ধতির মূল নীতিকে তিন ভাগে করা যেতে পারে—

(ক) চাপ কমবার সঙ্গে সঙ্গে যে কোন জিনিষের স্ফুটনাঙ্ক কমতে থাকে এবং বাষ্পীভবনের গতি বাড়তে থাকে।

(খ) শূন্যে বাষ্পীভূত অণুগুলি সরলরেখায় ধাবিত হয়।

(গ) বাষ্পীভূত অণুগুলি শীতল বস্তুর উপর ঘনীভূত হয়।

প্লাস্টিকের যে বস্তুটিকে ধাতুর আবরণ দেওয়া হবে, সেটিকে প্রথমে একটি বিশেষ ধরণের ল্যাকারের প্রলেপ দেওয়া হয়। এই প্রলেপটি আসল বস্তুর উপরে কোন সূক্ষ্ম খুঁৎ থাকলে ঠিক করে দেয়, ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে দেয়, ধাতুর সঙ্গে প্লাস্টিকের সংযোজন জোড়ালো করে এবং নিম্নচাপে প্লাস্টিকটি থেকে গ্যাস বেরোনো কমিয়ে দেয় কি জিনিষ দিয়ে এই ল্যাকারটি তৈরি করা হবে, তা নির্ভর করে প্লাস্টিকটির বৈশিষ্ট্য এবং উৎপন্ন দ্রব্যটির ব্যবহারের উপর। সাধারণতঃ অ্যাক্রাইলিক, ফেনোলিক, অ্যালিকিড, ইউরিয়া, সেলুলো-

জিক ও আরও নানা ধরণের রেজিনের একক বা একাধিক সংমিশ্রণে ল্যাকারটি প্রস্তুত করা হয়।

ধাতুর আবরণ দেবার জন্যে প্রায় ১২ ইঞ্চি থেকে ৮৪ ইঞ্চি পর্যন্ত ব্যাসের পাত্র ব্যবহার করা হয়। পাত্রটির সঙ্গে এমন ব্যবস্থা থাকে, যাতে অল্প সময়ের মধ্যে ভিতরের চাপ ১×১০^{-৫} সে মিঃ পর্যন্ত নামিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। যদিও নানা রকম ধাতুই ব্যবহার করা সম্ভব, তথাপি এই পদ্ধতিতে সাধারণতঃ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অ্যালুমিনিয়ামের আবরণ দেওয়া হয়। ভাল প্রতিফলন ক্ষমতা পাবার জন্যে অতি বিশুদ্ধ ধাতুর প্রয়োজন। পাত্রটির মধ্যস্থলে অবস্থিত বিদ্যুতের সাহায্যে উত্তপ্ত টাংস্টেনের তার কুণ্ডলীর মধ্যে অ্যালুমিনিয়ামটুকু নেওয়া হয় এবং স্তরে স্তরে তাপ বাড়িয়ে প্রায় ১৭০০° থেকে ১৮০০° সে. পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়। গলিত অ্যালুমিনিয়াম এই উত্তাপে এবং চাপে বাষ্পীভূত হতে থাকে এবং সোজা কিছু দূরে রাখা প্লাস্টিকের উপর গিয়ে জমতে থাকে। উত্তপ্ত কুণ্ডলীর বিকিরিত তাপ কিছুটা প্লাস্টিকের উপরেও পড়ে। সেই জন্যে যতটা সম্ভব কম তাপ ও কম চাপ রাখতে হয়। কারণ প্লাস্টিক ও ধাতুর আসঞ্জন তাপ ও চাপের সঙ্গে ব্যস্ত অনুপাতিক, কিন্তু ধাতুর অণুর গতিবেগের সঙ্গে সমানুপাতিক। আবার অণুর গতিবেগ তাপের সঙ্গে সমানুপাতিক হওয়ায় খুব কম তাপে আসঞ্জনও ভাল হবে না। কাজেই সব মিলিয়ে একটা রফা করে নিতে হয়। আবরণ দেবার কাজটা খুব তাড়াতাড়ি করা দরকার, অন্যথায় প্লাস্টিকটি নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভবনা থাকে। উপযুক্ত তারের কুণ্ডলী ও কক্ষের সাহায্যে ৩×১০^{-৬} থেকে ৫×১০^{-৬} ইঞ্চির মত বেধের আবরণ প্রায় ১৫ সেকেণ্ডের মত সময়ে দেওয়া সম্ভব।

ধাতুর সূক্ষ্ম আবরণটিকে রক্ষার জন্যে বা আকর্ষণীয় রঙে রঙীন করবার জন্যে এর উপরে আবার একটি উপযুক্ত পদার্থের (Lacquer) আবরণ দেওয়া হয়।

খেলনা, চশমার ফ্রেম, গহনা, লেন্স, নানা রকম হাতল, কেবিনেট, লুরেক্স ও অসংখ্য রকম সজ্জায় এই ধরণের ধাতুর আবরণ দেওয়া প্লাস্টিকের ব্যবহার রয়েছে।

চাকচিক্যময় সজ্জায় ব্যবহার ছাড়াও নতুন নতুন ব্যবহারিক কাজে এর প্রচলন বাড়বার ফলে পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে কিছু অসুবিধা দেখা দেয়। যদিও ধাতুর আবরণের খরচটা খুবই কম, তবু ঐ অতিরিক্ত পাতলা আবরণকে রক্ষার জন্যে আর একটা স্বচ্ছ আবরণের প্রয়োজনে খরচ কিছুটা বেড়ে যায়। উপরন্তু ধাতুর আবরণটি খুবই পলকা ধরণের হওয়ায় যেমন কোন শক্ত কাজে ভাল টেকে না, তেমনি বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা না থাকায় বৈদ্যুতিক শিল্পে সুবিধাজনক ব্যবহার সম্ভব হয় না।

যদিও খরচ বেশী পড়ে, তবু ভারী কাজে ব্যবহারোপযোগী প্লাস্টিকের বেলায় দ্বিতীয় অর্থাৎ তড়িৎলেপন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। আধুনিক তড়িৎলেপন পদ্ধতিকে মোটামুটি আট ভাগে ভাগ করা চলতে পারে।

প্রথম পর্যায়ে পদার্থটির পৃষ্ঠদেশকে যান্ত্রিক বা রাসায়নিক পদ্ধতিতে অসমতল করা হয়, যাতে পৃষ্ঠটির তৈলাক্ত ভাবটা নষ্ট হয়ে যায় এবং ধাতুর সঙ্গে প্লাস্টিকের জোড়টি বেশ শক্ত হয়। সাল-ফিউরিক-ক্রোমিক অ্যাসিডের সাহায্যে বন্ধুরতা আনয়ন করা ছাড়াও এমন একটি আধুনিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, যাতে একটি বিশেষ রাসায়নিকের সাহায্যে পদার্থটির উপর এক রকম রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটানো হয়, ফলে পৃষ্ঠদেশটির পূর্বের তুলনায় বেশী সমতল তো থাকেই উপরন্তু প্লাস্টিক ও ধাতুর আসঞ্জনও অনেক ভাল হয়। অবশ্য এই পদ্ধতির অসুবিধা হলো এই যে, প্লাস্টিকের ধর্ম অনুযায়ী রাসায়নিক খুঁজে বের করতে হয়

এবং যতদূর জানা আছে কয়েক রকমের প্লাস্টিক ছাড়া অন্যগুলির উপযোগী রাসায়নিক এখনও পাওয়া যায় নি।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বস্তুটিকে টিন বা টাইটেনিয়াম লবণের দ্রবণে ডোবানো হয়। এইভাবে পৃষ্ঠদেশটিতে শোষিত লবণটি পরের পর্যায়ে সোনা, রূপা বা তামার লবণের সাহায্যে জারিত করা হয় এবং এর ফলে বিজারিত শেষোক্ত ধাতুর একটি আস্তরণ পড়ে পৃষ্ঠদেশটির উপর। এই আস্তরণটি পরের পর্যায়ে অনুঘটকের কাজ করে। এবার প্লাস্টিকটিকে এমন একটি দ্রবণে ডোবানো হয়, যার মধ্যে থাকে যে ধাতুটির তড়িৎলেপন হবে, তারই কোন লবণ এবং একটি দুর্বল বিজারক। এই বিজারকটি সাধারণভাবে ঐ ধাতুর লবণটিকে বিজারিত করতে পারে না, তবে কোন অনুঘটকের সংস্পর্শে এলে ধাতুটি বিজারিত হয়ে অনুঘটকটির উপরে প্রক্ষিপ্ত হয়। কাজেই পরবর্তী ধাপের অর্থাৎ তড়িৎলেপনের উপযোগী পরিবহনতাযুক্ত আস্তরণ দিতে হলে যে ধাতুটি বিজারিত হয়ে অনুঘটকের উপর প্রক্ষিপ্ত হয় সেটারও অনুঘটকের কাজ করা দরকার। রৌপ্য, তাম্র ও নিকেল এই দ্বিবিধ প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগের অর্ধ ভাগ থেকে ছয় ভাগ বেধের ধাতুর প্রলেপই পরের পর্যায়ের তড়িৎলেপনের পক্ষে যথেষ্ট। পরের ধাপে পূর্বোক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত তড়িৎবাহী প্লাস্টিকটির উপর সাধারণ তড়িৎলেপন পদ্ধতিতে ০.০০২ থেকে ০.০০৭ ইঞ্চির বেধের তামার প্রলেপ দেওয়া হয়। এর পর হয় খুব দক্ষ হাতের পালিশ এবং শেষ পর্যায়ের তড়িৎলেপন। শেষবারে সাধারণতঃ তামা, নিকেল বা ক্রোমিয়ামের প্রলেপ দেওয়া হয়। অনেক সময় অবশ্য ইলেকট্রনিক শিল্পে ব্যবহারের জন্যে সোনার প্রলেপও দেওয়া হয়

তড়িৎলেপন পদ্ধতিতে প্রায় ক্ষেত্রেই অ্যাক্রাইলোনাইট্রাইল, বিউটাডাইন ও স্টাইরিনের মিলিত পলিমারের (Acrylonitrile, Butadiene-Styrene Copolymer) প্লাস্টিকের বস্তুর ব্যবহার হয়। এই ধরণের প্লাস্টিকে ধাতুর আবরণ বেশ মোটা দেওয়া যায়, ফলে যে সব ব্যবহারে ঘর্ষণ বা অন্য কোন রকম ধাতু-ক্ষরকারী অবস্থার মধ্যে থাকতে হয় সেখানে প্রথমোক্ত পদ্ধতির তুলনায় অনেক ভাল ফলপ্রসূ। রেডিও ও মোটর গাড়ীর বিভিন্ন ধরণের হাতলে রং-করা প্লাস্টিকের বদলে বা জল পরিবহনের কাজে এবং আরও অসংখ্য ধরণের কাজে এর যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে।

এছাড়াও ধাতু-আবরিত প্লাস্টিক ধাতুর পরিবর্তেও ব্যবহৃত হতে পারে। এর লঘুতা রকেট, মহাজাগতিক যান বা পরিবহনের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধাজনক। তাছাড়া সহজেই প্লাস্টিকের সাহায্যে কোন জটিল আকৃতির যন্ত্রাংশ সস্তা দামে তৈরি করা যায়। বৈদ্যুতিক শিল্পে ধাতু পরিবাহক ও প্লাস্টিক অপরিবাহক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কাজেই যেখানে জটিল ধরণের পরিবাহক বা খুব পাতলা ধাতুর আবরণেই কাজ চলে, সেখানে ধাতু-আবরিত প্লাস্টিকের প্রভূত ব্যবহার সম্ভব; যেমন—বিমানের বেতার-গ্রাহী দণ্ড (Antenna mast), দিকদর্শক লুপ (Direction finding loop), ফ্যারাডে শিল্ড (Farraday shield), কনডেন্সার এবং আরও অনেক কিছু। আলো প্রতিফলক আয়না হিসেবে নানা শিল্পে এবং সজ্জায়, তাপে প্রসারণতা অপেক্ষাকৃত কম বলে যে সব জায়গায় প্রায়শঃই তাপের পরিবর্তন হয়. সে সব ক্ষেত্রে ধাতুর পরিবর্তে এবং একাধিক ধাতু পরস্পরের সংস্পর্শে না থাকায় তড়িৎলেপিত ধাতুর তুলনায় ধাতু-আবরিত প্লাস্টিকে বৈদ্যুতিক বিভব (Electrolytic potential) কিছুই হয় না বলে সামুদ্রিক কাজে ব্যবহারে এর দ্বারা যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেছে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

ফল ও সব্জী সংরক্ষণের নতুন পদ্ধতি

বৃটেনে ফল ও সব্জী সংরক্ষণের একটি নতুন পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষায় আশ্চর্য রকমের ভাল ফল পাওয়া গেছে। এই পদ্ধতিতে নাইট্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করে আবহাওয়ায় অক্সিজেনের ভাগ কমিয়ে দেওয়া হয়।

চিরাচরিত হিমঘর পদ্ধতি বা কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রয়োগ পদ্ধতি যা বহু আপেল উৎপাদক গ্রহণ করে থাকেন, তার চেয়ে এই নতুন পদ্ধতিতে ফল ও সব্জী অনেক বেশী দিন ভাল অবস্থায় থাকে।

বিভিন্ন ফল ও সব্জীর জন্যে বিভিন্ন পরিমাণে অক্সিজেন হ্রাস করতে হয়। কোন্ শস্যের জন্যে কতখানি অক্সিজেন বাঞ্ছনীয়, তা এখনও সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নি, তবে আপেল ও ষ্ট্রবেরীর ক্ষেত্রে এই পরিমাণ জানা গেছে এবং এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে খুব ভাল ফল পাওয়া গেছে। এই পদ্ধতিতে ফুলকপি ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত তাজা রাখা সম্ভব হয়েছে।

লণ্ডনের ফার্ম বৃটিশ অক্সিজেন কোম্পানী লিমিটেড এই পদ্ধতি নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। ঐ ফার্মের জনৈক মুখপাত্র বলেন, ব্যবসায়িক দিক দিয়েও এই পদ্ধতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এর মূলধনের ব্যয় ও হিমঘর তৈরির মূলধনের ব্যয়ে খুব বেশী পার্থক্য হবে না।

নতুন ধরণের অক্সিজেন-তাঁবু

বেঁচে থাকবার জন্যে সকল প্রাণীরই অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অসুস্থ লোকদের অনেক সময় অতিরিক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়ে থাকে। দুর্ঘটনার রোগী হলে অতিরিক্ত অক্সিজেনের বিশেষভাবে প্রয়োজন। অস্ত্রোপচারের সময় বা বুকের রোগীদের জন্যেও অতিরিক্ত অক্সিজেনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

এই ধরণের রোগীদের জন্যে অক্সিজেন-তাঁবু উদ্ভাবিত হয়েছে। তাঁদের বিছানা এই তাঁবু দিয়ে মোড়া থাকে। বিছানার পাশে বসানো ধাতুর তৈরি অক্সিজেনের বোতল থেকে অক্সিজেন তাঁবুতে যায়। এর ফলে তাঁবু গরম হয়ে ওঠে বলে ঠাণ্ডা করবার যন্ত্রও তাঁবুর পাশে থাকে। তাঁবুর মধ্যে অক্সিজেন প্রবেশ করাবার আগে তাকে ঠাণ্ডা করে নেওয়া হয়।

একটি বৃটিশ ফার্ম এক প্রকার নতুন ও সহজ রকমের অক্সিজেন-তাঁবু উদ্ভাবন করেছেন। এই তাঁবুর জন্যে অক্সিজেন ঠাণ্ডা করবার বড় বড় যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না।

নতুন ধরণের অক্সিজেন-তাঁবু খুব ছোট। এর সাহায্যে শুধু রোগীর মাথা, কাঁধ ও অক্সিজেনের বোতলটি ঢাকা থাকে।

স্বচ্ছ প্লাস্টিকে তৈরি এই তাঁবুর বাইরে থেকে রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা চলে।

তাঁবুর পিছন দিকটা বিছানার গদীর তলায় গুঁজে দেওয়া হয়। সামনের দিকে থাকে পাত্‌লা প্লাস্টিকের তৈরি কয়েক প্রস্থ নরম স্কার্ট, যার ফলে রোগী যে ভাবেই শুয়ে থাকুক না কেন, অক্সিজেন-তাঁবুর ভিতরেই থেকে যায়।

ডাক্তার ও নার্সেরা প্রয়োজন হলে এই স্কার্টের তলা দিয়ে হাত ঢোকাতে পারেন।

ঠাণ্ডা করবার জন্যে বিশেষ কোন যন্ত্রেরও

এতে প্রয়োজন হয় না—কয়েকটা বেড শীট সরিয়ে ফেললেই হলো। খুব গরমের দেশে একটা বিছানার চাদরই যথেষ্ট। কখনো কখনো তাও সরিয়ে ফেলবার প্রয়োজন হতে পারে।

এই নতুন ধরণের তাঁবুতে ব্যবহৃত অক্সিজেন নিরাপদ এবং একে পরিচ্ছন্ন রাখাও সহজ। যে সব তাঁবু রোগীকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকা দেয়, তার চেয়ে এই নতুন তাঁবুর খরচও কম। এই তাঁবু অনেক হাল্কা ও সহজে ব্যবহারযোগ্য। এটি যে কোন জায়গাতেই ব্যবহার করা চলে এবং ইতিমধ্যেই বহু দেশে এটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

হাঁপানীর নতুন ওষুধ

হাঁপানী একটি সর্বদেশীয় রোগ—সকল বয়সের লোক এই রোগে প্রায় একই ভাবে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

যদিও এই রোগ নানা আকার নেয়, তবু আসলে এটি শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত রোগ। রোগ আক্রমণের সময় শ্বাসনালীগুলি বন্ধ হয়ে যায়।

হাঁপানী চিকিৎসার নতুন ব্যবস্থা এবং একটি নতুন ওষুধও বৃটেনে আবিষ্কৃত হয়েছে।

অতীতে এই রোগে যে সব ওষুধ ব্যবহৃত হয়েছে, তাদের কাজ ছিল শ্বাসনালীগুলি খুলে দেওয়া। তার ফলে এই সব সূক্ষ্ম নালীগুলিতে বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা, পরাগ ইত্যাদির অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা থাকতো এবং কাশি বৃদ্ধি করতো।

নতুন ওষুধের নাম ইন্ট্যাল (Intal) এই ওষুধ পূর্বোক্ত অসুবিধাগুলি দূর করবে বলে মনে হয়। দুই ঠোঁটের মাঝখানে চেপেধরা বুড়ো আঙুলের মত ছোট একটি ইনহেলারের সাহায্যে এই ওষুধ শ্বাস টেনে গ্রহণ করা হয়। শ্বাস টানবার ফলে একটি ছোট প্রোপেলারের মত জিনিষ ঘুরতে থাকে এবং গুঁড়া ওষুধ অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ওষুধটি থাকে ক্যাপস্থলের ভিতরে—সেটি ভেঙে ইনহেলারের মধ্যে পুরতে হয়।

ইনহেলারটিকে বলা হয় স্পিনহেলার এবং যে ক্যাপসুলে ওষুধ থাকে, তাকে বলা হয় স্পিনক্যাপ।

ওষুধের প্রভাব কার্যোপযোগী করতে হলে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ওষুধ ব্যবহার করতে হবে।

শিশুদের পক্ষে স্পিনহেলার ব্যবহার করবার অসুবিধা দেখা দিতে পারে, তবে পাঁচ বছরের বেশী বয়সের শিশুরা এটি সফলভাবে ব্যবহার করছে বলে জানানো হয়েছে।

পৃথিবীতে হাঁপানী রোগীর সংখ্যা কত, তা বলা যায় না। তবে ইন্ট্যাল বহু দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ফলও উৎসাহব্যঞ্জক।

মস্তিষ্কের রহস্য সন্ধানে

অধ্যাপক জে. জেড. ইয়ং এমন একজন জীব-বিজ্ঞানী, যিনি মস্তিষ্কের রহস্য-সন্ধানে জীবন নিয়োজিত করেছেন।

তিনি বলেন, মস্তিষ্ক সম্বন্ধে আমরা যত বেশী জানতে পারছি, ততই এটা স্পষ্ট হচ্ছে যে, ভবিষ্যতে মানুষের সকল জ্ঞানের মূল হবে মস্তিষ্ক সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করা।

অধ্যাপক ইয়ং ১৯৪৫ সাল থেকে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অ্যানাটমির অধ্যাপক। তাঁর স্নায়ুতন্ত্র সম্পর্কিত আবিষ্কার মস্তিষ্ক গবেষণায় এক উল্লেখযোগ্য অবদান। স্নায়ুর কাজ ও মস্তিষ্কের সমস্যা বিষয়ক গবেষণায় একে গবেষকেরা সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করছেন। অধ্যাপক ইয়ং তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণার জন্যে ১৯৬৭

সালের রয়েল সোসাইটির পদক লাভ করেন।

অধ্যাপক ইয়ং অক্টোপাসের মস্তিষ্ক অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে, স্মৃতির প্রকৃতি নির্ণয়ে উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীর চেয়ে নিম্ন স্তরের প্রাণী নিয়ে গবেষণা করা অধিকতর লাভজনক। তিনি বলেন, আমি মনে করি, আমাদের স্মৃতির একক খুঁজে বের করতে হবে।

মস্তিষ্ক অতীত ঘটনা সঞ্চয় করে রাখে ও ভবিষ্যতে তা ব্যবহার করে—এই স্মৃতি-কৌশল জানতে হবে।

অধ্যাপক ইয়ং মনে করেন, এই কৌশলের মর্ম উদ্‌ঘাটন করতে হলে একেবারে সহজতম শিক্ষা-প্রণালীগুলি বিচার করতে হবে; যেমন—পশু-শিক্ষা, উঁচু-নীচু, সাদা-কালো, মসৃণ-অমসৃণ ইত্যাদি ধারণা সম্বন্ধে দেখতে হবে, সেগুলি মস্তিষ্কে কি ধরণের ছাপ রেখে যায়।

অধ্যাপক ইয়ং মনে করেন, স্মৃতি এবং চেতনা এক বস্তু নয়—চেতনা কোন বস্তু নয়, কাজ। যেমন জীবন কোন বস্তু নয়, কাজ মাত্র—কোষগুলি নিজেদের মধ্যে এবং একত্রে যা করে, তাই জীবন। অজৈব-বিজ্ঞানীদের পক্ষে এটি একটু জটিল ধরণের ব্যাপার। কারণ জড়বস্তুর মত এখানে সবকিছু কার্য-কারণ সম্বন্ধে বাঁধা নয়। জলকে ১০০° সেঃ তাপে নিয়ে গেলে তা বাষ্প হবেই।

কিন্তু জৈব বস্তুর মধ্যে পছন্দ কাজ করে। অধ্যাপক ইয়ং বলেন, কোন পশুকে শিক্ষা দিতে গেলে সে তার পক্ষে আসতে পারে বা তার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে পারে। এটা নির্ভর করে তার অতীত অভিজ্ঞতার উপর।

এই প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি ছাড়া পদার্থ-বিজ্ঞানের ঘটনার সঙ্গে জীব-বিজ্ঞানের ঘটনার আর কোন বিশেষ পার্থক্য আছে বলে অধ্যাপক ইয়ং মনে করেন না। প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিই জীব-বিজ্ঞানকে জটিলতর করে তুলেছে।

রাস্তা ঝাঁট দেবার গাড়ী

ঘন্টায় পাঁচ মাইল পর্যন্ত রাস্তা পরিষ্কার করতে পারে, এমন একটি রাস্তা ঝাঁট দেবার গাড়ী একটি বৃটিশ ফার্ম সম্প্রতি বাজারে ছেড়েছেন। এই গাড়ীর শক্তি এই ধরণের পূর্ববর্তী গাড়ীগুলির চেয়ে অনেক বেশী এবং এটি চালকের পক্ষেও অনেক বেশী আরামদায়ক।

এই ধরণের যন্ত্র সাধারণতঃ ব্যবহার করে থাকেন মিউনিসিপ্যালিটি ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি। এদের মতামত ও প্রস্তাবের ভিত্তিতে নতুন যন্ত্রটিকে ৯ অশ্বশক্তিসম্পন্ন পেট্রল-ইঞ্জিনচালিত করা হয়েছে—অবশ্য এটিকে গ্যাস বা ডিজেল ইঞ্জিনের গাড়ীতেও পরিণত করা চলে।

গাড়ীর সঙ্গে যুক্ত প্রধান ঝাড়ুটির দৈর্ঘ্য ৩৬ ইঞ্চি। এছাড়া আরও দুটি ঝুলন্ত ঝাড়ু গাড়ীর দু-পাশে থাকে।

অতি শব্দ ও হাঁপানী

সাধারণ মানুষ অতি শব্দ (Ultra sound) শুনতে পায় না, কিন্তু হাঁপানী রোগীরা পান। গবেষক ও শিক্ষক মিঃ আর. কে. ম্যাশনের এটি এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। মিঃ ম্যাশন তাঁর গবেষণার কাজে প্লিমাথ টেক্‌নিক্যাল কলেজ ও মেরিন বায়োলজিক্যাল ষ্টেশনের সাহায্যে পান। তিনি লক্ষ্য করেছেন, হাঁপানী রোগীরা তাঁদের আবেগজনিত সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রে খুবই স্পর্শকাতর এবং তাপমাত্রার সামান্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও তাঁরা খুবই সংবেদনশীল।

তিনি মনে করেন, শ্রবণ ব্যবস্থা শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত এবং হাঁপানীর অর্থই হলো

শ্বাস-ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা। সুতরাং এটা খুবই সম্ভব যে, হাঁপানী রোগগ্রস্ত মানুষ অতিরিক্ত রকমের শব্দানুভূতিশীল। এজন্তে তিনি যাদের এক সময় হাঁপানী হয়েছিল এমন ২৮টি শিশু ও ১৯ জন বয়স্ক লোককে তিনি পরীক্ষা করেন এবং লক্ষ্য করেন যে, এরা হাঁপানী হয় নি এমন সমবয়সীদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত উচ্চতর তরঙ্গের শব্দ শুনতে পান।

মিঃ ম্যাশন বলেন, অতি শব্দের প্রতি সংবেদনশীলতা হাঁপানীর অন্যতম কারণও হতে পারে। এমনও হতে পারে, যে মানুষ অতি শব্দ (Ultra sound) শুনতে পায়, সে এমনি এক পর্যায়ে উত্তেজিত হয়, যাতে হাঁপানী রোগের উদ্ভব হয়। হাঁপানীকে অনেকাংশে মনস্তাত্ত্বিক রোগ বলে মনে করা হয়। ঘন্টার শব্দ, কাশির শব্দ, শিশুদের চীৎকার প্রভৃতি উচ্চ তরঙ্গের শব্দ হাঁপানী রোগীরা সহ্য করতে পারে না।

মিঃ ম্যাশন লক্ষ্য করেছেন, হাঁপানী রোগীরা অন্যান্যদের প্রতি অধিক আবেগ ও অনুকম্পা বোধ করে থাকে। উচ্চারিত বাক্যের মধ্যে যে সব আবেগময় অতি সূক্ষ্মতা থাকে, তা তারা শুনতে পায় বলেই বোধ হয় তারা মানুষের প্রতি অধিক সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে থাকে।

ফসিলের সঠিক সময়কাল নির্ধারণে ব্যবস্থা

গাছপালা ও জীবজন্তুর ৫০ হাজার বছর পর্যন্ত পুরনো ফসিলের সঠিক সময়কাল নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একটি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এই নতুন পদ্ধতিটি অঙ্গারের সাহায্যে তারিখ নির্ণয় পদ্ধতিরই রাসায়নিক রূপান্তর। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে বিদ্যমান তেজস্ক্রিয় অঙ্গার কতখানি হ্রাস পেয়েছে, এই রাসায়নিক ব্যবস্থায় তার পরিমাপ করা হয়। এথেকেই পুরাতত্ত্ববিদ, ভূতত্ত্ববিদ ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষকেরা ফসিলের বয়স নির্ধারণ করেন। নতুন এই ব্যবস্থাটি সংক্রান্ত তথ্যাদি জানিয়েছেন নিউইয়র্কের হোয়াইট প্লেনসে অবস্থিত পিকার কর্পোরেশনের লেবরেটরী ডিভিসনের প্রোডাক্ট ম্যানেজার জেম্‌স্ লারিন।

আসবাবপত্রকে বাতাসে ভাসিয়ে ঘর পরিষ্কার

হোভারক্র্যাফ্‌টের এয়ার কুশনের কৌশল প্রয়োগ করে গৃহস্থালীর ছোটখাটো অনেক কাজের সুবিধা পাওয়া যাবে।

লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হোভারক্র্যাফ্‌টের ব্যবসায়িক দিক সম্পর্কিত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বৃটেনের প্রধান হোভারক্র্যাফ্‌ট নির্মাতা ওয়েষ্ট্ল্যাণ্ড এয়ারক্র্যাফ্‌ট কোম্পানীর অন্যতম ম্যানেজার মিঃ লেসলি হেওয়ার্ড বলেন যে, বর্তমানে অধিকাংশ বাড়ীতে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু তার পরিবর্তে হোভারক্র্যাফ্‌টের এয়ার কুশন পদ্ধতিতে সহজে ঘরের যে কোন ভারী আসবাবপত্র, যেমন—কুকার, ষ্টোরেজ হিটার, আলমারী ইত্যাদি তোলবার কাজে লাগানো যাবে। এর জন্যে এদের তলায় শুধু একটি করে ট্রে উল্টো করে রেখে দিতে হবে এবং এগুলিকে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে হবে।

মিঃ হেওয়ার্ড ভাবীকালে গৃহের রূপ কি হবে, তার একটি ছবি দেখান। এই বাড়ীতে বৈদ্যুতিক লাইনের মত থাকবে প্রেসার লাইন। আসবাবপত্র ও গৃহস্থালীর সরঞ্জামগুলির চেম্বার বা ক্যাভিটি রাখতে হবে, যাতে সেগুলিকে প্রেসার সারকিটের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। এভাবে আসবাবগুলিকে এয়ার কুশনের উপর ভাসিয়ে রেখে প্রয়োজনমত সরানো যাবে।

এসব এয়ার কুশন প্রায় ৩৩৩ পাউণ্ড ভার উত্তোলন করতে পারবে।

দাঁতের ক্ষয় রোধের গবেষণা

দাঁতের ক্ষয় সব দেশেরই একটি অতি সাধারণ রোগ। ছত্রাক (Fungus) থেকে উৎপন্ন একটি পদার্থ এই রোগ ভীষণভাবে হ্রাস করতে পারে।

লণ্ডনের রয়াল কলেজ অব সার্জন্স-এর দন্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞান দপ্তরের কর্মীরা আবিষ্কার করেছেন যে, এমন অনেক ছত্রাক রয়েছে, যাদের দেহ-নিঃসৃত এনজাইম দাঁতের উপর জীবাণুর আক্রমণ রোধ করতে সক্ষম। ডেক্স-ট্রানেজ (Dextranase) নামের এই এনজাইম দাঁতের উপর ডেক্সট্রান নামক দ্রব্যের স্তর পড়া বন্ধ করতে পারে।

মুখের ভিতরে চিনিজাতীয় পদার্থের উপর জীবাণুর ক্রিয়ার ফলে ডেক্সট্রান তৈরি হয়। একবার তৈরি হলে তা দাঁতের সঙ্গে লেগে থাকে। এই স্তরের আশ্রয়ে থেকে জীবাণুগুলি চিনি বিশ্লেষণ করে অ্যাসিড তৈরি করতে থাকে। এই অ্যাসিড দাঁতের ক্ষয় ঘটায়।

মুখগহ্বরকে সম্পূর্ণরূপে জীবাণু-মুক্ত করা অসম্ভব। কোন না কোন আকারে মানুষ চিনি খাবে না, এমনও ভাবা চলে না। খাবার অব্যবহিত পরেই মুখ ধুয়ে ফেলাও কোন কাজের হবে না, কারণ ব্রাশের সাহায্যে ডেক্সট্রান তোলা যায় না। কিন্তু লণ্ডনের গবেষকদল দেখেছেন যে, ছত্রাক থেকে নিঃসৃত পেনি-সিলিয়াম ফিউনিকুলোসামের Penicillium funiculosum) সঙ্গে যদি ডেক্সট্রান মেশানো যায়, তাহলে ডেক্সট্রানেজ (Dextranase) তৈরি হয় এবং ডেক্সট্রান দূরীভূত হয়।

টেষ্ট টিউবে এবং আসল দাঁতের উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এই কাজে অতি অল্প পরিমাণ ডেক্সট্রানেজ-এর প্রয়োজন হবে। জীবজন্তুর উপরে প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে, এনজাইমটি খাদ্যের উপর প্রয়োগ করলেও একই ফল পাওয়া যায়।

ভবিষ্যতের গৃহ

পশ্চিম জার্মেনীর গৃহ প্রদর্শনীতে এবার ভবিষ্যৎ গৃহের একটি নমুনা দেখানো হয়েছে। এই গৃহের ষোলটি আলাদা আলাদা অংশ পলিয়েস্টার রেজিনের সাহায্যে মজবুত গ্লাস-ফাইবার দিয়ে তৈরি। পুরা বাড়ীটির ওজন ৫০০০ পাউণ্ড, ব্যাস ৮ মিটার, উচ্চতা ৪ মিটার। এতে বসবাসের জন্যে ৫০ মিটার জায়গা আছে। রান্নাঘর, শৌচাগার, স্নানঘর সবই আছে। মেঝে বিদ্যুতের সাহায্যে গরম করা যায়। গোটা ছয়েক আরাম কেদারা আছে। সব মরশুমে দিব্যি আরামে থাকবার যোগ্য এই বাড়ীর দাম এখন পঁচাত্তর হাজার টাকা। সবচেয়ে বড় কথা, এই বাড়ী খুলে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে আবার খাটিয়ে নেওয়া যায়।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুলাই—১৯৬৯

২২শ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা



চন্দ্র-পরিক্রমা শেষ করে অ্যাপোলো-১০ পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সময় মহাকাশচারীরা ২৪শে মে তারিখে ক্রমশঃ দূরে সরে-যাওয়া চাঁদের এই ফটোগ্রাফটি তুলেছেন। ছবিতে কেন্দ্রের নিকটবর্তী বড় কালো জায়গাটার নাম শান্ত সমুদ্র বা সি অব ট্র্যাঙ্কুইলিটি। অ্যাপোলো-১১ মহাকাশযানের আরোহীদের জন্যে এই স্থানটিই সম্ভাব্য অবতরণ-ক্ষেত্র বলে নির্ধারিত হয়েছে।

কাঠ থেকে কাগজ

কাগজ তৈরির ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাঠই কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রথমে কাঠ থেকে মণ্ড বা পাল্প্ তৈরি করা হয়। কাঠের মণ্ড সাধারণতঃ দুই রকমের হয়। মেকানিক্যাল বা যান্ত্রিক এবং কেমিক্যাল বা রাসায়নিক। সাধারণভাবে চূর্ণীকৃত কাঠ জলের সঙ্গে মিশিয়ে যে মণ্ড তৈরি হয়, তার নাম মেকানিক্যাল পাল্প। এই ধরণের মণ্ড থেকে যে কাগজ তৈরি হয়, তাতে কাঁচামালের সমস্ত অপদ্রব্য (Impurities) থেকে যায়। মেকানিক্যাল পাল্প্ থেকে সাধারণতঃ নিউজ প্রিন্ট বা ঐ জাতীয় কাগজ তৈরি হয়।

কাঠের টুক্‌রাগুলিকে নানারকম ক্ষারীয় বা অ্যাসিডিক পদার্থ সহযোগে ফুটিয়ে যে মণ্ড তৈরি করা হয়, তার নাম রাসায়নিক মণ্ড। এই ধরণের কাঠের মণ্ড থেকে যে কাগজ তৈরি হয়, তাতে কাঁচামাল অর্থাৎ কাঠের কোন রকম অপদ্রব্য থাকে না বললেই চলে। কস্টিক সোডার সঙ্গে ফুটিয়ে কাঠ থেকে যে মণ্ড পাওয়া যায়, তার নাম সোডা উড। সোডা উড থেকে যে কাগজ তৈরি হয়, তা সাধারণতঃ বই, ম্যাগাজিন, প্রচ্ছদ এবং হাতে লেখার কাগজ। অনুরূপভাবে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগ্‌নেসিয়াম বাইসালফাইট সহযোগে কাঠ থেকে যে মণ্ড প্রস্তুত করা হয়, তার নাম সালফাইট উড। এই ধরণের মণ্ড থেকে যে কাগজ তৈরি করা হয়, তা নিউজ প্রিন্টের চেয়ে ভাল হলেও বই বা প্রচ্ছদের কাগজের মত তত উন্নত ধরণের নয়।

আবার কাঠকে সোডিয়াম সালফেটের সঙ্গে ফুটিয়ে তাথেকে যে মণ্ড পাওয়া যায়, তার নাম দেওয়া হয়েছে সালফেট উড। এই ধরণের মণ্ড থেকে সাধারণতঃ ক্র্যাফ্‌ট্ পেপার তৈরি হয়।

মেকানিক্যাল পাল্প্ তৈরি করবার জন্যে কাঠের টুক্‌রাগুলিকে গ্রাইণ্ডিং মেসিনের সাহায্যে চূর্ণ করা হয়। চূর্ণ করবার সময় অত্যধিক উত্তাপে কাঠ যাতে জ্বলে না যায়, তার জন্যে তার উপর অনবরত জল ঢালা হয়। মণ্ড তৈরি করবার জন্যেও জলের প্রয়োজন হয়। মাঝামাঝি সাইজের মেসিন থেকে প্রতিদিন প্রায় পনেরো থেকে কুড়ি টন মণ্ড তৈরি করা যায়।

এভাবে প্রস্তুত মণ্ডের ভিতরে চূর্ণীকৃত কাঠের চেয়েও বড় সাইজের কাঠ থেকে যায়। নানা সাইজের এবড়ো-খেবড়ো এবং অসম কাঠের খণ্ড যাতে মণ্ডের ভিতরে থেকে না যায়, সে জন্যে মণ্ডকে বিভিন্ন ঘূর্ণায়মান ছাঁক্‌নির মধ্য দিয়ে চালিত করা হয়।

এভাবে প্রাপ্ত মণ্ডকে আরো সূক্ষ্মভাবে পরিশোধনের জন্যে রিফাইনার বা পরিশোধকের মধ্য দিয়ে চালিত করা হয়। এখানে মণ্ডের সঙ্গে আবার প্রয়োজনমত জল মেশানো হয় এবং চাপ প্রয়োগ করে মণ্ডকে কাদার মত থক্‌থকে পদার্থে পরিণত করা হয়।

মণ্ডের মধ্যে কাঠের আঁশগুলি যদিও ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে থাকে, তবুও তাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ থেকে যায়। এই প্রভেদ একেবারে কমিয়ে দেবার জন্যে মণ্ডের মধ্যে নানারকম পদার্থ মেশানো হয়। সাধারণতঃ যে সমস্ত পদার্থ মেশানো হয় তাদের মধ্যে চীনামাটি, ক্যালসিয়াম সালফেট, টাইটানিয়াম অক্সাইড প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রক্রিয়াকে ইংরেজীতে লোডিং বলা হয়। লোডিং-এর ফলে মণ্ড থেকে প্রস্তুত কাগজের শীট মসৃণ, সুসম, অস্বচ্ছ এবং সুসংবদ্ধ হয়।

এভাবে প্রাপ্ত মণ্ড থেকে যে কাগজ তৈরি হয়, তাতে কালি দিয়ে কিছু লিখলে বা ছাপলে সমস্ত শীট লেখার বা ছাপার কালিতে ভরে যায়। তার ফলে কোন কিছুই লেখা সম্ভব হয় না। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যে কাঠের মণ্ডে রজন, ফটকিরি প্রভৃতি মেশানো হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম পেপার-সাইজিং। সাইজিং প্রক্রিয়ার ফলে মণ্ডের আঁশগুলি রীতিমত সুসংবদ্ধ এবং অঙ্গাঙ্গী হয়ে থাকে।

এই সব প্রক্রিয়ার পর মণ্ডকে কাগজ তৈরির যন্ত্রের মধ্যে পাঠানো হয়। এই যন্ত্রের মধ্যে মণ্ডকে প্রথমে রীতিমত চট্‌কানো হয়। অতঃপর মথিত মণ্ডকে পরিশোধিত ও বাষ্পের সাহায্যে শুষ্ক করা হয়। সর্বশেষে চাপ প্রয়োগ করে মসৃণ কাগজের শীট তৈরি করা হয়।

এভাবেই কাঠের মেকানিক্যাল পাল্‌প্‌ থেকে কাগজ তৈরি করা হয়।

কাঠ থেকে কাগজ তৈরির ব্যাপারে মানুষ যে ভাবে তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি কাজে লাগিয়েছে, তা সত্যই বিস্ময়কর।

প্রভাতকুমার দত্ত

পাতার কাজ

তোমরা সবাই জান—পাতা হলো গাছের একটি প্রধান অংশ। পাতা সূর্যকিরণের সাহায্যে খাদ্য তৈরি করে এবং সেই খাদ্যকে শর্করা জাতীয় খাদ্যে পরিণত করে বিভিন্ন অংশে পাঠিয়ে দেয়—যার ফলে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের পুষ্টিসাধিত হয়। এই কারণে পাতাকে গাছের রান্নাঘরও বলা যেতে পারে।

পাতার সাধারণতঃ তিনটি অংশ থাকে, যথা—(১) গোড়া, (২) বোঁটা ও (৩) পত্রফলক।

গোড়া :—পাতার যে অংশটি কাণ্ড বা শাখা-প্রশাখার সঙ্গে সংলগ্ন থাকে, তাকে বলে গোড়া।

বোঁটা :—গোড়ার ঠিক পরেই সরু লম্বা মত অংশটিকে বলে বোঁটা।

পত্রফলক :—বোঁটার ঠিক পরেই পাতার সবুজ বর্ণের বিস্তৃত অংশকে বলে পত্রফলক। পত্রফলকই হলো পাতার প্রধান অংশ।

পাতার মধ্যে থাকে অসংখ্য সবুজ কণা বা ক্লোরোফিল। আমাদের শরীরের মধ্যে যেমন অসংখ্য ছিদ্র আছে, পাতার মধ্যেও সেই রকম অসংখ্য ছিদ্র থাকে, যাদের বলা হয় স্টোমা। এছাড়া পাতার মধ্যে থাকে অসংখ্য শিরা ও উপশিরা। আবার এই শিরা-উপশিরাগুলির মধ্যে থাকে ছোট ছোট (প্রায় গোলাকার) অংশ, যাদের বলা হয় কোষমণ্ডল। পাতার উপর ও নীচের দিকে দুই রকমের নলাকার কোষ থাকে, তারই এক রকমের মধ্য দিয়ে মাটির মধ্য থেকে শোষিত রস পাতার মধ্যে পৌঁছায়। তাদের বলা হয় জাইলেম কোষ এবং সেগুলির নীচের দিকে থাকে আর এক রকম কোষ, যাদের মধ্য দিয়ে প্রস্তুত খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পরিচালিত হয়। এই রকমের কোষ-নলগুলির নাম ফ্লোয়েম।

পাতার প্রধান কাজ তিনটি, যথা—(১) অঙ্গারাত্তীকরণ বা আলোকসংশ্লেষণ, (২) শ্বাসকার্য, (৩) প্রস্বেদন।

অঙ্গারাত্তীকরণ :—পাতার মধ্যে স্টোমাগুলি সূর্যকিরণে বড় হয়ে যায়। তখন বায়ুস্থিত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস পাতার মধ্যে প্রবেশ করে এবং অপর দিক থেকে অর্থাৎ মূল থেকে আগত রস পাতায় এসে পৌঁছুবার পর উভয়ের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া আরম্ভ হয়। আলোর উপস্থিতিতে পাতার সবুজ কণার সাহায্যে এটা হয়ে থাকে। পাতার এই কাজের নাম অঙ্গারাত্তীকরণ বা আলোকসংশ্লেষণ। তার ফলে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত হয় এবং অক্সিজেন বের হয়ে যায়। ঐ শ্বেতসারকে শর্করায়

পরিণত করে সূর্যাস্তের পর পাতা ফ্লোয়েম কোষের মধ্য দিয়ে গাছের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে দেয় এবং উদ্বৃত্ত অংশকে শ্বেতসাররূপে দেহের বিভিন্ন অংশে জমা রাখে।

পাতার দ্বিতীয় কাজের নাম শ্বাসকার্য। আমরা যেমন শ্বাসকার্যের সময় অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করি, উদ্ভিদও তেমনি শ্বাসকার্যের সময় অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে। কিন্তু খাদ্য তৈরির সময় গাছ কার্বন পাবার জন্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। উদ্ভিদের শ্বাসকার্য সব সময়েই হয়ে থাকে। তবে দিনের বেলায় পাতা অঙ্গারাত্তীকরণে লিপ্ত থাকে বলে বোঝা যায় না—রাতে বোঝা যায়।

পাতার তৃতীয় কাজ হলো—প্রস্বেদন। গাছ মাটি থেকে কঠিন খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না, তরল খাদ্য গ্রহণ করে এবং খাদ্য তৈরির জন্যে যতটা দরকার তার চেয়ে অতিরিক্ত রস সংগ্রহ করে। তারপর খাদ্য তৈরির জন্যে যতটা রস তাদের দরকার, সেটুকু নিয়ে বাকীটা পাতার মধ্য দিয়ে বাষ্পের আকারে বের করে দেয়। পাতার এই কার্যকে প্রস্বেদন বলা হয়।

প্রস্বেদনের সময় গাছ যে অতিরিক্ত রস জলীয় বাষ্পের আকারে পাতার মধ্য দিয়ে বের করে দেয়, তা একটি সহজ পরীক্ষার দ্বারা বোঝা যায়।

একটি টবের সতেজ গাছকে কিছুক্ষণ রোদে রেখে গাছের গোড়ার দিকে টবের মুখ রবারের পাতলা চাদর দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে দিতে হবে, অথবা ঐ রবারের চাদরের পরিবর্তে কিছুটা তেল দিলেও চলবে। এবার একটা বেলজার (কাচের) দিয়ে ঐ টবটিকে এমনভাবে ঢাকা দিতে হবে, যেন বায়ু চলাচল করতে না পারে। তারপর কয়েক ঘণ্টা বা কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে যে, কাচের বেলজারের ভিতরের গায়ে ছোট ছোট জলকণা জমা হয়েছে। প্রস্বেদন-ক্রিয়ার ফলে যে জল বাষ্পের আকারে নির্গত হয়েছে, তাই বেলজারের ভিতরের গায়ে জলবিন্দুর আকারে জমা হয়েছে। এজন্যেই যে স্থানে অরণ্য বেশী, সেই স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অন্যান্য স্থান অপেক্ষা একটু বেশী হয়ে থাকে।

শ্রীপরেশনাথ রায়

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। সিগারেট খেলে সত্যিই কি কিছু ক্ষতি হয়?

দেবাশীষ ঘড়ুই, পিণ্টু চক্রবর্তী
বিষ্ণুপুর

প্রশ্ন ২। পৃথিবীর চুম্বকত্বের উৎস সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

টুটুল কোলে ও মৈত্রালী সরকার
আলিপুরদুয়ার

উঃ ১। সিগারেটের উপরের কাগজটি ছিঁড়লেই তামাক দেখতে পাওয়া যায়। সিগারেট তৈরির জন্যে সাধারণতঃ নিকোটিনা টোবাক্যাম তামাক ব্যবহার করা হয়। সিগারেটের জনপ্রিয়তা যে ক্রমশঃই বাড়ছে, সেটা এর ক্রমবর্ধিত উৎপাদনের হার থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু সিগারেটের সঙ্গে চিকিৎসকদের সম্পর্কটা খুব সম্প্রীতিজনক নয়। আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি প্রায় দেড় লক্ষ লোকের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে, ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে ফুস্‌ফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, যারা ধূমপান করে না, তাদের তুলনায় অন্ততঃ দশ গুণ বেশী। স্কটল্যাণ্ডের জনৈক ডাক্তার বলেছেন যে, একজন মধ্যবয়সী পুরুষ যদি দিনে পঁচিশটি সিগারেট খায়, তবে সে ক্ষেত্রে তার আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা, যারা ধূমপান করেন না তাদের তুলনায় প্রায় ১৫ গুণ বেশী।

সিগারেটের ধোঁয়া কাশির উদ্রেক করে এবং যক্ষ্মা, হাঁপানী ইত্যাদি রোগীর ফুস্‌ফুসে ঢোকবার ফলে বেশ কিছুটা ক্ষতিসাধন করে।

থ্রমবোয়ানজাইটিস অবলিটারয়্যান্‌স্‌ নামক একটি রোগের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, ধূমপান অব্যাহত রাখলে রোগটা ক্রমশঃ বেড়েই চলে, কিন্তু ধূমপান বন্ধ করলে অনেকটা কমে যায়। এই রোগের ফলে হাতের আঙুল ও পায়ের পাতায় রক্ত কম পৌঁছায় এবং অসাড়তার সৃষ্টি করে।

তামাকের মধ্যে নিকোটিন নামে এক রকম তৈলাক্ত বর্ণহীন বিষাক্ত পদার্থ থাকে। সামান্য দুই সেন্টিগ্রাম নিকোটিনের প্রভাবে দেহে অস্থায়ী পঙ্গুত্ব দেখা দেয়। আমাদের দেশে যে মাপের সিগারেট বাজারে চালু আছে, তাতে প্রায় এক গ্রাম পরিমাণ নিকোটিন থাকে, কিন্তু শ্বাসযন্ত্রে পৌঁছায় এক মিলিগ্রাম কি আরও কম পরিমাণে। নিকোটিন শিরাগুলির অস্থায়ী সংকোচন আনে, যার ফলে দেখা যায়, ধূমপানের পরেই হাত ও পায়ের আঙুলের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেয়েছে। নিকোটিন শ্বাসযন্ত্রের ভিতর ঢুকে রক্তের চাপ বাড়িয়ে দেয়।

সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে ভাসমান কঠিন পদার্থ থাকে। এর নাম টার এবং এই টার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। টার প্রায় হাজার দুই পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে সংগঠিত। এই রাসায়নিক যৌগগুলির মধ্যে কার্বন মনোক্সাইড, আর্সেনিক ইত্যাদি বিষাক্ত পদার্থ আছে। বর্তমানে ফিলটার-টিপ ইত্যাদির সাহায্যে সিগারেটগুলিকে এমনভাবে তৈরির চেষ্টা চলছে, যাতে শরীরের অভ্যন্তরে কম পরিমাণে নিকোটিন ও টার প্রবেশ করতে পারে। এই ফিলটার-টিপ সেলুলোজ অ্যাসিটেট নামক একপ্রকার সিন্‌থেটিক ফাইবার দিয়ে তৈরি। কিন্তু দেখা যায় যে, ফিলটার-টিপ ধোঁয়ার সূক্ষ্ম পদার্থসমূহ আট্‌কাবার পক্ষে খুব উপযোগী নয়, তবে এর সামান্য কিছু প্রতিরোধ-ক্ষমতা আছে।

উঃ ২। আমরা জানি, মুক্ত চৌম্বক শলাকা সব সময়েই নিজেকে মোটামুটিভাবে ভৌগোলিক উত্তর ও দক্ষিণ দিক বরাবর স্থাপন করে। তাছাড়াও দেখা গেছে যে, কোন চৌম্বক পদার্থকে (Magnetic substance) পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ দিকে মুখ করে অনেক দিন ফেলে রাখলে সেটাতে ক্ষীণ চুম্বকত্বের সৃষ্টি হয়। এই সব ঘটনা থেকে মনে করা হয় যে, পৃথিবীর নিজস্ব একটা চৌম্বক ক্ষেত্র আছে। মুক্ত চৌম্বক শলাকার অক্ষ পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তর ও দক্ষিণ মেরু সংযোগকারী সরলরেখার সঙ্গে কোণ করে দাঁড়ায়। এথেকে আমরা মনে করতে পারি যে, পৃথিবীর চৌম্বক মেরু ও ভৌগোলিক মেরু আলাদা।

পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি, ভূপৃষ্ঠের উপর থেকে যত উপরে ওঠা যায়, ততই কমতে থাকে। দেখা গেছে যে, পৃথিবীর পৃষ্ঠে এই চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি ৪০০০ মাইল উপরে প্রায় আট ভাগের এক ভাগ। পৃথিবীর আকৃতির বিশালতার তুলনায় কিন্তু এর চৌম্বক ক্ষেত্র অনেক কম শক্তিশালী। ভূ-চুম্বকত্বের কারণ হিসাবে প্রথমে মনে করা হতো যে, পৃথিবীর কেন্দ্রে একটি শক্তিশালী চুম্বক চৌম্বক মেরুদ্বয়ের দিকে বিস্তৃত আছে। এই চুম্বকের অস্তিত্ব কল্পনা করলে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের বলরেখার সজ্জার ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা পরে প্রমাণ করেন যে, এই চুম্বকের অস্তিত্ব আরও ২১৪ মাইল দূরে হলে এই ব্যাখ্যা আরও যুক্তিসম্মত হতো। কিন্তু এটা বাস্তব বিরোধী কল্পনা মাত্র।

এছাড়াও মনে করা হতো, পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্তরে যে সমস্ত চৌম্বক ধাতু আছে, সেগুলিই এই চৌম্বক ক্ষেত্রের উৎস। ভূত্বকের নীচে যে সব জায়গায় লৌহ ইত্যাদির খনি আছে, সে সব জায়গায় চৌম্বক ক্ষেত্রে নানারূপ বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যায়। এই বিশৃঙ্খলা অনেক সময় মাটির নীচে লৌহ খনির অস্তিত্ব নির্দেশ করে।

এই যুক্তির সাহায্যে যদিও পৃথিবীর চুম্বকত্বের ব্যাখ্যা চলে, তথাপি এই মতবাদের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে বহু সন্দেহের অবকাশ আছে। ভূত্বকের নীচে যত

গভীরে যাওয়া যায়, তাপমাত্রা ততই বাড়তে থাকে। তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চুম্বকত্ব হ্রাস পায় এবং একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার উপরে চুম্বকত্ব বিনষ্ট হয়ে যায়। এই নির্দিষ্ট তাপমাত্রাকে বলা হয় কুরী পয়েন্ট। লোহার ক্ষেত্রে এই তাপমাত্রা ৭৫০° সেন্টিগ্রেড। পৃথিবীর অভ্যন্তরে ১০০ মাইল অথবা আরও ভিতরে তাপমাত্রা এই বিচুম্বকন তাপমাত্রা থেকে অনেক বেশী। কাজেই এখানে কোন চৌম্বক পদার্থ থাকলেও তার চুম্বকত্ব কার্যকরী হয় না। পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত শীতল স্তরগুলিতে এই চৌম্বক পদার্থগুলির অস্তিত্ব যদি ভূ-চুম্বকত্বের কারণ হয়, তাহলেও দেখা যায় যে, এর চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি যা হওয়া উচিত, বাস্তব ক্ষেত্রে ততখানি হয় না। পৃথিবীর প্রতি সি. সি. উপাদানের চুম্বকনের মাত্রা ·০৮ সি. জি. এস. একক হওয়া উচিত, কিন্তু পরীক্ষার ফলে দেখা যায়, এই মাত্রা অনেক কম।

যেহেতু উপরিউক্ত দুই মতবাদের সাহায্যে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না, তথাপি বর্তমানে মনে করা হয় যে, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রটি বৈদ্যুতিক তরঙ্গ-প্রবাহের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর কেন্দ্রীয় অঞ্চল অর্ধতরল পদার্থে গঠিত হওয়ায় এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-স্রোত চলাচল করতে পারে। হিসাব করে দেখা যায় যে, এই চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে ১০৯ অ্যাম্প. বিদ্যুৎ-স্রোতের প্রয়োজন। কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তরে এই বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ কি করে সৃষ্টি হতে পারে? যেহেতু পৃথিবীর অভ্যন্তরের উপাদানগুলির একটা রোধ (Resistance) আছে, সেহেতু অনাদি কাল থেকে এই বিদ্যুৎ-স্রোত প্রবাহিত হয়ে আসছে—এটা মেনে নেওয়া যায় না। পৃথিবীর ভৌগোলিক ও চৌম্বক মেরুরেখা খুব কাছাকাছি থাকায় মনে হয় যে, পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও এর চৌম্বক ক্ষেত্র পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। ১৯১৮ সালে পৃথিবীর আহ্নিক গতির আকস্মিক পরিবর্তনের সঙ্গে এর চৌম্বক ক্ষেত্রের আকস্মিক পরিবর্তন—এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে। অরষ্টেড, রোল্যাণ্ড প্রমুখ বিজ্ঞানীরা পরীক্ষার সাহায্যে দেখান যে, কোন বিদ্যুতায়িত বস্তু যদি নিজের অক্ষের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরতে থাকে, তবে তার চারদিকে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। ভূ-বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় জানা যায়, পৃথিবীপৃষ্ঠেও কিছু পরিমাণ স্থির-বিদ্যুৎ আছে। কাজেই উপরের ঘূর্ণন মতবাদের সাহায্যে আমরা পৃথিবীর চুম্বকত্ব ব্যাখ্যা করতে পারি। পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্যে এর অর্ধতরল কেন্দ্রমণ্ডলে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হতে পারে। এখন পৃথিবীর কেন্দ্রমণ্ডলে যদি কোন ক্ষীণ চৌম্বক ক্ষেত্র থাকে, তবে এই আলোড়নের দরুণ তড়িচ্চুম্বকীয় আবেশের ফলে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সৃষ্টি হতে পারে। যদি এভাবে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ একবার সৃষ্টি হয়, তবে তা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থ চৌম্বক ক্ষেত্রকে ক্রমশঃ শক্তিশালী করে তুলবে এবং এভাবে পৃথিবীর কেন্দ্রীয় অঞ্চল একটা ডায়নামোতে পরিণত হবে। এই ডায়নামো মতবাদের সাহায্যে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা গেছে।

শ্যামসুন্দর দে

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
কলেজ অব ইঞ্জিনীয়ারিং অ্যাণ্ড
টেক্‌নোলজী, ডিপার্টমেন্ট অব ফুড
টেক্‌নোলজী অ্যাণ্ড ব্যায়োকেমিক্যাল
ইঞ্জিনীয়ারিং, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা-৩২

২। মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ
১১।১, ইন্দ্রবিশ্বাস রোড
(ফ্ল্যাট নং ২)
কলিকাতা-৩৭

৩। রঞ্জন ভদ্র
অবধায়ক শ্রীঅলোকরঞ্জন ভদ্র
রবীন্দ্র পল্লী, মধ্যমগ্রাম
২৪ পরগণা

৪। মহুয়া বিশ্বাস
১৫।বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

৫। শ্রীনিলাংশু মুখোপাধ্যায়
১৪, হরিশ দে লেন
পোঃ ভদ্রকালী
জেলা—হুগলী

৬। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র
১১৫।এ, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৪

৭। শ্রীরবীন্দ্রনাথ মজুমদার
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
(বি. বি. এ)
পোঃ নরেন্দ্রপুর
জেলা ২৪ পরগণা

৮। রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
ক্যালকাটা কেমিক্যাল
(কন্‌ট্রোল লেবরেটরী)
৩৫, পণ্ডিতিয়া রোড
কলিকাতা-২৯

৯। দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বি-৩, সি. আই. টি বিল্ডিংস্‌
৩০, মদন চাটার্জী লেন
কলিকাতা-৭

১০। সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত
২৮৬, মহারাজা নন্দকুমার রোড (সাউথ)
কলিকাতা-৩৬

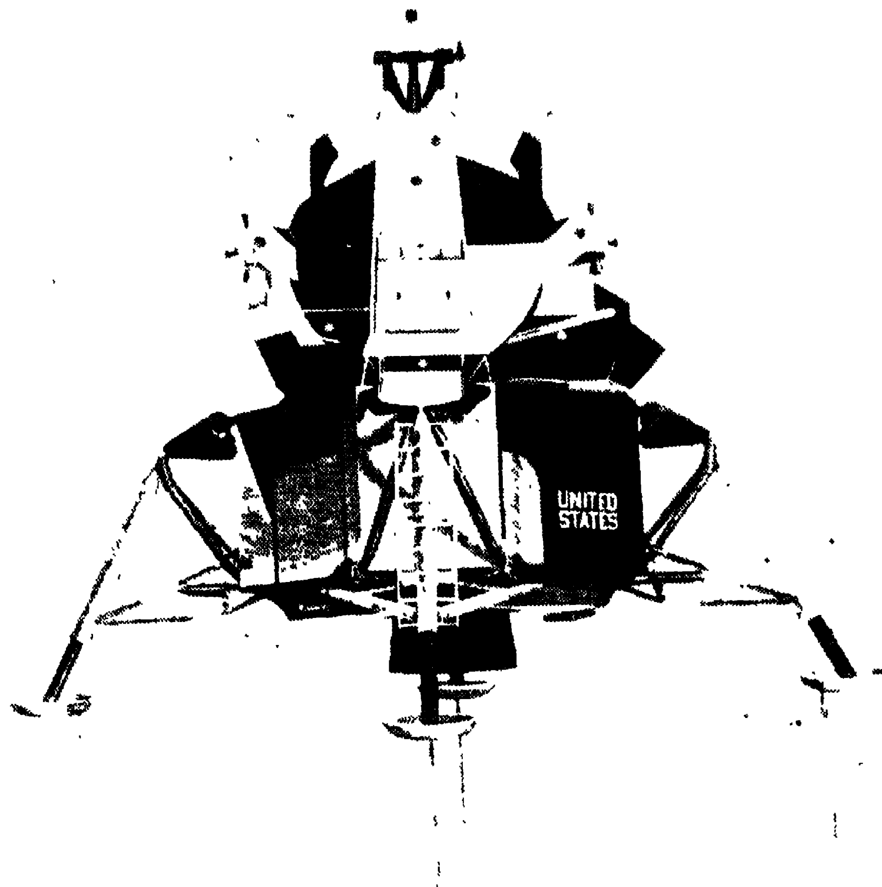
১১। প্রভাতকুমার দত্ত
৩৬।বি, বকুলবাগান রোড
কলিকাতা-২৫

১২। শ্রীপরেশনাথ রায়
গ্রাম—মোহনবাটী
ডাকঘর—নছিপুর (তারকেশ্বর)
জেলা—হুগলী

১৩। শ্যামসুন্দর দে
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স ; বিজ্ঞান কলেজ
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত



লুনার মডিউল

আমষ্ট্রং ও অলড্রিনকে নিয়ে এই লুনার মডিউলটি চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করেছে। এই লুনার মডিউলটির নিজস্ব পরিচালন, ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদি রয়েছে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাবিংশ বর্ষ অগাষ্ট, ১৯৬৯ অষ্টম সংখ্যা

নিবেদন

১৯৬৯ সালের ২১শে জুলাই, ভারতীয় সময় সকাল ৮টা ২৬ মিনিট ২০ সেকেণ্ড—মানব-সভ্যতার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন—একটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। চন্দ্র-পৃষ্ঠে মার্কিন মহাকাশচারী নীল আর্মষ্ট্রং-এর প্রথম পদক্ষেপের মধ্য দিয়া মানুষের যুগ যুগ সঞ্চিত কল্পনা বিজ্ঞানের আশ্চর্য ক্ষমতায় বাস্তবে রূপায়িত হইল। দূরকে নিকট করিবার জন্য মানুষের যে চিরন্তন প্রয়াস, চন্দ্রবিজয় তাহার একটি বিপুল সাফল্যের স্বাক্ষর।

কেপ কেনেডি হইতে উৎক্ষিপ্ত মূল মহাকাশ-যানে আরোহণ করিয়া তিন জন দুঃসাহসী অনুসন্ধানী—নীল আর্মষ্ট্রং, এড্উইন অলড্রিন ও মাইকেল কলিন্স চন্দ্রবিজয়ের সকল অভিযানে গত ১৬ই

জুলাই '৬৯ যাত্রা করিয়াছিলেন—সমগ্র মানব-সমাজের অগ্রগামী প্রতিনিধিরূপে, তাঁহাদিগকে জানাই আমাদের অন্তরের অভিনন্দন। যে সকল বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-কর্মীদের অধ্যবসায় ও সমবেত প্রচেষ্টায় এই অভিযান সফল হইয়াছে, তাঁহাদিগকে নিবেদন করি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা।

বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ চন্দ্র, তথা বিশ্ব-জগৎ সম্পর্কে ধীরে ধীরে নানাবিধ তথ্য আহরণ করিয়াছে। চন্দ্র-অভিযানের সাফল্যের মাধ্যমে সেই ঐতিহ্যের পথ বহুগুণে প্রশস্ত হইয়া গেল। এই অভিযানের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে ঐ ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই তাহা করিতে হইবে। এই পত্রিকার বর্তমান সংখ্যার কয়েকটি প্রবন্ধে ইহার আভাস পাওয়া হইবে।

বাস্তবনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, মহাকাশ-বিজ্ঞানে যে অবিশ্বাস্য রকম উন্নতি ঘটিয়াছে, মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়—এমন কি, বিজ্ঞানের অন্যান্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও সেইরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। এই বিষয়টিও বর্তমান সংখ্যায় আলোচিত হইয়াছে। আমরা একান্ত-ভাবে আশা করি, উক্ত ব্যবধান ক্রমশঃ হ্রাস পাইবে এবং মানব-সমাজ ও সভ্যতার সকল অঙ্গে অনুরূপ প্রগতির ধারা প্রবাহিত হইবে—মানুষের কীর্তির গৌরব তাহাকে তাহার সঙ্কীর্ণতা ও মলিনতা হইতে মুক্ত করিতে সাহায্য করিবে।

মহাকাশ, বিশেষতঃ চন্দ্র সম্পর্কে কিশোর-বিজ্ঞানীর দপ্তরে তাহাদের সেই কৌতূহল যৎ-কিঞ্চিৎ চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

যে বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের মধ্য দিয়া মানব-মনের চিরজিজ্ঞাসার একটি নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হইল এবং সমগ্র মানব-সমাজের প্রগতি ও কল্যাণকল্পে যাহার সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেই চন্দ্রবিজয়ের কৃতিত্বের স্মারক হিসাবে বর্তমান সংখ্যার 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' 'চন্দ্রাভিযান সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত হইল।

নানা কথা

সত্যেন বোস

২২শে জুলাই

আমেরিকার অভিযাত্রীরা চাঁদে পৌঁছে গেলেন, তখন আমাদের দেশে নিশুতি রাত। তবে এখানেও অনেক উৎসাহী বন্ধুরা ব্যগ্র হয়ে রাত জেগে বেতারে খবর শুনেছিলেন—তাঁদের কানে মানববাহী যানের চাঁদের মাটিতে প্রথম স্পর্শের খবরও নাকি বেতার ভেসে এসে পৌঁচেছিল। অন্যান্য দেশে টেলিভিশনে ছায়াছবিতে দেখা গিয়েছিল অভিযাত্রী আর্মস্ট্রং সিঁড়ি বেয়ে চাঁদে নেমে পড়লেন। যন্ত্রসভ্যতার যুগে প্রয়োগবিদ্যার এই চূড়ান্ত সাফল্যে সারা পৃথিবী জয়োল্লাসে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। বহু বৎসর ধরে হাজার হাজার বিজ্ঞানীদের সমবেত সহযোগিতা ও গবেষণার ফলে মানুষ চাঁদে পৌঁচেছে। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীব-বিজ্ঞানের অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এই প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে—যার কল্যাণে অবাধে বায়ুমণ্ডল ভেদ করে মহাশূন্যে রকেট-যানে মানুষের এই প্রয়াস সম্ভব হয়েছে। কে নাকি বলেছিলেন, চাঁদের মাটিতে অনেক হীরা-জহরৎ ছড়ানো আছে। অভিযাত্রীরা বস্তা ভরে সে সব নিয়ে ফিরবেন। বাজারে বিক্রী হলে তাথেকেই এই অভিযানের সব খরচ উঠে আসবে। ছবিতে দেখা গেল, তাঁরা আড়াই ঘণ্টা ধরে বেড়িয়েছেন—বস্তা ভরে তুলে আনছেন পাথর, উপলখণ্ড ও মাটির রাশি, যা এখানে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখবেন—তার উপাদানে কোন অজানা বস্তুর সন্ধান মিলবে কি না। সৃষ্টির রহস্য নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান, তাঁরা ভাবছেন, সৃষ্টির আদিতে আমাদের গ্রহ কেমন ছিল—তার সন্ধান হয়তো এই চাঁদের মাটিতে মিলতে পারে। এই পৃথিবীতে তো নানা প্রাকৃতিক বিপ্লবে সে সব আদিকথার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রকৃতির বিপর্যয়, তাছাড়া প্রাণের অভিযান ও দৌরাত্ম্য তো আছেই। শুধু বিশ্লেষণে অবশ্য বেশী কিছু নতুন উপাদানের সন্ধান তাঁরা আশা করেন না। কারণ পৃথিবীতে উড়ে এসেছে, উল্কাপাতে পড়েছে অনেক শিলা—যা সংগ্রহ করে তাঁরা দেখেছেন, আমাদের চিরপরিচিত পৃথিবীর উপাদান দিয়েই সে সব গড়া—কাজেই চাঁদে সংগৃহীত মশলা থেকে এমন কিছু নতুন খবর পাওয়া যাবে না, যা আগে থেকেই বিজ্ঞানীরা আন্দাজ করেন নি।

অবশ্য সংগ্রহ অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ হলেও এর জন্যে যে প্রচণ্ড পরিশ্রম ও জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করতে হয়েছে, তাতেই বিজ্ঞান-ভাণ্ডারে বিপুল সঞ্চয় জমেছে এত বছরে। সব তথ্য এখনো আমেরিকান বা রুশ বিজ্ঞানীমহল খোলা বাজারে ছাড়েন নি—সব কথা হয়তো আজ থেকে শতবর্ষ পরে প্রকাশ হবে।

* * *

২৩শে জুলাই

চাঁদের অভিযানে প্রতিযোগিতা করে আসছেন রাশিয়া। এবারও তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে লুনা-১৫ ছেড়েছেন। আজকের খবর—সেও নাকি ধীরে ধীরে চাঁদের কূলে ঠেকেছে। অবশ্য সবটাই দূর থেকে যন্ত্রবশে নিয়ন্ত্রিত ও চালিত—চালকবিহীন এই যান। হয়তো তথ্য সংগ্রহ

করছে, ছবি তুলছে, হয়তো বা সেও চাঁদের মাটি সংগ্রহ করে পৃথিবীতে ফিরবে। ইংরেজ বিজ্ঞানীরা কেউ ভেবেছেন—হয়তো যাত্রী পুনর্বার বোঝাই করে অ্যাপোলো-১১-এর ফিরতে একটু দেরী হতে পারে, তার আগে লুনা যদি ফিরে আসে—তো বিজয়ের গৌরব অনেকটা ম্লান হয়ে যাবে আমেরিকানদের।

* * *

২৪শে জুলাই

দুই মহাশক্তির মধ্যে মহাকাশ অভিযান নিয়ে খুব রেষারেষি। তবে এইবার বোধ হয় জয়মাল্য আমেরিকায় রয়ে গেল। নানা দেশ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন—সকলে বলছেন—অভিযাত্রীদের নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রইলো। কেউ বা ১লা জানুয়ারীর বদলে ২১শে জুলাই থেকে বর্ষ গণনা সুরু করতে চান। আজ সকলে উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করে রয়েছেন। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি স্বয়ং এগিয়ে চলেছেন অভিযাত্রীদের স্বাগত জানাতে—প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে, যেখানে তাঁদের আজ রাতে নামবার কথা। তার পরে কিছুদিন তাঁরা নতুন ধরণের আবাসে নজরবন্দী হয়ে থাকবেন—কারো যেন ছোঁয়াচ না লাগে। যাতে তাঁদের সঙ্গে চাঁদ থেকে কোন অজানা বীজাণু না এসে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। বোধ হয় মানুষ যাতে পৃথিবীতে বহুযুগ ধরে ঠিক থাকে, তার জন্যে এই সতর্কতা। অবশ্য চাঁদ থেকে আমদানী না হলেও মারণযজ্ঞের যথেষ্ট ইন্ধন মজুত রয়েছে এই পৃথিবীতেই। কি বোমা, কি বিষাক্ত গ্যাস, কোনটারই অভাব নেই। তাছাড়া শত্রুর রাজ্যে ইচ্ছামত রোগের বীজাণু ছড়িয়ে দেবার কৌশলও মানুষের অজানা নেই। মাঝে মাঝে সেই নিয়ে পরীক্ষা হয়ে গেছে—এই রকম কানাঘুষাও শোনা যায় মাঝে মাঝে। অবশ্য বিশ্বশান্তির ঢাকের বাজনায় তা অনেকটা চাপা পড়ে গেছে। ভারতের মত দরিদ্র অনেক দেশের নিরক্ষর মানুষ ভাবছে, প্রগতির এই প্রচণ্ড পদক্ষেপে তাদের কি লাভ হলো। মহাকাশচারীরা তো চাঁদে তারাখচিত পতাকা উড়িয়ে এলেন—আর ভাবলেন বিশ্বশান্তি আনবার এবং চিরস্থায়ী করবার জন্যে সব মানুষের সমবেত চেষ্টার প্রতীক হয়ে রইলো এটি।

* * *

এ দেশে বয়সের ভারে যাঁদের স্মৃতির বিলুপ্তি হয় নি, তাঁরা শৈশবে যে স্কুলে Pax Britannica-র কথা শুনতেন—তার বিষয় মনে পড়বে। আর মনে পড়বে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজের Union Jack-এর আওতায় বিশ্বশান্তি স্থাপনের দারুণ আকাঙ্ক্ষা। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার কথা এখনো শুনছি, ভ্রাতৃভাবের উচ্ছ্বসিত ধ্বনি বাতাস কাঁপাচ্ছে নানা কনফারেন্সে, তবে উপনিষদের কথার সময়োপযোগী টীকা করে নিলে দাঁড়ায়—এসব দুর্বলের লভ্য নয়।

যন্ত্র-বিজ্ঞানের উন্নতি এতদূর এগিয়েছে যে, আজ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলি মানুষকে ভাবনার দায় থেকে রেহাই দিয়েছে। যন্ত্রের হাতে নির্ভাবনায় নিজেকে সঁপে দেওয়া—ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে অকুতোভয়ে অজানা সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়াই হলো আজকের দিনের নির্দেশ। এটিতে ফল ভালই দাঁড়ায়—২১শে জুলাইয়ের অভিযান থেকে প্রমাণ হলো।

ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলছে। এদেশে জ্যোতিষীরা মাঝে মাঝে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন—চেতাবাণী মাঝে মাঝে আমেরিকার কাগজেও দেখি। অবশ্য জ্যোতিষ যে নির্ভুল নয়, তার প্রমাণ অনেক আছে। তবুও এ দেশ থেকে রাজজ্যোতিষীদের তাড়ানো যাবে না। বিজ্ঞানীরা এখন নবযুগের ভবিষ্যৎ-বক্তা, তাঁরা

বলছেন, এখন রাস্তা খুঁজে পেয়েছেন—এই বছরের মধ্যেই আবার চাঁদে যাবার তোড়জোড় চলছে। তাছাড়া শীঘ্রই এই শতক শেষ হবার আগেই মানুষ হয়তো মঙ্গলগ্রহে গিয়ে পৌঁছাবে এমন ভবিষ্যদ্বাণীও শুনছি।

সেকেলে আমরা ভাবতাম, আমাদের চির-সুন্দর পৃথিবী যার ধূলায় পিতৃপিতামহের দেহ-ভস্ম মিশিয়ে রয়েছে—এই সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা পৃথিবীকে মানুষ ভালবাসে। বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে সারা মানবজাতির সমবেত চেষ্টায় এই ধরায় স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করবে সে। কল্পনাপ্রবণ বিজ্ঞানী ভাবে, যুগ যুগ ধরে প্রাণ নানাভাবে ঘুরেছে—এই মর্তে নিজেকে বিকশিত করবার চেষ্টা করেছে—নানা জীবদেহের আবরণের মধ্যে খুঁজেছে সে তার সার্থকতা। বিবর্তনের শেষ ধাপে বুঝি পৌঁচেছে সে—তাই মানুষের আবির্ভাব। এইবার বিজ্ঞানের সাধনার পথে সে হয়তো খুঁজে পাবে চিরন্তন প্রশ্নের সদুত্তর। বিজ্ঞান মেটাবে সহজে মানুষের প্রতিদিনের চাহিদা, ফলে তার মনে জাগবে সন্তোষ, কুসংস্কার ঘুচে যাবে, পৃথিবীতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বৈষম্য লোপ পাবে—পরিপূর্ণ জ্ঞানের আলোকে সত্যস্বরূপ খুঁজে পাবে মানুষ। মানুষের ভাগ্যে সে দিন কখনো আসবে কিনা, জানি না। তবে আমার বিশ্বাস, চাঁদের অভিযান থেকে সে পথের নির্দেশ পাওয়া যায় নি। কাজেই—ততঃ কিম্।

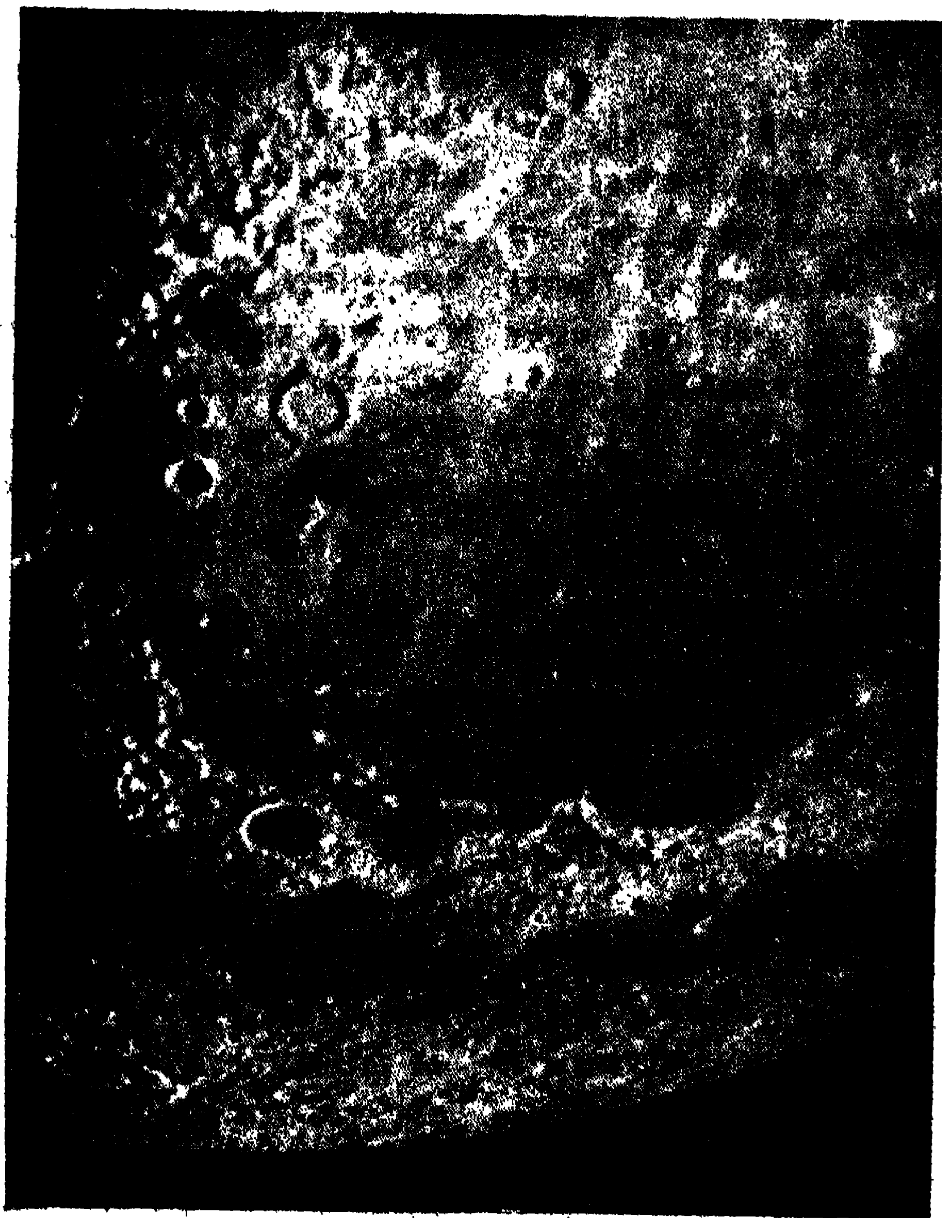
আলো ও বেতারের মাধ্যমে চন্দ্রলোক

অরুণকুমার সেন

আকাশের বুকে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী হলো চাঁদ। সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে এই চাঁদ নিয়ে টানাটানি করা যেন একটা চিরাচরিত ব্যাপার হয়ে এসেছে। দূরবীনের সাহায্যে প্রথম দেখা গেল যে, স্নিগ্ধ আলোর আধার এই চাঁদের পৃষ্ঠদেশ বস্তুতঃ খুবই বন্ধুর—অগণিত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে সজ্জিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকেরা বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে চাঁদের এক নতুন রূপ উদ্ঘাটিত করেন। জানা গেল চাঁদের পৃষ্ঠদেশের আভ্যন্তরীণ স্তরের বিষয়ে—এমন কি, উপরিভাগের বিদ্যুতাবিষ্ট একটি স্তরের অস্তিত্বেরও আভাস পাওয়া গেল। বিগত দশকের কিছু আগে থেকে বিশেষতঃ দূরপাল্লার রকেটের সাহায্যে পৃথিবীর আকর্ষণের গণ্ডী পার হবার পর থেকে চন্দ্রলোকের গবেষণায় এক নতুন সাড়া দেখা দিয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা এখন বামন হয়েও চাঁদে হাত দেবার উপক্রম করেছেন। এমন কি, চন্দ্রপৃষ্ঠের প্রায় মাইল দশেকের ভিতর সবান্ধবে উপস্থিত হয়ে চাঁদের এক ভয়ঙ্কর বাস্তব রূপকে দেখে এসেছেন। কি আছে ঐ চাঁদের দেশে? এই কৌতূহলটি মানুষের মনে সহজাত ভাবেই এসে পড়ে। তাছাড়া চাঁদের দেশে যাবার স্বপ্নকে আজকাল আর নিছক কবি-কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে চন্দ্রলোকে পদার্পণের আগে চন্দ্রপৃষ্ঠের প্রকৃতি, আব-হাওয়া ও বিপদসঙ্কুলতা প্রভৃতি বিষয়ে ভালভাবে জানা প্রয়োজন।

চাঁদের খবর আমরা পেয়ে থাকি মূলতঃ দু-ভাবে, যার একটি হলো চাঁদের আলোর মাধ্যমে এবং আর একটি হলো বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে চাঁদের গবেষণায়। প্রথমে দেখা যাক, চাঁদের আলো আমাদের কাছে কি কি খবর পৌঁছে দিতে

পারে। গ্যালিলিও তাঁর তৈরি প্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে দেখলেন চাঁদের পৃষ্ঠদেশে

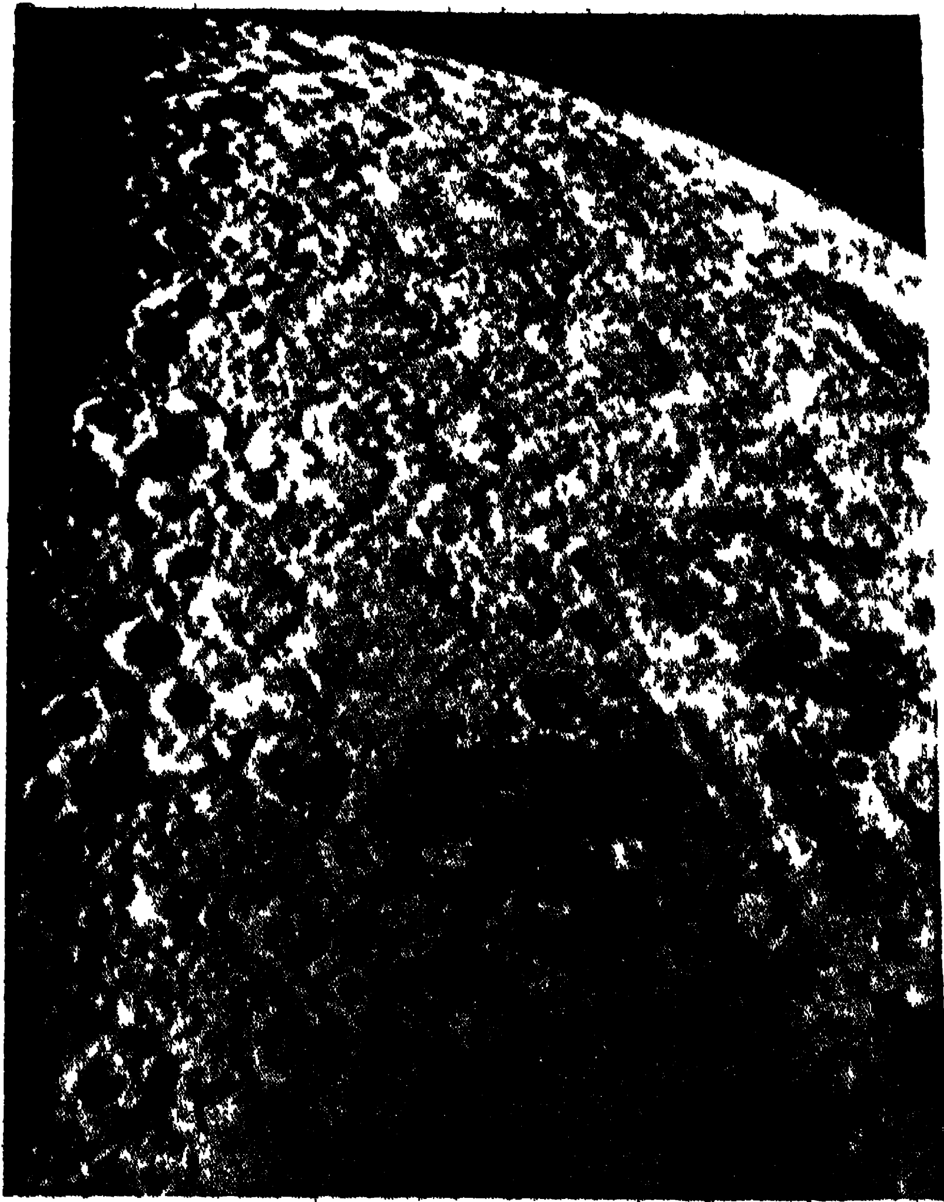


১নং চিত্র

চন্দ্রপৃষ্ঠের একটি পাহাড়ে ঘেরা সমতল অঞ্চল, নাম মেয়ার ইমব্রিয়াম। (মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরের ১০০ ইঞ্চি হুকার প্রতিফলকে তোলা ছবি, ছবিটিতে ১ ইঞ্চি=১০০ মাইল)

রয়েছে বিস্তীর্ণ মসৃণ ও সমতল ভূমি, যেগুলিকে তিনি বললেন মেরিয়া বা সাগর। আর মেরিয়ার চারপাশ উঁচু পর্বতমালায় ঘেরা রয়েছে (১নং চিত্র)। চন্দ্রপৃষ্ঠের আর একটি অঞ্চলে দেখা গেল কতকগুলি বিশালাকার গহ্বরের মত, যার প্রত্যেকটি ঘেরা রয়েছে পাহাড়ের প্রাচীর দিয়ে (২নং চিত্র)। গ্যালিলিও এগুলির নাম দিয়েছেন ক্র্যাটার বা আলামুখ।

জ্বালামুখের ব্যাস ১৫০ মাইল পর্যন্ত দেখা যায়। দূরবীনের সাহায্যে পর্বতাকীর্ণ অঞ্চলগুলি সম্বন্ধে গবেষণা করে দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গের ফুট। সূর্যালোকে উদ্ভাসিত এরকম চন্দ্রপৃষ্ঠের সমগ্র অঞ্চল থেকে প্রতিফলিত বা বিক্ষিপ্ত হয় শতকরা মাত্র ৭ ভাগ আলো, যার একাংশ



২নং চিত্র

চন্দ্রপৃষ্ঠের একটি বন্ধুর অঞ্চল; এখানে বহু জ্বালামুখ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো দেখা যাচ্ছে। (মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরের ১০০ ইঞ্চি ছকার প্রতিফলকে তোলা ছবি, ছবিটিতে ১ ইঞ্চি—১০০ মাইল)

উচ্চতা প্রায় ২৫,০০০ ফুট হবে আর জ্বালামুখের গহ্বরের সর্বনিম্ন গভীরতা হবে প্রায় ২৪,০০০ আমাদের কাছে পৌঁছায় চন্দ্রালোকরূপে। এই জন্যে স্বভাবতঃই এই চন্দ্রালোকের মাত্রাধিক

পরীক্ষার দ্বারা আমরা পেতে পারি চন্দ্রপৃষ্ঠের খবর।

বিগত শতকে চন্দ্রপৃষ্ঠের ঔজ্জ্বল্য ও রং নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। ঔজ্জ্বল্য সবচেয়ে বেশী হয় পূর্ণিমার সময়, যার আগের ও পরের দিনগুলিতে ঔজ্জ্বল্য খুব দ্রুত হারে কমে যায়। এথেকে অনুমান করা যায় যে, চন্দ্রপৃষ্ঠ হয়তো আলোর সূক্ষ্ম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মাপকাঠিতেও খুবই অমসৃণ। এমন কি, আপাতমসৃণ মেরিয়া অঞ্চলও খুবই অমসৃণ ভূমির মত বিক্ষিপ্ত করে থাকে সূর্যালোককে। অঞ্চলবিশেষে চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে বিক্ষিপ্ত আলোর ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য দেখা যায়, যা থেকে সেগুলির প্রকৃতি ও গঠনের বিষয় জানা যায়। চাঁদের আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সেটি অবিকল সূর্যের আলোর বর্ণালীর মত। তাই চাঁদের আলো বস্তুতঃ সূর্যের আলোর মতই সাদা। তবে আমাদের চোখে এই দুটির রঙের মধ্যে যেটুকু পার্থক্য মনে হয়, তার কারণ নিহিত রয়েছে আসলে চাঁদ ও সূর্যের ঔজ্জ্বল্যের বিশাল ব্যবধানের মধ্যে।

ঔজ্জ্বল্য ও বর্ণালী ছাড়া চাঁদের আলোর আর একটি ধর্ম নিয়েও অনেক গবেষণা হয়েছে, যা থেকে পাওয়া গেছে চন্দ্রপৃষ্ঠ সম্বন্ধে আরও নতুন তথ্য। ধর্মটি হলো সমবর্তন বা পোলারাইজেশন। ১৮১১ সালে বৈজ্ঞানিক অ্যারেগো দেখেছেন যে, মেরিয়া অঞ্চলের আলোতে পোলারাইজেশনের পরিমাণ উজ্জ্বলতর অঞ্চল থেকেও বেশী। তিনি আরও দেখেন যে, পূর্ণিমার সময় কোন রকম পোলারাইজেশন লক্ষ্য করা যায় না এবং আগের ও পরের দিনগুলিতে পোলারাইজেশন ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। ১৯৩৮ সালে লিয় ও রাইট নামে বৈজ্ঞানিকদ্বয় দেখান যে, মেরিয়া অঞ্চলে সূর্যালোকের শতকরা ১১ থেকে ১৫ ভাগের পোলারাইজেশন ঘটে। আর কয়েকটি উজ্জ্বল ছোট অংশের পোলারাইজেশন শতকরা ৫ ভাগেরও কম হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক গেরেল্‌স্ ১৯৬০ সালে দেখেন যে, চন্দ্রপৃষ্ঠের পোলারাইজেশন ঘটাবার ক্ষমতা আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল। তরঙ্গদৈর্ঘ্য বাড়লে ক্ষমতাটি কমে যায়। অমসৃণ চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে বিক্ষিপ্ত আলোতে পোলারাইজেশনের প্রকৃতিটা কি রকম হবে, তা আসলে নির্ভর করে সেখানকার পদার্থের আলো শোষণের ক্ষমতা, প্রতিসরণের ক্ষমতা এবং পৃষ্ঠদেশের মসৃণতা ও বন্ধুরতার উপর। এসব বিভিন্ন বিষয়ের পর্যালোচনা করে মনে হয় যে, চাঁদের সমস্ত জমিটা নিশ্চয়ই খুব সূক্ষ্ম ধূলিকণায় ঢাকা, যাদের গড় ব্যাস হবে প্রায় ১ থেকে ২ মাইক্রন (১ মাইক্রন = ১/১০০০০ সেন্টিমিটার)। পদার্থগত ভাবে সেগুলি হয়তো এক রকম পাথরের গুঁড়া, যাতে বালির মত পদার্থ আছে খুবই কম, আর তার সঙ্গে মিশে আছে পাথুরে চুণ জাতীয় পদার্থের গুঁড়া। এহেন চন্দ্রপৃষ্ঠ সূর্যালোকের একটা বিরাট অংশকে শুষে নেয়, যার ফলে সেগুলি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আর উত্তপ্ত চন্দ্রপৃষ্ঠ স্বভাবতঃই বিকিরণ করবে তাপরশ্মি, যা ধরা পড়ে ইনফ্রা রেড বা অবলোহিত আলোক-তরঙ্গের আকারে। এই আলো আমাদের চোখে সাড়া জাগাতে না পারলেও ধরা পড়ে থার্মো-কাপল্ নামক যন্ত্রের সাহায্যে। যন্ত্রটির অবলোহিত রশ্মি ধরবার ক্ষমতা এত বেশী যে, এটিকে যদি মাউন্ট প্যালোমারের ২০০ ইঞ্চি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মুখে রাখা যায়, তাহলে প্রায় ৬০০০ মাইল দূরের একটি মোম বাতির উত্তাপও ধরে ফেলবে। অবলোহিত রশ্মির মাধ্যমে জানা গেছে যে, চন্দ্রপৃষ্ঠের তাপাঙ্ক সেখানকার দিনের বেলায় হয়ে দাঁড়ায় ফুটন্ত জলের তাপাঙ্কের মত। আবার রাত্রিতে এত ঠাণ্ডা যে, তাপাঙ্ক হয়ে যায় —১৫৩° সেন্টিগ্রেড। আর অঞ্চলবিশেষে সূর্যোদয়ের ঠিক আগে তাপাঙ্ক থেকে

থাকে —১৭০° থেকে —১৮০° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত। বলা বাহুল্য, আমাদের পৃথিবীও ঠিক চাঁদেরই মত সূর্যালোক শোষণ করে অবলোহিত বা তাপরশ্মি বিকিরণ করে থাকে। তবে এক্ষেত্রে তাপাঙ্কের তারতম্য চাঁদের তুলনায় বহুগুণে কম। চন্দ্রপৃষ্ঠে তাপমাত্রার মারাত্মক পরিবর্তনের একটা প্রধান কারণ হলো এই যে, সেখানে কোন সমুদ্র, জলাশয় বা বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব নেই।

চন্দ্রপৃষ্ঠের কয়েকটি জায়গা আরও একটি উপায়ে সূর্যালোককে রূপান্তরিত করে থাকে, যার ফলে সেখান থেকে একটা নিজস্ব প্রভা বা লুমিনেসেন্স লক্ষ্য করা যায়। আসলে লুমিনেসেন্স হলো পদার্থের একটি বিশেষ গুণ, যার ফলে সেটি হ্রস্ব দৈর্ঘ্যের আলোক-তরঙ্গ শুষে নিয়ে বিকিরণ করে কয়েকটি দীর্ঘ তরঙ্গের আলো। প্রশ্ন হলো, চন্দ্রপৃষ্ঠের লুমিনেসেন্সের উৎপত্তি কোথায়? বস্তুতঃ চন্দ্রপৃষ্ঠে আমাদের বায়ুমণ্ডলের মত কোন আচ্ছাদন না থাকায় সূর্যালোকের যাবতীয় উপকরণ, খুব দীর্ঘ বেতার-তরঙ্গ থেকে সুরু করে খুব হ্রস্ব এক্স-রে পর্যন্ত পুরাপুরি শক্তিতে উদ্ভাসিত করে সেখানকার জমি। সূর্যালোকের এই বিশাল তরঙ্গগোষ্ঠীর একাংশ চন্দ্রপৃষ্ঠের পদার্থে আহত হয়ে লুমিনেসেন্সের সৃষ্টি করে। চেকোস্লোভাকিয়ার বৈজ্ঞানিক এফ. লিঙ্ক খুব ভালভাবে দেখেছেন যে, পূর্ণিমার চাঁদের ঔজ্জ্বল্যের মাসে মাসে লক্ষণীয় পরিবর্তন হয়, যদিও আমরা জানি যে, সূর্যালোকের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। এই ঘটনাই চন্দ্রপৃষ্ঠের লুমিনেসেন্সের অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়। ক্রিমিয়ার মানমন্দিরের বৈজ্ঞানিক এ. কজিরেভ এবং ফ্রান্সের জে. হুবোয়া ১৯৫৭ সালে স্বতন্ত্রভাবে এই লুমিনেসেন্স দেখেছেন। চন্দ্রপৃষ্ঠের কয়েকটি অঞ্চল, বিশেষতঃ অ্যারিষ্টার্কাস নামে আগ্নেয়গিরির চারপাশ থেকে কজিরেভ আরও দেখেছেন যে, চন্দ্রপৃষ্ঠে আহত সমগ্র সৌরশক্তির শতকরা ১ ভাগ মাত্র লুমিনেসেন্স-জনিত বেগুনী প্রভায় রূপান্তরিত হয়। চান্দ্র লুমিনেসেন্সের পরিবর্তনশীলতা ইঙ্গিত দেয় যে, এর উৎপত্তি নিশ্চয়ই সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত তড়িতাবিষ্ট কণিকা থেকে। বলা বাহুল্য, এহেন কণিকাই পার্থিব বায়ুমণ্ডলে আহত হয়ে মেরুজ্যোতির সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু চাঁদের বেলায় বায়ুমণ্ডলের আচ্ছাদন না থাকায় সৌরকণিকাগুলি সোজাসুজি আছড়ে পড়ে চাঁদের জমিতে। তাই চান্দ্রমেরুজ্যোতি, যা কজিরেভ ও হুবোয়া দেখেছেন চান্দ্রলুমিনেসেন্সের আকারে, তার উৎপত্তিস্থল হলো চাঁদের জমি। চান্দ্র-লুমিনেসেন্সের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, সেখানে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে লুমিনেসেন্সের অন্তর্ধান ঘটে। এথেকে মনে হয় যে, চাঁদের জমির কাছে তড়িতাবিষ্ট কণিকাসমূহ মোটামুটিভাবে সরল রেখায় ধাবিত হয়। এই ঘটনা আবার ইঙ্গিত দেয় যে, চাঁদের হয়তো কোন চৌম্বক ক্ষেত্র নেই আর যদিও বা থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই সেটি ০'০১ গাউসের বেশী হবে না, যা হলো পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। এই বিষয়ে আরও জানা গেল, ১৯৫৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বরে যখন একটি সোভিয়েট মহাশূন্যযান চন্দ্রপৃষ্ঠের অটোলাইকাস নামে জায়গায় গিয়ে আছড়ে পড়ে। যানটিতে অন্যান্য যন্ত্রের মধ্যে ছিল চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপের যন্ত্র। যানটির স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে চন্দ্রপৃষ্ঠের প্রায় ৩০ মাইল উপর থেকে প্রেরিত পরিমাপের ফলাফল থেকে জানা যায় যে, চান্দ্র-চৌম্বক ক্ষেত্র যদিও বা থাকে, তবে চন্দ্রপৃষ্ঠে তার পরিমাণ হবে ০'০০১ গাউসেরও কম। রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকেরা অবশ্য তাঁদের ফলাফলের সঙ্গে তড়িতাবিষ্ট সৌরকণিকা-প্রবাহের সম্পর্কটা ভেবে দেখেন নি। বস্তুতঃ সূর্য থেকে নির্গত এরূপ

কণিকা-প্রবাহ সব সময়েই রয়েছে—যাকে বলে সৌর বাতাস বা সোলার উইণ্ড। এর প্রভাবে চন্দ্রপৃষ্ঠের ৩০ মাইল উর্ধ্বে চৌম্বক ক্ষেত্রের কোন নিদর্শন না পাওয়ারই কথা।

আলো ও অবলোহিত রশ্মি ছাড়া বেতার তরঙ্গের মাধ্যমেও চাঁদের গবেষণা সুরু হয়েছে, যার ফলে সেখানকার জমির বিষয়ে অনেক নতুন তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। চন্দ্রগ্রহণের সময় পিডিংটন ও মিনেট ১২.৫ মিলিমিটার দীর্ঘ বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে চন্দ্রকিরণ পরীক্ষা করে দেখেন যে, তাতে কোন রকম পরিবর্তন হয় না—অথচ ঐ সময়ে চাঁদের অবলোহিত বিকিরণের পরিবর্তন দেখা যায়, ঠিক যতটা হয়ে থাকে সেখানকার দিন ও রাতের মধ্যে। আমেরিকার জিবসনও ৮.৬ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের মাধ্যমে একই রকম সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। কিন্তু সিনটন নামে বৈজ্ঞানিক ১.৫ মিলিমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে চন্দ্রকিরণে পরিবর্তন লক্ষ্য করেন অনেকটা অবলোহিত বিকিরণের মত, যদিও তার পরিমাণ অনেক কম আর সেটা ঘটে থাকে একটু পরে। বলা বাহুল্য, তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত বড় হবে, সেটা ততই চন্দ্রপৃষ্ঠের অভ্যন্তর থেকে বিক্ষিপ্ত হবে। এই সব হ্রস্ব দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ বা মাইক্রোওয়েভের মাধ্যমে গবেষণার ফলাফল থেকে অনুমান করা যায় যে, চন্দ্রপৃষ্ঠ হয়তো খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধূলিকণায় আচ্ছাদিত এবং এদের তাপ পরিবহনের ক্ষমতা খুবই কম। কারণ তা না হলে চন্দ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রার পরিবর্তন সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যেত আভ্যন্তরীণ স্তরে, যার ফলে চন্দ্রগ্রহণের সময় ঠিক একই রকম পরিবর্তন দেখা যেত অবলোহিত ও মাইক্রোয়েভ বেতার-তরঙ্গের বেলায়। এটা বেশ লক্ষণীয় যে, আলোর মাধ্যমে গবেষণাও চাঁদের পৃষ্ঠদেশে অনুরূপ সূক্ষ্ম ধূলিকণার অস্তিত্বের ইঙ্গিত করে—তবে সেটা কতটা গভীর, তা আজ একটা বিরাট প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাইক্রোওয়েভ বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে চান্দ্রধূলিকণার তাপ-পরিবাহী ক্ষমতার যে স্বল্পতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাথেকে মনে হয় যে, এর গভীরতা হবে অন্ততঃ কয়েক ইঞ্চি। তবে তার নীচে আরও কতদূর পর্যন্ত ধূলিকণা বিরাজ করতে পারে, তার কোন প্রত্যক্ষ হদিশ মেলে না। তাই এই ব্যাপারে নানা রকম বৈজ্ঞানিক যুক্তির শরণাপন্ন হতে হয়।

আসলে চন্দ্রপৃষ্ঠের উত্তাপের ভয়ানক তারতম্য হয়তো সেখানকার পাথরে ফাটল ধরিয়ে সেগুলিকে দিনে দিনে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ধূলিকণার সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া মহাজাগতিক রশ্মি সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি এবং তড়িতাবিষ্ট কণিকা সেখানকার পদার্থের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে, যার ফলে সেগুলি ভেঙ্গে গিয়ে ধূলিকণার আকার ধারণ করে। এসব ছাড়া চান্দ্র-ধূলিকণার বাহুল্যের পিছনে আরও একটি কারণ থাকতে পারে। চাঁদ আমাদের পৃথিবীর মতই ধাবিত হচ্ছে মহাকাশের মধ্য দিয়ে, যার ফলে মহাজাগতিক ধূলিকণা আঁকড়ে লেগে যাবে চাঁদের গায়ে। এই সব বিভিন্ন কারণ পর্যালোচনা করে মনে হয় যে, চন্দ্রপৃষ্ঠে ধূলিস্তরের গভীরতা হবে কয়েক ইঞ্চি।

১৯৪৬ সালে আমেরিকার উইট ও ষ্টোডোলা চাঁদের দিকে ২.৭ মিটার দৈর্ঘ্যের শক্তিশালী বেতার-তরঙ্গ পাঠিয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত অংশ ধরতে পেরেছেন। এভাবে চান্দ্রগবেষণার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। ব্যাপারটা আসলে অনেকটা রেডারের সাহায্যে এরোপ্লেনের গা থেকে প্রতিফলিত রশ্মি ধরবার সামিল। ১৯৫০ সালে কার ও সেন ১৫ মিটার দীর্ঘ বেতার-তরঙ্গের সাহায্যেও অনেকটা একই রকমের চান্দ্র-প্রতিফলন দেখতে পেলেন। ১৯৬২ সালে বৈজ্ঞানিক ইভানও ৩ থেকে ০.১ মিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে অনুরূপ গবেষণায় দেখেন যে, চন্দ্রপৃষ্ঠ যেন একটা খুবই মসৃণ প্রতিফলক। কি করে এরকম ঘটতে পারে,

যেখানে আলো, অবলোহিত ও মাইক্রোওয়েভ বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, চন্দ্রপৃষ্ঠ অন্ততঃ কয়েক ইঞ্চি পুরু ধূলায় আবৃত? এর একটা ব্যাখ্যা হলো এই যে, হয়তো ঐ দীর্ঘ বেতার-তরঙ্গগুলি চন্দ্রপৃষ্ঠের উপরিস্থিত একটি বিস্তৃত আয়নিত অঞ্চল থেকে প্রতিফলিত হয়। বস্তুতঃ এরকম আয়নিত অঞ্চলের অস্তিত্ব নানা দিক দিয়ে অনুমান করা যায়। নিরাভরণ চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রতিনিয়ত মহাজাগতিক রশ্মি এবং সূর্যের যাবতীয় রশ্মি ও কণিকাসমূহ এসে পড়ছে পূর্ণ শক্তিতে। ফলে সেগুলি চন্দ্রপৃষ্ঠের পদার্থকে আয়নিত করবে এবং সৃষ্টি করবে এক চান্দ্রআয়নমণ্ডলের। হিসাবে দেখা যায় যে, এরূপে সৃষ্ট আয়নমণ্ডলের ইলেকট্রন-ঘনত্ব পার্থিব আয়নমণ্ডলের ই ও এফ স্তরের ইলেকট্রন-ঘনত্বের চেয়ে অনেক বেশী হবে। ১৯৫৬ সালে চান্দ্রআয়নমণ্ডলের অস্তিত্বের আর একটি প্রমাণ পেয়েছেন ইংল্যাণ্ডের বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানী এলস্‌মোর ও হোয়াইটফিল্ড। তাঁরা টরাস নামে তারকাপুঞ্জের অন্তর্গত ক্র্যাব নেবুলার ভগ্নাবশেষ থেকে নির্গত বেতার-তরঙ্গ ৩·৭ মিটারে ধরছিলেন। ২৪শে জানুয়ারী টরাসের বেতার উৎস আর পৃথিবীর মাঝখানে এসে পড়ে চাঁদ, যার ফলে অনেকটা সূর্যগ্রহণের নিয়মে ঘটবার কথা ঐ বেতার উৎসের গ্রহণ। কিন্তু দেখা গেল—বেতার গ্রহণ সুরু হচ্ছে উৎসটি থেকে নির্গত আলোর গ্রহণের একটু পরে। আবার বেতার গ্রহণটি শেষ হয়ে গেল আলোক গ্রহণের একটু আগে। চাঁদের আয়নমণ্ডলে বেতার-তরঙ্গের প্রতিসরণের মাধ্যমে এই ঘটনার ব্যাখ্যা করা চলে। আর ঐ প্রতিসরণের পরিমাণ থেকে হিসাব করে দেখা যায় যে, চান্দ্রআয়নমণ্ডলে ইলেকট্রনের পরিমাণ হয়তো হবে প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে ১০,০০০ কণিকা, যা হলো আমাদের পারিপার্শ্বিক মহাকাশের ইলেকট্রনের ঘনত্বের প্রায় ১০০ গুণ।

১৯৫৯ সালের ৭ই অক্টোবর রাশিয়ার মহাকাশযান লুনিক-১ চাঁদের উল্টোপিঠের অর্থাৎ যেদিকটা সব সময় আমাদের থেকে উল্টোদিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকে, তার একটা চাঞ্চল্যকর ছবি স্বয়ংক্রিয় টেলিভিসন যন্ত্রের সাহায্যে প্রেরণ করে (৩নং চিত্র)। তারপর থেকে সুরু হলো মহাকাশযান পাঠিয়ে চাঁদের গবেষণা। আমেরিকার তিনটি মহাকাশযান রেঞ্জার-৭, ৮ ও ৯ চন্দ্রপৃষ্ঠে গিয়ে আছড়ে পড়ে সেখানকার বহু নতুন খবর পাঠিয়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রেঞ্জার-৭ প্রেরিত সাদা পর্বতের ছবি। মনে হয়, এই সব সাদা পর্বতের উৎপত্তি হয়েছে আগ্নেয়গিরি থেকে নিঃসৃত শেষাংশ থেকে, যার মধ্যে হয়তো আছে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, লেড ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম অক্সাইড, ম্যাগ্‌নেসিয়াম অক্সাইড প্রভৃতি সাদা উপকরণ। রেঞ্জার মহাকাশযানগুলি চন্দ্রপৃষ্ঠের উপর আধ মিটারেরও বড় নানা রকমের বৈশিষ্ট্যও উদ্‌ঘাটিত করলো। রেঞ্জার-৯ মহাকাশযানটি চন্দ্রপৃষ্ঠের কাঠিন্যের বা ওজন বইবার ক্ষমতার একটা খবর এনে দিল। মহাকাশযানটির চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণজনিত ক্ষতচিহ্নের মাধ্যমে জানা গেল যে, অ্যালফনসাস নামক জায়গাটির ওজন সইবার ক্ষমতা প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে ১ থেকে ২ কেজি, যা হলো অনেকটা সাগরপারের ভিজা বালির সমতুল্য। তবে এতে মানুষের চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণে কোন অসুবিধা হবে না। রেঞ্জার মহাকাশযানগুলির সাহায্যে পাঁচটি মেয়ার অঞ্চলের জমিতে আগ্নেয় শিলাস্তরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হলো। স্তরটি কোথাও বা সম্পূর্ণ অনাবৃত, কোথাও বা পুরু আচ্ছাদনে ঢাকা, যার গভীরতা কয়েক ইঞ্চি থেকে প্রায় ১ গজ পর্যন্ত হতে পারে। ১৯৬৬ সালে রাশিয়া থেকে প্রেরিত লুনা-৯ মহাকাশযান চন্দ্রপৃষ্ঠে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতিসহ অক্ষত অবস্থায় ধীরে ধীরে অবতরণ

করে মাত্র দুই ফুট উঁচু থেকে সেখানকার এক চমকপ্রদ ছবি তুলে পাঠিয়েছে। ছবিটির একটি নমুনা ৪নং চিত্রে দেখানো হলো যাতে চন্দ্রপৃষ্ঠের উপর মাত্র ২ মিলিমিটার আকারের বৈশিষ্ট্যও পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। জমিটার প্রায় সর্বত্রই বেশ সমতল। তবে সেটি খুব ফাঁপা ঝামার মত সচ্ছিদ্র লাভায় গঠিত, যার এক একটি ছিদ্রের ব্যাস হবে হয়তো ১ সেন্টিমিটারেরও কম। তাছাড়া কয়েকটি অস্বচ্ছ পাথরের টুকরাও দেখা যাচ্ছে ফাঁপা লাভায় আবৃত জমিটার উপর।



৩নং চিত্র

চাঁদের উল্টো পিঠের প্রথম ছবি। এটি চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪০,০০০ মাইল দূর থেকে রাশিয়ার মহাকাশযান লুনিক-১ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে তুলেছে। উল্টো পিঠে ঐ সময় সূর্য প্রায় মাথার উপর ছিল। যার ফলে কোন পর্বতমালা বা জ্বালামুখ বিশেষ কোন ছায়াপাত করে নি।
(ছবিটিতে ১ ইঞ্চি=৫০০ মাইল)

টুকরাগুলির ব্যাস হবে প্রায় ১০ থেকে ২০ সেন্টিমিটার আর সেগুলিও গঠিত জমির মত ফাঁপা লাভায়। তবে চন্দ্রপৃষ্ঠের তথাকথিত কয়েক ইঞ্চি পুরু ধূলিকণার কোন চিহ্ন দেখা যায় নি। মাস কয়েক পর আমেরিকার সারভেয়ার-১ নামে মহাকাশযান লুনা-৯-এর মত অক্ষত অবস্থায় অবতরণ করে অনুরূপ তথ্য এনে দিল। কিছুদিন হলো খুব আধুনিক ও উন্নত ধরণের রেডার যন্ত্রের সাহায্যে গবেষণায় বৈজ্ঞানিক ইভানস্ অনুমান করেন যে, চন্দ্রপৃষ্ঠের সর্বত্রই

খুব হাল্কা এবং ফাঁপা পদার্থে আবৃত, যার গড় গভীরতা হয়তো ১০ সেন্টিমিটারেরও বেশী হবে— এমন কি, ১ গজও হতে পারে।

আলো ও বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে পৃথিবী থেকে বা মহাকাশযানের সাহায্যে গবেষণায় দীর্ঘকাল ধরে চন্দ্রপৃষ্ঠ, তার আভ্যন্তরীণ স্তর এবং চান্দ্রআয়নমণ্ডল সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। তবে সেগুলি অনেকাংশেই নির্ভরশীল তত্ত্বগত হিসাব-নিকাশ ও অনুমানের উপর। মহাকাশযানগুলি চন্দ্রপৃষ্ঠের ফটো তুলে সেখানকার ১ মিলিমিটার থেকে ৫০০ মিটার আকারের বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে, যা পৃথিবীতে বসে আলো ও বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে বা তথাকথিত উপায়ে জানা সম্ভব নয়। তবে ছবি থেকে চন্দ্রলোকের বিষয়ে তথ্য আহরণ করাটা মূলতঃ খুবই কঠিন ব্যাপার, আর তাতে খুবই পারদর্শিতার প্রয়োজন। এমন কি, অনেকে ঐসব তথ্যের উপর পুরাপুরি আস্থা রাখতে পারেন না; বরং পৃথিবী থেকে পাওয়া তথ্যগুলির উপরই জোর দিয়ে থাকেন। আশা করা যায়, আগামী দিনের মহাকাশযাত্রী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসহ চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে তথ্যগুলির সত্যতা যাচাই করে হয়তো সমস্ত বাকবিতণ্ডার অবসান ঘটাবেন।



৪নং চিত্র

চন্দ্রপৃষ্ঠের ২ ফুট উপর থেকে তোলা প্রথম ছবি। এটি রাশিয়ার মহাকাশযান লুনা-৯ অক্ষতভাবে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে তুলেছে।

[প্রবন্ধটি ১০-৭-৬৯ তারিখের পূর্বে লিখিত]

চাঁদের সৃষ্টি-রহস্য

শান্তিময় বসু

চাঁদের সৃষ্টি কেমন করে হলো, তা আজও সঠিকভাবে বলা যায় না। এর প্রধান কারণ হলো, চাঁদের জন্মের বহু বহু দিন পর পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটে। যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায় না, সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য উপস্থাপিত করা সুকঠিন। এই অবস্থায় চাঁদের উপরিভাগ, গঠন-বৈশিষ্ট্য, উপাদান ও চলবার ভঙ্গিমা বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা কয়েকটি তত্ত্ব পেশ করেছেন।

বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক কান্ট (Kant) বললেন চাঁদ, গ্রহ ও সূর্য একই সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল। মহাবিশ্বের ধূলা ও গ্যাসীয় পদার্থ সমন্বিত এক হিমশীতল মেঘ সঙ্কুচিত হয়ে আমাদের সৌরজগৎ সৃষ্টি করেছিল। কান্টের দর্শনপ্রসূত চিন্তাধারাকে এক বলিষ্ঠ রূপ দিলেন ফরাসী অঙ্কবিশারদ লাপ্লাস (Laplace)। তিনি বললেন যে, কান্টের ওই গ্যাসীয় মেঘটির মধ্যের পরমাণুগুলি প্রথমে অতিবেগসম্পন্ন ছিল। কালে এই পরমাণুগুলির অস্থিরতা কমে আসে ও তখন গ্যাসীয় মেঘটি ধীরে ধীরে আবর্তন করতে সুরু করে। আবর্তনশীল এই মেঘটি সঙ্কুচিত হতে থাকে এবং সময়ে সময়ে কিছু অংশ বিচ্যুত হয়ে গ্রহগুলির সৃষ্টি করে। কেন্দ্রের আবর্তনশীল বস্তুটিই সঙ্কুচিত হয়ে সূর্যের জন্ম-দান করলো লাপ্লাস নিজে প্রখ্যাত অঙ্কবিশারদ হয়েও এই সৃষ্টি-রহস্যকে অঙ্কের সূত্র দিয়ে নিবদ্ধ করেন নি। গল্পচ্ছলে তিনি সৃষ্টি-রহস্যের যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, সেটি অঙ্কের বিচারে টিকবে না, তা সম্ভবতঃ অনুমান করেছিলেন। কিন্তু পরে লাপ্লাসের চিন্তাধারা অবলম্বন করে বিজ্ঞানীরা নানা তথ্য উপস্থাপিত করতে সুরু করলেন। পরিশেষে দেখা গেল যে, লাপ্লাসের ব্যাখ্যা ঠিক নয়। তার কারণ ওই উপায়ে সূর্যের সৃষ্টি হলে সূর্যের আবর্তনকাল খুবই কম হতে হয়। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সৌর-কলঙ্কের গতিবেগ থেকে দেখেছেন যে, পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে সূর্য দীর্ঘ ২৭ দিনে একবার আবর্তন করে। এই বৈষম্যের ফলে লাপ্লাসের চিন্তাধারা বাতিল করে দেওয়া হলো।

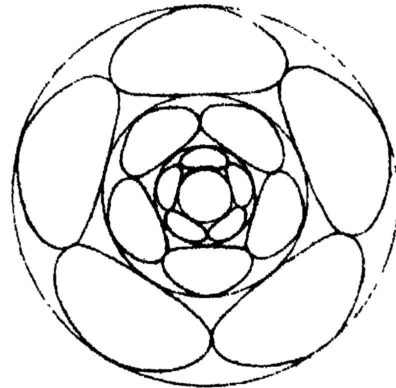
পরে ডারউইন (Darwin) এক মতবাদ পেশ করলেন। এই ডারউইন প্রখ্যাত অঙ্কবিদ্ ছিলেন ও জোয়ার-ভাটা সম্বন্ধে অনেক মৌলিক গবেষণা করেছিলেন। তিনি বললেন যে, পৃথিবীর এক বিচ্যুত অংশ হলো চাঁদ। অতীতে পৃথিবীর ভর ছিল বর্তমানের চাঁদ ও পৃথিবীর যুক্তভরের সমান। হিসেব করে ডারউইন দেখালেন যে, এই যুক্তভরের নিজস্ব কম্পনকাল হবে চার ঘণ্টা আর এই যুক্তভর নিজের মেরুর চারধারে আবর্তনও করবে ওই চার ঘণ্টা সময়ে। সূর্যের জন্যে পৃথিবীর উপরিভাগে যে জোয়ার হয় তাদের পারস্পরিক কালান্তর হয় আবর্তনকালের অর্ধেক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবী ও চাঁদের যুক্তভরসম্পন্ন পদার্থটির উপর জোয়ারের কালান্তর হবে দুই ঘণ্টা; অর্থাৎ কম্পনকাল জোয়ারের কালান্তরের দুই গুণিতক। এই অবস্থায় পৃথিবীর নিজস্ব কম্পনজনিত শক্তি জোয়ারের উচ্চতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে। জোয়ারের উচ্চতা ক্রমাগত বাড়তে থাকবে এবং শীঘ্রই তার মান এত বেশী হবে যে, পৃথিবীর কিয়দংশ বিচ্যুত করে পৃথিবী শান্ত

অবস্থায় ফিরে আসবে। ডারউইনের এই ব্যাখ্যা অনুনাদ তত্ত্ব (Resonance Theory) বলে আখ্যা পেয়েছে। এই বিচ্যুত অংশটি সৃষ্টি করলো বর্তমানের চাঁদ।

অসমণ্ড ফিসার (Osmond Fischer) বললেন যে, এই ঘটনাটি ঘটে যখন পৃথিবীর উপরিভাগের অল্প অংশ কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল। বর্তমানের প্রশান্ত মহাসাগরের কাছ থেকেই এই বিচ্যুতি ঘটে। সেই বিরাট গর্তটি পরে জলে ভর্তি হয়ে সৃষ্টি করেছে প্রশান্ত মহাসাগরের।

মুল্টন (Moulton), জেফ্রিস (Jeffreys) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা পরে দেখালেন যে, ডারউইনের জোয়ারের ব্যাখ্যা ঠিক নয়। তাঁরা দেখালেন যে, জোয়ারের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক ঘর্ষণজনিত তাপের সৃষ্টি হবে। জোয়ারের শক্তি থেকে এই তাপশক্তি সঞ্চারিত হলে জোয়ারের মান খুব বেশী বাড়তে পারবে না। সুতরাং পৃথিবীর কিয়দংশ বিচ্যুত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা আবার কান্ট (Kant)-এর চিন্তাধারা থেকে সুরু করেছেন। জ্যোতি-বিজ্ঞানী, পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞানী এবং ভূ-বিজ্ঞানীরা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই তত্ত্ব উপ-স্থাপিত করেছেন। লাপ্লাসের ব্যাখ্যায় যে ভুল ছিল, তা দূর করে এক বলিষ্ঠ তত্ত্ব পরিবেশন করতে পেরেছেন। এই তত্ত্বের মূলে রয়েছেন ভাই-জ্যাকার (Weizsäcker), উরে (Urey), কুইপার (Kuiper) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখেছেন যে, মহাবিশ্বে কান্টের চিন্তাপ্রসূত ধূলা ও গ্যাসের মেঘ প্রচুর রয়েছে। সুতরাং নভোমণ্ডলের অগণিত হিমশীতল মেঘগুলিরই একটি সৌরজগৎ সৃষ্টি করতে পারে। এই মেঘের উপাদান ছিল বর্তমান মহাবিশ্বের অন্য মেঘের উপাদানের মতই। প্রতি ১০০০ পরমাণুতে ৯০০টি হাইড্রোজেন, ৯৭টি হিলিয়াম ও বাকী ৩টি হলো ভারী ধরণের পরমাণু, যেমন—কার্বন, অক্সিজেন ও লৌহ। এই গ্যাসীয় পরমাণুগুলি প্রথমে খুবই উত্তেজিত অবস্থায় বিরাট গতিবেগসম্পন্ন ছিল। পরে এই উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে আসে ও ফলে ওই গ্যাসীয় পদার্থটি ধীরে ধীরে আবর্তন করতে সুরু করে। এই আবর্তনরত অবস্থায় মেঘের মধ্যে ঘূর্ণাবর্তের (Whirlpool) সৃষ্টি হয় (চিত্র ১)। বহু ঘূর্ণির সৃষ্টি ও লয় চলতে থাকে। কেন্দ্রের বড় ঘূর্ণিটি



১নং চিত্র
সৌরজগৎ সৃষ্টির উৎস ঘূর্ণাবর্ত

তাড়াতাড়ি সঙ্কুচিত হয়ে এক নিবিড় কালো বস্তুর সৃষ্টি করলো। এই কেন্দ্রীনই হলো শিশু সূর্য। চারধারের ঘূর্ণিগুলির মধ্যে গ্যাসীয় পরমাণুগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হাল্কা ও ভারী ধরণের অণুর সৃষ্টি করলো। একদিকে যেমন জল, অ্যামো-নিয়া সৃষ্টি হলো, তেমনি ভারী লোহা, পাথরজাতীয় সিলিকেট গঠিত হলো। কেন্দ্রীনসম্পন্ন আবর্তন-শীল গ্যাস অভিকর্ষ বলের মাধ্যমে একটি চাকৃতির আকার ধারণ করলো। চেহারাটা অনেকটা ঘূর্ণায়মান গ্রামোফোন রেকর্ডের মত—রেকর্ডের মাঝখানের গর্তটির স্থান জুড়ে রয়েছে শিশু সূর্য। আর চাকৃতিটি আকারে বর্তমানের সৌরজগতের সীমার প্রায় সমান। ঘূর্ণায়মান চাকৃতিটির মধ্যে আবার ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হলো। শিশু সূর্যের আকর্ষণ

ও পরস্পরের মধ্যে ধাক্কা লাগবার ফলে এই ঘূর্ণাবর্তগুলি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হতে লাগলো। ঘূর্ণাবর্তের বাঁচবার একমাত্র উপায় হলো এক বিশিষ্ট মাত্রার বেশী পদার্থকে আবদ্ধ করা। অবশেষে নয়টি ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হলো—এই নয়টি হলো বর্তমান সূর্যের নয়টি গ্রহ। এই ঘূর্ণাবর্তগুলি শিশু সূর্যের চারধারে আবর্তন করতে করতে ঝাঁট দিয়ে বাড়্‌তি পদার্থ সঞ্চয় করতে থাকলো। এই সময়ে ঘূর্ণাবর্তগুলির তুলনায় শিশু সূর্যের আয়তন ছিল ১০০ গুণ। শিশু সূর্যের অভিকর্ষ বল বেশী হওয়ায় হাল্কা ধরণের হাইড্রোজেন প্রায় সবটুকুই গ্রাস করলো। শিশু সূর্যের পারমাণবিক প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেনের দহনক্রিয়া সুরু হলো। ফলে, এটি হঠাৎ উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত হয়ে সৃষ্টি করলো বর্তমানের সূর্য। আবর্তনশীল নয়টি ঘূর্ণির একটি হলো পৃথিবী ও চাঁদের উৎস। এই ঘূর্ণিটির আয়তন এমন হলো যে, ওই ঘূর্ণিটিকে দু-ভাগে বিভক্ত হতে হলো। কেন্দ্রের বড় ঘূর্ণিটি হলো প্রাচীন পৃথিবী ও বাইরের ক্ষুদ্র ঘূর্ণিটি প্রাচীন চাঁদ। কেন্দ্রের ঘূর্ণি অর্থাৎ পৃথিবীর চারধারে ছোট ঘূর্ণি অর্থাৎ চাঁদ প্রদক্ষিণ করতে লাগলো। পূর্বের মতই উভয়ে শিশু সূর্যের চারধারে আবর্তন করতে লাগলো। এই সময়ে পৃথিবী ও চাঁদ উভয়েই ছিল হিমশীতল গ্যাস আর উভয়ের ভর বর্তমান ভরের বহুগুণ ছিল। পৃথিবী ও চাঁদের উপাদান স্থির হলো এদের অবস্থান অনুযায়ী। কেন্দ্রের ঘূর্ণি পৃথিবীতে প্রাধান্য পেলো ভারী ধরণের পদার্থগুলি আর চাঁদে রইলো সৌরজগতের উৎস ধূলা, গ্যাসসমন্বিত মেঘের উপাদান। এই জন্যেই চাঁদের উপাদানের ঘনত্ব পৃথিবীর চেয়ে কম। চাঁদের উপাদান অনেকটা সূর্যের মতই। এর পর অতিকায় পৃথিবী ও চাঁদ ক্ষীণকায় হয়ে গেল। কারণস্বরূপ বলা হয় যে, পৃথিবী ও চাঁদের সঙ্কোচন ও বাহ্যিক পদার্থগুলির সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে তাপের সৃষ্টি হয়। সঙ্কোচন ও বাহ্যিক সংঘর্ষের পরিমাণ এত বেশী যে, তাপমাত্রা প্রচণ্ড হয়ে যায়। পৃথিবীর ভর চাঁদের ভরের তুলনায় অনেক বেশী হওয়ায় চাঁদের তুলনায় পৃথিবীতে তাপ সঞ্চার হলো অনেক বেশী। পৃথিবীর এই প্রচণ্ড তাপমাত্রায় বরফ নিমেষে উঠলো বাষ্প হয়ে—এমন কি, ভারী লোহা ও পাথরজাতীয় বস্তু গলন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হলো। সিলিকেটজাতীয় পাথুরে বস্তুগুলি গলন্ত পিণ্ডে ভাসমান হলো। এদের লোহাজাতীয় ভারী অংশ পৃথিবীর অভ্যন্তরে নিমজ্জিত হলো আর হাল্কা ধরণের পদার্থগুলি গ্যাসীয় আকার ধারণ করলো। চাঁদ ও পৃথিবীর এই গলন্ত অবস্থায় অনেক হাল্কা উপাদানই অভিকর্ষ বল পেরিয়ে মহাকাশে ধাবিত হলো। চাঁদ ও পৃথিবীতে ভারী ধরণের গ্যাসগুলিই আবহাওয়ার সৃষ্টি করলো। চাঁদের ভর কম তাই এর আবহাওয়া হলো হাল্কা ধরণের। সে তুলনায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অনেক ঘন ছিল। ইতিমধ্যে শিশু সূর্যের পারমাণবিক প্রক্রিয়া প্রবল হওয়ার জন্যে সূর্য অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে রশ্মি বিকিরণ করতে লাগলো। আলোর রশ্মির চাপে (Light pressure) পৃথিবী ও চাঁদের আবহাওয়ামণ্ডলের বিচ্যুতি ঘটলো। চাঁদ আবহাওয়ামণ্ডল রক্ষা করতে না পেরে আবহাওয়া বিবর্জিত অবস্থা প্রাপ্ত হলো। আর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল বেশী হওয়ায় সূর্যরশ্মির চাপ সত্ত্বেও আবহাওয়ার কিয়দংশ রক্ষা করতে পারলো। চাঁদ ও পৃথিবী ধীরে ধীরে শীতল হতে সুরু করলো ও উপরিভাগ কঠিন আকার ধারণ করলো।

ঠিক এই সময়ে পারিপার্শ্বিক উল্কাজাতীয় পদার্থও ছিল অনেক বেশী। পৃথিবী ও চাঁদের উপর এরা নিরন্তর এসে পড়তে লাগলো। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে এই উল্কাগুলির সংঘর্ষের ফলে উল্কাগুলির অধিকাংশই গ্যাসীয় আকার ধারণ করতে থাকে। ফলে পৃথিবীর

উপরিভাগের সঙ্গে বেশী সংঘর্ষ হতে পারে না। কিন্তু চাঁদ বায়ুমণ্ডলহীন হওয়ায় উল্কাগুলি অবাধে চাঁদের উপরিভাগের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটাতে লাগলো। উল্কাগুলি চাঁদের উপরিভাগ ভেদ করে ভিতরে প্রবিষ্ট হলো। উল্কার গতিশক্তি তাপশক্তিতে



২নং চিত্র
চাঁদের অসমান উপরিভাগ।

পরিণত হলো। এই প্রচণ্ড উত্তাপের ফলে চাঁদের আভ্যন্তরীণ সমস্ত পদার্থ অগ্ন্যুৎপাত সুরু করতে থাকলো। কালক্রমে উল্কাগুলি চাঁদের উপরিভাগকে এবড়ো-খেবড়ো করে তুললো (চিত্র ২)।

চাঁদের এই সৃষ্টি-রহস্যের ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করেছেন। তবু সূক্ষ্ম দ্বিধা-সংশয়ের শেষ নেই, বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনও অনেক মতবিরোধ রয়েছে।

১৬ই জুলাই তারিখে উৎক্ষিপ্ত অ্যাপোলো-১১ মাহাকাশযানের চন্দ্র-অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে—মানুষ চাঁদে পদার্পণ করেছে এবং মহাকাশচারীরা চাঁদের পৃষ্ঠদেশ থেকে মাটি, পাথর, ধুলা প্রভৃতি সংগ্রহ করেছেন। তাঁদের সংগৃহীত নমুনাগুলি পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে চাঁদ সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য জানা যাবে। আশা করা যায়, এই ধরণের পরীক্ষার মাধ্যমে চাঁদের সৃষ্টি-রহস্য সঠিকভাবে উদ্ঘাটিত হবে।

চন্দ্র-অভিযান মানুষের কি কাজে আসবে?

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

চন্দ্র-অভিযান, বিশেষত: চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের অবতরণ-অভিযান যেমন বিরাট ব্যয়বহুল তেমনি অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। আজ তাই সাধারণ মানুষের মনে চন্দ্র-অভিযান সম্পর্কে একটি প্রশ্ন বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। সে প্রশ্নটি হচ্ছে, এই বিরাট ব্যয় ও বিপদের ঝুঁকি নিয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের সত্যকার কোন সার্থকতা আছে কি—অর্থাৎ এই চন্দ্র-অভিযান পৃথিবীর মানুষের কি কাজে আসবে?

এই প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক। বিজ্ঞানীরা বহু পূর্বেই এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন এবং তার উত্তরও তাঁরা প্রস্তুত করে রেখেছেন। বিজ্ঞানীরা বলেন, চন্দ্র-অভিযানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আশু উপযোগিতা হচ্ছে বিশ্ব-রহস্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। তাঁরা অনুমান করেন, চন্দ্রের বুকে সৌরজগতের ইতিবৃত্তের বহু অধ্যায় লিখিত আছে—যে সব নথিপত্র পৃথিবীর বুক থেকে ভূমি-অবক্ষয়, ভূমি-সঞ্চয়, ভূমি-কর্ষণ এবং নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে লুপ্ত হয়ে গেছে।

আমরা জানি, চন্দ্রের বুকে বিরাট বিরাট গহ্বর আছে। এই সব গহ্বর এত বিরাট যে, তার কেন্দ্রস্থলে কোন মহাকাশচারী গিয়ে দাঁড়ালে তিনি চন্দ্রের দিগন্ত ছাড়িয়ে গহ্বরের কানা দেখতে পাবেন না। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, এই গহ্বরগুলি হচ্ছে সৌরজগতের আদিযুগের নিদর্শন, যখন সৌরজগৎ ছিল এক প্রলয়ঙ্কর অবস্থায় এবং যখন সৌরজগৎ এমন বহু মহাজাগতিক বস্তুপিণ্ডে পরিপূর্ণ ছিল, যেগুলি অবিশ্রান্ত কক্ষপথে বিচরণ করতে করতে সময় সময় পৃথিবী, চন্দ্র, মঙ্গল ও অন্যান্য গ্রহের বুকে নিক্ষিপ্ত হতো। মার্কিন তথ্যানুসন্ধানী মহাকাশযান চতুর্থ মেরিনার কর্তৃক গৃহীত মঙ্গলগ্রহের চিত্র থেকে দেখা যায়, মঙ্গলগ্রহ সৌরজগতে গ্রহাণুবলয়ের কাছাকাছি থাকবার দরুণ এই সব বস্তুপিণ্ডের দ্বারা ভীষণভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে।

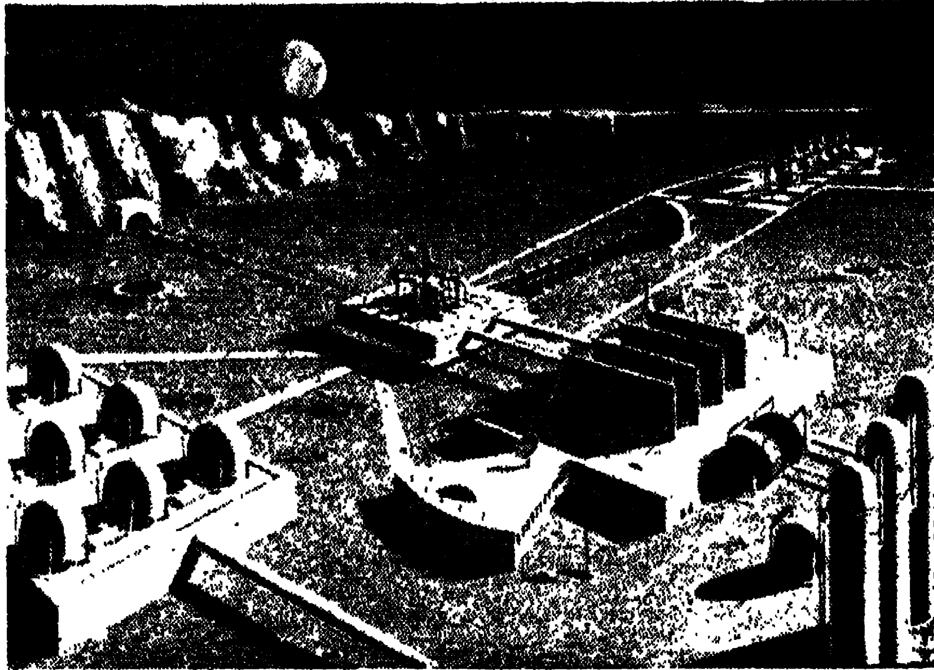
পৃথিবীর বুকে এই ধরণের আঘাতের অতি ক্ষীণ নিদর্শন পাওয়া যায়। হুডসন উপসাগরের পূর্বতীরে একটি গোলাকার অংশ এবং জার্মেনীতে একটি ১১ মাইল দীর্ঘ গোলাকার অববাহিকা দেখা যায়। এই অববাহিকার মধ্যে বর্তমানে কয়েকটি গ্রাম ও একটি প্রাচীর-ঘেরা প্রাচীন শহর আছে। এসব দেখে বলা যায়, এই অববাহিকা যতই প্রাচীন হোক, পৃথিবীর সৃষ্টিকালের তুলনায় তা অপেক্ষাকৃত নবীন। তাই বিশ্ব-সৃষ্টির অতীত ইতিহাসের প্রকৃত পরিচয় জানতে হলে চন্দ্রের দিকে আমাদের তাকাতে হবে।

এই ধরণের মহাজাগতিক বস্তুপিণ্ড বা গ্রহাণুর সঙ্গে পৃথিবী ও চন্দ্রের এখনও কি সময় সময় সংঘর্ষ ঘটতে পারে? যদি ঘটে তার ফল কি হবে? কয়েক শ' গজ ব্যাসেরও কোন গ্রহাণুর সঙ্গে যদি সংঘর্ষ ঘটে তাহলে বিস্ফোরণের ফলে যে তাপ উৎপন্ন হবে, তাতে একটি গহ্বরের সৃষ্টি হতে পারে। আটটি গ্রহাণুর কথা এখনও পর্যন্ত জানা গেছে, যেগুলি কক্ষপথে বিচরণ করতে করতে পৃথিবীর কক্ষপথের কাছাকাছি আসে। এই গ্রহাণুগুলি 'অ্যাপোলো' গ্রহাণুপুঞ্জ নামে অভিহিত। এই গ্রহাণুগুলির আকার খুব বড় নয়। এদের ব্যাস এক মাইল থেকে কুড়ি মাইল পর্যন্ত। সবচেয়ে বড় গ্রহাণুটি 'এরোস'

(Eros) নামে অভিহিত। এটি ২০ মাইল লম্বা ও ৫ থেকে ১০ মাইল চওড়া। এই ধরণের গ্রহাণু আরও থাকতে পারে। কিন্তু সেগুলি পৃথিবীর কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত তাদের আবিষ্কার করা যাবে না।

ইকারাস্ (Icarus) নামে একটি গ্রহাণু ১৯৪৯ সালে আবিষ্কৃত হয়। এর ব্যাস ০·৬ মাইল। ১৯৬৮ সালের ১৫ই জুন এই গ্রহাণুটি পৃথিবীর ৪২ লক্ষ মাইল দূরত্ব থেকে চলে গেছে। যদি ভবিষ্যতে কখনও এই গ্রহাণুটির সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষ ঘটে, তাহলে যে বিস্ফোরণ ঘটবে, তা হবে হাজারটি হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের সমান। তবে ১৯৪৯ সাল থেকে এই গ্রহাণুটির কক্ষপথ পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে এই ধরণের সংঘর্ষের কোন সম্ভাবনাই নেই।

চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষ পদার্পণ করে চান্দ্র-গহ্বরের কাল নির্ণয় করতে পারলে সৌরজগতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এই ধরণের সংঘাতের হার পরিমাপ করা সম্ভব হবে। চন্দ্রের বুকে পদার্পণ করলে আর একটি রহস্যও উদ্ঘাটিত হবে—সেটি হচ্ছে চন্দ্র-সৃষ্টির রহস্য। চন্দ্রের সৃষ্টি পৃথিবী থেকে, না চন্দ্র নিজেই একটা বিরাট গ্রহাণু? কেউ কেউ কেউ অনুমান করেন, চন্দ্র হচ্ছে একটি বিরাট গ্রহাণু যা কালক্রমে পৃথিবীর অভিকর্ষের বন্ধনে বাঁধা পড়ে আবর্তন করে চলেছে। বস্তুত, সৌরজগতের গ্রহপরিবারের মধ্যে চন্দ্রকে একজন আগন্তুক বলেই মনে হয়। যেসব উপাদানে চন্দ্র গঠিত তাদের গড়পড়তা ঘনত্ব সৌরপরিবারে ভিতরের দিকে বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গলগ্রহের উপাদানসমূহের ঘনত্বের চেয়ে অনেক কম। আবার সৌরপরিবারে বাইরের



১নং চিত্র

চন্দ্রপৃষ্ঠের উপাদান থেকে রকেটের জ্বালানী প্রস্তুতের কারখানা
(পরিকল্পিত চিত্ররূপ)

দিকে বৃহস্পতি ইত্যাদি যেসব গ্রহ আছে তাতে হাইড্রোজেনের মত হাল্কা উপাদানের পরিমাণ অনেক বেশী। তাহলে কি মনে করতে হবে চন্দ্র হচ্ছে সৌরপরিবারে এদের মাঝামাঝি ধরণের একটি বস্তুপিণ্ড; অর্থাৎ গ্রহাণুপুঞ্জের সন্তান?

চন্দ্র সম্পর্কে এই মতবাদ যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের পৃথিবীর কাছে একটি গ্রহাণুকে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের জন্যে পাওয়া যাবে। কিন্তু এই মতবাদে কিছু আপত্তি আছে। পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবার সময় চন্দ্র যে সঠিক কোণে ও সঠিক গতিবেগে পৃথিবীর কাছে উপস্থিত হয়েছিল, তা বিশ্বাস করা কঠিন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করবার জন্যে যেসব রুশ ও মার্কিন মহাকাশযান প্রেরণ করা হয়েছিল, সেগুলি চন্দ্রের কাছাকাছি আসবার সময় তাদের কক্ষপথ ও গতির পরিবর্তন যদি ঘটানো না হতো, তা হলে সেগুলি সরাসরি চন্দ্রের বুকে গিয়ে আছড়ে পড়তো অথবা চন্দ্রের পাশ কাটিয়ে চলে যেত।

চন্দ্রের সৃষ্টি সম্বন্ধে আরও কয়েকটি মতবাদ প্রচলিত আছে। একটি মত অনুযায়ী পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চন্দ্রের সৃষ্টি। পৃথিবীর উপরিভাগের ঘনত্ব তার সামগ্রিক ঘনত্বের চেয়ে কম। এই মতবাদে চন্দ্রের অপেক্ষাকৃত কম ঘনত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আর একটি মত অনুযায়ী পৃথিবী সৃষ্টি হবার পর তার কক্ষপথে যে মহাজাগতিক বস্তুর অবশেষ ছিল, তা ঘনীভূত হয়ে চন্দ্রের উৎপত্তি। এই দুটি মতবাদ সম্পর্কে বিজ্ঞানীমহলে সংশয় দেখা যায়।

চন্দ্রের বুকে মানুষ উপনীত না হওয়া পর্যন্ত এই সব বিতর্কের অবসান হবে না। চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষ উপস্থিত হলে যেমন চন্দ্রের সৃষ্টি-রহস্য উন্মোচনের সুযোগ পাওয়া যাবে, তেমনি পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে জানবারও সুবিধা হবে। তখন জানা যাবে পৃথিবীর বুকে কেন সমুদ্র ও মহাদেশ আছে, পৃথিবীর অংশ-বিশেষে বিপর্যয়ের ফলে কেন নগরাদি ধ্বংস হয়ে যায়, নতুন নতুন পর্বত ও দ্বীপের উৎপত্তি হয় এবং পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে অতীতের চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে যায়।

আমরা জানি, পৃথিবীর মত চন্দ্রের কোন বায়ুমণ্ডল বা আবহাওয়া নেই। চন্দ্রে কোন বায়ুমণ্ডল না থাকায় চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে গ্রহ-নক্ষত্রাদি সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণে সুবিধা আছে অনেকখানি। এদিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্র। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটনে বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞান আজকাল বিজ্ঞানীদের বিশেষভাবে সহায়তা করছে। কিন্তু বেতার-তরঙ্গের বর্ণালী অতি বিস্তৃত এবং পৃথিবীর আবহাওয়ার আবরণের দরুণ তার অনেকখানি বেতার-দূরবীক্ষণের অ্যান্টিনায় ধরা পড়ে না। তা সত্ত্বেও বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সুদূর নীহারিকালোক থেকে আগত বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে আমরা কোয়াসার, পালসার, এক্স-রে নক্ষত্র ইত্যাদি বহু বিচিত্র মহাজাগতিক বস্তুর সন্ধান পেয়েছি।

শুধু যে পৃথিবীর আবহাওয়া বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে মহাজাগতিক বস্তুর অনুসন্ধানে বাধা সৃষ্টি করে তা নয়, সেই সঙ্গে মানুষের সৃষ্ট যেসব বেতার-সঙ্কেত মহাকাশে পাঠানো হয়, তার দরুণও সুদূর নক্ষত্রলোক থেকে আগত ক্ষীণ বেতার-তরঙ্গ বিশ্লেষণে অসুবিধার উদ্ভব হয়। এদিক থেকে চন্দ্রপৃষ্ঠে বেতার-দূরবীক্ষণের পর্যবেক্ষণে সুবিধা আছে অনেকখানি। আমরা জানি, পৃথিবী থেকে চন্দ্রের যে দিক কখনই দেখা যায় না, সেখান থেকে বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত হয় না। কাজেই চন্দ্রের এই পৃষ্ঠে বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্র স্থাপন করে ব্রহ্মাণ্ডলোকের রহস্য অনুসন্ধানে বিশেষ সুবিধা হবে। এছাড়া চন্দ্রে কোন বায়ুমণ্ডল না থাকায় এবং তার অভি-

কর্ষ কম হওয়ায় বেতার-দূরবীক্ষণের বিরাটাকার অ্যান্টিনাগুলি বেশ হাল্কা করেই তৈরি করা যাবে। এক্ষেত্রে একমাত্র সমস্যা হবে—চন্দ্রপৃষ্ঠে দিনরাত্রির তাপমাত্রার বিরাট তারতম্যের জন্যে যন্ত্রপাতি নির্মাণে বিশেষ পরিকল্পনা করতে হবে।

চন্দ্র সম্পর্কে একটি প্রশ্ন বহুদিন থেকে উঠেছে—চন্দ্র ও পৃথিবীর রাসায়নিক গঠন একই রকম কিনা ? চন্দ্রে কি এমন কিছু জিনিষ আছে, প্রাপ্ত খনিজের সঙ্গে হয়তো মিলবে না। চন্দ্রে প্রকৃতপক্ষে কোন আবহাওয়া নেই, সেখানে প্রায় পরম শূন্যতা বিদ্যমান। তাহলে চন্দ্রপৃষ্ঠের উপাদানগুলি ভূপৃষ্ঠের শিলার মত অক্সিজেনাম্বিত হবে না। লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি বছর ধরে চন্দ্রপৃষ্ঠের সেই উপাদানগুলি বায়ুমণ্ডলের বিনা আবরণে সূর্যের তীব্র বিকিরণের সম্মুখীন হয়েছে। তার ফলে সেগুলি যেসব ধর্মপ্রাপ্ত হয়েছে, তা আমাদের সম্পূর্ণ অজানা। রসায়ন ও খনিজ-



৪নং চিত্র

চন্দ্রপৃষ্ঠে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের সম্ভাব্য চিত্ররূপ। মহাকাশচারীরা একটি চলমান পরীক্ষাগার থেকে জিনিষপত্র নামাচ্ছেন।

বা পৃথিবীতে নেই ? মহাকাশ অভিযান সম্পর্কে সোভিয়েট রাশিয়ার এই বছরের তথ্যবিবরণী থেকে জানা যায়, চন্দ্রের পরিবেশ পৃথিবীর পরিবেশ থেকে এত পৃথক যে, চন্দ্রে যেসব খনিজদ্রব্য পাওয়া যাবে, তা আমাদের পৃথিবীতে তত্ত্বের দিক থেকে চন্দ্র এভাবে মানুষের কাছে একটা নতুন পথ খুলে দিতে পারে। তবে এই উপাদানগুলির প্রকৃতি না জানা পর্যন্ত সেগুলিকে পৃথিবীতে মানুষের কাজে লাগাবার কথা ভাবা যাবে না। এখন শুধু অতীত ইতিহাসের পাতা

উল্টে আমরা স্মরণ করতে পারি, বিজ্ঞানের প্রতিটি নতুন দিগন্ত মানুষের জীবনে কি যুগান্তকারী পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

মহাকাশচারীরা চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে কি নিদর্শন সংগ্রহ করে আনবেন, তার কিছুটা আভাস আমরা পেতে পারি পৃথিবীতে মিউজিয়ামে রক্ষিত প্রস্তর উল্কাপিণ্ড থেকে। এই উল্কাপিণ্ডগুলির সংযুতি পৃথিবীতে পাওয়া যে কোন জিনিষ থেকে ভিন্ন রকমের। কনড্রুল (Chondrule) নামে ক্ষুদ্র বস্তু দিয়ে এই উল্কাপিণ্ডগুলি গঠিত। এগুলি দেখতে অনেকটা চালের কণার মত।

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, বিরাটাকার লৌহ উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে চন্দ্রের সংঘর্ষের ফলে এই অংশগুলির সৃষ্টি হয়েছে। সুদূর অতীতে কোন সংঘর্ষের ফলে এক বা একাধিক গ্রহাণুর কেন্দ্রস্থল থেকে এই লৌহ ভগ্নাংশগুলির উৎপত্তি হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষপথের মাঝখানে এই রকম হাজার হাজার গ্রহাণু সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই এলাকাকে বলা হয় গ্রহাণু-বলয়। এই মহাজাগতিক বস্তুপিণ্ডগুলি কখনই পৃথিবীর কাছে আসে না, কিন্তু গ্রহাণুবলয়ের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে তাদের ভগ্নাংশ শেষ পর্যন্ত চন্দ্র ও পৃথিবীর মাঝপথে উৎক্ষিপ্ত হয়। এই ধরণের একটি নিকেল-লৌহ উল্কাপিণ্ড (ওজন ৩১ টন) গ্রীনল্যাণ্ডের কাছে পাওয়া গেছে এবং এর চেয়ে অনেক ভারী উল্কাপিণ্ডও ভূপৃষ্ঠে পড়েছে। যখন এই মহাজাগতিক বস্তুপিণ্ডগুলি বায়ুশূন্য চন্দ্রপৃষ্ঠে পড়ে, তখন সেগুলি চন্দ্রপৃষ্ঠের ভগ্নাংশ নিশ্চয়ই মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে থাকে। চন্দ্রের ক্ষীণ অভিকর্ষের দরুণ এই ভগ্নাংশের বেশীর ভাগই মহাকাশের বুকে ছড়িয়ে পড়ে এবং কতকগুলি হয়তো উল্কারূপে ভূপৃষ্ঠে পড়ে থাকবে। এই ধারণা সত্য কিনা তা আমরা জানতে পারবো না, যতক্ষণ মহাকাশচারীরা চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পৃথিবীতে নিয়ে না আসছেন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, চন্দ্রপৃষ্ঠের শিলা যদি মূল্যবান উপাদানে (যে উপাদান পৃথিবীতে নেই বা নিঃশেষিতপ্রায় হতে চলেছে) সমৃদ্ধ বলে জানা যায়, তাহলে চান্দ্রশিলা মানুষের কাজে লাগাবার জন্যে পৃথিবীতে বহন করে আনা সম্ভব হবে কি? যাঁরা খুব আশাবাদী তাঁরা মনে করেন, চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে মূল্যবান খনিজ উপাদান পৃথিবীতে বহন করে আনা এক সময় সম্ভব হবে এবং তা বিশেষ ব্যয়বহুলও হবে না। তাঁরা বলেন, পৃথিবী থেকে চন্দ্রে ভারী জিনিষপত্র বহন করে নিয়ে যাবার যে অসুবিধা আছে, চন্দ্র থেকে পৃথিবীতে জিনিষ নিয়ে আসতে তেমন অসুবিধা হবে না। ভূপৃষ্ঠ থেকে এক টন ওজনের মাল তুলে কক্ষপথে স্থাপন করতে ৫০ টন জ্বালানীর প্রয়োজন হয়। এত বেশী জ্বালানীর প্রয়োজন হবার কারণ হচ্ছে—অংশতঃ পৃথিবীর প্রচণ্ড অভিকর্ষ এবং অংশতঃ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে মহাকাশযানকে যেতে হয় বলে। পক্ষান্তরে চন্দ্রে কোন বায়ু নেই এবং তার অভিকর্ষও অনেক কম। পৃথিবীর অভিকর্ষের বন্ধন ছিন্ন করতে ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল গতিবেগের প্রয়োজন হয়, পক্ষান্তরে চন্দ্রের অভিকর্ষ-বন্ধন ছিন্ন করতে তার মাত্র এক-ষষ্ঠাংশ গতিবেগ প্রয়োজন।

কম ব্যয়ে মহাকাশযানকে উৎক্ষেপণের ক্ষেত্রে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল একটা অতিরিক্ত বাধা সৃষ্টি করে বায়ুমণ্ডলের স্তর অতিক্রম করবার জন্যে মহাকাশযানকে যত দ্রুত সম্ভব যেতে হবে; অর্থাৎ মহাকাশযানকে খাড়াভাবে উৎক্ষেপণ করতে হবে। পক্ষান্তরে চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় অনুভূমিকভাবে মহাকাশযানকে উৎক্ষেপণ করা সম্ভব। এর ফলে উৎক্ষেপণের ব্যয়ও অনেক কম হবে।

মানুষ চন্দ্রে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করলে সেখানে তার জীবনধারণের উপযোগী খাদ্যের জন্যে সে কি অসুবিধার সম্মুখীন হবে না? এই প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রথম প্রথম পৃথিবী থেকে খাদ্য বহন করে নিয়ে যেতে হবে, কিন্তু ভবিষ্যতে তার প্রয়োজন হবে না। উল্কাপিণ্ড এবং নাক্ষত্র বর্ণালী (যা থেকে নক্ষত্রের পৃথিবীর মূল উপাদানগুলি—এমন কি, পরমাণুশক্তি উৎপাদনের উপাদানও বর্তমান আছে। তাহলে চান্দ্র উপনিবেশ বহুলাংশে স্বয়ম্ভর হতে পারে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, সংশ্লেষণ রসায়নে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পেলে চান্দ্রশিলা থেকে কার্বন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, সালফার এবং ফস্‌ফরাস প্রভৃতি উপাদানগুলি (যা দিয়ে



৩নং চিত্র

চন্দ্রপৃষ্ঠে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের সম্ভাব্য চিত্ররূপ চন্দ্রপৃষ্ঠে একটি অর্ধস্থায়ী পর্যবেক্ষণ শিবির।

রাসায়নিক সংযুক্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়) পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র মূলতঃ একই ধর্মবিশিষ্ট একই রকম উপাদানগুলি বিদ্যমান আছে, যদিও অবস্থাবিশেষে তাদের আনুপাতিক পরিমাণের তারতম্য ঘটে থাকে। এই কারণে অনুমান করা হয়, চন্দ্রপৃষ্ঠে জৈব অণু গঠিত) নিষ্কাশন করা সম্ভব হতে পারে। এই উপাদানগুলি দিয়ে বিশেষ ধরণের খাদ্য প্রস্তুতের কারখানায় প্রোটিন, শর্করা ও স্নেহজাতীয় পদার্থ সংশ্লেষণ করা সম্ভব হতে পারে। তবে এই সব পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে সুদূর ভবিষ্যতে, বর্তমানে তার আশু সম্ভাবনা নেই।

চন্দ্রের বায়ুশূন্যতা ও ক্ষীণ অভিকর্ষের ভিত্তিতে চান্দ্র পরিবেশকে মানুষের আরও নানা কাজে লাগানো যেতে পারে। রসায়ন, ধাতুবিদ্যা এবং কঠিন অবস্থার ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুশূন্য অবস্থায় কার্যকরী বহু শিল্প গড়ে উঠতে পারে। তাই অনেকে বলেন, চন্দ্রপৃষ্ঠে বিশেষ ধরণের শিল্প গড়ে তোলবার সম্ভাবনা আছে প্রচুর। কেউ কেউ আবার বলেন, চন্দ্রের ক্ষীণ অভিকর্ষ-জনিত পরিবেশ হৃদ্‌রোগাক্রান্ত মানুষের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ হবে। কিন্তু চন্দ্রপৃষ্ঠে উপনীত হবার আগে যাতে এই রোগীদের হৃদ্‌যন্ত্র মাঝপথে বিকল না হয়ে যায়, তার জন্যে বহু সমস্যার সমাধান করতে হবে এবং সেটা অচিরে সম্ভব হবে না। চন্দ্রলোকে যাতায়াত যখন সহজ হয়ে উঠবে, তখন সেটা হবে সম্ভব।

মানুষের মহাকাশ অভিযান শুধুমাত্র চন্দ্র-অভিযানে সীমিত নয়। চন্দ্র-অভিযান হচ্ছে মানুষের গ্রহান্তর যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ। চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের অবতরণের অভিযান সফল হবার ফলে গ্রহান্তর যাত্রায় মানুষের সামর্থ্য সম্পর্কে প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া গেল। চন্দ্র হবে গ্রহান্তর-অভিযানে মানুষের শিক্ষণ-ক্ষেত্র। এই শিক্ষণ-ক্ষেত্রে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে মানুষ একদিন হয়তো গ্রহান্তরের পথে অগ্রসর হবে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নতুন নতুন রহস্য উদ্‌ঘাটন করবে।

মহাকাশ অভিযানের অন্ধকার দিক

জয়ন্ত বসু

(১)

ভাই বাতায়নদা,

দেখতে দেখতে সেই জুলাই মাস এসে গেল—এই মাসেই তো মানুষের প্রথম চাঁদে গিয়ে নামবার কথা। ভাবতেও কেমন রোমাঞ্চ লাগে-আর মনে হয় বিজ্ঞানের কি আশ্চর্য উন্নতিই না হয়েছে! চাঁদে যাওয়ার এবং সাধারণভাবে মহাকাশ অভিযানের তাৎপর্যের বিষয় কিছু কিছু কাগজে-পত্রিকায় পড়েছি ও রেডিয়োয় শুনেছি। কিন্তু বাতায়নদা, বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী নাকি—তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত বিজ্ঞানীও আছেন—মহাকাশ অভিযানের বিরুদ্ধে মত পোষণ করেন। তোমার মাধ্যমে তো বিজ্ঞান-জগতের আলো-হাওয়া মাঝে মাঝে পাই, এবার ঐ বিজ্ঞানীদের মত সম্পর্কে তুমি একটু আলোকপাত করবে কি?... ইতি—

বোলপুর তোমার স্নেহের
১।৭।৬৯ বোলতা

(২)

কল্যাণীয়াসু,

তুমি তোমার চিঠিতে একটা ভাল প্রশ্ন করেছ। কারণ চাঁদের যেমন একটা দিক আছে, যা আমরা কোন সময়ই দেখতে পাই না, মহাকাশ অভিযানেরও অনেকটা সেই রকমই একটা দিক রয়েছে, যেটা সাধারণতঃ লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে যায়। অনেকে মনে করেন, মহাকাশ অভিযানের ব্যাপারটা একটা হিমশৈলের মত, যার দৃশ্য অংশের চেয়ে অদৃশ্য

অংশ হচ্ছে বড়। আর সেই অদৃশ্য অংশে রয়েছে নানা রকম বিপদের সম্ভাবনা। ঐ সব বিপদের জন্যেই কয়েকজন বিজ্ঞানী মহাকাশ অভিযান সম্বন্ধে বিরূপ। এই অভিযানের অন্ধকার দিকটি নিয়ে ভিতরে ভিতরে চিন্তা-ভাবনা আছে ঠিকই, কিন্তু বাইরে বিশেষ আলোচনা হয় না। তোমার প্রশ্নের হুল খেয়ে ভিতরের কথা খানিকটা আমি প্রকাশ করে দিচ্ছি।

প্রথমেই যে বিষয় বলতে হয়, তা হলো মহাকাশ-বিজ্ঞানকে যুদ্ধের জন্যে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং সে উদ্দেশ্যে নানা ধরণের প্রস্তুতিও হচ্ছে। রাষ্ট্রের নেতারা যে এদিকে নজর দিয়েছেন, তা পরিষ্কার জানা গেল বছর তিনেক আগে আমেরিকার তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জনসন যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীকে ১৫০ কোটি ডলারের MOL প্রকল্পে কাজ সুরু করবার সম্মতি দিলেন। Manned Orbiting Laboratory (অর্থাৎ পৃথিবীকে পরিক্রমারত মনুষ্যসমন্বিত গবেষণাগার), এই ইংরেজি শব্দ তিনটির প্রথম অক্ষরগুলি নিয়ে MOL কথাটি গঠিত। ঐ প্রকল্প অনুযায়ী ভূপৃষ্ঠ থেকে ২০০/৩০০ মাইল উপরে এক নাগাড়ে তিন সপ্তাহ ধরে গবেষণাগারটি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে। দু'জন কর্মীর কাজ করবার মত ব্যবস্থা থাকবে সেই গবেষণাগারে। গবেষণাগারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে একটি জেমিনি মহাকাশযান। পৃথিবী থেকে উপরে ওঠবার সময় কর্মী দু'জন ঐ মহাকাশযানে থাকবেন। তারপর কক্ষপথে উপস্থিত হলে একটি সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে গবেষণাগারে প্রবেশ করে তাঁরা সেখানে কর্মরত হবেন। পৃথিবীতে ফিরে আসার সময় তাঁরা আবার জেমিনি মহাকাশযানটি ব্যবহার করবেন।

MOL প্রকল্পে কয়েকটি অভিযানের কথা চিন্তা করা হয়েছে। 'মহাকাশে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কি কি কাজ করতে পারা যায়', তাই নির্ধারণ করা হলো এই সব অভিযানের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। এটা জানা আছে যে, মহাকাশে মানুষের সামরিক কার্যকলাপ প্রধানতঃ আক্রমণাত্মক প্রকৃতির এবং সেখানে একটি অন্যতম কার্য হচ্ছে—পরদেশে গুপ্ত পর্যবেক্ষণ চালানো। এই পর্যবেক্ষণের জন্যে পরিক্রমারত গবেষণাগারে দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও রেডারের বিশেষ ধরণের এরিয়েল রাখবার ব্যবস্থা হচ্ছে। ঐ গবেষণাগার বা ভবিষ্যতে ঐ জাতীয় যে সব গবেষণাগার (!) তৈরি হবে, সেগুলি যদি হাইড্রোজেন বোমার বাহক হয়, তাহলেও বিস্মিত হবার কারণ নেই।

পৃথিবীতে আজ যে দুটি সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ, সেই আমেরিকা ও রাশিয়াসমেত অনেকগুলি দেশ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষা বন্ধ রাখতে চুক্তিবদ্ধ। কোন দেশ যদি এই ধরণের পরীক্ষা করে, তাহলে অন্য দেশ সহজেই তা ধরতে পারবে। কিন্তু কেবলমাত্র একটি দেশের লোক যদি চাঁদে গিয়ে উপস্থিত হয়, তবে নির্বিরোধে ও যথেষ্ট গোপনে তাঁরা সেখানে বোমা সংক্রান্ত পরীক্ষা চালিয়ে যেতে পারবেন। চাঁদের কয়েকটি জায়গা বেছে হাইড্রোজেন বোমার গুদাম হিসাবেও সেগুলিকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

মহাকাশের সামরিক তাৎপর্য প্রসঙ্গে ইংল্যাণ্ডের খ্যাতনামা অধ্যাপক বার্নার্ড লাভাল একবার বলেছিলেন—'যদিও প্রায়ই এটা বলা হয় যে, মহাকাশ অভিযান সংক্রান্ত আমেরিকার কার্যকলাপের মধ্যে গোপনীয়তা কিছু নেই ও সে সম্বন্ধে সব খবরই সকলে পেতে পারেন, একথা কিন্তু আসলে ঠিক নয়। গত কয়েক বছর ধরে নাসা (অর্থাৎ আমেরিকার অসামরিক মহাকাশ অভিযানের কর্তৃপক্ষ—লেখক) যত যানকে মহাকাশে পাঠাচ্ছে, তার চেয়ে প্রতি বছরই বেশী সংখ্যায় মহাকাশযানকে পাঠাচ্ছে আমেরিকার সামরিক বাহিনী।'

মহাকাশে রাশিয়ানদের সামরিক কোন আয়োজনের কথা আমাদের এখনো জানা নেই, কিন্তু এটা নিশ্চয় বলা যায় যে, যুদ্ধের প্রস্তুতিতে তাঁরা সহজে আমেরিকানদের থেকে পিছপা হবেন না। অধ্যাপক লাভাল বলেছেন—'এটা জানা আছে যে, কস্‌মস নামে যে সব মহাকাশ-যানকে রাশিয়া পৃথিবীর কক্ষে স্থাপন করেছে, তাদের উদ্দেশ্য—বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সামরিক অনুসন্ধানের কাজও (যথা, গুপ্তচরবৃত্তি ও আলোকচিত্র গ্রহণ) চালিয়ে যাওয়া।'

অতএব আমরা বুঝতে পারছি যে, মহাকাশে মানুষের জয়যাত্রা একদিকে যত এগোচ্ছে, ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা অন্যদিকে তত বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে বিশ্বধ্বংসকারী যুদ্ধের সম্ভাবনাও যে কিঞ্চিৎ বাড়ছে না, তা নয়। এই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করেই সামরিক উদ্দেশ্যে মহাকাশের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করে ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী মাসে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, কিন্তু ঐ চুক্তিটি যথাযথ পালিত হচ্ছে বা হবে কিনা, তা নিশ্চয় করে কেউ বলতে পারেন না।

সামরিক আয়োজনে মহাকাশের ব্যবহার ভারতবর্ষের মত অনুন্নত দেশের পক্ষে বিশেষ ভয়ের কারণ। মহাকাশ-বিজ্ঞানের এই অপপ্রয়োগ হতে থাকলে উন্নত দেশগুলি এমন একটি অতিরিক্ত শক্তির অধিকারী হবে, যা তারা অনায়াসে অনুন্নত দেশগুলির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে পারে।

মহাকাশ অভিযান সম্পর্কে অধ্যাপক সি. ভি. রামন যা মন্তব্য করেছেন, তার সারমর্ম হচ্ছে: সামরিক আয়োজনই মহাকাশ অভিযানের একমাত্র সার্থকতা। মনে হয়, মহাকাশ জয় নিয়ে যাঁরা অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস করেন, তাঁদের উপর বিরক্ত হয়েই তিনি এই বিরূপ মন্তব্যটি করেছেন, কারণ মহাকাশ অভিযান এক দিক থেকে আমাদের বিজ্ঞান-ধর্মী সভ্যতার নিঃসন্দেহে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তবে ঐ অভিযানের যে অন্ধকার দিকটির দিকে রামন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং যে দিকটির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তারিতভাবে তোমায় আমি জানালাম, সে দিকে চক্ষু বুজে বসে থাকাও বুদ্ধির পরিচয় নয়। একথা বুঝতে হবে যে, বিজ্ঞানীদের যতই সদুদ্দেশ্য থাক, মহাকাশ-বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগে রাষ্ট্রের নেতাদের নিরস্ত করা হয়তো সম্ভব হবে না। মনে রাখতে হবে যে, পারমাণবিক শক্তি-বিজ্ঞানে যাঁর অসামান্য অবদান, সেই মহামতি আইনষ্টাইনের আন্তরিক আপত্তি সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের নির্দেশ দিতে কুণ্ঠিত হন নি।

সামরিক আয়োজন ছাড়া আরও যে কারণে অনেকে মহাকাশ অভিযানের প্রতি বিরূপ, তা হলো এর জন্যে সুবিপুল অর্থের ব্যয়। কেবল অ্যাপোলো-১০ অভিযানের জন্যেই নাকি ব্যয় হয়েছিল প্রায় ৩৫ কোটি ডলার অর্থাৎ ২৫০ থেকে ৩০০ কোটি টাকা। মহাকাশ অভিযান খাতে একা আমেরিকারই বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ৪৫০ কোটি ডলার। অথচ পৃথিবীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ লোক এখনো অনাহারে-অর্ধাহারে ও অশিক্ষায়-কুশিক্ষায় দিন কাটাচ্ছে, তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করবার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট অর্থ ও মানুষের প্রচেষ্টার প্রয়োগ হচ্ছে না। এমন কি, মহাকাশ অভিযানের দৌলতে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রও অনেকটা অবহেলিত হচ্ছে। যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে মহাকাশ-বিজ্ঞান ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, সেই জ্যোতির্বিজ্ঞানেরই একটি দিকের কথা উদাহরণ হিসাবে বলা যায়। আলোক দূরবীক্ষণ যন্ত্র ইত্যাদির সাহায্যে ভূপৃষ্ঠ থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের জন্যে ১৯৬৪ সালে আমেরিকার 'ন্যাশান্যাল

অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সেস' যে কর্মসূচী প্রস্তাব করেছিলেন, তাতে ১০ বছরে মোট ব্যয় বরাদ্দ ছিল মহাকাশ অভিযানের গড়ে ১৫ থেকে ২০ দিনের ব্যয়ের সমান। তবু গত ৫ বছরে ঐ কর্মসূচীর সামান্যই রূপায়িত হয়েছে। আসলে কোন দেশে মহাকাশ-বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে এখন সেই দেশের মর্যাদার মাপকাঠি হিসাবে দেখে প্রায় একরোখাভাবে ঐ বিজ্ঞানের চর্চা করা হচ্ছে। এই অসম দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলিতে—বিশেষতঃ কল্যাণকর শাখাগুলিতে—অধিকতর শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োগ করা উচিত বলে অনেকে মনে করেন।...ইতি—

কলকাতা তোমার
৫।৭।৬৯ বাতায়নদা

(৩)

ভাই বাতায়নদা,

তোমার চিঠিতে মহাকাশ অভিযান সম্পর্কে এমন অনেক কথা জানা গেল, যা সাধারণতঃ সত্যই বিশেষ আলোচনা করা হয় না। তবে কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে পড়ছিলুম, কোন কোন বিজ্ঞানী নাকি বলেছেন, মহাকাশ-চারীরা চাঁদে নেমে সেখান থেকে ফিরে এলে সেখানকার জীবাণু তাঁদের মাধ্যমে পৃথিবীতে এসে উপস্থিত হতে পারে। এতেও কি বিপদের সম্ভাবনা থাকছে না ?

আচ্ছা, বাতায়নদা, আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা ছাড়াও যে সব ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে মহাকাশ অভিযান ফলপ্রসূ হচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও বেশী ফলপ্রসূ হতে পারে—যেমন কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবীর সর্বত্র রেডিও ও টেলিভিসন সংযোগ, আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া ইত্যাদি—সে সব সম্বন্ধে তোমার মত কি—এগুলিতে মানুষের নিছক উপকারই কি হবে না ?...ইতি—

বোলপুর তোমার স্নেহের
৮।৭।৬৯ বোলতা

(৪)

কল্যাণীয়াসু,

...জীবাণুর মাধ্যমে তুমি যে ঝুঁকির কথা বলেছ, সে ঝুঁকি তো আছেই। মহাকাশযান যখন চাঁদ বা কোন গ্রহ থেকে পৃথিবীতে ফিরবে, তখন সে সব জায়গা বা মহাকাশযানের চলার পথ থেকে আমাদের অপরিচিত জীবাণু ঐ যানের বা যানের আরোহীদের মাধ্যমে পৃথিবীতে এসে উপস্থিত হতে পারে এবং যদি উপস্থিতই হয়, তাহলে নানান নতুন রোগের প্রকোপ দেখা দেবার সম্ভাবনা আছে। আমাদের দেহে এসব রোগের প্রতিরোধক ব্যবস্থা না থাকায় মহামারীর প্রাদুর্ভাবও নিতান্তই স্বাভাবিক। অপর পক্ষে, মহাকাশযানের মাধ্যমে পৃথিবীর জীবাণু চাঁদে বা কোন গ্রহে গিয়ে সেখানে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং সেখানে যদি কোন প্রাণী-জগৎ থাকে, তবে তাকে বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে। বিজ্ঞানীরা অবশ্য জীবাণুর সম্ভাব্য প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন ও এই সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বনের পক্ষপাতী। মহাকাশযান জীবাণুমুক্ত করা বাধ্যতামূলক করে এজন্যে ১৯৬৪ সালে কয়েকটি নিয়ম গৃহীত হয় এবং ১৯৬৬ সালে নিয়মগুলি পরিমার্জিত করা হয়েছে। তবে এই জীবাণুমুক্ত করবার কাজটা খুব সহজ নয়। একজন মার্কিন পদস্থ কর্মচারী বলেছেন, মহাকাশযান তো ঠিক বীনের একটা টিন নয় যে, একে ১০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় অনায়াসেই ফুটিয়ে নেওয়া যাবে। এই অসুবিধার জন্যেই ১৯৬৭ সালে মহাকাশযান জীবাণুমুক্ত করা সম্পর্কে লণ্ডনে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়, তাতে দু'জন মার্কিন

বিজ্ঞানী ঐ নিয়মগুলি শিথিল করবার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা তখন ক্ষুব্ধ হয়ে পাল্টা জবাবে জানান, তাঁরাও তাহলে নিয়মগুলি সম্পূর্ণ মানবেন না। শেষ পর্যন্ত তখনকার মত মিটমাট হয়ে যায় এবং যতদূর জানা যায়, এখনো পর্যন্ত নিয়মগুলি পালিত হচ্ছে। কিন্তু মহাকাশ অভিযানের প্রতিযোগিতা যদি তীব্র হয়ে ওঠে, তাহলে রাষ্ট্রীয় নেতাদের চাপে বিজ্ঞানীরা হয়তো প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করবেন না, এরকম একটা সম্ভাবনা রয়ে গেছে।

মহাকাশ অভিযানের যে সব ব্যবহারিক প্রয়োগের কথা তুমি লিখেছ, তাতে মানুষের উপকার হবে ঠিকই, তবে সেই মানুষ বলতে প্রধানতঃ আমেরিকা বা রাশিয়ার অধিবাসীদেরই বোঝাবে। কারণ ২।১টি দেশের হাতে যদি কোন বিশেষ ক্ষমতা থাকে, তবে বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই ক্ষমতা মূলতঃ কেবল ঐ দেশগুলির উপকারের জন্যে (এবং সম্ভবতঃ তাদের শত্রুদের অপকারের জন্যে) ব্যবহৃত হবে। এই জন্যে আমেরিকার সঙ্গে আপাতঃ বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও পশ্চিম ইওরোপের রাষ্ট্রগুলি পরস্পর মিলিত হয়ে ELDO (European Launcher Development Organisation), ESRO (European Space Research Organisation) প্রভৃতি সংস্থার মাধ্যমে নিজেরাই মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তুমি যে রেডিও ও টেলিভিসন সংযোগের কথা লিখেছ, আগামী বছর দশেকের মধ্যে তা রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব বিস্তারে এবং বড় বড় ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপন প্রচারের হাতিয়ার হিসাবেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। গত বছর বৃটেনের খ্যাতনামা সাংবাদিক নেভিল ব্রাউন পশ্চিম ইওরোপবাসীদের পক্ষ নিয়ে লিখেছেন—'আমরা যদি মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণা একেবারে ত্যাগ করি, তাহলে এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পশ্চিম ইওরোপ, তথা সারা বিশ্বকে রাশিয়া ও আমেরিকার নিছক দয়ার উপর ছেড়ে দেওয়া হবে।' তা সত্ত্বেও বৃটেন হয়তো অদূর ভবিষ্যতে মহাকাশ সংক্রান্ত পশ্চিম ইওরোপের সংস্থাগুলি থেকে বেরিয়ে আসবে—কেন না, এতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তা তার পক্ষে বহন করা দুঃসাধ্য বলে নাকি বোধ হচ্ছে। তাই যদি হয়, তাহলে ভারতবর্ষের মত অনগ্রসর দেশে মহাকাশ-বিজ্ঞানের নামে একটি-দুটি প্রতিষ্ঠান খুলে রাখা বা টুকিটাকি কাজ করা ছাড়া সত্যিকারের কার্যকর কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা কি বর্তমানে সম্ভব? তাহলে আমরা এই মন্তব্য বোধহয় করতে পারি যে, মহাকাশ-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে অনগ্রসর দেশগুলিকে অগ্রসর দেশগুলির প্রভাব ও প্রতিপত্তির নিকট আরও বেশী নতিশীল করে ফেলবে।

আমার কথাগুলি পড়তে হয়তো কিছুটা খারাপ লাগছে, কিন্তু ভাবোচ্ছ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গীতে বা অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভাষায় 'হুজুগের' দৃষ্টিভঙ্গীতে মহাকাশ-বিজ্ঞানকে বিচার না করে স্থির মস্তিষ্কে বিচার করলে বোঝা যাবে—একজন প্রকৃত বিজ্ঞানী যেমন কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সময় প্রয়োজনীয় সাবধানতা সম্বন্ধে সচেতন থাকেন, সেই রকম মহাকাশ-বিজ্ঞান চর্চার সময়ও আমাদের সম্ভাব্য বিপদগুলি সম্বন্ধে সচেতন থাকা একান্ত দরকার।

পরিশেষে এটা বলি যে, মহাকাশ অভিযানের যে অন্ধকার দিক, তার জন্যে বিজ্ঞান ঠিক দায়ী নয়, দায়ী হচ্ছে বিজ্ঞান ও মানুষের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান—

প্রথমটি চলেছে দ্রুতগতিতে এগিয়ে, দ্বিতীয়টি বলতে গেলে একটা 'অচলায়তন'। এই ফাঁক যদি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে, তবে একদিন হয়তো মহাকাশ-বিজ্ঞানসমেত সমগ্র মনুষ্য সমাজ পারমাণবিক যুদ্ধের কল্যাণে সেই ফাঁকের মধ্যে পড়ে একেবারে বিলীন হয়ে যাবে। ইতি—

কলকাতা তোমার
১৪।৭।৬৯ বাতায়নদা

মহাকাশ অভিযান ও পৃথিবীর চাঁদ

শঙ্কর চক্রবর্তী

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে যে মহাজাগতিক যুগের সূচনা হয়েছিল পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে, কিছুদিন আগে তারই এক অতি রোমাঞ্চকর ঘটনাকে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ প্রত্যক্ষ করলেন। গত ১৬ই জুলাই অ্যাপোলো-১১ মহাকাশযান তিনজন আমেরিকান যাত্রীকে নিয়ে পৃথিবী থেকে চাঁদের দিকে রওনা হলো এবং ২০শে জুলাই ভারতীয় সময় মধ্যরাত্রি নাগাদ অ্যাপোলোর সঙ্গে সংলগ্ন আর একটি ক্ষুদে মহাকাশযান 'লুনার মডিউল' দুজন যাত্রীকে নিয়ে চাঁদের জমিতে গিয়ে নামলো। তারপর ২১শে জুলাই ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ঐ দুজন যাত্রী মহাকাশ পোষাকে সজ্জিত হয়ে চাঁদের জমির ওপর এসে দাঁড়ালেন।

মানুষের বহুযুগের স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপলাভ করেছে। অ্যাপোলো মহাকাশ-অভিযানের আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। যে চাঁদের দেশ ছিল এই অভিযানের লক্ষ্যস্থল, গত কয়েক বছরের মহাকাশ অভিযানের মাধ্যমে সেই চাঁদ সম্বন্ধে যে সব বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, বর্তমান প্রবন্ধে আমরা তাই নিয়ে আলোচনা করবো। এই সব তথ্য হাতে না পেলে বিজ্ঞানীরা মানুষকে চাঁদে নামাবার কোন পরিকল্পনার কথা ভাবতেই পারতেন না।

চন্দ্র-গবেষণার প্রথম পর্ব

পৃথিবীর চাঁদকে নিয়ে আমাদের কৌতুহলের অন্ত নেই। মহাকাশে চাঁদ আমাদের সবচেয়ে কাছাকাছি বস্তু হওয়ার জন্যে আলোক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে চাঁদকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগটা সব সময়েই রয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাঞ্চল্য ও আলোড়ন আলোক দূরবীক্ষণের সাহায্যে চাঁদকে দেখার পথে এক বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়াবার ফলে চন্দ্র-গবেষণার পরিধি সীমাবদ্ধ হয়ে ছিল। চাঁদের জমির ওপর সবচেয়ে ছোট যে বস্তুর গঠন পৃথিবীর আলোক দূরবীক্ষণের আয়ত্তের মধ্যে ধরা দিচ্ছিলো, তা আকারে আধ কিলোমিটারের চেয়ে বড় নয়। বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে চাঁদের জমির গঠন-প্রকৃতি পরীক্ষার কাজ অবশ্য কয়েক বছর ধরে সুরু হয়েছে।

চন্দ্র-গবেষণার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের কাছে দুটি পথ খোলা ছিল—একটি হলো, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে কোন কক্ষপথে আলোক দূরবীক্ষণ সমন্বিত কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়ে চাঁদের জমির খুঁটিনাটি গঠনকে পর্যবেক্ষণ করা; অপরটি হলো, চাঁদের জমির খুব কাছে স্বয়ংক্রিয় মহাজাগতিক ষ্টেশনকে পাঠিয়ে আরও সূক্ষ্মভাবে চন্দ্র-গবেষণার কাজকে পরিচালিত করা। বিজ্ঞানীরা দ্বিতীয় পথটিকেই বেছে নিলেন।

পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলকে কাটিয়ে চাঁদের দেশে মহাকাশযান পাঠাবার প্রচেষ্টা ১৯৫৮ সাল থেকেই সুরু হয়েছে। ঐ বছর যথাক্রমে ১১ই অক্টোবর ও ৬ই ডিসেম্বর আমেরিকান বিজ্ঞানীরা চাঁদের দিকে পায়োনিয়ার-১ ও পায়োনিয়ার-৩ নামে দুটি মহাকাশযান ছুঁড়লেন, কিন্তু ওরা পৃথিবী থেকে মাত্র ১,২০,০০০ ও ১০,১১২৮ কিলোমিটার পর্যন্ত পাড়ি জমাতে পেরেছিল।

চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছাবার প্রথম কৃতিত্ব অর্জন করলেন সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা। তাঁরা ১৯৫৯ সালের ২রা জানুয়ারী তারিখে পৃথিবী থেকে লুনা-১ নামে একটি মহাজাগতিক রকেটকে ছুঁড়লেন, যেটি প্রায় ১০ ঘন্টা বাদে চাঁদের কাছে পৌঁছে, চাঁদের জমির ৫৯৬৫ কিলোমিটার পাশ কাটিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হলো সৌরলোকে এবং মানুষের হাতেগড়া প্রথম কৃত্রিম গ্রহের ভূমিকা নিয়ে সৌরজগতে নিজের আসনকে প্রতিষ্ঠিত করে বসলো।

চাঁদের জমিতে পৃথিবীর বস্তুজগতের প্রথম প্রতিনিধিরূপে এরপরে আছড়ে পড়লো লুনা-২। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা ১৯৫৯ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে ওকে পাঠিয়েছিলেন। মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে এক নতুন ইতিহাস রচিত হয়েছিল সেদিন। এরপর একই বছরে ৪ঠা অক্টোবর তারিখে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা লুনা-৩ নামে একটি স্বয়ংক্রিয় মহাজাগতিক ষ্টেশনকে এক মস্ত লম্বা উপবৃত্তাকার কক্ষপথে চাঁদের দিকে পাঠালেন। ঐ ষ্টেশনটি চাঁদকে পরিক্রমা করে চাঁদের উল্টোপিঠের ছবি সর্বপ্রথম তুলে নিয়ে এলো এবং মহাকাশে সেই ছবিগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিস্ফুটন করে টেলিমেট্রিক যান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের গবেষণা দপ্তরে সেগুলিকে ফেরৎ পাঠালো। সেখানে টেলিভিশন ব্যবস্থার মাধ্যমে টুক্রা ছবিগুলি পুনর্গঠিত হয়ে গোড়াকার আসল ছবিটি তৈরি হয়ে উঠলো। চাঁদের যে উল্টো পিঠটাকে আমরা কখনো দেখতে পাই না, তার প্রথম ছবি এভাবে উপহার পেল পৃথিবীর মানুষ।

লুনা-৩ চাঁদের উল্টোপিঠের শতকরা ২৮ ভাগ জায়গার ছবি তুলতে পেরেছিলো। ঐ পিঠের শতকরা ১৩ ভাগ জায়গা মহাকাশযানটির দৃষ্টির আড়ালে ছিল। ১৯৬৫ সালের ২০শে জুলাই আর একটি রাশিয়ান মহাকাশযান জোন্দ্-৩ বাকী অংশের প্রায় সবটুকুরই ছবি তুলে নেয়। এরপরেও চাঁদের উল্টোপিঠের যে অতি সামান্য জায়গার ছবি নেবার কাজ বাকী রয়ে গেল, তা ১৯৬৭ সালে আমেরিকান মহাকাশযান অরবিটার-৫ সম্পূর্ণ করে তোলে।

চাঁদের জমিতে আছ্ড়ে পড়া

এরপর চন্দ্র-গবেষণায় এক নতুন অধ্যায় সুরু হলো। ১৯৬২ সালের ২৩শে এপ্রিল থেকে সুরু করে ১৯৬৭ সালের ৭ই নভেম্বরের মধ্যে সবশুদ্ধ দশটি মহাকাশযান চাঁদের জমিতে আছ্ড়ে পড়লো—এর মধ্যে ছটি পাঠিয়েছিলেন আমেরিকার বিজ্ঞানীরা, আর তিনটি সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা। আছ্ড়ে পড়বার পর মহাকাশযানগুলির সর্বাঙ্গ ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়, কিন্তু তার আগে আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতির কলকাঠির স্বয়ংক্রিয়ভাবে নড়াচড়ার মধ্য দিয়ে ওরা চাঁদ সম্বন্ধে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিজ্ঞানীদের হাতে তুলে দিয়ে গেছে। ওরা যেমন একদিকে চাঁদের mass বা ভর সম্বন্ধে আমাদের পুরনো ধারণাকে সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি আছ্ড়ে পড়বার আগের মিনিট পনেরোর মধ্যে চাঁদের জমির কাছে থেকে তোলা টেলিভিসন ছবিগুলির মাধ্যমে চাঁদের গঠন-প্রকৃতির রহস্য সম্বন্ধেও বহু আলোকপাত করতে পেরেছে।

আমেরিকার রেঞ্জার মহাকাশযানগুলি ডপ্‌লার পদ্ধতির মাধ্যমে পৃথিবী ও চাঁদের ভরের যে আনুপাতিক সম্পর্ক নির্ণয় করেছে, তার গড় মূল্যমান হলো ৮১·৩০৩। এই সূক্ষ্মতার মাপ ইতিপূর্বে পৃথিবী থেকে বিভিন্ন জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে এই প্রসঙ্গে যে পরীক্ষালব্ধ ফল পাওয়া গিয়েছিল, তার তুলনায় প্রায় দশগুণ

রেঞ্জার শ্রেণীর মহাকাশযানগুলি চাঁদের জমির ওপর এক মিটার বা তার চেয়েও ছোট আকারের গঠনের ছবি তুলে পাঠাতে পেরেছিল; পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল আলোক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে তোলা ছবির তুলনায় এর সূক্ষ্মতার মাপ ছিল দশ হাজার গুণের চেয়েও বেশী।

খুব কাছে থেকে তোলা চাঁদের এই সব ছবির দৌলতে চাঁদের এক অনাবিষ্কৃত রূপ বিজ্ঞানীদের কাছে ধরা দিল। ইতিপূর্বে চাঁদের সবচেয়ে ছোট যে ক্র্যাটার বা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, তার চেয়েও আকারে বেশ কয়েক গুণ ছোট বহু জ্বালামুখের অস্তিত্ব ধরা পড়লো। ওদের সংখ্যাতত্ত্বের বিচারের মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম এক দ্বিতীয় চরিত্রের জ্বালামুখের সন্ধান পাওয়া গেল, যারা বাইরে থেকে আসা উল্কাজাতীয় মহাজাগতিক বস্তুর সংঘাতে গড়ে ওঠে নি—বরং ঐ সব বস্তুর সংঘাতে চাঁদের জমির বিভিন্ন জায়গা থেকে ছিট্‌কে ওঠা প্রস্তরখণ্ডের সংঘাতেই ওদের সৃষ্টি হয়েছে বলে একদল চান্দ্রবিজ্ঞানী অনুমান করছেন।

চাঁদের জ্বালামুখ ও মেরিয়া

পৃথিবী থেকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চাঁদের দৃশ্য পিঠটার ওপর এপর্যন্ত প্রায় ৩২০০০ জ্বালামুখের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। চাঁদের থালাটা জুড়ে দেখা গিয়েছিল ওরা সবাই বিভিন্ন সরলরেখার আকারে সারিবদ্ধ হয়ে আছে। জ্বালামুখগুলির অবস্থানের মধ্যে এই জাতীয় একটি চমৎকার শৃঙ্খলার সন্ধান পেয়ে ওদের উৎপত্তি সম্বন্ধে চন্দ্র-বিশেষজ্ঞেরা দুটি তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছিলেন। একটি তত্ত্বের বক্তব্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, চাঁদের জীবনের প্রাথমিক অবস্থায় হাজার হাজার উল্কা এসে তার জমির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। উল্কার আঘাতে লক্ষ লক্ষ টন পাথর শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে শূন্যস্থানগুলিতে সৃষ্টি হয়েছিল ঐ জ্বালামুখগুলির।

এই ধারণার জবাবে পাল্টা যে তত্ত্বটি হাজির করা হয়েছে, তার মতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গারই জ্বালামুখগুলির উৎপত্তির কারণ। আজকের ঠাণ্ডা, মৃত আগ্নেয়গিরিগুলি একদিন ছিল জীবন্ত অবস্থায়। তখন মাঝে মাঝেই ওরা ফুঁসে উঠতো এবং বিপুল পরিমাণে অনন্ত পাথর ও লাভার স্রোত ছুঁড়ে মারতো। এমনি ধারার ব্যাপার সুদীর্ঘকাল ধরে চলতে চলতে ঐ জ্বালামুখগুলি ওদের বর্তমান গভীরতা ও বিস্তৃতিকে লাভ করে বসেছে।

চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে 'আইজাক নিউটন' নামে একটি জ্বালামুখ রয়েছে, পাদদেশ থেকে যার উচ্চতা প্রায় ৮৭০০ মিটার (২৯০০০ ফুট)। ঐ একই অঞ্চলে ক্লেভিয়াস নামে যে জ্বালামুখটি রয়েছে, তার পাথরের দেয়ালের ব্যাস হলো প্রায় ২৩৪ কিলোমিটার (১৪৬ মাইল)।

রেঞ্জার মহাকাশযানগুলি চাঁদের কয়েকটি 'মেরিয়া' বা জমাট-বাঁধা লাভার সমুদ্রের ওপর গিয়ে আছ্‌ড়ে পড়েছিল। ওদের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব যদিও ছিল কয়েক-শ' কিলোমিটারের মত, কিন্তু নামবার জায়গাগুলিতে খুব ছোট মাপের বিভিন্ন বস্তুর গঠনের মধ্যে এক আশ্চর্য মিল ধরা পড়েছিল। ফলে একদল চান্দ্রবিজ্ঞানী অনুমান করছেন, চাঁদের বিভিন্ন এলাকার মেরিয়াগুলি হয়তো কোন আকস্মিক ঘটনার ফলে সৃষ্টি না হয়ে এক

সাধারণ ঘটনা থেকেই তৈরি হয়েছে। এই ঘটনার উৎসকে চাঁদের ভিতরে খুঁজে লাভ নেই। তাকে খুঁজতে হবে বাইরে। বিভিন্ন গ্রহের মধ্যবর্তী অঞ্চলে উল্কাজাতীয় বস্তুদের যে ধ্বংসাবশেষ বা ধূলা ছড়িয়ে আছে, তারই কিছু অংশকে ঝেঁটিয়ে সংগ্রহ করে চাঁদ যেন তার সর্বাঙ্গ জুড়ে একই নামাবলীর পোষাক পরে বসে আছে। এই ধারণাটি অবশ্যই বিতর্কমূলক।



১নং চিত্র।

চাঁদের উল্টোপিঠে এক বিশাল আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। জ্বালামুখের খাড়া দেয়াল এবং তলদেশে বিশাল সব প্রস্তরখণ্ড দেখা যাচ্ছে। এই ছবিটি গত মে মাসে অ্যাপোলো-১০ মহাকাশযান যখন চাঁদকে পরিক্রমা করছিল, তখন চন্দ্রযান লুনার মডিউল অ্যাপোলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক উপবৃত্তাকার কক্ষপথে চাঁদের মাত্র ১০ মাইল উপর থেকে এই ছবিটি তুলেছিল।

চাঁদে যাঁরা অক্ষতভাবে নামলো (Soft-landers)

১৯৬৬ সাল থেকে চাঁদে অভিযানের আর এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হলো। ১৯৬৬ ও ১৯৬৭, এই দু-বছরের মধ্যে পর পর সাতটি স্বয়ংক্রিয় মহাজাগতিক ষ্টেশন অক্ষতভাবে চাঁদের জমির বিভিন্ন জায়গায় এসে নামলো; এর মধ্যে দুটি পাঠিয়েছিলেন সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা, পাঁচটি আমেরিকার বিজ্ঞানীরা।



২নং চিত্র।

চাঁদের জমির মাত্র ১০ মাইল ওপর থেকে অ্যাপোলো-১০ মহাকাশযানের তোলা ছবি। বহু ছোট-বড় আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ এবং পাহাড় ছবির মধ্যে চোখে পড়ছে।

চাঁদের জমিতে সর্বপ্রথম অক্ষতভাবে লুনা-৯ নামে একটি বৈজ্ঞানিক ষ্টেশনকে নামাবার কৃতিত্ব অর্জন করলেন সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা, ১৯৬৬ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে। ষ্টেশনটি চাঁদের দৃশ্য পিঠের বাঁ-দিকে চাঁদের বিষুবরেখার ওপরে Oceanus Procellerum বা ঝড়ের সাগর নামে একটি মেরিয়ার ওপর গিয়ে নেমে-ছিল। লুনা-৯ চাঁদের জমিতে ওর নামার জায়গার যে সব ছবি তুলে ফেরৎ পাঠিয়েছিল, সেগুলির বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এই ধারণা পোষণ করলেন যে, ঐ

জমি ব্যাসল্ট শিলার লাভাপ্রবাহ থেকে তৈরি; কালো, অনেকটা স্পঞ্জের মতন ঐ হাল্কা শিলার স্ল্যাগ বা টাকের সঙ্গে অনেকটা মিল রয়েছে।

লুনা-৯ চাঁদে নামবার সময় চাঁদের জমিতে মহাকাশযানটির বসে যাবার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নি। এথেকে বোঝা গেল, চাঁদের জমির গঠন বেশ শক্ত এবং চাঁদের প্রতি বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ জায়গার ৬-১০ পাউণ্ডের মত ভর ধারণ করবার ক্ষমতা রয়েছে। একে অনেকটা ভিজে বালির ধারণ-ক্ষমতার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। একটি লোক যদি এই ধরণের জমির ওপর দিয়ে সাবধানে হাঁটাচলা করে তাহলে সে জমির বসে যাবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু প্রতিটি পদক্ষেপের সময় চাঁদের জমির ওপর এক ইঞ্চি বা তার চেয়েও গভীর পায়ের ছাপ পড়বার সম্ভাবনা রয়েছে। এই বিষয়ে লুনা-৯ এবং পরবর্তী কালে আমেরিকার সার্ভেয়ার শ্রেণীর যে মহাকাশযানগুলি চাঁদের জমিতে নেমেছিল, তাদের পর্যবেক্ষণের ফল একই রকমের হতে দেখা গেছে।

লুনা-৯-এর কাছ থেকে পাওয়া আর একটি বেতার-সঙ্কেতের বিশ্লেষণের ফলে জানা যায়, চাঁদের জমির ওপর বিকিরণের যে তীব্রতা তা প্রধানতঃ মহাজাগতিক রশ্মির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। চাঁদে বায়ুমণ্ডলের আবরণের অভাবে এই রশ্মি ওর প্রাথমিক চরিত্র ও তীব্রতা নিয়ে চাঁদের জমি বরাবর নেমে আসে এবং জমির ওপরের শিলাস্তরের পরমাণুগুলির অভ্যন্তরে পারমাণবিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ঘটায় ও বিকিরণ সৃষ্টি করে।

আমেরিকার বিজ্ঞানীরা সার্ভেয়ার নামে পাঁচটি মহাকাশযানকে চাঁদের জমিতে নামিয়েছিলেন। ওদের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি চাঁদ সম্বন্ধে বহু নতুন খবর যুগিয়েছে। সেই খবরগুলির খানিকটা পরিচয় নেওয়া যেতে পারে।

চাঁদের জরীপ-কাজ

সার্ভেয়ারদের কাছ থেকে লুনা-৯-এর মতই যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খবরটি পাওয়া গিয়েছিল তা হলো এই যে, চাঁদের ওপরটা ধূলায় ভরা নয় বরং ওর গঠনটা পৃথিবীরই মত। মহাকাশযানগুলির পাদানি কখনোই চাঁদের জমির ভিতরে তিন ইঞ্চির বেশী প্রবেশ করে নি। চাঁদের ওপরটা অতি সূক্ষ্ম এক কণিকাস্তরের দ্বারা আবৃত হয়ে আছে, যার আচরণ অনেকটা ভিজা বালির মত। বায়ুহীন চাঁদের জমির ওপর যে উল্কার দল এসে প্রতিনিয়ত সংঘাত সৃষ্টি করছে, ওরাই শিলাস্তূপকে ভেঙে ধূলায় পরিণত করছে, কিন্তু এই ধূলার স্তর গভীরতায় খুবই সামান্য।

১৯৬৭ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখে সার্ভেয়ার-৩ মহাকাশযানটি চাঁদের ওপর সর্বপ্রথম পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করলো। পুরা ৪১ মিনিট ধরে সূর্যের আলো সম্পূর্ণভাবে পৃথিবীর আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। ১০৭ মিনিটব্যাপী চন্দ্রগ্রহণের সমগ্র সময় জুড়ে সার্ভেয়ার-৩-এর আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি তাপমাত্রার ২৪৩ ডিগ্রী ফারেনহাইট থেকে —২৪০ ডিগ্রী ফারেনহাইটের কাছাকাছি (প্রায় ৪০০ ডিগ্রী ফারেনহাইটের মত তফাৎ) নেমে আসবার আশ্চর্য ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করে এবং সংগৃহীত তথ্যকে পৃথিবীতে ফেরৎ পাঠায়। পৃথিবীর চারপাশে এক জ্যোতির্বলয়ের অবস্থিতির ছবিও সার্ভেয়ার-৩-এর ক্যামেরা সর্বপ্রথম পৃথিবীর মানুষকে উপহার দেয়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সূর্যের আলোর Diffraction বা অবচ্যুতির জন্যেই এই জ্যোতির্বলয়ের সৃষ্টি হচ্ছে।

সার্ভেয়ার-৩ চাঁদের মাটি খোঁড়বার বেশ কিছু

লটবহর নিয়ে চাঁদে পাড়ি জমিয়েছিল। যন্ত্রটির চেহারাটি ছিল এই—পাঁচ ফুট লম্বা একটি বাহুর প্রান্তে একটি অ্যালুমিনিয়ামের বন্ধ বসানো, আয়তনে যা মানুষের মুঠোর চেয়ে খানিকটা বড় এবং এর নীচে আবার একটি ইস্পাত এবং রিইনফোর্স্‌ড্-প্লাষ্টিকের দরজা বসানো। চারটি ছোট মোটর এই বাহুটিকে লম্বায় ছোট-বড় করতে পারে, ওপরে নীচে এবং দুপাশে নড়াতে পারে, দরজটাকে খোলা এবং বন্ধের কাজও করতে পারে। এই যন্ত্রটিকে ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাসাডেনা থেকে বেতার-সঙ্কেতের সাহায্যে পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। চাঁদের জমির ওপর এই যন্ত্রটির সাহায্যে তিন ফুট লম্বা এবং নয় ইঞ্চি গভীর গর্ত খোঁড়া হলো। একই সঙ্গে আরো ছোট ছোট গর্ত খুঁড়ে চাঁদের জমির ধারণ ক্ষমতাকে পরীক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।



৩নং চিত্র।

চাঁদের জমির ওপর হাইগিনাস ফাটল—তিন কিলোমিটার চওড়া এবং লম্বায় ২০০ কিলোমিটারেরও বেশী। অ্যাপোলো-১০ মহাকাশযান চাঁদের জমির ১০ মাইল উচ্চতা দিয়ে পরিক্রমার সময় এই ছবিটি তোলে।

চাঁদের জমির চেহারা সম্বন্ধে এভাবে খানিকটা ধারণা সংগ্রহ করে নিয়ে আমেরিকার বিজ্ঞানীরা এর পর সার্ভেয়ার-৫ নামে একটি মহাকাশযানকে চাঁদে পাঠালেন। উদ্দেশ্যটা ছিল, লুনাইটের (চাঁদের ওপরকার বস্তু)

রাসায়নিক গঠনকে পরিমাপ করা। লুনাইট লাভা বা অন্য কোন শিলার দ্বারা তৈরি কিনা—এই ছিল প্রশ্ন।

সার্ভেয়ার-৫ চাঁদে Alpha scatterer নামে একটি যন্ত্র নিয়ে এসেছিল। এর ভিতরে ছিল একটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ এবং একটি ইলেকট্রনিক তেজস্ক্রিয়তা নির্দেশক যন্ত্র। এই যন্ত্রটি কোন বস্তুর ওপর তেজস্ক্রিয় কণিকার স্রোত ছুঁড়ে মারে এবং প্রতিফলিত কণিকাগুলিকে সংগ্রহ করে। যে সব কণিকা প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এলো, তাদের সংখ্যা এবং শক্তির পরিমাপ করে, যে বস্তু থেকে সেগুলি প্রতিফলিত হলো, বিজ্ঞানীরা তার রাসায়নিক গঠন নির্ণয় করতে পারেন।

সার্ভেয়ার-৫-এর Alpha scatterer যন্ত্রটির কলকাঠির নড়াচড়ায় জানা গেল, চাঁদের পৃষ্ঠভাগের শিলা ও মৃত্তিকা রাসায়নিক বিচারে আগ্নেয়শিলা ব্যাসল্টেরই মত। লুনা-৯-এর কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের বক্তব্যও ছিল একই। ব্যাসল্ট হলো পৃথিবীর ভিত্তি-প্রস্তরের মত। পৃথিবীর বেশীর ভাগ সমুদ্রের তলদেশ এই কালো কঠিন শিলাটির দ্বারা তৈরি এবং পৃথিবীর জমির ওপর বহু জায়গায় এর সন্ধান মেলে।

পৃথিবীতে, শিলা গলে গিয়ে এবং তারপর ঘনীভূত হয়ে ব্যাসল্টকে গড়ে তুলেছে। কাজেই চাঁদে এই শিলাটির সন্ধান পাবার পর বহু বিশেষজ্ঞই এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে, চাঁদ তার গঠনপর্বের কোন এক সময়ে নিশ্চয়ই উত্তপ্ত অবস্থায় ছিল।

চাঁদ আরো উজ্জ্বল নয় কেন?

সার্ভেয়ার-৫-এর চাঁদের জমি খোঁড়বার যন্ত্রটি দিয়ে আর একটি পরীক্ষা করা হলো। চাঁদের ওপরকার শিলাকে উল্টে দিয়ে তলার মৃত্তিকার ওপর আঁচড় কাটতেই বিজ্ঞানীরা বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে, মাত্র দুই ইঞ্চি নীচের মৃত্তিকার রং দেখা যাচ্ছে অনেক বেশী কালো! চাঁদ মনে হয়, যেন কাগজের মত পাত্‌লা বার্নিসরূপী এক ধূলার স্তরের দ্বারা আবৃত হয়ে বসে আছে। Solar wind বা সূর্যের বাতাসের সংঘাতেই ঐ ধূলার স্তরের রং কাল্‌চে হয়ে উঠেছে।

সূর্যের বাতাস প্রধানতঃ প্রোটন কণিকার দ্বারা তৈরি। চাঁদের ওপর যখন ঐ কণিকাগুলি এসে আছ্‌ড়ে পড়ে, তখন সেগুলি সাময়িকভাবে মুক্ত ইলেকট্রনদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চাঁদের ওপর neutral বা বৈদ্যুতিক ব্যাপারে নিরপেক্ষ হাইড্রোজেনের পরমাণুদের এক ক্ষণস্থায়ী Exosphereরূপী পরিমণ্ডল তৈরি করে বসে। ঐ পরিমণ্ডলের স্বাভাবিক ঘনত্ব প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে এক-শটি পরমাণুর মত। কিন্তু Solar flare বা সৌরোচ্ছ্বাসের সময় যখন সূর্য থেকে প্রোটন কণিকা-স্রোতের তীব্রতা বেড়ে ওঠে, তখন এই ঘনত্ব স্বল্পকালের জন্যে দশ থেকে এক-শ' গুণ পর্যন্ত বেড়ে উঠতে পারে।

যদিও প্রোটন কণিকা হলো সূর্যের বাতাসের প্রধান উপাদান, ওর সঙ্গে কিছু পরিমাণে ভারী মৌলিক পদার্থের পরমাণুরাও থাকে—যেমন কার্বন। কার্বন পরমাণুর কেন্দ্রকেরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হলে হাইড্রোজেনের মত গ্যাসরূপে গড়ে ওঠে না, বরং যে কঠিন জায়গার উপর ওরা সংঘাত সৃষ্টি করে, তার ওপরেই জমা পড়ে গিয়ে আণবিক কার্বনের একটি পাত্‌লা স্তর (সোজা কথায় ঝুল) গঠন করে ধীরে ধীরে জায়গাটিকে কাল্‌চে করে তোলে। কলকারখানা-প্রধান এলাকায় ঘরবাড়ীগুলি যেভাবে কালক্রমে কাল্‌চে হয়ে ওঠে, এও যেন অনেকটা তাই, তবে চাঁদের ওপর ঘটনাটা ঘট্‌ছে অনেক ধীরগতিতে।

চাঁদের জন্মের পর গত ৪৫০ কোটি বছর ধরে সূর্যের কার্বনরূপী ঝুল ক্রমাগত জমা পড়ে

পড়ে চাঁদের জমির সূর্যের আলো প্রতিফলিত করবার ক্ষমতাই অনেকখানি কমে এসেছে। চাঁদের জমির গড় Albedo বা সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করার ক্ষমতার মাপ পাওয়া যাচ্ছে ·০৭২—অর্থাৎ পৃথিবীর সাধারণ শিলা ব্যাসল্ট, গ্র্যানিটের ক্ষেত্রে ঐ ক্ষমতার তুলনায় প্রায় দুই থেকে তিন গুণ কম। পৃথিবীর ত্বকের ঐ সব শিলার গড় ঘনত্ব হলো প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে ২·৮ গ্র্যাম (সমগ্র পৃথিবীর গড় ঘনত্ব অবশ্য প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে ৫·৫৪ গ্র্যাম)। চাঁদের গড় ঘনত্ব হলো প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে ৩·৩৪ গ্র্যাম, অর্থাৎ পৃথিবীর গ্র্যানিট জাতীয় শিলার তুলনায় বেশী। কাজেই চাঁদের ওপরকার জমিকে আমরা যদি কোনরকম ভাবে পরিষ্কার করে ফেলতে পারি, তাহলে আমাদের চাঁদনী রাতগুলি আজকের তুলনায় দুই থেকে তিন গুণ বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, সন্দেহ নেই।

চাঁদের ক্ষুদে চাঁদ

১৯৬৬ সালের মার্চ মাস থেকে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা চাঁদকে একদল বিচিত্র বস্তু উপহার দিতে সুরু করলেন। চাঁদের চারপাশে খুব কাছাকাছি কক্ষপথে আটটি কৃত্রিম উপগ্রহ বা ক্ষুদে চাঁদকেই তাঁরা বসিয়ে দিলেন—এর মধ্যে তিনটি পাঠিয়েছিলেন সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা, পাঁচটি আমেরিকার বিজ্ঞানীরা।

চাঁদের প্রথম ক্ষুদে চাঁদটি ছিল লুনা-১০—সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা ১৯৬৬ সালের ৩রা এপ্রিল এটিকে চাঁদের কক্ষপথে বসিয়েছিলেন।

চাঁদের জমি থেকে যে গামারশ্মি নির্গত হচ্ছে, লুনা-১০-এর আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি তার পরিমাপ গ্রহণ করে। এর ফলে জানা যায়, চাঁদের ওপরকার শিলাস্তরের তেজস্ক্রিয়তা বা স্বাভাবিক বিকিরণের মাত্রা পৃথিবীর ত্বকের ব্যাসল্ট ও গ্র্যানিট শিলার স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তার খুব কাছাকাছি। চাঁদের বিভিন্ন জায়গার গামা-বিকিরণের ক্ষমতাকে পরিমাপ করে দেখা গেছে যে, চাঁদের স্থলভাগ (ঝলমলে জায়গাগুলি, যারা সূর্যের আলোর শতকরা ১৮ ভাগকে প্রতিফলিত করে থাকে) ও তার মেরিয়া বা জমাট-বাঁধা লাভার সমুদ্রগুলির (চাঁদের কালো জায়গাগুলি, যারা সূর্যের আলোর শতকরা মাত্র সাত ভাগকে প্রতিফলিত করে) ক্ষেত্রে এই পরিমাপের মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ ধরা পড়ছে না।

এই খবরটি বিজ্ঞানীদের কাছে চাঁদের জন্মের প্রসঙ্গটা আর একবার নতুন করে তুলে ধরলো। তাঁরা এখন মোটামুটি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার চেষ্টা করছেন, তা হলো এই যে, পৃথিবী ও চাঁদের জন্ম আজ থেকে পাঁচ-শ' কোটি বছর আগে, হয় একই কারণে (সূর্যের মহাকর্ষ-বলের এলাকার মধ্যে এক শীতল পরিবেশে ধূলা ও গ্যাসের চক্রগুলির ক্রমাগত দানা বাঁধবার মধ্য দিয়ে) ঘটেছে অথবা চাঁদ ছিল একদিন পৃথিবীরই অংশ (প্রশান্ত মহাসাগরের বিরাট গভীর খাতটা থেকে চাঁদের বস্তুপুঞ্জের ছিটকে বেরিয়ে যাবার ধারণাটি)। চাঁদের উৎপত্তি সম্বন্ধে অন্যান্য ধারণা নিয়ে যে তর্কবিতর্কের পালাটা ছিল, তা বোধ হয় এবারে ছোট হয়ে এল।

১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা চাঁদের জমির ওপর লুনা-২ নামে যে মহাকাশযানটি ছুঁড়ে মেরেছিলেন, ওর ম্যাগ্নেটোমিটারে (চৌম্বক ক্ষেত্র মাপবার যন্ত্র) চাঁদের নিজস্ব কোন চৌম্বক ক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া যায় নি। যেটুকু পাওয়া গিয়েছিল, তার পরিমাপ ছিল খুবই সামান্য, মাত্র ·০০০৩ গস্ বা পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের $\frac{1}{400}$ ভাগ। কিন্তু লুনা-১০-এর ম্যাগ্নেটোমিটারে চাঁদের একটি দুর্বল চৌম্বক ক্ষেত্রের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। সূর্য থেকে সূর্যের বাতাসরূপী যে বৈদ্যুতিক কণিকা-স্রোত

ঘণ্টায় প্রায় ১১ লক্ষ থেকে ২১ লক্ষ কিলো-মিটার বেগে ছুটে বেড়াচ্ছে, তাই হয়তো চাঁদের ভিতরে একটি স্বল্পমাত্রার বিদ্যুৎ-প্রবাহ তৈরি করে বসছে। ঐ বিদ্যুৎ-প্রবাহ থেকেই আবার একটি দুর্বল চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হচ্ছে।

পৃথিবীর ম্যাগ্নেটোস্ফিয়ার বা চৌম্বকমণ্ডলের প্রভাবেও চাঁদের চৌম্বক ক্ষেত্রটা তৈরি হতে পারে। অথবা চাঁদ হয়ত সৌরদেহজাত কোন চৌম্বক ক্ষেত্রকে বন্দী করে নিয়েছে বা আন্তর্গ্রহ অঞ্চলের কোন চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারাই চাঁদ তার চুম্বকত্বকে অর্জন করে বসে আছে।

লুনা-১০-এর যন্ত্রে চাঁদের বায়ুমণ্ডলের যে ঘনত্ব ধরা পড়েছে, তা পৃথিবীর জমির ওপর বায়ু-মণ্ডলের যে ঘনত্ব, তার এক লক্ষ কোটি ভাগের একভাগ মাত্র। লুনা-১০ চাঁদের কক্ষপথে স্বল্পশক্তিসম্পন্ন একটি আয়ন কণিকা স্রোতের সন্ধান পেয়েছে। চাঁদের প্রান্ত ছুঁয়ে লুনা-১০ থেকে পাঠানো বেতার-সঙ্কেত পৃথিবীতে আসার সময় সামান্ত Diffraction বা অবচ্যুতির ঘটনার মধ্য দিয়ে চাঁদের ওপর এক অতিতনু আয়নমণ্ডলের অস্তিত্ব ধরা পড়েছিল।

লুনা-১০ চাঁদ থেকে যে তাপ-তরঙ্গের সন্ধান পায়, তার সবচেয়ে বেশী তীব্রতা অনুভূত হয়েছিল বর্ণালীর অবলোহিত অঞ্চলের শেষপ্রান্তে এবং এই তরঙ্গের মাপ ছিল ৭-২০ মাইক্রনের (এক মাইক্রন $=\frac{১}{১০০০}$ মিলিমিটার $=১০^{-৬}$ মিটার) মত।

লুনা-১০ চাঁদের জমি থেকে রঞ্জেন রশ্মির বিকিরণের পরিমাপ গ্রহণ করে। এই পরিমাপ চাঁদের শিলার মধ্যে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরিমাণ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে বেতার-তরঙ্গের গবেষণার মাধ্যমে ইতিপূর্বে যা জানা গিয়েছিল, সে বিষয়ে সঠিক ধারণা গ্রহণ করতে বিজ্ঞানীদের সাহায্য করেছে। ইতিপূর্বে বেতার-তরঙ্গের গবেষণায় জানা যায়, লুনাইটের মধ্যে সিলিকন অক্সাইড রয়েছে শতকরা ৬০ থেকে ৬৫ ভাগ, অ্যালুমিনিয়াম ডাইঅক্সাইড রয়েছে শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ এবং পটাসিয়াম, সোডিয়াম, আয়রন ও ম্যাগ্নেসিয়াম অক্সাইড শতকরা ২০ ভাগ পরিমাণে রয়েছে। চাঁদের রাসায়নিক গঠন-প্রকৃতির অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে তার সৃষ্টি ও বিবর্তন সম্বন্ধে বহু রহস্যের সমাধান করা সম্ভব হবে।

চাঁদে মানুষের অভিযানের সময় উল্কার সঙ্গে সংঘাত কখনো কখনো এক বিরাট বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। চাঁদের কাছাকাছি অঞ্চলে উল্কাকণাগুলির পরিমাণ সম্বন্ধে লুনা-১০ বেশ কিছু তথ্য পাঠায়। ১৯৬৬ সালের ৩রা এপ্রিল থেকে ১২ই এপ্রিলের মধ্যে কোন একদিন ৫ ঘণ্টা ১৬ মিনিট সময়ের মধ্যে লুনা-১০-এর সঙ্গে উল্কাকণাগুলির ৫৩টি সংঘাত ঘটে। আন্তর্গ্রহ অঞ্চলে গড়পড়তা প্রতি সেকেণ্ডে প্রতি বর্গমিটার ক্ষেত্রে উল্কাকণার সঙ্গে সংঘাতের তুলনায় এই সংখ্যাটি প্রায় ১০০ গুণ বেশী।

চাঁদের কাছাকাছি অঞ্চলে বস্তুর ঘনত্বের এই বৃদ্ধিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, চাঁদ নিজেই হলো বেশ কিছু কণিকার উৎস। উল্কার দল যখন চাঁদের জমির ওপর এসে আছ্ড়ে পড়ে, তখন বিস্ফোরণের ফলে বেশ কিছু পরিমাণ শিলা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গিয়ে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়। এদের মধ্যে কিছু চাঁদের জমিতে ফিরে আসে, কিছু অতিরিক্ত বেগের প্রভাবে চাঁদের অভিকর্ষ বলকে কাটিয়ে আন্তর্গ্রহ অঞ্চলে বেরিয়ে চলে যায়, আবার কিছু পৃথিবী ও চাঁদের অভিকর্ষ-বলের সম্মিলিত প্রভাবে চাঁদের চারপাশে বেশ কিছুদিনের জন্যে আবর্তিত হতে পারে। লুনা-১০ যে উল্কাকণাগুলির সংযোগে এসেছিল, তাদের মধ্যে এই জাতীয় কণিকা হয়তো বেশ কিছু পরিমাণে ছিল।

আমেরিকার বিজ্ঞানীরা চাঁদের চারপাশে যে কৃত্রিম উপগ্রহদের বসিয়েছিলেন, সেগুলির মধ্যে দুটি—অরবিটার-চার ও অরবিটার-পাঁচ, পালা করে চাঁদের দৃশ্য ও অদৃশ্য পিঠের সমগ্র অঞ্চলের ছবি তুলে নেয়। সোভিয়েট মহাকাশ-যান লুনা-৩ ও জোন্দ্-৩ ইতিপূর্বে চাঁদের প্রায় সমগ্র উল্টো পিঠের ছবি তুলে এনেছিল। চাঁদের জমির ওপর ৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের কোন বস্তুকে এ সব ছবির দৌলতে আলাদা করে চেনা সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আলোক দূরবীক্ষণ যন্ত্র, পর্যবেক্ষণের সবচেয়ে ভাল অবস্থার মধ্যেও চাঁদের যে সব ছবি তুলতে পেরেছে, সে তুলনায় আগের তোলা ছবিগুলির Resolution বা বিশ্লেষণের ক্ষমতা প্রায় দশগুণ বেশী।

আমাদের পৃথিবীর ভূভাগের তুলনায় চাঁদের ভূভাগ সম্বন্ধে আলোকচিত্রের তথ্য এখন বিজ্ঞানীদের হাতে অনেক বেশী সম্পূর্ণ পরিমাণে রয়েছে। এই বিপুল তথ্যের বিশ্লেষণের কাজ সম্পূর্ণ করতে অবশ্য বহু বছর সময় লেগে যাবে। সমস্যার জটিলতা আমাদের কাছে আরো পরিষ্কার হয়ে ওঠে যখন দেখা যায় যে, অতি ক্ষুদ্র থেকে বিরাট বড় মাপের জ্বালামুখের সন্ধানই পাওয়া গেছে প্রায় দু-কোটির মত।

চাঁদের এক রহস্য

লুনা-৩, ১৯৫৯ সালে চাঁদের উল্টো পিঠের যে ছবি তুলে পাঠিয়েছিল, সেই ছবিগুলির সঙ্গে চাঁদের দৃশ্য পিঠের অনেক বিষয়ে তফাৎ ধরা পড়ে। চাঁদের অদৃশ্য পিঠে মেরিয়ার সংখ্যা কম এবং অন্য পিঠের তুলনায় সেগুলি আয়তনেও অনেক ছোট। পর্বতমালার সংখ্যাই সেখানে বেশী। জ্বালামুখগুলি আকারে কেউ খুব বড় নয়। সবচেয়ে বড়টির ব্যাস ৬৫ কিলোমিটারের মত। চাঁদের দুই পিঠের গঠন-প্রকৃতির মধ্যে এই পার্থক্যের সন্ধান পাবার পর বিজ্ঞানীরা বড় চিন্তায় পড়েছেন।

অরবিটার-৫ চাঁদের উল্টো পিঠের ছবি তোলবার সময় সেখানে বিচিত্র গঠনের গর্তের সন্ধান পায়। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা সেগুলির নাম দিয়েছিলেন Thallasoids—সেগুলি হলো চাঁদের জমির ওপর বড় আকারের অগভীর সব গর্ত। চাঁদের দৃশ্য পিঠের Mare Crisium বা Mare Serenitatis-এর মত ছোট আকারের মেয়ারের সঙ্গে ওদের চেহারার মাপে তুলনা চলতে পারে, কিন্তু মেয়ারগুলির মেঝে জুড়ে যে কালো বস্তুর ছড়াছড়ি, তা ওদের নেই।

এই নতুন আবিষ্কারের ফলে চাঁদের ধূলার তত্ত্বের (Lunar dust hypothesis) প্রবক্তারা খুবই বেকায়দায় পড়েছেন। এই তত্ত্বের মোদ্দা কথাটা হলো এই যে, চাঁদের স্থলভাগ বয়সের বিচারে মেরিয়ার তুলনায় প্রাচীন। অথচ ওদের সূর্যের আলো প্রতিফলনের ক্ষমতা বেশী। তার কারণ, ওরা বিকিরণের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কম। উল্কার সংঘাতে বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় ওরা ক্রমাগত ক্ষয় পাচ্ছে এবং এর ফলে ওদের চেহারাটা সব সময়েই নতুন দেখায়। এখন এই ক্ষয়ে-যাওয়া বস্তু সব সময়েই নাকি ধূলার আকারে চাঁদের মেরিয়ারূপী আধারগুলিতে গিয়ে জমা হয়ে ওদের চেহারাগুলিকে কালচে করে তুলছে।

চাঁদের জমির ওপর যদিও নানা ধরণের ক্ষয়ের কাজ (ভূকম্প ও তাপ প্রভৃতি জনিত) চালু রয়েছে, কিন্তু এমন কোন প্রক্রিয়ার কথা ভাবা যায় না, যার ফলে চাঁদের জমি মিহি ধূলায় পরিণত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। যদিও দিনের বেলায় চাঁদের ধূলিকণার পরস্পরের মধ্যে সংযোগ শিথিল হয়ে পড়ে, কিন্তু রাত্রিবেলায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডার প্রভাবে সেই ধূলিকণা বায়ুহীন চাঁদের

ওপর প্রায় vacuum welding-এর মত চাঁদের জমির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আটকে থাকবে।

চাঁদের জমির ওপর দিয়ে রাশি রাশি ধূলা ছড়িয়ে গিয়ে কালক্রমে যদি মেরিয়াগুলির তলদেশ ভরে তুলে থাকে, তাহলে চাঁদের বহু ছোট ছোট জ্বালামুখ, বিরাট ফাটলগুলি এবং চাঁদের উল্টো পিঠে থ্যালেসয়েডরূপী বড় অগভীর জায়গাগুলিতেই বা ধূলার দল গিয়ে হাজির হলো না কেন?

চাঁদের জমিতে ধূলার পরিমাণ পরীক্ষা করবার জন্যে মহাকাশযান সার্ভেয়ার-এক চাঁদে নামবার পর তাথেকে গ্যাসের একটি জোরালো স্রোতকে চাঁদের জমির ওপর ফেলা হয়, কিন্তু সার্ভেয়ারের টেলিভিশন ক্যামেরায় ধূলার কোন আলোড়নই নজরে পড়ে নি। ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে সার্ভেয়ার-৩ বিশেষ ব্যবস্থায় চাঁদের জমির বেশ খানিকটা অংশ তুলে নিয়ে তার একটি পাদানির ওপর তাকে ছড়িয়ে দেয়, কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেল, ঐ বস্তু আদৌ কোন ধূলা নয়—বায়ুহীনতার জন্যে দৃঢ়সম্বদ্ধ অবস্থায় থাকা গ্র্যাভেলরূপী বস্তু মাত্র।

'চাঁদের ধূলার তত্ত্বের' প্রবক্তাদের উৎসাহে এবারে খানিকটা ভাটা পড়তে পারে।

চাঁদের জমি

বিভিন্ন শ্রেণীর মহাকাশযানের চন্দ্র-গবেষণার মাধ্যমে এবং সম্প্রতিক কালের অ্যাপোলো-আট ও অ্যাপোলো-দশের চন্দ্র-পরিক্রমার ফলে চাঁদের জমির চেহারা সম্বন্ধে মোটামুটি যে ধারণাটা আমরা পাচ্ছি, তা হলো এই যে, চাঁদের জমির গঠন অত্যন্ত অমসৃণ, বন্ধুর, এবড়ো-খেবড়ো ও ভাঙ্গাচোড়া। চতুর্দিকে ছড়ানো রয়েছে ছোট-বড় পাথরের স্তূপ। চাঁদের মেরিয়া, চাঁদের জ্বালামুখ—সর্বত্রই চাঁদের জমির চেহারা একই রকম—এদের তলদেশ জুড়ে বিরাট লম্বা গভীর সব ফাটল চোখে পড়ে।

চাঁদকে পরিক্রমার সময় দুই অ্যাপোলোর যাত্রীরা বারে বারেই জানিয়েছেন—পৃথিবীর রূপ, রসহীন, প্রায় মরুময় চাঁদের মানুষের মনকে আকর্ষণ করবার কোন উপকরণই নেই। মানুষ কোন দিনই এখানে বাস করতে চাইবে না। পৃথিবী থেকে যে চাঁদকে দেখে আমরা মুগ্ধ হই, সে চাঁদের এই বর্ণনায় মানুষের মন খুশী হতে পারে না।

চাঁদের একটি দিনের পরিমাণ পৃথিবীর ১৪টি দিনের সমান এবং একটি রাতের পরিমাণ ১৪টি রাতের সমান। দিনের বেলায় সূর্য যখন মাথার ওপর এসে দাঁড়ায়, তখন তাপমাত্রা চড়তে চড়তে ২৫০ ডিগ্রী ফারেনহাইটের কোঠায় পৌঁছে যায়। আবার সূর্য ডোবার পর তাপমাত্রা কমতে কমতে সূর্যোদয়ের আগে -৩৮০ ডিগ্রী ফারেনহাইটে নেমে আসে।

দিন ও রাতের তাপমাত্রার মধ্যে প্রায় ৬৩০ ডিগ্রী ফারেনহাইটের এই যে বিরাট তফাৎ, তা চাঁদে অক্ষতভাবে নামবার পর বিভিন্ন মহাকাশযানের যান্ত্রিক পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছিল। চাঁদের জমি থেকে অবলোহিতরূপী যে তাপীয় বিকিরণ বিভিন্ন সময়ে নির্গত হয়ে থাকে, ইতিপূর্বে পৃথিবী থেকে তার তীব্রতার পরিমাপ করে তাপের ঐ তারতম্য সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করা সম্ভব হচ্ছিল।

চাঁদের দিন ও রাতের তাপমাত্রার মধ্যে এই বিরাট তারতম্য থেকে এটাই বোঝা যায় যে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সমগ্র সময়ের মধ্যে চাঁদের ওপরকার তাপ-তরঙ্গ তার জমির খুব ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। পরীক্ষায় দেখা গেছে, চাঁদে এক সেন্টিমিটারের চেয়ে ক্রমশঃ বড় মাপের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তাপ-তরঙ্গ জমির পৃষ্ঠভাগের নীচেকার স্তর থেকে জন্মায়। ঐ তাপ-তরঙ্গের

তীব্রতার পরিমাপের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, চাঁদের জমির ওপর তাপমাত্রার এই যে বিরাট পার্থক্য, তা জমির মাত্র এক ফুট নীচেই আর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সেখানে তাপমাত্রা সব সময়ের জন্যে -৯৫ ডিগ্রী ফারেন-হাইটে বজায় রয়েছে।

সোভিয়েট মহাকাশযান লুনা-১৩ চাঁদের জমিতে অবতরণের পর তার অভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি চাঁদের জমির নীচের বিভিন্ন স্তরের যে তাপ-মাত্রার তথ্য সংগ্রহ করেছে, তাথেকেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, চাঁদের জমির বাইরেকার স্তরের তাপ পরিবহনের ক্ষমতা খুবই সামান্য—পৃথিবীর যে কোন কঠিন বস্তুর তুলনায় এই ক্ষমতার পরিমাণটা খুবই কম।

চাঁদের নতুন খবর

অ্যাপোলো-আট মহাকাশযানের চাঁদের চারপাশে পরিক্রমার পথের সূক্ষ্ম পরিমাপের মাধ্যমে চাঁদের এক নতুন চেহারা ধরা পড়েছে। চাঁদ হলো কমলালেবুর মত গোল এবং তার মেরু প্রদেশটা খানিকটা চাপা—চাঁদের এই পুরনো চেহারার জায়গায় চাঁদকে একটি পিয়ার ফলের আকৃতিবিশিষ্ট বস্তু বলে নাকি আমাদের এখন থেকে গ্রহণ করতে হবে। পৃথিবীর চারপাশে পরিক্রমারত আমেরিকার একটি কৃত্রিম উপগ্রহের ঘোরবার ধরণ-ধারণকে পরীক্ষা করে বেশ কয়েক বছর আগে পৃথিবীরও একটি পিয়ার ফলের মত চেহারার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল।

পিয়ার ফলের মত চেহারা থেকে বুঝতে হবে, পৃথিবীরই মত চাঁদের উত্তর মেরু অঞ্চলে খানিকটা জায়গা যেন আঁবের মত ঠেলে বেরিয়ে আছে এবং দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে সমপরিমাণ খানিকটা জায়গা যেন ঠেলে ভিতরে বসানো রয়েছে। চাঁদের এই চেহারার ফলে, তার অভিকর্ষ-বলের পূর্বনির্ধারিত মাপের যে হিসেব আমাদের কাছে রয়েছে, তার মধ্যেও বিচ্যুতি ঘটতে দেখা গেছে।

অ্যাপোলো-আট মহাকাশযানের পর্যবেক্ষণে চাঁদের জমির তলায় Mascons নামে ঘনবস্তুর দৃঢ়-কঠিন সমাবেশের অনেক অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। ম্যাসকন হলো লোহা অথবা অন্য কোন চৌম্বক বস্তুর সমাবেশ। চাঁদের শৈশব অবস্থায় যে বিরাট ধূমকেতুর দল চাঁদের জমির ওপর এসে আছড়ে পড়েছিল, ম্যাসকন তার গলিত রূপ থেকেও তৈরি হয়ে থাকতে পারে অথবা স্বাভাবিক কোন আকর হিসেবেও এদের ধরা যায়। একটি বিশেষ ম্যাসকন প্রস্থে আট কিলোমিটার এবং ব্যাসের মাপে ৪৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।

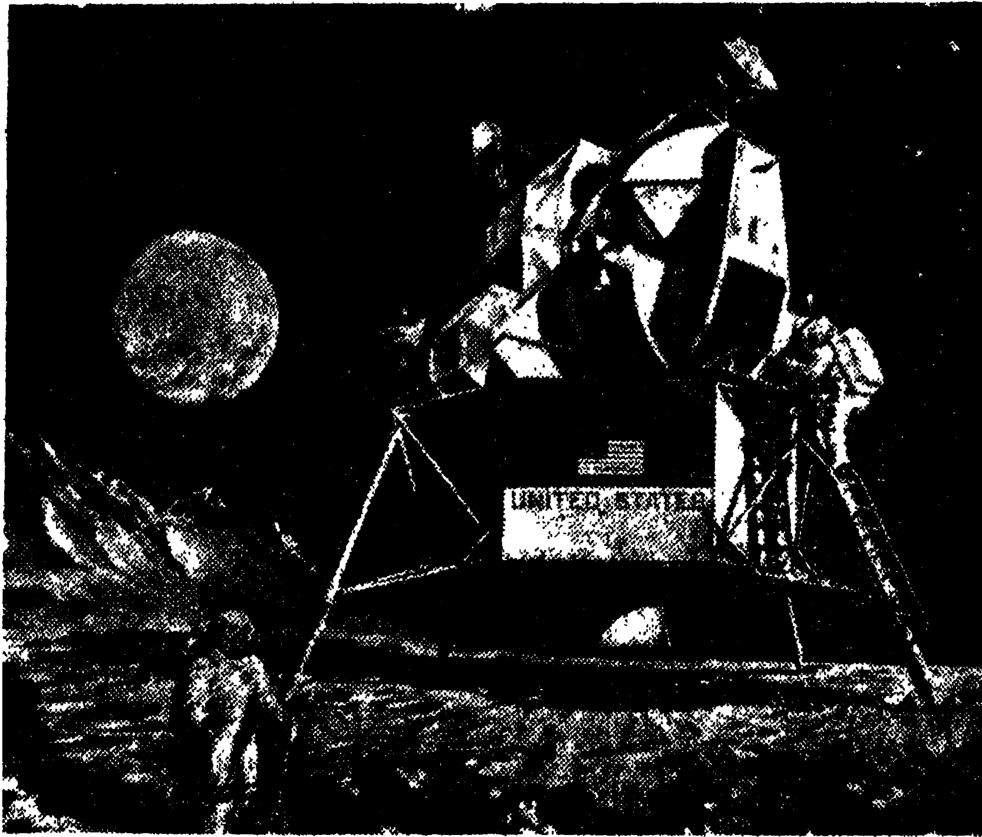
চাঁদের পিয়ারের মত আকৃতি এবং তার জমির তলায় ম্যাসকনের অবস্থিতি অ্যাপোলো-আট মহাকাশযানের চন্দ্র-পরিক্রমা পথের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, যার ফলে নির্দিষ্ট কক্ষ-পথ থেকে অ্যাপোলোর কখনো কখনো ৪৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিচ্যুতি ঘটতে দেখা গেছে।

চাঁদের ভিতরে কোন জলের সন্ধান বা চাঁদের জমির ওপর বীজাণুর মত কোন প্রাণের অস্তিত্বের খবর এপর্যন্ত কোন মহাকাশযানই সংগ্রহ করতে পারে নি।

অ্যাপোলো-১০ মহাকাশযানের যাত্রীরা চাঁদের জমির ওপর এমন কতকগুলি ক্ষয়ের কাজ দেখেছিলেন, যেগুলি জলের প্রবাহের দ্বারাই ঘটেছে বলে মনে হয়। চাঁদের জমির ওপর কোন জলের অস্তিত্বের প্রশ্নই ওঠে না। চাঁদের দুর্বল অভিকর্ষ-বলের জন্যে এবং কোন বায়ু-না থাকার ফলে সেই জল বহু কোটি বছর আগেই বাষ্পীভূত হয়ে মিলিয়ে গেছে। কিন্তু চাঁদের জমির তলায় বরফের আকারে জলের অবস্থিতির সমস্ত সম্ভাবনাকে একেবারে বাতিল করা যায় না।

চাঁদে প্রথম মানুষ

অ্যাপোলো-১১ মহাকাশযানের যে দু-জন যাত্রী চাঁদের জমির ওপর নেমেছিলেন, তাঁদের বর্ণনা থেকে চাঁদের জমির যে চেহারার সন্ধান আমরা পেয়েছি, তা আমাদের কাছে খুব অপরিচিত নয়। তাঁরা যে জায়গাটায় নেমেছিলেন, সেটা মোটামুটি সমতল হলেও আশেপাশে তাঁরা অজস্র আলামুখ দেখতে পেয়েছেন—এদের



৪নং চিত্র।

শিল্পীর কল্পনায় চাঁদের জমিতে অবতরণের পর চন্দ্রযান লুনার মডিউল এবং মহাকাশযাত্রীরা। প্রশান্তি সাগর নামে একটি জমাট-বাঁধা লাভার সমুদ্রের উপর চন্দ্রযানটি নেমেছে। নিকষ কালো মহাকাশের পটভূমিতে বিরাট পৃথিবীকে দেখা যাচ্ছে।

ব্যাস এক ফুট থেকে ৫০ ফুটের মত। আগে যা মনে হয়েছিল, চাঁদের জমির চেহারাটা তার চেয়েও অনেক বেশী ভাঙাচোরা ও গর্তে পূর্ণ।

চাঁদের জমির ওপর সাবধানে পা ফেলে হাঁটবার সময় মহাকাশযাত্রীদের মনে হচ্ছিলো, কালো গুঁড়ার মত কি যেন তাদের জুতার সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। কোন ধুলার স্তরের সন্ধান তাঁরা পান নি, কিন্তু তাঁদের পা জমিতে ঠিক মত খানিকটা বসে যাচ্ছিলো।

অ্যাপোলো-১১-এর যাত্রীরা চাঁদের জমির ১০ পাউণ্ডের মত বস্তু পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন। ঐ বস্তুর মধ্যে চাঁদের জন্ম ও বিবর্তনের কিছু ইতিহাস হয়তো লুকিয়ে আছে। চাঁদের কিছু মৃত্তিকাকে অনেকটা ভিজা ভিজা মনে হয়েছে।

এর ফলে চাঁদের জমির তলায় বরফের আকারে জলের অস্তিত্বের প্রশ্নটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

এছাড়া চাঁদে আরও কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কাজ মহাকাশযাত্রীরা করেছেন।

চাঁদ একেবারে মরা জগৎ, সেখানে প্রাণের কোন অস্তিত্বই নেই—একথা জোর গলায় কেউই বলতে পারেন না। পৃথিবী থেকে এপর্যন্ত যে কয়টি মহাকাশযানকে চাঁদে পাঠানো হয়েছে, তাদের বীজাণুমুক্ত করে পাঠানো হয়েছিল। কারণ, ওরা যদি পৃথিবীর কিছু বীজাণুকে চাঁদে নিয়ে হাজির করতো, তাহলে ওরা চাঁদের বীজাণুদের ক্ষেত্রে কি বিপর্যয়ের সৃষ্টি করতো, তা আগে থেকে বলা সম্ভব ছিল না। ঠিক তেমনিভাবে অ্যাপোলো-১১ মহাকাশযানের যাত্রীরা চাঁদের জমিতে নেমে সেখান থেকে ফিরে আসবার সময় চাঁদের কিছু বীজাণুকে যাতে পৃথিবীর পরিবেশে ছড়িয়ে না দেন, তার জন্যেও তাঁরা ফিরে আসবার পর নানা ধরণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

চাঁদে যেহেতু কোন জল নেই, কোন বাতাস নেই, তাই চাঁদে পৃথিবীর মত কোন ক্ষয় নেই। চাঁদে ক্ষয় যা হয়, তা ভূকম্পন বা তাপের প্রচণ্ড তারতম্যের ফলেই ঘটে। কাজেই চাঁদে হয়তো বহু জায়গা রয়েছে, যা সেই আদ্যিকালের বদ্যি-বুড়োর মত জন্মকাল থেকে একই রূপে অবস্থান করছে। সেই সব জায়গার বস্তু যেদিন মানুষের নাগালের মধ্যে আসবে, সেদিন তার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে মানুষ শুধু তার পৃথিবীর চাঁদ নয়, তার নিজের পৃথিবী ও সৌরজগতের জন্ম ও বিবর্তন সম্বন্ধে বহু রহস্যের কিনারা করতে পারবে। আমরা সবাই সেই দিনের জন্যে সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রয়েছি।

চন্দ্র-অভিযানে মানুষ

রবীন্দ্রকুমার পাল

চাঁদ পৃথিবীর একটি মাত্র উপগ্রহ। চাঁদ হয়তো সুদূর অতীতের কোন এক সময়ে পৃথিবীর বুক ছেড়ে স্বতন্ত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং সে আর পৃথিবীর কাছে না থেকে ছিট্‌কে চলে গিয়েছিল দূর আকাশে দু-লক্ষ উনচল্লিশ হাজার মাইল দূরে, কিন্তু তবুও পৃথিবীর টান কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তারপর থেকে সে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলো। এক শত বছর আগে একজন দূরদ্রষ্টা, জুলে ভার্ণে কল্পনার চোখে চন্দ্র-জয়ের যে বিবরণ দিয়ে গেছেন, বিংশ-শতাব্দীর সপ্তম দশকের শেষ প্রান্তে আজ তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হতে চলেছে। মানুষের কাছে এক সময়ে যা অসম্ভব বলে মনে হতো, অদম্য মনোবল, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি এবং যান্ত্রিক কুশলতা তাকে সম্ভব করে তুলেছে।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—এই দুই দেশের বৈজ্ঞানিক কুশলতায় ধাপে ধাপে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে অতদূরে মহাকাশে অবস্থিত চাঁদে পৌঁছাবার সাফল্যের দ্বারে উপনীত হয়েও বিজ্ঞানীদের মনে দারুণ সংশয় ছিল—রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের ভঙ্গুর দেহ ঐ বিপদসঙ্কুল অবস্থায় সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত পরিবেশে গিয়ে সুস্থদেহে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবে কিনা। অতি দ্রুত উত্তরণ, পৃথিবী এবং

চাঁদের চারদিকে প্রদক্ষিণের সময় ঘূর্ণ্যাবর্তন, অক্সিজেনের অভাব, পৃথিবীর অভিকর্ষহীনতা, অত্যুত্তাপ, রন্‌জেন রশ্মি, কস্‌মিক রশ্মি প্রভৃতির প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করে পৃথিবীর বুকে ফিরে আসা সম্ভব কিনা, তাই ছিল ভাবনার বিষয়।

বিগত দ্বিতীয় বিশ্বমহাসমরের কালে দেখা গেছে যে, অতিদ্রুত তির্যকভাবে উর্ধ্বে বিমানকে চালিয়ে নিয়ে যেতে থাকলে চালকের মাথাটি কেন্দ্রাতিগ ত্বরণের (Centrifugal acceleration) প্রভাবে ঘূর্ণ্যাবর্ত-কেন্দ্রের (Centre of rotation) দিকে ঝুঁকে পড়ে। ফলে জাড্য (Inertia) হেতু রক্তস্রোত দেহের নিম্নাংশের দিকে ধাবিত হয়। হৃৎপিণ্ডে ঐ সময়ে শৈরিক রক্তের প্রবেশ এত কমে যায় যে, মস্তিষ্কের মধ্যে ও অক্ষিপটের ধমনীতে রক্তের চাপ অত্যন্ত হ্রাস পায়। সে জন্যে চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে এবং সংজ্ঞা লোপ পায়। আবার অতি দ্রুত নীচে নেমে আসতে থাকলে উদরের মধ্যস্থিত দেহাংশগুলি বুক ও উদরের মধ্যবর্তী পাঁচিল মধ্যচ্ছদাকে (Diaphragm) টেনে ধরে বলে শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। আবার যখন সহসা তির্যক গতি থেকে ত্বরান্বিত গতি উপরের দিকে পরিবর্তিত হয়, তখন মাথাটি অন্তদিকে ঝুঁকে পড়বার জন্যে বিয়োগাত্মক ত্বরণ (Negative acceleration) জনিত লক্ষণসমূহ দেখা যায়। ফলে গ্রীবাদেশীয় এবং শিরোদেশীয় রক্ত-প্রণালীগুলির মধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণে রক্ত জমে থাকে এবং তারই জন্যে ত্বকের নীচে রক্তপাত (কালশিরে) হতে থাকে, মাথা টনটন করে এবং এমন চোখের কষ্ট হতে থাকে যে, মনে হয় যেন তা কোটর ছেড়ে ছিট্‌কে বেরিয়ে যাবে। এরূপ অবস্থায় উদরের মধ্যস্থিত দেহাংশগুলি মধ্যচ্ছদাকে উপরের দিকে ঠেলে দিতে থাকে বলে হৃৎপিণ্ডে অধিক পরিমাণে শৈরিক রক্ত আসতে থাকে এবং মস্তিষ্কে ও অক্ষিপটে অত্যধিক রক্ত সঞ্চালনের ফলে মাথা ধরে ও যন্ত্রণাবোধ হতে পারে এবং চোখে ঝাপ্‌সা দেখা যায় এবং অক্ষিপটের ধমনীর পাচিল দুর্বল হলে তাতে রক্তপাত হতে পারে। কৃত্রিম উপগ্রহকে বহু উর্ধ্বে উৎক্ষেপণের পর প্রাণিদেহে কোন অনিষ্টকর প্রভাব এরূপে ঘটে কিনা, তাই জানতে ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহে লাইকা নামক কুকুরকে পাঠানো হয়। এক সপ্তাহ পৃথিবীর উপগ্রহ রূপে ঘূর্ণ্যাবর্তনের পর যখন তা আবার মাটিতে নেমে এলো, তাতে দেখা গেল—কৃত্রিম উপগ্রহের অক্সিজেন মিশ্রিত আবহাওয়ায় এত বেগে অতি উর্ধে ওঠা, আবহমণ্ডলের বাইরে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় সাত দিন যাপন, অভিকর্ষহীনতার ফলে দেহে ভারশূন্যতা কিংবা অতি ত্বরণের অবস্থায় নিম্নাবতরণ সত্ত্বেও লাইকার দেহে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নি।

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগ থেকে মার্কিন বিজ্ঞানীরাও মহাকাশ বিজয়ে সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামেন। সোভিয়েট দেশের য়ুরি গ্যাগারিনই প্রথম মানুষ, যিনি অসংখ্য অজ্ঞাত আশঙ্কাকে তুচ্ছ করে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের উপরে উঠে সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে ফিরে আসেন। ভস্তোক প্রভৃতি মহাশূন্যে অভিযানের যানগুলি এমনভাবে নির্মিত হয়, যাতে নভশ্চরদের ক্যাপ্‌সুলের আবরণকে ভেদ করে আবহমণ্ডলের উপরে আয়নমণ্ডল কিংবা তারও উপরে সূর্য থেকে নির্গত হ্রস্ব-তরঙ্গযুক্ত রক্তোত্তর রন্‌জেন, গামা ও কস্‌মিক রশ্মি প্রভৃতি ক্যাপ্‌সুলের মধ্যে প্রবেশ করে নভশ্চরদের দেহে অনিষ্ট না ঘটাতে পারে। অ্যাপোলো জাতীয় মার্কিন মহাকাশযানগুলির ক্যাপ্‌সুলের আবরণ হিসাবে ঐ জন্যে বিশেষ অ্যালুমিনিয়াম (Honey comb aluminium) নামক সঙ্কর উপাদান ব্যবহৃত হয়, যার ফলে তা সাধারণ অ্যালুমিনিয়াম-নির্মিত

আবরণ অপেক্ষা একদিকে শতকরা চল্লিশ ভাগ অধিকতর হাল্‌কা তো হয়ই, অন্য দিকে আবার শতকরা চল্লিশ ভাগ অধিকতর শক্ত হয়। এর ফলে এক কস্‌মিক রশ্মি ছাড়া অন্য অনিষ্টকর রশ্মিগুলির প্রভাব নভশ্চরদের উপর অতি নগণ্যই হয়। তবু যদি তেজস্ক্রিয় পরিবেশের পরিমাপক যন্ত্রের (Dosimeter) সাহায্যে তার আতিশয্য ঘটতে দেখা যায়, তাহলে মহাকাশচারীর পক্ষে বিশেষ রাসায়নিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেবার সুযোগ ও সুবিধা যানের মধ্যে থাকে। আর মহাকাশযান চালনাকালে চালক যে চেয়ারে বসে তা চালান, তার কাঠামোতেই মহাকাশ পোষাকের বায়ু-চলাচল ব্যবস্থা, নির্গমন ও পাইরো টেক্‌নিক্যাল ব্যবস্থা ও প্যারাসুট ব্যবস্থাও থাকে।

১৯৬৪ সালের ১২ই অক্টোবর তিনজন নভশ্চর ভ্লাদিমির, কোমারোফ, কন্‌স্তান্তিন ফিয়েকতিস্তফ এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানী বোরিশ ইয়েগরোফ একসঙ্গে মহাকাশযান ভস্‌খোদের যাত্রী ছিলেন; উদ্দেশ্য মহাকাশচারণাকালে নভশ্চরদের কর্মদক্ষতা ও প্রতিক্রিয়াগুলি খতিয়ে দেখা, মানবদেহের উপর যে সমস্ত বিভিন্ন ধরণের প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে, সেগুলি অনুধাবন করা এবং ঐ একই সঙ্গে চিকিৎসা ও জীবন-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গবেষণা চালিয়ে যাওয়া। তাদের কার্যসূচীতে ছিল—(১) কারিগরী, শারীরিক এবং চিকিৎসা ও জীববিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণা, (২) তৃতীয় ও চতুর্থ পরিক্রমাকালে শারীরবৃত্ত সংক্রান্ত গবেষণা, (৩) পঞ্চম পরিক্রমা কালে চালক কোমারফ যখন বিশ্রাম ও নিদ্রা উপভোগ করেন, ততক্ষণ ইয়েগরোফ শারীরবৃত্ত সম্বন্ধীয় গবেষণায় রত ছিলেন, (৪) ষষ্ঠ পরিক্রমা কালে ইয়েগরোফ নিজে বিশ্রাম নেন এবং (৫) সপ্তম পরিক্রমা কালে তিনজনই আবার একসঙ্গে নৈশ ভোজন করেন।

এর ফলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, মহাব্যোমযান উৎক্ষেপণ কালে ও ভারহীন অবস্থায় উত্তরণ কালের ধাক্কা তাঁরা সকলেই অতি ভালভাবে সাম্‌লে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং প্রতি আবর্তনের শেষে প্রত্যেকেরই নাড়ীর ঘাতের সংখ্যা ছিল ৬০ থেকে ৭০ এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের হার ছিল প্রতি মিনিটে ১৭ থেকে ২০, অর্থাৎ মহাকাশচারণে বারবার আবর্তনের পরও তাদের দেহযন্ত্র সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও ধাতস্থ ছিল।

আবার ১৯৬৬ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী ভেতেরোক ও উগোলেক নামে দুটি কুকুরসহ কস্‌মস-১১০ নামক যে পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহটি সোভিয়েট কর্তৃক মহাকাশে উপক্ষিপ্ত হয়ে ২২ দিন ধরে ৩৩০ বার কক্ষপথে আবর্তনের পর পৃথিবীতে নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে আসে। তাতে দেখা যায় যে, অবতরণের পর এবং কিছুকাল পর্যবেক্ষণাধীন থাকবার পরও তারা শারীরিক ও মানসিক সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায়ই আছে। ঐ যানে (১) মানুষ কি ভারশূন্যতার অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে? এবং (২) যদি তা পারে, তবে পৃথিবীর অভিকর্ষে প্রত্যাবর্তন তার পক্ষে কতটা বিপজ্জনক হতে পারে—ইত্যাদি বিষয় নির্ণয়ের জন্যে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ছিল। ঐ যন্ত্রগুলির দ্বারা মহাকাশ-যাত্রা ও সেখান থেকে প্রত্যাগমন কালে কিভাবে ঐরূপ অনভ্যস্ত পরিবেশে হৃৎসংবহনতন্ত্র প্রতিবর্তী স্নায়ু-ক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ভারশূন্য অবস্থায় দীর্ঘকাল অবস্থানের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর প্রতিক্রিয়া কি, তাও জানা সম্ভব হয়েছে। আবার মহাশূন্যের তেজ-স্ক্রিয়তার জীবন্ত দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর প্রভাব এবং ৯০০ কিলোমিটার উচ্চতায় পৃথিবীর তেজস্ক্রিয় বলয়ের বিরাট গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সম্বন্ধেও জানা যায়। পরবর্তী কালে অ্যাপোলো শ্রেণীর মার্কিন মহাকাশযানের নভশ্চরদের চাঁদের

কাছাকাছি পৌছে আবার পৃথিবীর অভিকর্ষের আওতায় ফিরে আসবার পক্ষে ঐ গবেষণা-লব্ধ ফলগুলি খুবই কাজে লেগেছিল।

বিগত মে মাসের শেষ ভাগে অ্যাপোলো-১০-এ তিনজন মার্কিন নভশ্চর জন ইয়ং, ইউজিন শারনান এবং টমাস স্ট্যাফোর্ড-এর কৃতিত্ব ও সাফল্য পরবর্তী অভিযানে মানুষের পক্ষে চাঁদে অবতরণের শেষ ধাপ প্রস্তুত করেছে। এই শেষ অভিযানে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও কার্যবিবরণী মহাশূন্যে মানুষের উপর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক কিছু জ্ঞাতব্যের সন্ধান দেয়। মহাশযান থেকে নভশ্চরদের মুখে শোনা যায়, "আমরা খুব খুসী কিন্তু ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত।" ভূপৃষ্ঠ থেকে তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয় "বেশ খাওয়ার পর বিশ্রাম করুন, আমরা আর বিরক্ত করবো না।"

অতঃপর চাঁদের অপর পৃষ্ঠ অতিক্রমের পর স্ট্যাফোর্ড ও শারনান, গোমাংস, শাক-সব্জি আনারস, ফলের কেক, কমলা ও আঙ্গুর দিয়ে ভোজনপর্ব সমাধা করেন—পৃথিবীতে টেলিভিশনে সে দৃশ্য দেখা যায়। মূল মহাকাশযানের চালক জন ইয়ং-এর ভোজনে আরো কিছু দেরী হয়। কিন্তু তাঁদের মধ্যে ক্লান্তির কোন চিহ্ন তখনকার মত দেখা যায় নি।

কিন্তু মহাকাশযাত্রীদের শরীরেও সময়ে সময়ে ক্লান্তি এবং অসুস্থতা যে দেখা দেয় নি, এমন নয়। পায়ে ছিল, দেহ সঞ্চালনে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবার জন্যে ফাইবার গ্লাসের জুতা এবং মহাকাশযানের বিদ্যুৎ-প্রতিরোধক আবরণটিও ছিল ফাইবার গ্লাসে তৈরি। ২২তম চন্দ্র-প্রদক্ষিণের সময় তা ভেঙ্গে টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে যাওয়ায় তাঁদের পক্ষে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তাঁরা সংবাদ পাঠান - মনে হচ্ছে যেন শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। এগুলি নাক, কান, চোখ এবং দেহের যেখানে লাগছে, সেখানেই চুলকাচ্ছে, না হয় অন্য অসুবিধার সৃষ্টি করছে। তিন দিন ধরে আমাদের হাঁচি, কাশি হচ্ছিলো, এখন আমরা জল দিয়ে মহাকাশযানটি ধুয়ে দেওয়ায় সে সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। কিন্তু পৃথিবীর অভিকর্ষের বন্ধনে ফিরে আসবার পর জানান যে, গ্লাস ফাইবারের টুক্‌রায় এখনো তাঁদের হাত-পা চুলকাচ্ছে এবং স্ট্যাফোর্ডের গায়ে চুলকানির মত কি যেন বেরিয়েছে। এক সময়ে নাকি ভাইরাস সংক্রমণের মত কিছু হয়ে একজন নভশ্চরের জ্বর জ্বর ভাব হলেও তা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় নি।

১৯৬৩ সালে একজন সোভিয়েট নভশ্চর পাঁচ দিন পর্যন্ত ভারশূন্য অবস্থায় থাকেন এবং প্রথমে তা নানাভাবে অস্বস্তিকর হয়ে উঠলেও একই অবস্থায় চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে অস্বাভাবিক অবস্থাজনিত প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াগুলি অনেকটা দূর হয়ে যায় এবং ঐরূপ পরিস্থিতিতে তাঁর দেহ অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে বলে তিনি মনে করেন। আবার বিলায়েভ ও লেনোন নামক দু'জন সোভিয়েট নভশ্চর মহাকাশযান ত্যাগ করে, জীবনরক্ষার উপাদানসহ বিশিষ্ট পোষাক পরিহিত অবস্থায় ১২ মিনিটকাল বায়ু-শূন্য স্থানে ভাসমান অবস্থায় থেকে প্রমাণ করেন যে, অল্প সময়ের জন্যে ঐরূপ অবস্থানও দেহের পক্ষে ক্ষতিকর নয়।

মনোনীত মহাকাশচারীদের মহাকাশযাত্রার আগে রকেটে আকাশযানের তুল্য গতি, ত্বরণ, ঘূর্ণন, কৃত্রিম ভারশূন্যতা প্রভৃতি আরোপের দ্বারা প্রাথমিক পর্ব হিসাবে সহনশীলতা ও অভ্যস্ততা কতদূর জন্মায় তা পরীক্ষা করে তাঁদের দুঃসাধ্য অভিযানে পাঠানো হয়। তারই ফলে অতি ত্বরণ, ভার-শূন্যতা এবং অনবরত আবর্তনের ফলে অন্তঃ-কর্ণের অভ্যন্তরে তরল পদার্থের কম্পন প্রভৃতির দেহ ও মনের উপর প্রতিক্রিয়া এড়ানো অনেকটাই সম্ভব হয়। আবার উপযুক্ত স্বাস্থ্যবতী ও মনোবলসম্পন্না রমণীও যে পুরুষের মতই সফল নভশ্চারিণী হতে পারেন,

ভস্টোক-৬-এর আরোহিণী ১৯৬৩ সালে ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভার দ্বারা তাই প্রমাণিত হয়েছে। "শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাব তাই সয়"—এই প্রবাদবাক্যের সার্থকতা আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু তা হলেও কি মহাকাশযানে চাঁদ কিংবা দূর-দূরান্তের শুক্র বা মঙ্গলগ্রহে যাওয়া কিংবা কিছুদিনের জন্তেও—এমন কি, চাঁদে বাস করবার সকল সমস্যাই মিটে গেছে? না, মহা-জাগতিক রশ্মির প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করবার উপায় এখনো জানা নেই। গ্রহ বা উপগ্রহে অবতরণের পর সেখান থেকে পৃথিবীতে অজ্ঞাত জীবাণুকে (বা ভাইরাস) পৃথিবীতে নিয়ে আসবার আশঙ্কাও বড় কম নয়। শুক্র, মঙ্গল প্রভৃতির তুলনায় চাঁদ আমাদের নিকট প্রতিবেশী; সুতরাং সেখানে যাওয়া এবং ত্বরিতে ফিরে আসবার ফলে পর্যাপ্ত খাদ্য, অক্সিজেন কিংবা জল বয়ে নিয়ে যাওয়া যায় মহাকাশযানে কিংবা তৎসংলগ্ন চন্দ্রযানে। কিন্তু ১০ কোটি ৮০ লক্ষ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত শুক্রের ২৭ কোটি কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে নিকটবর্তী হতে হলে কিংবা আরো দূরে অবস্থিত মঙ্গল-গ্রহের কাছাকাছি গিয়ে ফিরে আসতে হলে কিংবা চাঁদে গিয়েও কয়েকদিনের জন্তেও প্রবাসী হতে হলে, সে অনুপাতে উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্যসম্ভার, জল ও অক্সিজেন প্রভৃতি বয়ে নিয়ে যাওয়া একটি মস্ত বড় সমস্যা। ঐ সমস্যার কি ভাবে সুষ্ঠু সমাধান করা যায়, বিজ্ঞানীরা মহাকাশযাত্রার আরম্ভ থেকেই তা ভাবছেন। উদ্ভিদ-জগতের সঙ্গে প্রাণী-জগতের, এই পৃথিবীতে সর্বদাই পরস্পরের স্বার্থে আদান-প্রদান চলছে—এই গুরুতর সমস্যার সমাধান তারই কোনরূপ পুনরাবৃত্তির ক্ষুদ্র সংস্করণের দ্বারা হতে পারে কি না, সে সম্বন্ধেও জল্পনা-কল্পনা চলছে। লতা-পাতা, শাক-সব্জি, ফল-মূল মানুষের খাদ্য, মানুষের পক্ষে অক্সিজেন গ্যাস এবং জল অত্যাবশ্যক আবার উদ্ভিদের পক্ষে একই ভাবে জল এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড (এবং কিছুটা অক্সিজেনও) আবশ্যক। অন্যদিকে মানুষের মলমূত্র উদ্ভিদের পক্ষে সার এবং উদ্ভিদ যেমন প্রাণীদের কাছ থেকে পায় কার্বন ডাই-অক্সাইড, প্রাণীরাও তেমনি উদ্ভিদের কাছ থেকে পেতে পারে অক্সিজেন। এভাবে যদি অতি সহজে জন্মায় কোন ক্ষুদ্র উদ্ভিদ, যাকে সহজেই মানুষ আকাশচারণাকালে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে গ্রহান্তর যাত্রায়, যেখানে এই পারস্পরিক সাহায্য ও উপকার চক্রাকারে চলতে থাকে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞানীরা তারই সন্ধান করছিলেন বহুদিন ধরে এবং সুখের বিষয় মজাপুকুর, পচা ডোবা প্রভৃতিতে ক্লোরেলা নামক শৈবালজাতীয় এরূপ অতি ক্ষুদ্র একটি উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গেছে, (১) যা, এমন কি, লেবরেটরীর মধ্যে দ্রুত বাড়ে, (২) নানারকম পুষ্টিদ্রব্যের উপস্থিতিতে যা সাময়িকভাবে আহার্যরূপে ব্যবহৃত হতে পারে এবং (৩) যা সূর্যালোকের প্রভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে গ্রহণ করে শর্করা তৈরি করে, তার ফলে অক্সিজেন তৈরি করতে পারে। এই উদ্দেশ্যে মানবদেহ-নিঃসৃত ঘাম বা মূত্র থেকে জলীয়াংশও তা গ্রহণ করে। ঐগুলি এবং মলও সাররূপে তার চাষের সাহায্য করে।*

সুতরাং এই নগণ্য উদ্ভিদের সাহায্যে দীর্ঘকাল মহাকাশে কিংবা চাঁদ বা গ্রহান্তরে অবস্থানকালে খাদ্য এবং অক্সিজেনের অভাব অনেকটা মিটাতে পারে। শুক্রের আবহমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্পের অস্তিত্বের

---

* 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় শ্রীঅলোকা রায় লিখিত 'মহাকাশ পরিক্রমায় ক্লোরেলার সম্ভাবনাপূর্ণ ভূমিকা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

প্রমাণ পাওয়া গেছে। আবার অ্যাপোলো-১০-এর নভশ্চর ইয়ং জানিয়েছেন যে, তাঁরা আকাশযানের সামনের দরজায় ইস্পাতের বীমে জলের বিন্দু দেখেছেন, যার ফলে মহাকাশযান ও চন্দ্রযানের সুড়ঙ্গের দেয়াল ভিজে ভিজে দেখাচ্ছিল। তাছাড়া ঘাম ও মূত্রকে শোধন করে জলরূপে তাকে আবার ব্যবহার করাও যেতে পারে। ইতিহাসে এরূপ নজীরও আছে। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের কালে চারপাশে ঘেরাও হওয়াতে জার্মেনীতে যখন চরম খাদ্যাভাব চলছিল, তখন মল থেকে অপরিপক্কভাবে নিষ্ক্রান্ত স্নেহোপাদান পরিশোধনের পর জার্মানরা স্নেহজাতীয় দ্রব্যের চাহিদা অনেকটা মেটাতে পেরেছিল। কিন্তু জেনেশুনে এভাবে পরিশুদ্ধ জল কি ভাবে নভশ্চরেরা গ্রহণ করবেন, তাই বিবেচ্য। ক্লোরেলা কি দেহের পক্ষে অত্যাবশ্যক প্রোটিনের চাহিদা সম্যক মেটাতে পারবে? তাছাড়া অপ্রীতিকর গন্ধ তাকে একমাত্র খাদ্যরূপে গ্রহণের একটা অন্তরায়ও বটে।

রকেটের কথা ও কাহিনী

রমাতোষ সরকার

বিজ্ঞানের ইতিহাসে বা সমগ্রভাবে মানব-সভ্যতার ইতিহাসে সমসাময়িক যুগ 'মহাকাশ যুগ' (Space age) নামে চিহ্নিত হবার যোগ্য। এযুগে মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে মানুষ যে সাফল্য অর্জন করেছে এবং করছে তা যেমন চমকপ্রদ ও কৃতিত্বজনক, তেমনই সুদূরফলপ্রদায়ী। প্রাসঙ্গিক গবেষণালব্ধ ফল মানুষের ক্রিয়া-কাণ্ডের সর্বক্ষেত্রে, সর্বস্তরেই কম-বেশী প্রভাব বিস্তার করবে। স্বভাবতঃই আবালবৃদ্ধবনিতা, আপামর জনসাধারণের বিশেষ কৌতূহল, বিশেষ ঔৎসুক্য এই মহাকাশ গবেষণার সম্বন্ধে।

মহাকাশ গবেষণায় মানুষের প্রথম ও প্রধান উপকরণ রকেট। ক্যামেরা থেকে কম্পিউটার পর্যন্ত ছোট-বড়, সরল-জটিল অনেক যন্ত্রেরই এই ব্যাপারে নানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, কিন্তু রকেটের অবদানই নিঃসন্দেহে সর্বাধিক। আধুনিক জনমানসে তাই রকেট ও মহাকাশ যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে।

রকেট ও মহাকাশের অচ্ছেদ্য সম্পর্কের সূত্রটি নিহিত আছে মহাকাশের সংজ্ঞা বা পরিচয় এবং রকেটের ক্রিয়াপদ্ধতির মধ্যে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীর পরিভাষায় (বা একটু অনুধাবন করলেই বোঝা যায়, সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত ভাষাতেও) মহাকাশ বলতে যা বোঝায় ভূপৃষ্ঠের অব্যবহিত পরেই তার শুরু নয়। মহাকাশের বিস্তার পৃথিবী বেষ্টনকারী বায়ুমণ্ডলের বা অন্ততঃ পক্ষে তার ঘন, ভারী অংশের ঊর্ধ্বে—অর্থাৎ, ভূপৃষ্ঠের শতাধিক মাইলের ঊর্ধ্বে। অর্থাৎ সঞ্চরমান মেঘকে, উড়ন্ত কাক-চিলকে বা এরোপ্লেন-যাত্রীকে আকাশচারী বলা চলে কিন্তু মহাকাশচারী নয়। মহাকাশচারী প্রথম পার্থিব বস্তু ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে উৎক্ষিপ্ত স্পুটনিক-১, প্রথম মহাকাশচারী প্রাণী পরের মাসে স্পুটনিক-২-বাহিত কুকুর—লাইকা, প্রথম মহাকাশচারী মানুষ ১৯৬১ সালের ভোস্টক-১ যাত্রী ইউরি গাগারিন। স্পুটনিক-১, লাইকা ও গাগারিনের ভূতল থেকে দূরত্ব ছিল যথাক্রমে প্রায় ৬০০, ১০০০ ও ২০০

মাইল। এ-দূরত্বগুলি সবই মহাকাশের অন্তর্গত; কারণ ৩০০/৭০০ মাইলের উর্ধ্বে বায়ুমণ্ডল অনুপস্থিত এবং ১২০/১৩০ মাইল দূরত্বে বাতাস এত সূক্ষ্ম (Rarefied), এত লঘু যে, প্রায় না থাকবার মত। এ-দূরত্বে বেলুন, প্লেন প্রভৃতি যে কোন প্রকার বায়ু-নির্ভর যানবাহন চলনশক্তি-হীন, কিন্তু রকেটে, শুধুমাত্র রকেটেরই, এখানে স্বচ্ছন্দ বিহার। অধিকন্তু, বায়ুমণ্ডলের প্রতিরোধ না থাকায় মহাকাশে রকেটের চলাফেরা সহজতর।

বায়ুমণ্ডল না থাকলেও মহাকাশে যে চলাচলে কোনও প্রতিরোধ নেই, এমন নয়। মহাকর্ষের বিশ্বজোড়া ফাঁদ (কোথাও কঠিন, কোথাও শিথিল) তো পাতা আছেই, তাছাড়া মহাকাশ বায়ুশূন্য হলেও একেবারে বস্তুশূন্য নয়—সর্বত্রই লঘু, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে আছে বস্তুর ক্ষীণ উপস্থিতি। তাই মহাকাশের বিকল্প নাম হিসাবে যদিও মহাশূন্য শব্দটি অনেক সময় ব্যবহার করা হয়, শেষোক্ত শব্দটি কিন্তু আক্ষরিক অর্থে গ্রহণীয় নয়।

রকেটের ক্রিয়াপদ্ধতি বুঝতে গেলে গতি-বিদ্যার তিনটি মূল সূত্রকে জানতে হবে। নিউটনের সূত্র নামে অভিহিত সূত্রত্রয়কে এই ভাবে বিবৃত করা যায়:

(১) বলপ্রযুক্ত না হলে কোন স্থির বস্তুর পক্ষে আদৌ গতিশীল হওয়া সম্ভবপর নয়, গতিশীল বস্তুর পক্ষেও গতিবেগ বা গতিপথ পরিবর্তন বলপ্রয়োগসাপেক্ষ;

(২) গতিপথ বা গতিপথের পরিবর্তন হয় প্রযুক্ত বলাভিমুখী, গতিবেগের পরিবর্তন-হার বলের সমানুপাতিক;

(৩) ক্রিয়া মাত্রেরই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে; অর্থাৎ, বল প্রয়োগ করলেই সমপরিমাণ কিন্তু বিপরীতমুখী বললাভ ঘটে।

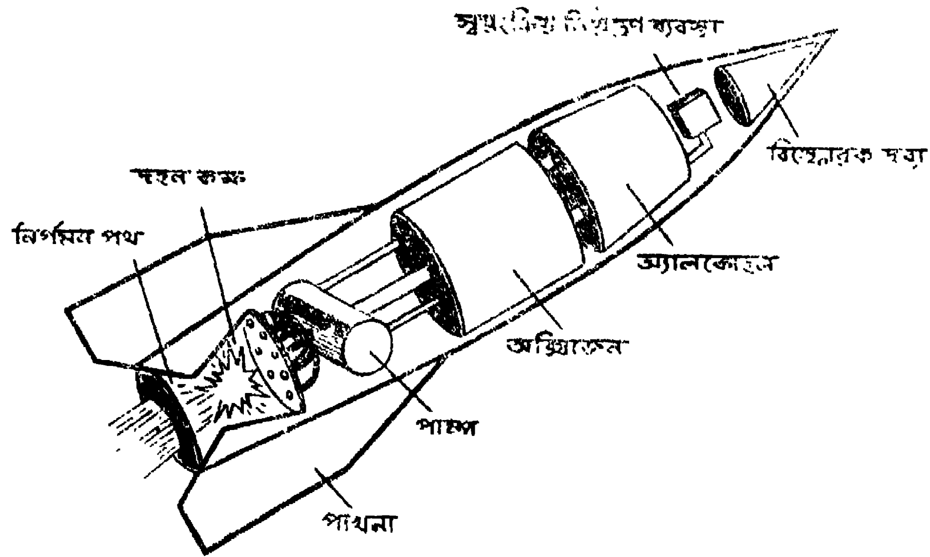
তৃতীয় সূত্রটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কারণ, আপাতসরল এ-সূত্রটি প্রায়ই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে। তাছাড়া, বর্তমান প্রসঙ্গে এ-সূত্রটির সাতিশয় গুরুত্ব। টীকা হিসাবে এখানে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করা হচ্ছে। প্রথমতঃ, ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া, অর্থাৎ প্রযুক্ত বল এবং লব্ধবল, দুটি পৃথক বস্তুতে বা এক বস্তুর দুই পৃথক অংশে কার্যকর। দ্বিতীয়তঃ, সমপরিমাণ হলেও (ভিন্ন বস্তুখণ্ডে কার্যকর) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলাফল ভিন্ন পরিমাণ হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পৃথিবীর আকর্ষণে বৃন্তচ্যুত ফল যখন সবেগে পতনশীল হয়, তখন ফলের সমপরিমাণ আকর্ষণে পৃথিবীর অবস্থার কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবর্তন হয় না।

রকেটের গতিবিধির বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য চলনক্ষম বস্তু থেকে তার মূলগত পার্থক্য তার আত্ম-নির্ভর চালিকাশক্তি—তার স্বজাত বল। আধুনিক জেট বিমান ছাড়া অন্য সমস্ত যানবাহনই, এমন কি, শামুকগোষ্ঠীর এক প্রকার জলচর প্রাণী ছাড়া, সম্ভবতঃ অন্য সব সচল প্রাণীই চলাফেরার ব্যাপারে আবশ্যিক ভাবে এবং প্রত্যক্ষভাবে পারিপার্শ্বিক মাটি, জল, বায়ু প্রভৃতির সহায়তা গ্রহণ করে; দেহসংলগ্ন অপর কোন না কোন বস্তুর উপর ক্রিয়া বা বল প্রয়োগ করে প্রতিফল হিসাবে স্বদেহে যে প্রতিক্রিয়া বা বল লাভ করে, তাই এ-সকল বস্তুর চালিকাশক্তি। আর রকেট? রকেটের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বহিঃস্থ কোন বস্তুর স্থান নাই। রকেটের এক অংশের ক্রিয়া অপরাংশের উপর; অপসৃয়মান শেষাংশের প্রতিক্রিয়ায় প্রথমাংশের গতি।

উপরে প্রসঙ্গতঃ ব্যতিক্রম হিসাবে জেট বিমান ও শামুকজাতীয় প্রাণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এদের চালিকাশক্তি রকেটেরই অনুরূপ, কিন্তু তবু এদের সঙ্গেও রকেটের গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ আছে। এরা পরোক্ষভাবে পারিপার্শ্বিককে ব্যবহার করে—জেট বা শামুক

যথাক্রমে বাতাস বা জলকে প্রথমে ধীরে ধীরে দেহের অঙ্গীভূত করে ও পরে (জেটের ক্ষেত্রে, রাসায়নিকভাবে পরিবর্তিত রূপে) সবেগে নিষ্কাশন করে। রকেট, মুক্ত মহাকাশ-পরিব্রাজক রকেট, কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী। চলার পথে রকেট বর্জন করে, গ্রহণ করে না।

১নং চিত্রটি একটি তরল-উদ্দীপক (Liquid propellant) রকেটের রূপরেখা। চিত্রটি এক-ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। রকেটের অ্যালকোহল চিহ্নিত অংশে অন্য কোন তরল দাহ্য পদার্থ এবং অক্সিজেন চিহ্নিত অংশে অন্য দহন-সহায়কও ব্যবহার করা চলে। রকেট-বিজ্ঞানের পরিভাষায় বিস্ফোরক অংশটির নাম পে-লোড (Pay-load)। রকেটের উদ্দেশ্য অনুযায়ী এখানে বিস্ফোরকের পরিবর্তে অন্য বস্তুও রাখা যায়; যথা—আরোহী, বৈজ্ঞানিক তথ্য-সংগ্রাহক



১নং চিত্র
রকেটের গঠন

রূপ স্বব্যাখ্যাত। এই ধরণের রকেট উৎক্ষেপণের উদ্দেশ্যে অ্যালকোহল ও অক্সিজেন, দাহ্য ও দহনসহায়ক দুটি তরল রাসায়নিককে প্রথমে পাম্প সহযোগে নিয়ন্ত্রিত গতিতে দহনকক্ষে প্রবিষ্ট ও পরে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অগ্নিসংযুক্ত করা হয়। দহনের ফলে যে প্রভূত গ্যাস সমুৎপন্ন হয়, রকেটের আভ্যন্তরীণ চাপে তা নির্গমন পথে সবেগে নির্গত হয় এবং প্রতি-ক্রিয়ার চাপে রকেটকে বিপরীত দিকে ধাবিত করে। V-2 নামে পরিচিত এই প্রকার রকেট দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানদের দ্বারা ক্ষেপণাস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং ইংল্যাণ্ডে প্রচুর ক্ষতি যন্ত্রপাতি, স্বয়ংসম্পূর্ণ আর একটি ক্ষুদ্রতর রকেট ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনানুসারে রকেটটিতে ধীরে ধীরে অবতরণের বা বেতার-বার্তা প্রেরণের বা পে-লোড থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ব্যবস্থাদি সংযুক্ত থাকে।

নিউটনীয় গতিবিদ্যার তৃতীয় মূলসূত্রের আলোকে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক, সাধারণ-ভাবে গতির রহস্য আর বিশেষভাবে রকেটের সরল অথচ বিশিষ্ট গতিতত্ত্ব মানুষ বুঝতে শিখেছে সপ্তদশ শতকের শেষদিক থেকে, কিন্তু ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থেকে সে-তত্ত্ব মানুষ ব্যবহার করেছে, এমন কি, কতকাংশে রকেট-

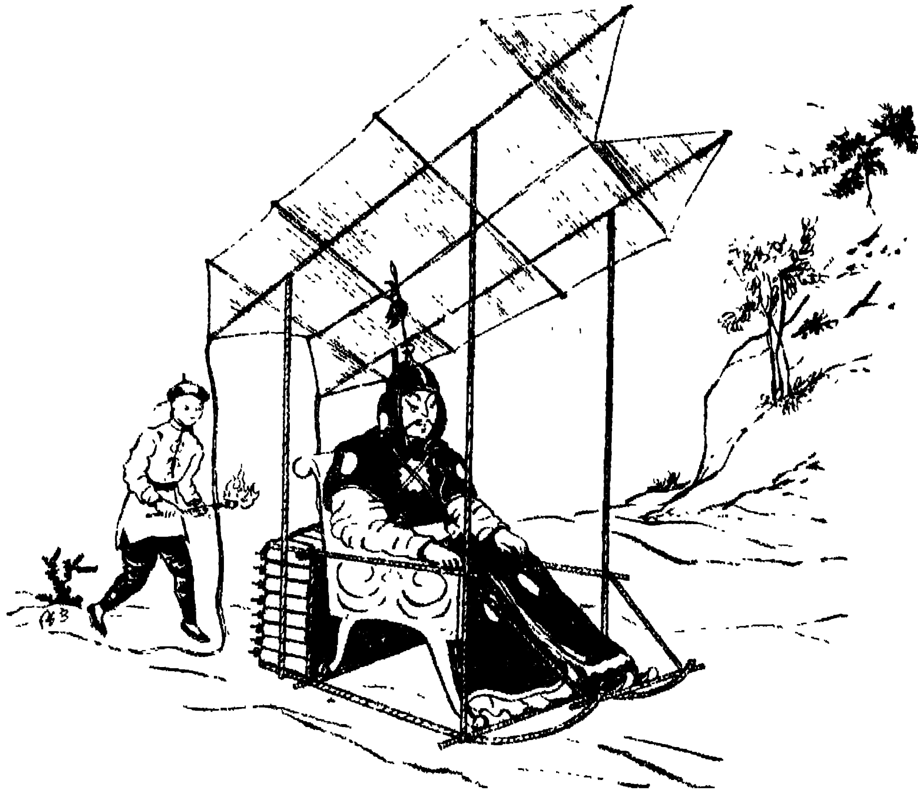
নির্মাণ কৌশলও আয়ত্ত করেছে তার অনেক আগেই।

সুদূর অতীত ইতিহাসের পাতা উল্টালে প্রতিক্রিয়া-তত্ত্ব (Reaction principle) ব্যবহারের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যাবে বোধ হয় গ্রীস প্রসঙ্গে। সেটাই স্বাভাবিক; কারণ প্রাচীন গ্রীকরা শুধু সমসাময়িক অন্যান্য সভ্য জাতিগুলির মত ইতিহাস-সৃষ্টিই করতেন না, যত্নের সঙ্গে ইতিহাস-রচনাও করতেন। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে আধুনিক ইটালীর দক্ষিণাঞ্চলে স্থাপিত গ্রীক সহর টারেন্টুম (Tarentum)-এর আরকিটাস (Archytas) একটি সচল কাষ্ঠপারাবত নির্মাণ করেন; মনে হয়, এটির চালিকাশক্তি ছিল নিষ্কাশিত বাষ্পের প্রতিক্রিয়া। নিশ্চিততর নজীর সৃষ্টি করেন আলেকজাণ্ড্রিয়ার হেরন (Heron), খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে। এঁর উদ্ভাবিত বর্তুল, ইওলিপাইল (Aeolipile) ছিল নিঃসৃয়মান বাষ্পের চাপে ঘূর্ণ্যমান। পরবর্তী প্রায় হাজার বছরের ইতিহাস এ-প্রসঙ্গে নীরব। সরবে মৌনভঙ্গ করেছে একাদশ শতাব্দী। তৎকালীন লেখক নু চিং সুং তাও (Nu Ching Ssung Tao) অগ্নিবাণ (Fire arrow)-এর বিস্ময়কর বর্ণনা দিয়েছেন; এই বাণ নিক্ষেপে ধনুক লাগে না, লাগে সংলগ্ন বারুদকক্ষে অগ্নিসংযোগ। অগ্নিবাণ সুনিশ্চিতভাবে আধুনিক রকেটের প্রত্যক্ষ পূর্ব-পুরুষ। অগ্নিবাণের উন্নত সংস্করণে অগ্রভাগের সূক্ষ্ম ফলা পরিত্যক্ত হয়; সেক্ষেত্রে বারুদই ছিল দুটি উদ্দেশ্যের সাধক। ১২৩২ খৃষ্টাব্দে পিকিং সহরের প্রতিরক্ষীরা চেঙ্গিজ পুত্র ওগোদাই (Ogodai) পরিচালিত মঙ্গোল হানাদারদের বারংবার প্রতিহত করে রকেট বা ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে। আশাহত মঙ্গোলরা পরে রকেটাস্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করে এবং সম্ভবতঃ তারাই ইউরোপে সে বিদ্যা রপ্তানী করে। রকেট প্রসঙ্গে আর একটি চৈনিক প্রচেষ্টা অতীব কৌতুকজনক। ১৫০০ অব্দে ওয়ান-হু (Wan Hu) নামে জনৈক রাজপুরুষ আকাশ বিহারের অভিলাষে ৪৭টি রকেট ও ২টি বৃহদাকার ঘুড়িসংযুক্ত আসনে উপবিষ্ট হয়ে রকেটে অগ্নিসংযোগের আদেশ দেন; ওয়ান-হু-র শেষ পরিণতি সম্পর্কে সমকালীন সাহিত্য একমত নয়, কিন্তু এই ব্যাপারে ঐকমত্য আছে যে, প্রচণ্ড ধোঁয়ার অন্তরালে তিনি অনতিবিলম্বে বেপাত্তা হন!

ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতিহাসে প্রতিক্রিয়াতত্ত্ব বা রকেট-চর্চার কম-বেশী কৃতিত্ব (চীন ছাড়া) আরব দেশ, ইটালী, ইংল্যাণ্ড ও জার্মেনীর মধ্যে বণ্টিত। উল্লিখিত প্রথম তিনটি দেশের হাসান আলরামা (Hassan Alrammah), জোয়ানেস দ্য ফণ্টানা (Joanes de Fontana), রজার বেকন প্রভৃতি সমরাস্ত্র হিসাবেই রকেট ব্যবহারে উদ্যোগী ছিলেন। জার্মেনীর কনরাড কাইজার ফন আইখষ্ট্যাড্ট (Kanrad Kyeser von Eichstadt) কিন্তু রকেটের জনকল্যাণকর অন্য প্রয়োগের কথাও চিন্তা করেন; এর উদ্ভাবন, খুঁটির সাহায্যে টান করে খাটানো তার থেকে শিথিলভাবে প্রলম্বিত ছোট রকেটের সাহায্যে অল্প দূরত্বে দ্রুত বার্তা প্রেরণকে আধুনিক টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার স্থূল পূর্বরূপ বলা যেতে পারে। রকেটকে ধীরে ধীরে অবতরণ করানোর বাস্তব পরিকল্পনাও সম্ভবতঃ জার্মান মস্তিষ্ক-প্রসূত; ১৫৩০ সালে কাউন্ট রাইনহার্ট ফন সোমস্ (Reinhart von Solms) প্যারাসুটজাতীয় কৌশল সংবলিত রকেটের কথা লেখেন। রকেট-চর্চায় জার্মানদের আর একটি স্থায়ী অবদান নামকরণের ক্ষেত্রে। Rocket, Roquet, Rakete, Rocchetta প্রভৃতি আধুনিক সুপ্রচলিত ইউরোপীয় অভিধা-গুলির উৎস অজানা সূত্রে প্রাপ্ত, ১৫৫১ সালে জার্মেনীতে প্রথম ব্যবহৃত Roget শব্দটি।

যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে রকেটের একটি বড় ত্রুটি ছিল তার অনিশ্চিত লক্ষ্য সন্ধান। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে কামান-বন্দুকের প্রভূত উন্নতি হতে থাকে এবং এগুলিই যোদ্ধারা অধিকতর নির্ভরযোগ্য বিবেচনা করতে থাকেন। ফলে রকেট-চর্চায় এই সময় থেকে ভাটা পড়তে থাকে। রকেটের অপর একটি ব্যবহার কিন্তু আবিষ্কারের সময় থেকেই অব্যাহতভাবে চলতে থাকে; সেটি আতসবাজী বা হাউই হিসাবে। এ-সূত্রে রকেটের কিছু কিছু উৎকর্ষ এবং পরিবর্ধনও ঘটে; নামডাক অর্জন করেন। এঁদের মধ্যেই একজন, গিতানো (Gaetano) ১৭৪৯ সালে ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জর্জের আমন্ত্রণে লণ্ডনের সেন্ট জেম্‌স্‌ পার্কে রকেট বা হাউই বাজীর এক চমকপ্রদ উপভোগ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন।

এই ঘটনার প্রায় দুই দশক পরে ইংরেজেরা রকেটের আর একটি চমকপ্রদ প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করেন ভারতভূমিতে, যদিও এবারের অভিজ্ঞতা মোটেই সুখপ্রদ ছিল না। এবারের প্রদর্শক মহীশূরাধিপতি হায়দর আলি, উপলক্ষ্য প্রথম



২নং চিত্র

ওয়ান-হুর মহাকাশ যাত্রা

যথা—একাধিক পর্যায়ের (Multi-stage) রকেট, যাতে সর্বনিম্নে স্থাপিত রকেটের ক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে অগ্রভাগে সংযুক্ত পরবর্তী রকেটের ক্রিয়া শুরু হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হাউই প্রস্তুতকারক হিসাবে ইটালীর কারিগরেরা বিশেষ মহীশূরের যুদ্ধ। উন্নত ধরণের দূরপাল্লার রকেট ও সহস্রাধিক রকেটাস্ত্র ব্যবহারদক্ষ যোদ্ধার সহায়তায় হায়দর পররাজ্যলোভী ইংরেজকে হতবুদ্ধি ও পর্যুদস্ত করে সন্ধি ভিক্ষায় বাধ্য করেন। এই ঘটনাই সমরবিশারদের দৃষ্টি পুনরায়

রকেটের দিকে আকৃষ্ট করে। ১৭৯২ সালে হায়দর-পুত্র টিপু শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধে পুনর্বার রকেটাস্ত্র কৌশলে ইংরেজকে কাবু করলে ইংরেজ কৃতসঙ্কল্প হয়ে পূর্ণোদ্যমে রকেট-চর্চা সুরু করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই উইলিয়াম কনগ্রীভ (William Congreve)-এর কৃতিত্বে ইংরেজ রকেটাস্ত্র ক্রমশঃ মারাত্মক রূপ ধারণ করতে থাকে। এর শোচনীয় পরিণতি হিসাবে ডেনমার্কের কোপেনহাগেন সহর একবার প্রায় ভূলুণ্ঠিত হয়। তাছাড়া নেপোলিয়নের সঙ্গে সংঘর্ষে ফরাসীদের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতা রক্ষা প্রয়াসী আমেরিকানদের বিরুদ্ধেও ইংরেজ রকেট কার্যকারিতার পরিচয় দেয়। এই সময়ে বড় বড় প্রতিটি রাজ্যই স্ব স্ব অস্ত্রাগারে সাধ্যমত রকেটাস্ত্র সংযোজন করতে থাকেন। কিন্তু উল্লিখিত ঘটনাগুলির কিছুদিন পরেই অব্যর্থ লক্ষ্য সন্ধানের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রকেটকে আবার উন্নততর বন্দুক-কামানের কাছে হার মানতে হয়।

পরবর্তী ৭০-৮০ বছরের রকেট চর্চার ইতিহাসে মাত্র দু'চারটি ঘটনা বা নাম উল্লেখের দাবী রাখে। মার্কিন উদ্ভাবক হেল (Hale) বক্রাকৃতি পাখ্না সংযোগে রকেটকে চলার পথে ঘূর্ণ্যমান করেন; এর ফলে রকেটের পথচ্যুতি বা লক্ষ্যচ্যুতি হ্রাস পায়। ইটালীর গবেষক রুগেরি (Ruggieri) প্যারাসুটযুক্ত রকেটের সাহায্যে আকাশে ইঁদুর প্রেরণ করেন (সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে, এঁকে মানুষ প্রেরণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করতে হয়)। ফরাসী যন্ত্রবিদ দঁসস্ (Dencesse) স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরাযুক্ত রকেটের পরিকল্পনা করেন। এছাড়া রকেটযুক্ত হার্পুন ভূপৃষ্ঠে বা সমুদ্রপৃষ্ঠে রকেট-চালিত যানবাহনের কিছু কিছু পরিকল্পনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাও সাধিত হয়।

প্রধানতঃ যুদ্ধাস্ত্র, হাউই প্রভৃতি রূপে সুদীর্ঘ-কাল একপ্রকার হীন জীবনযাপন করে বিজ্ঞানের ইতিহাসে রকেট যেন পুনর্জীবন লাভ করে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে। যাঁদের পৌরোহিত্যে রকেটের এই দ্বিজত্ব লাভ তাঁরা হলেন জার্মান, রুশ ও ফরাসী দেশের তিনজন বিজ্ঞানসাধক। এঁরা অল্প কয়েক বছরের ব্যবধানে, পরস্পরের উদ্যোগ-আয়োজন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিতভাবে স্ব স্ব ক্ষেত্রে একক সাধনায় ব্রতী হন। এঁদের আচার-অনুষ্ঠানের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে সমকালীন মানুষের মহাকাশ সম্বন্ধে অধিকতর আগ্রহ, বায়ুগতিবিদ্যা (Aerodynamics) ও তাপগতিবিদ্যা (Thermodynamics) প্রসঙ্গে গভীরতর জ্ঞান এবং কিছু কিছু অভিনব গুণসম্পন্ন রাসায়নিক পদার্থের আবিষ্কার।

রকেটের নব-জীবনের কাহিনী এবং নতুন রকেটের কথা হবে পরবর্তী আর একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

মহাকাশ-ভ্রমণে শারীরতাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া

সুশীলরঞ্জন মৈত্র

মানুষের শারীরিক নিয়মপদ্ধতি পৃথিবীপৃষ্ঠের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে আবদ্ধ। যে সকল প্রাণী পৃথিবীতে আমরা দেখিতে পাই, তাহাদের অস্তিত্ব এই পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার জন্যই সম্ভব হইয়াছে। এই আবহাওয়া বলিতে জল, মাটি, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন সমন্বিত বায়ুস্তর প্রভৃতিকে বুঝায়। এই জল মাটি ও বায়ু হইতে উদ্ভূত খাদ্যবস্তু নিত্য আমাদের শরীরের বৃদ্ধি, ক্ষয়রোধ ও জীবনীশক্তির রাসায়নিক প্রক্রিয়া চালাইয়া যাইতেছে। কিন্তু এই আবহাওয়া এবং আমাদের শরীর পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির মধ্যে রহিয়াছে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, মানুষের জীবন বায়ুস্তর, খাদ্য ও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এই তিন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল রহিয়াছে। পৃথিবীপৃষ্ঠে মানুষ যেভাবে চলাফেরা করে তাহাতে ইহার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি যদি সরাইয়া লওয়া হয় এবং আহার ও অক্সিজেন প্রভৃতির ব্যবস্থা ঠিক রাখা হয়, তাহা হইলে জীবনধারণ প্রক্রিয়ায় কোন পরিবর্তন হইবে কিনা, তাহা মানুষ এতদিন চিন্তা করে নাই। কিন্তু মানুষ যদি পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির বাহিরে যাইবার চেষ্টা করে, যাহা বর্তমানে রকেটের সাহায্যে হইতেছে, তবে মানুষের শারীরিক ক্রিয়া কি একই ভাবে চলিবে অথবা তাহার পরিবর্তন ঘটিবে?

বর্তমানে কয়েক বৎসর ধরিয়া মহাকাশযাত্রায় মানুষের উপর এই সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইতেছে। এই মহাকাশযাত্রায় বিজ্ঞানের প্রয়োগ-বিস্তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যে রকেটের ভিতরে মানুষকে মহাকাশে প্রেরণ করা হইতেছে, তাহার গঠন ইত্যাদি এমন ভাবে করা হইয়াছে যে, মানুষ তাহার আহার-নিদ্রা, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস—যাহা বায়ুমণ্ডলের চাপেই সম্ভব এবং অন্যান্য শারীরিক ক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবে করিতে পারিতেছে; অর্থাৎ পৃথিবীর আবহাওয়া যেমন সাবমেরিনে লইয়া মানুষ অনেক দিন জলের নীচে বাস করিতে পারিতেছে, সেইরূপ এই রকেটেরও যে প্রকোষ্ঠে মহাকাশযাত্রীরা থাকে, তাহাতেও সেইরূপ আবহাওয়া রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। তবে মানুষের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সামান্য তারতম্য করা হয়; অর্থাৎ পৃথিবীপৃষ্ঠে মানুষ যে খাদ্য গ্রহণ করিতেছে, মহাকাশযাত্রী তাহার রাসায়নিক গুণ ঠিক রাখিয়া তাহাই আহার করিয়া থাকে। যে অক্সিজেন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যে লওয়া হইতেছে, রকেটের ভিতর মহাকাশযাত্রীর প্রকোষ্ঠে তাহাই গ্রহণ করিতেছে; সুতরাং পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে মহাকাশে রকেটযাত্রায় মানুষের আহার অথবা অক্সিজেন পাইবার বিশেষ কোন তারতম্য হইতেছে না। পৃথিবীর উপর মানুষের অক্সিজেন লইবার সময় বাতাস নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে যায় এবং এই বাতাসে $\frac{1}{5}$ ভাগ অক্সিজেন এবং প্রায় $\frac{4}{5}$ নাইট্রোজেন ও অন্যান্য গ্যাস অতি সামান্যই থাকে। আমরা যদি পৃথিবীপৃষ্ঠের উপরে উঠি, যেমন পর্বতারোহণ অথবা আকাশযানের সাহায্যে, তখন বায়ুর চাপের সঙ্গে অক্সিজেনের চাপ কমে, কিন্তু আমাদের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না, যদি অনেক উপরে উঠিয়া না যাই। এই বাতাসের ভিতর শুধু অক্সিজেনেরই

আমাদের প্রয়োজন, নাইট্রোজেন বাতাসে যাহা আছে, তাহার কোন প্রয়োজন মানুষের নাই। সাধারণতঃ পৃথিবীপৃষ্ঠে বা সমুদ্রতটে বাতাস যে চাপে থাকে, তাহাকে আমরা ৭৬০ মিলিমিটার পারদে প্রকাশ করি। ইহার ভিতর অক্সিজেন প্রায় ১৫৯ মিলিমিটার পারদের চাপ দেয়। অন্য বাকী চাপ (৭৬০-১৫৯) নাইট্রোজেন ও অন্যান্য গ্যাস মানুষের দরকার হয় না। সুতরাং রকেটের মহাকাশযাত্রীর প্রকোষ্ঠে ১৫৯ মিলিমিটার পারদের চাপে অক্সিজেন থাকিলে মহাকাশযাত্রীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কোন অসুবিধা হয় না। বাতাস না হইয়া শুধু অক্সিজেন হইলে নাইট্রোজেনকে বাদ দেওয়া হয়। শরীরের জলীয় অংশে সাধারণ বায়ুর চাপে সমস্ত গ্যাসই কিছুটা দ্রবীভূত থাকে এবং এই দ্রবীভূত নাইট্রোজেন নিম্নচাপের ফলে বুদ্‌বুদের আকারে বাহির হইতে পারে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম "ডিস্‌ব্যারিজম" (Dysbarism)। মহাকাশযাত্রীরা নিম্নচাপের সম্মুখীন হইতে পারে এবং নাইট্রোজেন যখন অপ্রয়োজনীয়, তখন বাতাসের চাপের শুধু অক্সিজেন লইলে এই অসুবিধা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সুতরাং মহাকাশযাত্রীর প্রকোষ্ঠে অক্সিজেনের চাপ ১৫০ মিলিমিটার পারদের মত রাখা হয়। যে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈয়ার হয় তাহা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সরাইয়া লওয়া হয়। অতএব মহাকাশযাত্রীর প্রকোষ্ঠে সর্বদা ১৫০ মিলিমিটার পারদের চাপে অক্সিজেন থাকে এবং নাইট্রোজেন থাকে না। যে কার্বন ডাইঅক্সাইড শ্বাস-প্রশ্বাস হইতে নির্গত হয়, তাহা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সরাইবার ব্যবস্থা থাকে। ইহার উপর মহাকাশচারীরা যে পোষাক পরিয়া থাকেন, তাহাতে ৩.১ Psi চাপে অক্সিজেন থাকে। এই সব ব্যবস্থার সাহায্যে এবং পোষাকের মধ্যে অক্সিজেন এবং চাপের ব্যবস্থা থাকিবার ফলে মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যার সমাধান করা হয়। আহারের বিষয় আমরা জানি যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শর্করা, প্রোটিন, স্নেহ, খনিজ ও ভিটামিন ঠিক রাখিয়া খাবার তৈয়ার করিয়া প্যাকেট করিয়া রাখা যায়। সুতরাং খাদ্যের সমাধান করা কোন সমস্যাই নয়। আমরা দেখিয়াছি—কয়েক দিন পূর্বে আর্মষ্ট্রং ও অলড্রিন মহাকাশ-পোষাক পরিয়া চন্দ্রের পৃষ্ঠে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। সেই সময় তাঁহাদের হৃৎপিণ্ড চালনা প্রতি মিনিটে ৯০ হইতে ১০০-এর ভিতর ছিল। পৃথিবীপৃষ্ঠেও মানুষের চলাফেরার সময় হৃৎপিণ্ডের গতি প্রতি মিনিটে ৯০-এর মত হয়। সুতরাং মহাকাশের পোষাকে অক্সিজেন লইয়া যাইবার জন্য চন্দ্রপৃষ্ঠেও কোন অসুবিধা হয় নাই।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শারীরিক প্রক্রিয়ার উপর কি কাজ করে, এই বিষয়ে আলোচনা একেবারে আধুনিক যুগে সুরু হয়। শারীরবিদ্যায় আমরা জানি যে, মানুষ যেসব কাজ করে তাহা মাংসপেশীর সাহায্যে করা হয়। কোন বস্তু তুলিতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিপরীত শক্তি মাংসপেশীর সাহায্যে দিতে হয়। শরীর দণ্ডায়মান অবস্থায় এবং ইহার বিভিন্ন ভঙ্গীতে রাখিতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিপরীত শক্তি ব্যবহার করিতে হয়। কতকগুলি মাংসপেশী, যেগুলি এই বিপরীত শক্তি দেয়, সেগুলিকে মাধ্যাকর্ষণ বিপরীত মাংসপেশী বলে (Antigravity muscles)। পৃথিবীর উপর মাধ্যাককর্ষণ শক্তি থাকিবার ফলে ইহাদের কাজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খুব প্রয়োজনীয় প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু যে স্থানে এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি থাকে না শরীর সেই জায়গায় গেলে ইহার কি হইবে? মহাকাশ-বিদ্যার ইঞ্জিনিয়ারেরা বলেন যে, পৃথিবীপৃষ্ঠের ১২০ হইতে ১৪০ মাইল উর্ধ্বে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রায় শূন্য হইয়া যায়। মানুষ ইহার উপরে উঠিলে মাধ্যাকর্ষণ বিপরীত মাংসপেশীর কাজ থাকে না।

ইহা ছাড়া কোন কাজ, যেমন—কোন বস্তু তোলা বা নামান পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব কাটাইয়া করিতে হইবে। যেমন—জলের গ্লাস বা চামচে করিয়া খাবার মুখে নেওয়া এবং নামাইয়া আনা অর্থাৎ তুলিতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কাটাইয়া করিতে হইবে এবং নামাইতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সাহায্য করিবে। কিন্তু পৃথিবী-পৃষ্ঠের ১৪০ মাইল উপরে মহাকাশযানে ইহা করিতে অর্থাৎ তুলিতে ও নামাইতে মাংস-পেশীর কাজের সাহায্যে করিতে হইবে এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি না থাকায় তুলিবার সময় ইহার বাধা যেমন থাকিবে না আবার নামাইবার সময়ও ইহার সাহায্য পাওয়া যাইবে না। এখন পর্যন্ত মহাকাশযাত্রীরা যতদিন মহাকাশে রহিয়াছেন, তাহাতে এই মাংসপেশীর উপর কোন স্থায়ী প্রভাব হয় নাই। আমরা জানি যে, মাংস-পেশীর কর্মক্ষমতার সঙ্গে তাহার গঠন অঙ্গাঙ্গী-ভাবে আবদ্ধ। সক্রিয় মাংসপেশীর গঠন প্রয়োজনীয় শক্তি দিবার মত করিয়া তৈয়ার হয় এবং নিষ্ক্রিয় মাংসপেশী কাজ করে না অথবা অল্প করে বলিয়া তাহার গঠন তদনুযায়ী হাল্কা থাকে। সুতরাং অনেকদিন মানুষ মহাকাশে থাকিলে মাংসপেশীর কি পরিবর্তন হইবে, তাহা এখনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাসাপেক্ষ।

হৃৎপিণ্ড ও রক্ত-সঞ্চালন শারীরিক প্রক্রিয়া-গুলির ভিতর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান প্রক্রিয়া। যে রক্ত-সঞ্চালন শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে হইতেছে, তাহার সাহায্যেই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন কোষগুলি অক্সিজেন ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাইতেছে এবং ইহাদের দূষিত পদার্থ দূরীভূত হইতেছে। এই হৃৎপিণ্ড ও তাহার রক্ত-সঞ্চালন পদ্ধতির উপর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কি কোন প্রভাব হইবে? মানুষের দণ্ডায়মান অবস্থায় শরীরের নিম্নদিকে রক্ত-সঞ্চালনে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হৃৎপিণ্ডের রক্ত-সঞ্চালন শক্তিকে সাহায্য করিবে, কিন্তু মস্তিষ্কের রক্ত-সঞ্চালনের সময় বাধা দিবে। আবার শায়িত অবস্থায় একই সমতলে হইবার ফলে এই বাধা বা সাহায্য কিছুই থাকিবে না। পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, হৃৎপিণ্ডের চালনা প্রতি মিনিটে শায়িত অবস্থায় সর্বাপেক্ষা কম, কিন্তু দণ্ডায়মান অথবা উপবিষ্ট অবস্থায় কিছুটা বৃদ্ধি পায়। ইহার কারণ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সমান অবস্থা এবং মাধ্যাকর্ষণ বিপরীত মাংসপেশীর কাজ নাই বলিয়া হৃৎপিণ্ড-চালনার শক্তি কমিয়া যায় এবং এই সকল মাংস-পেশীর কাজ থাকিলে অথবা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তারতম্য হইলে ইহা কিছুটা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু হৃৎপিণ্ড ও তাহার শিরা-উপশিরা একটি আবদ্ধ ব্যবস্থা বলিয়া হৃৎপিণ্ডের চালনাশক্তি (Pumping action) মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে খুব সামান্য ভাবে বিঘ্নিত হইবে। সেই জন্য আর্মষ্ট্রং ও অলড্রিনের হৃৎপিণ্ড-চালনা চন্দ্রে পদচালনা করিবার সময় যেমন ৯০ হইতে ১০০-এর ভিতর ছিল, পৃথিবী-পরিক্রমা অথবা চন্দ্র-পরিক্রমার সময়ও তাহাই ছিল। সুতরাং পৃথিবীর আবহাওয়া, বিশেষতঃ অক্সিজেন ও তাপ যদি ঠিক রাখা হয়, তবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য হৃৎপিণ্ডের চালনা শক্তির বিশেষ তারতম্য হইবে না। ইহার দ্বারা পাচন-ক্রিয়ায় রক্ত হইতে কিড্‌নির (Kidney) সাহায্যে মূত্র তৈয়ার, যকৃতের ক্রিয়া, স্নায়ুকোষের ক্রিয়া ইত্যাদি বিশেষ বিঘ্নিত হইবার কারণ নাই। ইহার কারণ, ইহারা শরীরে আবদ্ধ অবস্থায় রক্তের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া কাজ করে। মহাকাশযানে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড ঠিক থাকিবার ফলে রক্তের কোন তারতম্য হয় না। সুতরাং এই রক্তের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া যাহাদের প্রক্রিয়া নিরূপিত হয়, তাহাদের ক্রিয়ারও কোন তারতম্য হওয়া উচিত নয়। মহাকাশযাত্রীদের যে পরীক্ষা হইয়াছে, তাহাতে ইহাদের ক্রিয়ার কোন ব্যাঘাত হইয়াছে বলিয়া কোন সংবাদ নাই।

বর্তমান চিন্তাধারার শারীরবিদ্যা ও বায়োকেমিষ্ট্রির সাহায্যে জানিতে পারা যায় যে, DNA ও RNA অণুগুলি প্রয়োজনীয় অণু রক্তের ভিতর হইতে সংগ্রহ করিয়া শরীরের কোষগুলি তৈয়ার করিতেছে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে এই পুষ্টি তৈয়ার করিবার অণুগুলি কি মানে একত্রিত থাকিবে এবং RNA তাহা হইতে কি গতিতে আহরণ করিবে, তাহার পরিষ্কার ধারণা এখন পর্যন্ত হয় নাই। যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অভাবে এই অণুগুলি অল্প একত্রিত হয়, যাহাতে RNA তাহার প্রয়োজনীয় অণু প্রাপ্তিতে ব্যাঘাত পায়, তবে কোষ তৈয়ার প্রক্রিয়ারও তারতম্য হইবে। বর্তমানে যে কয়টি পরীক্ষা হইয়াছে, তাহাতে এই বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই এবং এই দিকে চিন্তা করিয়া কোন পরীক্ষা হয় নাই। তবে ইহা অল্প সময়ের ব্যাপার নয়, অনেক দিন ধরিয়া যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অভাবে বাস করিতে হয় এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যদি RNA অণুর পুষ্টি তৈয়ার করিবার অণুর একত্রিতের মানের উপর প্রভাব থাকে, তবেই ইহা হইতে পারে। সুতরাং ইহা ভবিষ্যতের পরীক্ষাসাপেক্ষ।

বর্তমানে মহাকাশযাত্রার যে কয়েকটি প্রচেষ্টা হইয়াছে, তাহাতে ইহা পরিষ্কার হইয়াছে যে, মানুষ যদি মহাকাশযানের ভিতর পৃথিবীর মত পরিবেশ লইয়া যায়, তবে অন্তত: যে কয়দিনের পরীক্ষা হইয়াছে, তাহাতে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, সাধারণ জীবনধারণ করিতে কোন অসুবিধা হইবে না। মহাকাশযানের গঠন-পদ্ধতিই পৃথিবীর আবহাওয়া লইয়া যাইবার সুবিধা-অসুবিধা ঠিক করে। ভ্যান অ্যালেন বেল্টে সূর্যের এবং অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের যে ঘনীভূত শক্তি আছে, তাহা হইতে মহাকাশযাত্রীকে রক্ষা করিতে মহাকাশযানের গঠন-প্রণালীর ব্যবস্থাই প্রধান সহায়। চন্দ্রযাত্রা শেষ করিয়া যখন মহাকাশযাত্রীরা পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া আসে, তখন পৃথিবীর চতুর্দিকের গ্যাস অণুর সংঘাতে মহাকাশযানের বাহিরের আবেষ্টন অতি উচ্চ তাপ গ্রহণ করে এবং যাহা ৪১০০° ফা. পর্যন্ত উঠিয়াছিল। ষ্টীল ফার্নেসে লোহাকে তরল অবস্থায় রূপান্তরিত করিয়া রাখিতে ২০০০° ফা. দরকার হয়; সুতরাং কি পরিমাণ তাপ মহাকাশযানের চতুর্দিকে হইয়াছিল তাহা অনুমান করা যায়। কিন্তু তখন মহাকাশযানের ভিতর তাপ ৮০° ফা. ছিল। সুতরাং মহাকাশযাত্রীদের কোন অসুবিধা হয় নাই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই মহাকাশযানের গঠন-ব্যবস্থা, যাহার সাহায্যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য সব পরিবেশ লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর রাশিয়া প্রথম স্পুটনিক মহাকাশে পাঠাইয়া প্রমাণ করে যে, পৃথিবী হইতে মহাকাশে যাত্রা সম্ভব। ১২ই এপ্রিল ১৯৬১, গাগারিন প্রথম পৃথিবীর চতুর্দিকে মহাকাশযানে পরিভ্রমণ করিয়া মানুষের মহাকাশে ভ্রমণ সম্ভব করেন। ১৬ই জুলাই কলিন্স, আর্মষ্ট্রং ও অলড্রিন চন্দ্রের দিকে যাত্রা করিয়া ২১শে জুলাই চন্দ্রে পৌঁছান। প্রথমোক্ত ২ জন ২ ঘন্টা চন্দ্রপৃষ্ঠে পদচালনা করে ঐ দিনই তাঁহারা চন্দ্র হইতে রওনা হইয়া ২৪শে জুলাই প্রশান্ত মহাসাগরে প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রমাণিত করেন, এই অভিযানে মানুষের জীবনযাত্রায় কোন ব্যাঘাত হয় না। তবে দরকার, অক্সিজেন পৃথিবীতে যে চাপে আছে, তাপমাত্রা যাহাতে শরীর ঠিকমত থাকিতে পারে এবং শরীর রক্ষার উপযুক্ত আহার। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অভাবে বিশেষ অসুবিধা হয় না। মানুষের বহু আকাঙ্খিত ও স্বপ্নের জিনিষ বাস্তবে পরিণীত হইল। ২১শে জুলাই সকাল ৮টা ২৬ মিঃ ২০ সেঃ মানব-ইতিহাসে চিরকাল ভাস্বর হইয়া থাকিবে। পৃথিবীর

যুগ-যুগান্ত অতিক্রান্ত হইয়া গেলেও কোন দিনও হয়তো মুছিয়া যাইবে না এই মুহূর্তটি মানব-ইতিহাসের পাতা হইতে। এই সকলই সম্ভব হইয়াছে শারীরবিদ্যার সাহায্যে মানুষের জীবন সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা ও বিজ্ঞানের প্রয়োগ বিদ্যার সাহায্যে ইহাকে রক্ষা করিয়া পৃথিবীর আবহাওয়া লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থায়। ভবিষ্যতে এই জ্ঞান আরও কত প্রসার লাভ করে, তাহা ঔৎসুক্যের সঙ্গে সকলেই লক্ষ্য করিয়া যাইবেন। মানুষের প্রয়োজনে ইহা কতদূর কাজ করিবে, অদূর ভবিষ্যতেই তাহা প্রমাণিত হইবে। পৃথিবীর শত সমস্যা এখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে এবং তাহার জন্য মানুষ সংগ্রাম ও কলহে ব্যস্ত। কিন্তু এই সকল সত্ত্বেও বিজ্ঞান ও জ্ঞানের পরিধি কতদূর মানুষ গ্রহণ করিতে পারে, তাহার এই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আশা করি, মানুষ ভবিষ্যতে আরও সুন্দর ব্যবস্থা এই পৃথিবীতে তৈয়ার করিতে পারিবে।

চন্দ্রবিজয় ও মানব-মন

রেবন্ত বসু

চন্দ্রবিজয় মানুষের মহাবিশ্বের পথে যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ—তারপর সৌরজগতের কোন কোন গ্রহ, তারপর অন্য কোন নক্ষত্র বা সৌরজগৎ—তারায় তারায় বেড়ানোটা দার্শনিকের মনোজগতের একটা উদাসীন চিন্তা হতে আর রাজী নয়—সে এখন বিজ্ঞানের ক্ষমতার ভর করে সত্যই বাস্তব রূপ চায়। প্রশ্ন উঠেছে—চন্দ্রবিজয় করে আমাদের লাভটা কি হবে? শুধুই কি অর্থের অপচয়, আমেরিকা ও রাশিয়ার যুদ্ধশক্তির ক্ষমতাবৃদ্ধি? অথবা পৃথিবীর আবহাওয়া সম্বন্ধে অধিকতর বিশারদ হওয়া অথবা চাঁদ থেকে দুর্লভ পদার্থ সংগ্রহ করা? বিজ্ঞান, সে তো আলাদীনের গল্পের সেই দৈত্য—তাকে সৃষ্টি করতে বললে সৃষ্টি করে, ধ্বংস করতে বললে তাই করে। পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলির যাঁরা কর্ণধার, তাঁরা যদি বিজ্ঞানের এই বিরাট শক্তির অপব্যবহার না করেন, তাহলে আজ চাঁদ, কাল চাঁদ থেকে অন্য কোন গ্রহে পাড়ি দেবার মধ্যে কোন পার্থিব ধ্বংসের বীজ অঙ্কুরিত হবে না। বর্তমান সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোয় আবার ঐ সব কর্ণধারগণ অনেকাংশেই প্রভাবিত হন জনমতের দ্বারা। কাজেই শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবীর সাধারণ মানুষের উপরই পৃথিবীর ভবিষ্যতের ভাল-মন্দ নির্ভর করছে। এখন এই পৃথিবীর সাধারণ মানুষ কেমন করে এই চন্দ্রাভিযানের বিষয় ভাবে, সেটা দেখতে হবে।

সাধারণ মানুষ যখন কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় নিয়ে ভাবে তখন সাধারণতঃ এত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ভাবে যে সে ভাবনাটা ফুরিয়ে যেতে সময় লাগে না বেশী; অর্থাৎ তাদের ভাবনাটা তাদের চেতনার প্রাথমিক স্তরেই আলোড়ন সৃষ্টি করে মরে যায়, মনের গভীরে কোন দাগ কাটে না। চন্দ্রাভিযানের প্রথম হুজুগ শেষ হয়েছে, চন্দ্রবিজয়ের উত্তেজনাও অচিরে প্রশমিত হবে—সাধারণ মানুষ অফিসে যাবে, সিনেমায় যাবে, খেলা দেখবে, টিউশনী করবে—ছোটখাটো সুখদুঃখ নিয়ে মেতে থাকবে। আর তাদের এই ঔদাসীন্যের হয়তো সুযোগ নেবেন রাষ্ট্রবিদেরা—বিজ্ঞানের এই

শক্তিকে হয়তো তাঁরা নিজেদের স্বার্থের জন্যে অপচয় করবেন। এই জন্যেই প্রয়োজন মহাকাশে জয়যাত্রা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের একটা সুস্পষ্ট ধারণার।

চন্দ্রবিজয়ের, তথা মহাবিশ্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানের আকুলতার সঙ্গে সাধারণ মানুষের কি সম্পর্ক থাকতে পারে, সেটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'যখন অ্যাষ্ট্রোনমি পড়ে নক্ষত্রজগতের সৃষ্টির রহস্যশালার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ানো যায়, তখন জীবনের ছোট ছোট ভারগুলি কতই লঘু হয়ে যায়' (ছিন্নপত্রাবলী)। অ্যাষ্ট্রোনমি পড়ে যখন আমরা চাঁদের দিকে তাকাই তখন আর তাকে চরকা-বুড়ির বাসস্থান বা প্রিয়জনের মুখ বলে মনে করতে পারি না—তখন আর মাথার উপরের সন্ধ্যার আকাশ শুধু মায়াবী সুন্দর হয়ে থাকে না, সে হয়ে ওঠে এক আশ্চর্য সত্য। ঐ চাঁদের কথাতেই ফিরে আসা যাক। ওর বাস্তব সত্যগুলি কি? তা হচ্ছে চাঁদ পৃথিবীর একটি উপগ্রহ—ওর নিজের কোন আলো নেই—সবই সূর্যের প্রতিফলিত আলো। ঐ চাঁদ পৃথিবী থেকে প্রায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল দূরে থেকে ঘণ্টায় মোটামুটি ২৩০০ মাইল বেগে ২৯½ দিনে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করছে। সেই প্রদক্ষিণের সময় সে একই পিঠ পৃথিবীর দিকে সর্বদা ফিরিয়ে রেখেছে। চাঁদে দিনের বেলায় উত্তাপ ফুটন্ত জলের চেয়েও অনেক বেশী আর রাত্রিবেলায় শৈত্য বরফের চেয়ে প্রায় ২৫০° ফারেনহাইট নীচে। আরো জানা গেল, চাঁদের ব্যাস প্রায় ২১৬০ মাইল, উপাদান জল থেকে ৩½ গুণ ভারী। ৮০টা চাঁদের ওজন হচ্ছে একটা পৃথিবীর ওজনের সমান। আর ঐ কালো কালো চাঁদের কলঙ্ক-গুলি কি? ওগুলি বড় বড় গহ্বর। আর আছে পাহাড়, তার সর্বাঙ্গে হচ্ছে উল্কাবৃষ্টি। চাঁদে কি কোন প্রাণী আছে? এই প্রশ্নের উত্তর: সম্ভাবনা কম, কারণ সেখানে বায়ু নেই, তাপমাত্রার পার্থক্যও খুব বেশী। চাঁদ নিঃসঙ্গ, একাকী, উদাসীন। এইটুকু জানলাম আর মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় লিখে পাস করে সওদাগরী অফিসে চাকরি নিলাম—এই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে পড়াটাই মাঠে মারা গেল। শুধু জানলেই হবে না, ভাবতে হবে। চাঁদ তো কাছের জিনিষ—শুক্রে মহাকাশযান পাঠিয়েছে রাশিয়া, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শনি—আগামী কালের কোন না কোন দিন তাদের কাছে বার্তা পাঠাবে পৃথিবীর মানুষ। এই তো গেল একটি সৌরজগৎ—তারপর বিরাট শূন্যতা—তারপর আরো এক নক্ষত্র—হয়তো বা আরো এক সৌরজগৎ—তার গ্রহমণ্ডলী, তারপর আরো—আরো। কি বিশাল, কি ব্যাপক এই মহাবিশ্ব! পৃথিবীর সমস্ত বালুকণার গণনা মানুষের পক্ষে যদি বা সম্ভব হয়, কিন্তু মহাবিশ্বের সমস্ত নক্ষত্রের গণনা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাতে কি? জগদীশচন্দ্র লিখেছেন—'অধিকতর বিস্ময়কর কাহাকে বলিব? বিশ্বের অসীমতা কিম্বা এই সসীম ক্ষুদ্র বিন্দুতে অসীম ধারণা করিবার প্রয়াস—কোন্‌টা অধিক বিস্ময়কর?' যে মানুষ এমন শক্তিমান, যার মধ্যে জগদীশচন্দ্র দেখেছেন দৈবশক্তির প্রকাশ সে কি তুচ্ছ সঙ্কীর্ণতা, তুচ্ছ অহঙ্কার নিয়ে কালযাপন করতে পারে—এতে কি সে নিজেই নিজের শুধু ক্ষতিই নয়—অপমানও করে না? এই অসীম বিশ্বলীলায় যার না আছে আদি, না আছে অন্ত, যার ব্যাপকতা বোঝাবার জন্যে আমাদের পুরাণ বলছেন—মানুষের ষাট হাজার বছর ব্রহ্মার এক মুহূর্ত—সেখানে আমাদের দুদিনের হাসি-কান্নার জীবন কি করুণভাবে তুচ্ছ, আমরা কত ক্ষুদ্র, আমরা কত অসহায়! তবু আমরা বিজয়ী, কারণ অসীমের রহস্য আমরা উদ্‌ঘাটন হয়তো করতে পারবো না, কিন্তু সেই রহস্যের দোলা

লেগেছে আমাদের রক্তে, আমাদের মনে—আমরা আর শুধু পৃথিবী নিয়ে সন্তুষ্ট নই, আমরা মহাজগতের পথের পথিক হয়েছি। মাঝে মাঝেও যদি এমনি করে ভাবা যায়, তাহলে যুদ্ধ, হত্যা, কালোবাজারি, রেষারেষি ইত্যাদি যাবতীয় নোংরা জিনিষ থেকে আমরা কিছুক্ষণের জন্যে অন্ততঃ নিজেদের মুক্ত করে আনতে পারি।

পৃথিবীর মানুষকে হতে হবে ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'স্কাইলার্কের' মত 'Type of the wise who soar, but never roam/True to the kindred points of Heaven and Home'. আমাদের এক পা থাকতো মাটিতে, এক পা আকাশে। আমরা আমাদের পার্থিব কাজও করবো আবার মহাজগতিক নাগরিক হিসাবেও নিজেদের ভাববো। সেই কথাই পাই রবীন্দ্রনাথের একটি লেখায়, 'দিনের বেলায় পৃথিবী ছাড়া আমাদের কাছে কিছুই নেই—রাত্রে গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে অনন্ত জগতের সঙ্গে আমাদের যোগ স্থাপন হয়। কাজের সময় আমরা পৃথিবীর মানুষ, বিশ্রামের সময় আমরা জগতের লোক' (ছিন্নপত্রাবলী)। চন্দ্রবিজয় যদি সাধারণ মানুষকে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে উৎসুক করে তুলতে পারে, মহৎভাবে বিরাটভাবে ভাবাতে পারে তবেই এর সার্থকতা। কারণ তাহলে মানুষের মনোজগতে এক বিরাট ওলটপালটের পালা আসবে—মানুষ তার সকল সঙ্কীর্ণতা আর স্বার্থান্ধতা থেকে মুক্তিলাভ করবে।

এই নিবন্ধের পরিশেষে মহাবিশ্বের কথা বিশেষ করে একান্তে চিন্তা করলে মানুষের কি ভাবের উদয় হতে পারে, তার বর্ণনা প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র কর্তৃক উদ্ধৃত জার্মান কবি রিক্টারের একটি রচনার কিয়দংশ লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে: জার্মান কবি রিক্টার স্বপ্নরাজ্যে দেবদূতের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। দেবদূত কহিলেন, 'মানব, তুমি বিশ্বরচয়িতার অনন্ত রচনা দেখিতে চাহিয়াছ—আইস, মহাবিশ্ব দেখিবে।' মানব দেবস্পর্শে পৃথিবীর আকর্ষণ হইতে বিমুক্ত হইয়া দেবদূতসহ অনন্ত আকাশপথে যাত্রা করিল। আকাশের উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তর ভেদ করিয়া তাহারা ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সপ্ত গ্রহ পশ্চাতে ফেলিয়া মুহূর্তের মধ্যে সৌরদেশে উপনীত হইল। * * * পরে সৌররাজ্য ত্যাগ করিয়া সুদূরস্থিত তারকার রাজ্যে উপস্থিত হইল। * * * দক্ষিণে বামে, সম্মুখে পশ্চাতে দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করিয়া অগণ্য জগতের অনন্ত শ্রেণী। * * * ঊর্ধ্বহীন, অধোহীন, দিকহীন অনন্ত। পরে এই মহাজগৎ অতিক্রম করিয়া আরও দূরস্থিত অচিন্ত্য জগতের উদ্দেশ্যে তাহারা চলিল। * * * ধারণাতীত মহাব্রহ্মাণ্ডের অগণ্য সমাবেশ দেখিয়া মানুষ একেবারে অবসন্ন হইয়া বলিল, 'দেবদূত! আমার প্রাণবায়ু বাহির করিয়া দাও। এই দেহ অচেতন ধূলিকণায় মিশিয়া যাউক। অসহ্য এই অনন্তের ভার। এই জগতের শেষ কোথায়?' (অব্যক্ত)। এই যে ক্ষুদ্রতার ভাব, অসহায়ের ভাব, মুক্তির আকাঙ্খা এই সবই মানব-মনের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া। আরো যখন গম্ভীরভাবে চিন্তা করবে মানুষ তখন সে বলবে: আমার গর্ব, আমি এত ক্ষুদ্র হয়েও এক আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী। সেই ক্ষমতার উৎসস্থল আমার মন যে হার মানতে চায় না, যে আত্মবিশ্বাসে অটল, ক্ষণিকের ব্যর্থতা যার কাছে অন্তিম সার্থকতারই স্তম্ভমাত্র। আরো এক আশ্চর্য অনুভূতি জাগবে তার মনে। এই উদাসীন জগৎলীলায় আমরা ছোট একটি গ্রহে কিছু প্রাণী কিছুদিনের জন্যে উপস্থিত হয়েছি; তবে কেন এই সাদা-কালোয়, ধনী-দরিদ্রে, উচ্চ-নীচে কৃত্রিম পার্থক্য—দেশে দেশে জাতে জাতে বিদ্বেষ? সব মানুষ যেদিন এমনি করে ভাববে, সেদিন বার্ট্রাণ্ড রাসেলের 'World State' আর শুধু কল্পনা থাকবে না—সত্যে রূপান্তরিত হবে।

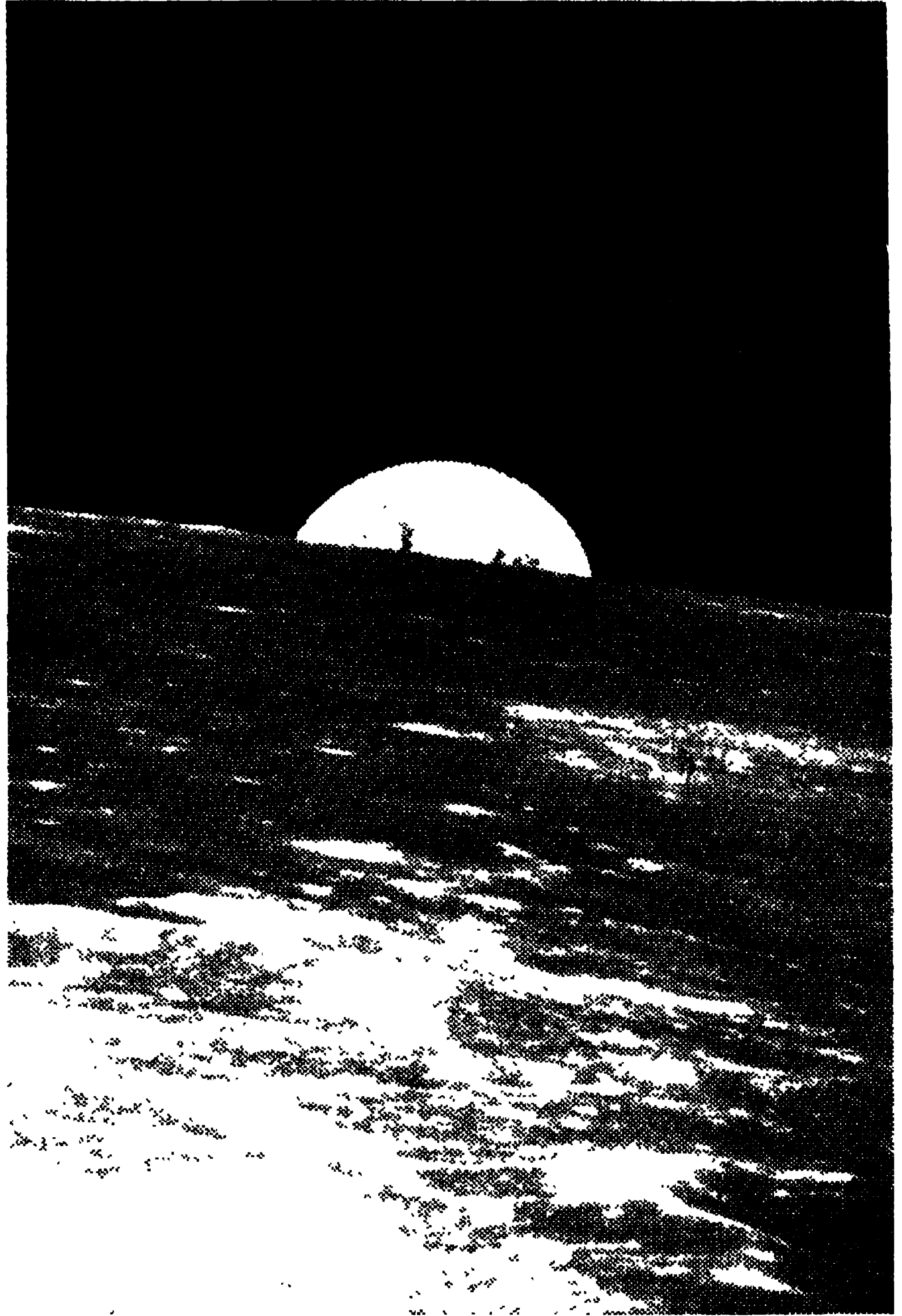
মানুষের কাছে চাঁদের হয়েছে হার, আরো অনেক গ্রহও উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হবে—তারই সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনোজগতেও আসুক আমূল পরিবর্তন—তবেই মানুষ হবে অসীমের উপাসক, আলোকের অনুগামী, অমৃতের পুত্র।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অগাষ্ট—১৯৬৯

২২শ বর্ষ ঃ ৮ম সংখ্যা



চাঁদের দিগন্তে পৃথিবীর উদয়ের এই অপূর্ব ও বিস্ময়কর আলোকচিত্রখানি নিয়েছেন অ্যাপোলো-১০-এর মহাকাশচারিগণ। গত মে মাসে ৮দিনের অভিযানে ৩১বার চন্দ্র প্রদক্ষিণকালে তাঁরা চাঁদের দিগন্তে পৃথিবীর উদয় ও অস্তের লীলাখেলা অনেকবার দেখেছেন।

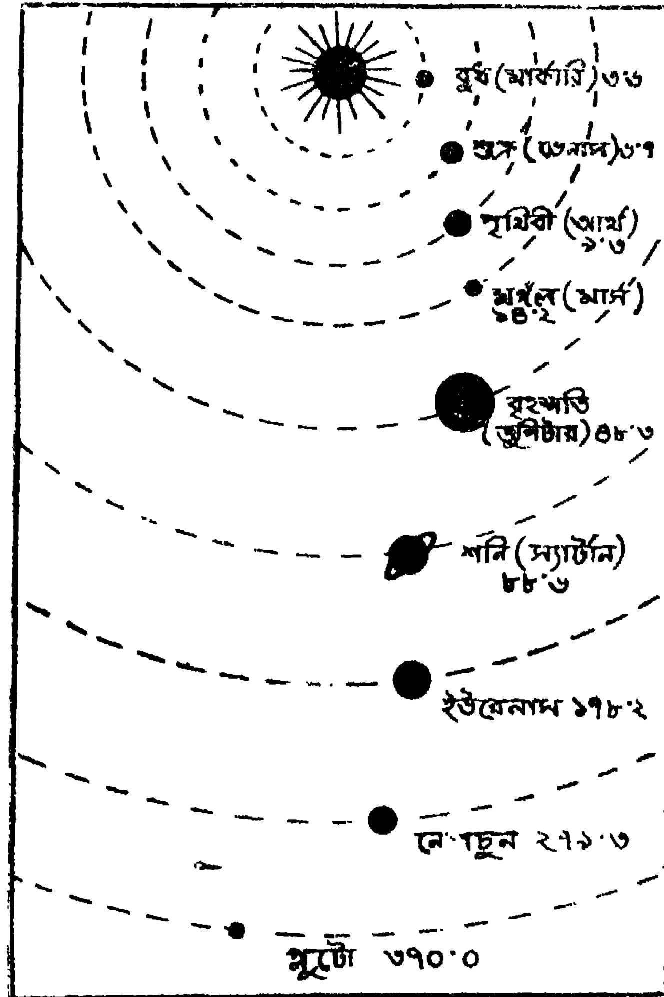
পৃথিবীর নিকট প্রতিবেশী শুক্র

বছরের কয়েক মাস রোজ সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশের গায়ে একটি অতি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ফুটে উঠতে দেখা যায়। যাকে সচরাচর লোকে বলে সন্ধ্যাতারা। এটাকেই আবার রাত্রিশেষে পূব আকাশে জ্বল জ্বল করতে দেখা যায়। আমরা বলি, প্রভাতী তারা বা শুকতারা। আমরা শুকতারা বা সন্ধ্যাতারা বলি সত্য, কিন্তু মহাশূন্যের সব গ্রহ-নক্ষত্রের চেয়ে অধিকতর উজ্জ্বল এই জ্যোতিষ্কটি আসলে কোন তারকা বা নক্ষত্র নয়। তারকা হলে এটি এরূপ স্থির আলো দিত না, এত উজ্জ্বলও দেখাতো না। বস্তুতঃ এটি আমাদের পৃথিবীর মতই সৌর পরিবারের একটি গ্রহ—সূর্য-পরিক্রমায় পৃথিবীর সহযাত্রী ও নিকটতম প্রতিবেশী।

আমাদের আবাসভূমি এই পৃথিবী সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণরত একটি গ্রহ মাত্র। একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবী সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করছে ৩৬৫ দিনে, যে সময়টা হলো আমাদের এক বছর। শুক্রগ্রহও একইভাবে অপর একটি কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। আর তাকে একবার প্রদক্ষিণ করতে শুক্রগ্রহের লাগে আমাদের ২২৪ দিন। দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর বছরের চেয়ে শুক্রের বছর অনেক ছোট। এর কারণ, পৃথিবীর চেয়ে শুক্রগ্রহ সূর্যের নিকটবর্তী অপেক্ষাকৃত ছোট একটি কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, কাজেই সময় লাগছে কম। সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব হলো ৯,৩০,০০,০০০ মাইল আর শুক্রগ্রহের হলো ৬,৭০,০০,০০০ মাইল। তাহলে পৃথিবী থেকে শুক্রের গড় দূরত্ব দাঁড়ালো ২,৬০,০০,০০০ মাইল। অন্যান্য গ্রহগুলির তুলনায় পৃথিবী থেকে শুক্রের এই বিরাট দূরত্বও হলো নিকটতম। এর কারণ, দূরত্ব হিসাবে পৃথিবীর পরবর্তী গ্রহ মঙ্গল সূর্য থেকে ১৪,২০,০০,০০০ মাইল দূরবর্তী, কিন্তু পৃথিবী থেকে মঙ্গল গ্রহের গড় দূরত্ব হলো ৪,৯০,০০,০০০ মাইল, শুক্রগ্রহের দূরত্বের চেয়ে অনেক বেশী, প্রায় দ্বিগুণ। এসব হিসাব থেকে দেখা যায় যে, গ্রহগুলির মধ্যে শুক্রই পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী, পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী—দূরত্ব মাত্র ২,৬০,০০,০০০ মাইল। এই বিরাট ব্যবধানও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশালত্ব ও গ্রহ-নক্ষত্রাদির অসীম দূরত্বের তুলনায় অতি নগণ্য।

অজানাকে জানবার আকাঙ্খা মানুষের প্রকৃতিগত। অন্ধকার রাতে মহাশূন্যের উজ্জ্বল আলোকবিন্দুগুলির দিকে চেয়ে আদিম মানুষও বিস্মিত হয়েছে। ভেবেছে, ওগুলি কি? যুগ যুগ ধরে এই আদিম জিজ্ঞাসা ক্রমে রূপ নিয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞানে। বহুকাল খালি চোখেই মানুষ আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রগুলির গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করেছে। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে নিকোলাস কোপার্নিকাস গ্রহ-নক্ষত্রগুলির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ

করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূত্রপাত করেন সত্য, কিন্তু তাও ছিল ভ্রান্তিপূর্ণ। কোপার্নিকাসের মতে, সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে—যেমন আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়। তারপর ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে গ্যালিলিও টেলিস্কোপ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি নির্ভুলভাবে পর্যবেক্ষণ করে অনেক তথ্য উদ্ঘাটন করেন। পৃথিবী, বুধ ও শুক্র সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে এবং এরা সূর্যের



১নং চিত্র
সূর্য থেকে গ্রহগুলির গড় দূরত্ব কোটির হিসাবে দেখানো হয়েছে।

এক-একটি গ্রহ—এই তথ্য প্রচার করেন গ্যালিলিও। প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে এই তথ্যের সত্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁকে চরম দণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল।

যাহোক, এসব হলো জ্যোতির্বিজ্ঞানের গোড়ার কথা। আমরা এখানে শুক্রগ্রহের কথাই আলোচনা করবো। গ্যালিলিও তাঁর মৃত্যুর আগে ১৬১০ খৃষ্টাব্দে তাঁর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে শুক্রগ্রহের কক্ষপথ ও বার্ষিক গতির বিবিধ তথ্য আবিষ্কার করে যান। ক্রমে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। আবিষ্কৃত হয়েছে

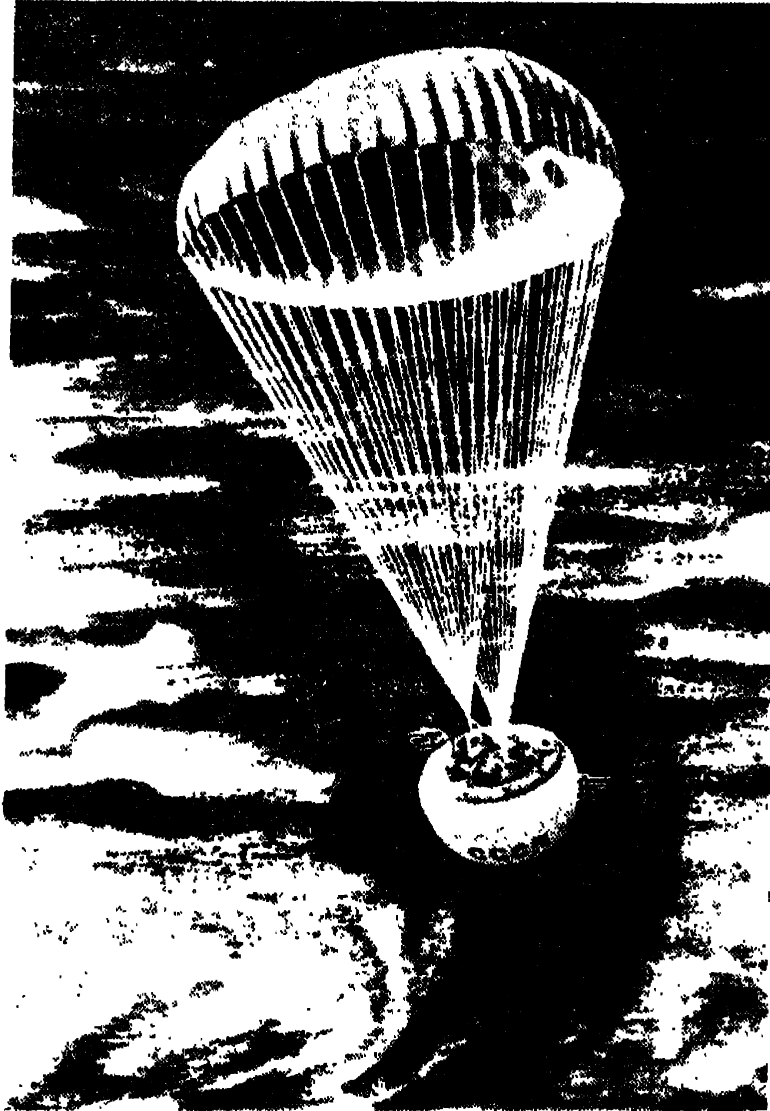
স্পেক্ট্রোস্কোপ বা বর্ণালী-বিশ্লেষণ যন্ত্র ও দূরবীক্ষণিক ক্যামেরা। সাম্প্রতিক কালে রেডার, রেডিও, টেলিস্কোপ প্রভৃতি যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। এসবের সাহায্যে শুক্র-গ্রহের গঠন, তার আকাশমণ্ডল, শুক্রপৃষ্ঠের তাপ ও চাপ প্রভৃতি বিভিন্ন তথ্যের সন্ধান অনেকটা নির্ভরযোগ্যভাবেই পাওয়া গেছে। পৃথিবীর নিকটতম হলেও ২,৬০,০০,০০০ মাইল দূরবর্তী শুক্রগ্রহের সঠিক তথ্যাদি জানা সহজ নয়—কতকটা পর্যবেক্ষণ, কতকটা যুক্তি এবং কতকটা গণনার উপর নির্ভর করতেই হয়। মানুষের জানবার আকাঙ্খা অদম্য। শুক্রগ্রহের মাটি কিরূপ, তার বায়ুমণ্ডল আছে কিনা, তাপ ও চাপ কেমন, কোন প্রাণীর অস্তিত্ব সেখানে সম্ভব কি-না—এসব তথ্য জানবার জন্যে মানুষ ব্যাকুল।

মানুষের জ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা আজ যে অভাবনীয় উন্নত স্তরে পৌঁচেছে, তাতে শুক্রগ্রহে অভিযান ও তার সাক্ষাৎ তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপার আর কল্পনার স্তরে নেই—অদূর ভবিষ্যতে হয়তো একদিন মানুষ শুক্রগ্রহে পৌঁছুবে। ইতিমধ্যেই রাশিয়ার ভেনেরা-৫ ও ভেনেরা-৬ নামক দুটি মহাকাশযান গত ১৬ ও ১৭ই মে (১৯৬৯) তারিখে শুক্রগ্রহে অবতরণ করেছে। রকেট-চালিত এই মহাকাশযান দুটি সোভিয়েট রাশিয়ার ভূপৃষ্ঠ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পুরা চার মাসে মহাশূন্য পাড়ি দিয়ে অক্ষত দেহে শুক্রপৃষ্ঠে ধীরে ধীরে অবতরণ করেছে এবং যান্ত্রিক ব্যবস্থায় শুক্র সম্বন্ধে বিবিধ বার্তা পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। মানুষের হাতে তৈরি কোন পার্থিব জিনিষ বা যন্ত্রের কোন গ্রহে অবতরণ এই প্রথম এবং সোভিয়েট রাশিয়ার প্রযুক্তিবিদ্যার অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক।

এই সাফল্যের আগেও অবশ্য রাশিয়া আরও চারবার চারটি মহাকাশযান শুক্রের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিল। কিন্তু তাদের কোন-কোনটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মহাশূন্যে হারিয়ে গেছে, কোনটি শুক্রের পৃষ্ঠে আছড়ে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। কেবল সোভিয়েট রাশিয়াই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও কয়েকবার শুক্রের অভিমুখে মহাকাশযান পাঠিয়েছে, কিন্তু সফলকাম হয় নি। আমেরিকার মেরিনার-৫ মহাকাশযান শুক্রগ্রহের অপেক্ষাকৃত নিকট দিয়ে ছুটে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মহাকাশের কোন্ দিকে চলে গেল, তার কোন হদিশ পাওয়া যায় নি। এসব অসাফল্যের ভিতর দিয়েও শুক্রগ্রহের অনেক তথ্য যানগুলির গতিপথের বেতার-সঙ্কেতের মাধ্যমে জানা গিয়েছিল। সর্বশেষ ভেনেরা-৫ ও ভেনেরা-৬ শুক্রপৃষ্ঠ থেকেই তার সব তথ্য জানিয়েছে। এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

ইতিপূর্বে শুক্রগ্রহের বাস্তব তথ্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বিশেষ কিছু জানা ছিল না। এই প্রথম ভেনেরা-৫ ও ভেনেরা-৬ গ্রহটির বিবিধ তথ্য সাক্ষাৎভাবে জেনে বেতার-সঙ্কেতের সাহায্যে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে এবং মানুষের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করেছে। মহাকাশযান অভিযানে এই সাফল্যের তুলনা নেই। এই মহাকাশযান দুটি

শুক্রের আবহমণ্ডলের ভিতর দিয়ে অবতরণকালেও প্রায় এক ঘণ্টা ধরে তার রাসায়নিক গঠন, বাষ্পীয় চাপ ও ঘনত্ব এবং তাপমাত্রা সম্পর্কে সঠিক বার্তা পাঠিয়েছে। এসব বার্তা থেকে জানা গেছে, এক রকম গাঢ় গ্যাসপুঞ্জ শুক্রগ্রহকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছে যে, সূর্যের আলোক তা ভেদ করে শুক্রপৃষ্ঠে পৌঁছায় না। এই



২নং চিত্র
শুক্রগ্রহের আবহমণ্ডলের মধ্য দিয়ে মানবহীন যানের অবতরণ (পরিকল্পিত চিত্ররূপ)

গাঢ় বাষ্পীয় আবরণে সূর্যালোক প্রতিফলিত ও বিচ্ছুরিত হয়েই শুক্রগ্রহ উজ্জ্বল দেখায়—তার প্রকৃত পৃষ্ঠভাগ অন্ধকার। এই বাষ্পীয় আবরণের জন্যেই শুক্রপৃষ্ঠের টেলিভিসন-চিত্র গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি—তার সম্ভাবনাও নেই। আরও জানা গেছে, শুক্রের ঐ বাষ্পীয় আবহমণ্ডলের তাপমাত্রা বিভিন্ন উচ্চতায় ২৫০ ডিগ্রি থেকে ৪০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। চাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের প্রায় ২০ গুণ।

ভেনেরা-৫ ও ভেনেরা-৬ মহাকাশযান দুটিকে অবিকল একই রকম যন্ত্রপাতিসহ প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে উভয় যান থেকে প্রেরিত বার্তা অনুরূপ হয় এবং তথ্যাদির নির্ভুলতা প্রমাণিত হতে পারে। যান দুটির প্রত্যেকটির ওজন ছিল ১,১৩০ কিলোগ্রাম। যাহোক, মহাকাশযান দুটিতে বিবিধ যন্ত্রপাতির মধ্যে গ্যাস-বিশ্লেষক যন্ত্রটি বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে শুক্রের আবহমণ্ডলের গ্যাসীয় গঠন নিরূপণ করে বেতার-সঙ্কেতে জানিয়েছে। জানা গেছে, শুক্রের উপরিভাগে প্রায় ৭০ শতাংশ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস, ২'৫ শতাংশ নাইট্রোজেন, মোটামুটি এক শতাংশ অক্সিজেন এবং বাকীটা নানা রকম নিষ্ক্রিয় গ্যাস ও এক রকম বাষ্প রয়েছে। এই মিশ্র গ্যাসীয় মণ্ডলের ঘনত্ব এবং তাপমাত্রাও পৃথিবীর প্রাণী-জগতের পক্ষে মারাত্মক। কার্বন ডাইঅক্সাইডের আধিক্যহেতু শুক্রগ্রহে আমাদের পৃথিবীর জীবনধারা অব্যাহত রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই মহাকাশ অভিযানে এভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবীতে জীবন বলতে আমরা যা বুঝি, শুক্রে তার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। কিন্তু কোন কোন বিজ্ঞানী এখনও মনে করেন যে, শুক্রগ্রহে হয়তো বা সিলিকন-ভিত্তিক কোন জীবনধারা থাকতে পারে। তবে এটা তাত্ত্বিক অনুমান মাত্র।

সোভিয়েট রাশিয়ার এই গ্রহান্তর অভিযানের সাফল্য অতি বিস্ময়কর। এথেকে প্রাপ্ত শুক্রগ্রহের বিবিধ তথ্যাদি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে, বর্তমান বা ভাবীকালের কোন মানুষ কোন দিন শুক্রগ্রহ জয় করতে পারবে না, মানুষের জীবনধারণ সেখানে অসম্ভব। তা সত্ত্বেও মানুষের গ্রহান্তর অভিযান ও মহাকাশ বিজয়ের আকাঙ্খা যেরূপ উদগ্র হয়ে উঠেছে এবং সে পথে ক্রমোন্নতি ঘটছে, তাতে মনে করা যেতে পারে—এবারের ভেনেরা-৫ ও ভেনেরা-৬ মহাকাশযানের যান্ত্রিক তথ্যানুসন্ধানে সন্তুষ্ট না থেকে রাশিয়া বা আমেরিকা হয়তো একদিন শুক্রগ্রহে মানুষও পাঠাবে। চন্দ্রপৃষ্ঠের অবস্থাও বোধ হয় মনুষ্য-বসবাসের উপযোগী নয়, কিন্তু তথাপি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চন্দ্রে তিনজন মানুষ পাঠিয়ে সুস্থশরীরে তাঁদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনেছেন। মানুষের সর্বপ্রথম চন্দ্রপৃষ্ঠে পদার্পণ এবং প্রত্যাবর্তন পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব বিস্ময়কর ঘটনা। মহাকাশ অভিযানের প্রথম পর্ব শেষ হলো মাত্র।

দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মানুষের পক্ষে চাঁদে বাস করা কি সম্ভব?

চাঁদ আমাদের দেশে ছেলেবুড়ো সবারই মামা। জুলে ভার্নে, লুকিয়ানা প্রভৃতি লেখকদের চাঁদ সম্পর্কে লেখা মজার মজার গল্পের কথা আমরা জানি। তাঁরা কল্পনায় যে চন্দ্র-অভিযানের কথা চিন্তা করে গেছেন, সে কল্পনা আজ বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারেরও আগে, যে সময় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা যুক্তি-বিচারের কথা কেউ চিন্তা করতো না, সেই আদিম যুগ থেকেই পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদকে মানুষ চিনতো। সে যুগে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ইত্যাদির উদয় ও অস্ত লক্ষ্য করে সময় নির্ধারণ করা হতো। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশ সম্পর্কে মানুষের জিজ্ঞাসা ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। কোপার্নিকাসের যুগ থেকে আরম্ভ করে বহু জ্যোতির্বিজ্ঞানীর বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যুক্তি-বিচারের ফলে মহাকাশ সম্পর্কে প্রচুর তথ্য আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারে জমা হয়েছে। পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যবর্তী পথের দুর্গমতা আজ বিজ্ঞানীর চেষ্টায় দূর হয়েছে। মানুষের তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের আওতা ছাড়িয়ে চলে গেছে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রে এবং সেখান থেকে সে চাঁদকে লক্ষ্য করেছে। পৃথিবী থেকে চাঁদের যে দিক কোন দিনই দেখা যায় না, কিছুকাল পূর্বে মহাকাশচারীরা চাঁদের সেই বিপরীত দিক দেখে পৃথিবীর মাটিতে ফিরে এসেছেন।

চাঁদে যাবার জন্যে এই যে অভিযান-পর্ব চলছিল, গত ২১শে জুলাই তার বিস্ময়কর সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি ঘটেছে। ঐ তারিখে পৃথিবীর মানুষ চন্দ্রপৃষ্ঠে পদার্পণ করে সেখানকার কিছু মৃত্তিকা ও উপলখণ্ড নিয়ে নিরাপদে ফিরে এসেছে। এর ফলে স্বভাবতঃই আমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগে যে, এত আগ্রহ নিয়ে যে চাঁদে মানুষ পাঠানো হলো, সেখানে মানুষ বাস করতে পারবে তো? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে এপর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের দূরবীন, রেডার প্রভৃতি যন্ত্র ও বিভিন্ন মহাকাশযানের সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পাওয়া চাঁদসম্পর্কিত তথ্যগুলি আলোচনা করা দরকার। এই আলোচনার মাধ্যমেই হয়তো আমাদের প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাবে।

চাঁদ হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ এবং সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী। প্রায় উপবৃত্তাকার পথে চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে চলেছে। চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী দূরত্ব প্রায় দু-লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল। পৃথিবী চাঁদের তুলনায় একাশী গুণ ভারী। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের শক্তি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের শক্তির তুলনায় প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। পৃথিবীর মাটিতে একটা বস্তুর যা ওজন, চাঁদে গিয়ে সে

ওজনটা প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ দাঁড়াবে, অর্থাৎ এখানে যে মানুষের ওজন দেড় মণ, চাঁদে তার ওজন হবে ১০ সেরের মত।

চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই। সূর্যের আলো প্রতিফলিত করেই চাঁদের আলোর সৃষ্টি। পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করতে চাঁদের যে সময় লাগে, সেই সময়ে চাঁদ একবার নিজের অক্ষের চতুর্দিকে ঘুরে আসে। এই কারণেই আমরা পৃথিবী থেকে চাঁদের একটা দিকই দেখতে পাই।

চাঁদের গায়ে যে কালো দাগগুলি আমাদের কাছে চাঁদের কলঙ্ক নামে পরিচিত, সেগুলিকে বলা হয় চাঁদের সমুদ্র। কিন্তু শুধু নামের বাহার। চাঁদে না আছে বৃষ্টি, না আছে জল। চাঁদের থালার ঝলমলে স্থানগুলি হলো, উঁচু-নীচু চক্রাকার পাহাড়, ছোট-বড় অসংখ্য ফাটল, আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ ও গোলাকার সমতল ক্ষেত্রের রাজত্ব।

চাঁদে জল, বাতাস, উদ্ভিদ বা প্রাণী—কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই বলে আমাদের ধারণা। চাঁদে দিনের বেলায় তাপমাত্রা প্রায় ১০০° সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি ওঠে ও রাতে তাপমাত্রা হিমাঙ্কেরও প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ ডিগ্রী নীচে নেমে যায়। চাঁদের যে দিকটা আমরা দেখতে পাই না, তার সঙ্গে চাঁদের দৃশ্য দিকটার কিছু পার্থক্য আছে। জানা গেছে যে, চাঁদের বিপরীত পৃষ্ঠে জ্বালামুখ বা গহ্বরের সংখ্যা অনেক বেশী আর সমুদ্রের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। চাঁদের একটা রাত অথবা দিন পৃথিবীর চৌদ্দটা রাত অথবা দিনের সমান।

জীবনধারণের জন্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ আলো, তাপ, বাতাস ও জলের প্রয়োজন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত চাঁদ সম্পর্কে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে, তাথেকে বোঝাই যাচ্ছে যে, চাঁদে মানুষের পক্ষে সাধারণভাবে বাস করা সম্ভব হবে না। চাঁদের জমিতে বাস করবার সমস্যা প্রচুর। চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই, কাজেই সেখানে বাতাসের চাপও নেই। বায়ুমণ্ডলের আবরণ না থাকবার ফলে মহাকাশ ও সূর্য থেকে নির্গত বিভিন্ন ধরণের রশ্মি, যেগুলি মানুষের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, সেগুলি সরাসরি চাঁদের জমিতে নেমে আসে। এই সব অনিষ্টকারী রশ্মির প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে মানুষকে চাঁদে বাস করতে হবে। বায়ুমণ্ডল না থাকবার দরুণ মহাকাশ থেকে আগত উল্কাপিণ্ড সোজাসুজি এসে চাঁদের বুকে আঘাত করবে। এই সব উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষে মানুষের জীবননাশ অবশ্যম্ভাবী। চাঁদে অক্সিজেনের অভাব দূর করবার জন্যে বিজ্ঞানীরা নানা রকম চিন্তা করছেন। তাঁদের ধারণা, কাচপাত্রে ক্লোরেলা নামক একজাতীয় শ্যাওলার চাষ করলে তাথেকে মানুষের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পাওয়া যাবে। আপাততঃ পৃথিবী থেকে সাময়িকভাবে অক্সিজেন সরবরাহের একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা আরও মনে করেন যে, চাঁদের পাথর গুঁড়া

করে কিছু অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাস পাওয়া যেতে পারে—যেগুলি মিলিয়ে জল সরবরাহের একটা আংশিক ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।

চাঁদে শব্দ চলাচলের মাধ্যম হিসাবে বায়ুমণ্ডলকে পাওয়া যাবে না—কাজেই সেখানে মানুষের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলা সম্ভব হবে না। সে ক্ষেত্রে বেতার যন্ত্রের প্রয়োজন অপরিহার্য। কিন্তু তাতেও একটা অসুবিধা আছে। পৃথিবীর চারদিক ঘেরা আয়নমণ্ডল থেকে বেতার-তরঙ্গ প্রতিহত হয়ে বহুদূর পর্যন্ত প্রচারিত হয়। চাঁদে সম্ভবতঃ কোন আয়নমণ্ডল নেই। কাজেই বেতার-তরঙ্গ সেখানে বেশী দূর ছড়াতে পারবে না।

আগেই বলেছি যে, চাঁদে দিন ও রাতের তাপমাত্রার প্রভেদ খুবই বেশী—তাপমাত্রার এই বিপুল পার্থক্যে মানুষ বাঁচতে পারবে না। চাঁদে পরিচলনের মাধ্যম হিসাবে বায়ু নেই, কাজেই দিনের বেলায়ও তাপ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছড়াতে পারে না। এই কারণেই আলো থেকে এক বা দুই পা এগিয়ে বা পিছিয়ে কোন ছায়াঘেরা জায়গায় ঢুকলেই তাপমাত্রা হিমাঙ্কের বহু নীচে এসে দাঁড়াবে। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে, চাঁদের জমির প্রায় কুড়ি-পঁচিশ ফুট তলায় মানুষের বাসের উপযুক্ত তাপমাত্রা পাওয়া যেতে পারে।

চাঁদে শারীরিক ওজন কম হবার দরুণ হৃদ্‌যন্ত্রের উপর রক্তের চাপও কম পড়বে। এর ফলে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্ষয় হবে আস্তে আস্তে অর্থাৎ চাঁদে গেলে মানুষের জীবনে বার্ধক্য আসবে খুব ধীরে ধীরে। কাজেই ব্লাড প্রেসারের রোগীদের কাছে চাঁদ হবে স্বর্গরাজ্য।

চাঁদের জমিতে স্থানে স্থানে ছোট-বড় অসংখ্য ফাটল থাকায় অবাধ ভ্রমণের অনেক বাধা আছে। তবে পৃথিবীর মাটিতে যে ব্যক্তি পাঁচ ফুট লাফাতে পারে, চাঁদে গিয়ে সে ৩০ ফুট লাফাতে পারবে। কাজেই চাঁদের জমির উপর ৩০ কি ৪০ ফুট ফাটল লাফিয়ে পার হওয়া তার কাছে মোটেই শক্ত ব্যাপার হবে না।

এতক্ষণ ধরে আমরা যে আলোচনা করলাম, তাথেকে খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, মানুষ স্বাভাবিকভাবে চাঁদে বাস করতে পারবে না। তবে চাঁদে বাস করবার মত পরিবেশ তৈরি করতে বিজ্ঞানীরা যে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন, সেটা সফল হলে মানুষের পক্ষে চাঁদে বাস করা সম্ভব হবে।

গত কয়েক বছর ধরে চাঁদে যাবার জন্যে খুব তোড়জোড় চলে আসছিল। ১৯৫৭ সালে অক্টোবর মাসে রাশিয়ার প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক-১ থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত অনেক মহাকাশযানই মহাকাশে পাঠানো হয়েছে। আমেরিকা ও রাশিয়ার পাঠানো বিভিন্ন মহাকাশযানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে চাঁদের বিষয়ে বহু নতুন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এই তো সেদিন অ্যাপোলো-৮ নামক মহাকাশযানে চড়ে তিনজন

মহাকাশযাত্রী চাঁদের পিঠের প্রায় ৭০ মাইল দূর থেকে চাঁদকে দশ বার প্রদক্ষিণ করে পৃথিবীর মাটিতে ফিরে এলেন। অ্যাপোলো-৮-এর সাফল্যমণ্ডিত অভিযানের পর গত মার্চ মাসে অ্যাপোলো-৯ ও তারপর অ্যাপোলো-১০-কে নিয়ে পরীক্ষা চালানো হলো। অ্যাপোলো-৯-কে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ভিতর রেখেই নানারকম পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী মহাকাশযান অ্যাপোলো-১০-কে নিয়ে যাওয়া হলো চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের আওতার মধ্যে। অ্যাপোলো-১০ ৭০ মাইল দূর থেকে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করবার সময় ও এর থেকে বিচ্ছিন্ন চন্দ্রযানে চড়ে দু-জন অভিযাত্রী চাঁদের পৃষ্ঠদেশের দশ মাইলের মধ্যে এগুলেন। পৃথিবীতে ফেরবার সময় চন্দ্রযানের আরোহীরা ফিরে এলেন মূল মহাকাশযানটিতে ও চন্দ্রযানকে সরিয়ে দেওয়া হলো সূর্যের দিকে অনিশ্চিতের পথে। এর পরেই গত ১৬ই জুলাই অ্যাপোলো-১১ মহাকাশযানে তিনজন নভশ্চর চন্দ্রাভিমুখে যাত্রা করেন এবং ২১শে জুলাই তারিখে অ্যাপোলো-১১ মহাকাশযান থেকে চন্দ্রযানে করে দু-জন মহাকাশচারী চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করেন।

চাঁদ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গেলেও একে ঘিরে অনেক প্রশ্নই আমাদের মনে জমে আছে—যার উত্তর আজও মেলে নি, তাই অনেক চন্দ্র-বিজ্ঞানী মনে করেন যে, চাঁদে হয়তো এমন জায়গাও আছে, যেখানে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই বাস করতে পারবে।

যুগ যুগ ধরে যা কবির কল্পনায় উদ্ভাসিত হয়েছে, যাকে নিয়ে বিভিন্ন যুগে ও কালে অজস্র রূপকথা তৈরি হয়েছে—বিজ্ঞানীরা তার সম্বন্ধে বহু তথ্য উদ্‌ঘাটনে সক্ষম হয়েছেন। এমন দিনও আসতে পারে, যখন বিদেশ যাত্রার মত চাঁদে যাত্রার পথও আমাদের কাছে সুগম হয়ে উঠবে।

শ্যামসুন্দর দে

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। চাঁদে আগ্নেয়গিরির অস্তিত্বের কোন প্রমাণ আছে কি?

কানাই সরকার ও মনোরঞ্জন সাহা
চাকদহ

উঃ ১। টেলিস্কোপের মাধ্যমে চাঁদের দিকে চোখ ফেরালেই আমরা চাঁদের গায়ে উঁচু-নীচু বহু পাহাড় ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গহ্বর দেখতে পাই। গ্যালিলিও প্রথম এই গহ্বরগুলিকে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ বলে অনুমান করেন। এই গহ্বরগুলি আয়তনে যথেষ্ট বড়। কিন্তু চাঁদের এই গহ্বরগুলি যে সত্যই আগ্নেয়গিরির জ্বালা-মুখ এই সম্বন্ধে বহুদিন পর্যন্ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। পরবর্তী কালে একজন ইংরেজ জ্যোতির্বিদ এই গহ্বরগুলির মুখ থেকে নির্গত একপ্রকার উজ্জ্বল দীপ্তি

দেখতে পান, যাকে তিনি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গার বলে মনে করেন। আরও পরে ম্যাডলর ও বিয়ার নামক দুজন বিজ্ঞানী দীর্ঘকাল পরীক্ষা চালাবার পর এক নতুন সিদ্ধান্তে পৌঁছেন। তাঁদের মতবাদ অনুযায়ী চাঁদে জীবনের কোন অস্তিত্ব নেই অর্থাৎ সেখানে জল, বায়ু, গাছপালা, ঝড়বৃষ্টির কোন লক্ষণই নেই; সুতরাং সেখানে জীবন্ত আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু আর একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী চাঁদ পর্যবেক্ষণের সময় হঠাৎ একটা গহ্বরকে অদৃশ্য হতে দেখেন। বিজ্ঞানীরা এই অদৃশ্য হওয়াকে ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদির সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন এবং অবশেষে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, চাঁদে প্রাকৃতিক লীলা এখনও শেষ হয় নি। তখন বিজ্ঞানীমহলে চাঁদের সজীবতা প্রমাণের জন্যে উৎসাহ পড়ে গেল এবং তাঁরা হঠাৎ বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে এমন কতকগুলি রঙের রেখা আবিষ্কার করেন, যার উৎস হতে পারে একমাত্র আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। কিন্তু কোন কোন বিজ্ঞানীর মত অনুযায়ী গহ্বরের মধ্যে আটকে থাকা গ্যাস হঠাৎ বেরিয়ে আসবার ফলেই উপরিউক্ত ব্যাপারটা ঘটছে। চাঁদে আগ্নেয়গিরি আছে কি নেই, এই বিতর্কের সমাধানের জন্যে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা চাঁদকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন এবং চাঁদের বুকে কতক-গুলি লাল, কমলা ইত্যাদি রঙের ছোপের সন্ধান পেলেন। এই ছোপগুলির অস্তিত্বের মূলে কি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গারই দায়ী—বিজ্ঞানীদের মনে এই জিজ্ঞাসা ভীষণভাবে দেখা দিল। কিন্তু আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গার হলে ছোপের চারপাশের জায়গা ধূলা ও ভস্মরাশিতে ঢাকা পড়তো। কিন্তু ছোপগুলি যখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তখন ব্যাপারট আলাদা। তাঁরা ধারণা করলেন যে, সূর্য থেকে যে সব প্রোটন কণা নির্গত হচ্ছে, সেগুলি চাঁদে কোন বায়ুমণ্ডল না থাকায় সোজাসুজি তার পৃষ্ঠে এসে পড়ছে এবং তার ফলেই ছোপগুলির সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের মতে, চাঁদের গহ্বরগুলি মহাকাশ থেকে ছুটে-আসা উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে চন্দ্রপৃষ্ঠের সংঘর্ষে সৃষ্টি হয়েছে—পৃথিবী থেকে যেগুলিকে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ বলে মনে হয়। তবে বর্তমানে চাঁদে পাঠানো রুশ ও মার্কিন যন্ত্রগুলির নিরীক্ষায় জানা গেছে যে, চাঁদ বেশ সজীব; কাজেই সেখানে জীবন্ত আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব থাকা খুব অসম্ভব নয়। অ্যাপোলো ১০-এর অভিযাত্রীরা চাঁদের কোন কোন স্থানে এমন সব জমি দেখেছেন যেগুলি অগ্ন্যুৎপাতের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়, তবে তাঁরা চাঁদের বুকে কোন সজীব আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব দেখতে পান নি।

চাঁদের এই বিরাট গহ্বরগুলির সৃষ্টি সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। তবে মানুষ চাঁদের মাটিতে পদার্পণ করেছে এবং সেখানকার মাটি সংগ্রহ করে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে। এই মাটি পরীক্ষা করলেই চাঁদে আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের বহুদিনের বিতর্কের সমাধান হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

শ্যামসুন্দর দে

বিবিধ

চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের পদার্পণ

গত ২১শে জুলাই (১৯৬৯) পৃথিবীর দু-জন মানুষ নীল আর্মস্ট্রং এবং এডুইন অলড্রিন চাঁদের বুকে এই সর্বপ্রথম তাঁদের পদচিহ্ন অঙ্কিত করে এসেছেন। গত ১৬ই জুলাই ভারতীয় সময় মূল যানের সাংকেতিক নাম কলম্বিয়া এবং চন্দ্রযানের সাংকেতিক নাম ঈগল।

প্রায় সাত ঘণ্টা চন্দ্রযানে বিশ্রামের পর ২১শে জুলাই ভারতীয় সময় সকাল ৮-২৬ মিনিট ২০ সেকেণ্ডে আর্মষ্ট্রং ঈগল-এর মই বেয়ে চাঁদের



নীল আর্মষ্ট্রং



এডুইন অলড্রিন

সন্ধ্যা ৭টা ২ মিনিটে কেপ কেনেডি থেকে তিনজন মার্কিন নভশ্চর অ্যাপোলো-১১ মহাকাশ-যানযোগে চন্দ্র অভিমুখে যাত্রা করেন।

অ্যাপোলো-১১ অভিযানে মূল যানের চালক ছিলেন মাইকেল কলিন্স এবং চন্দ্রযানের নায়ক ছিলেন আর্মস্ট্রং ও চালক ছিলেন অলড্রিন। মাটিতে প্রথম পদার্পণ করেন। তার কুড়ি মিনিট পরে অলড্রিনও চন্দ্রপৃষ্ঠে নামেন। তাঁরা চাঁদের মাটি ও পাথর সংগ্রহ করেন এবং একটি সিস্-মোমিটার ও একটি লেসার প্রতিফলক যন্ত্র চন্দ্রপৃষ্ঠে স্থাপন করেন।

চন্দ্রপৃষ্ঠে তাঁদের চলাফেরা ও অন্যান্য কার্যক্রম

পৃথিবীর মানুষ যাতে দেখতে পায়, সে জন্যে চন্দ্রযান থেকে চাঁদের মাটিতে নামবার সময় আর্মষ্ট্রং বাইরের এমন এক জায়গায় একটি টেলিভিশন ক্যামেরা বসিয়ে দেন, যেখান থেকে সব কিছু দেখা যায়।



মাইকেল কলিন্স

পৃথিবী থেকে যাত্রার ৮ দিন পরে ২৪শে জুলাই ভারতীয় সময় রাত্রি ১০টা ১৯ মিনিটে তিনজন মহাকাশচারীকে নিয়ে মূল অ্যাপোলো-১১ যানটি হাওয়াই দ্বীপের কাছে মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে নিরাপদে অবতরণ করে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাবিংশ বর্ষ | সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ | নবম সংখ্যা

মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষা

শ্রীত্রিদিবরঞ্জন মিত্র

ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষা আরম্ভ হয় রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ[১] স্থাপনের সময় হইতে।* এতদিন পর্যন্ত ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষার প্রচলন ছিল। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই অধ্যাপক বিনয় সরকার, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীরা বাংলা দেশে বাংলা ভাষায় উচ্চশ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার প্রথা প্রচলন করিবার জন্য বিশেষ ভাবে আন্দোলন সুরু করেন। তবে সেই আন্দোলন দেশের প্রতিটি শিক্ষিত মনকে বিশেষ ভাবে আন্দোলিত করিতে না পারায় বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার প্রচলন হয় নাই। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে স্বাধীন ভারতে এই আন্দোলন দেশ জোরদার হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রতিটি শিক্ষিত মনকে নাড়া দিয়াছে। ফলে এখন শিক্ষকদের অনভ্যাসহেতু ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইতে দেখা যাইতেছে। তাই শিক্ষার মাধ্যম লইয়া নানা রকম তর্কের ঝড় উঠিয়াছে।

---

১ অধুনা প্রেসিডেন্সি কলেজ নামে খ্যাত।

*Report of the Education Commission(1964-66). Education and National Development, by D.S. Kothari (1966). P, 397

এক পক্ষ বলিতেছেন, বাংলায় উপযুক্ত পরিভাষার অভাব এবং ঐ ভাষায় শিক্ষা দিতে গেলে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই অনভ্যাস-হেতু ভীষণ অসুবিধা হয়। তাঁহাদের বক্তব্য, ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াও বাঙালীরা কি বিজ্ঞানে আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন হয় নাই? দ্বিতীয় পক্ষ বলিতেছেন, বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া সম্ভব, তবে ইংরেজীতে অজ্ঞতার জন্ত আমরা অন্তান্ত উন্নত দেশগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িব।

প্রথম পক্ষের কথা লইয়াই আলোচনা করা যাউক। প্রকৃত পক্ষে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক শব্দের উপযুক্ত সরস পরিভাষার অভাব রহিয়াছে। ইহার কারণ, এতকাল পর্যন্ত এই বিষয় লইয়া দেশব্যাপী কোন আন্দোলন দেখা দেয় নাই। ফলে বিজ্ঞানী ও ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের অনাকর্ষণ হেতু কোন পরিভাষা বা সুখপাঠ্য কোন* পাঠ্যপুস্তক রচিত হয় নাই। তবে প্রয়োজন ব্যতীত কোন কিছুই হয় না। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইতেছি—

"আমি জানি, তর্ক এই উঠিবে, তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চ শিক্ষা দিতে চাও, কিন্তু বাংলা ভাষায় উঁচু দরের শিক্ষা গ্রন্থ কই? নাই সেকথা মানি, কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষা গ্রন্থ হয় কী উপায়ে? শিক্ষা গ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে, সৌখিন লোকে সখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে, কিংবা সে আগাছাও নয় যে, মাঠে-বাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। শিক্ষাকে যদি শিক্ষা গ্রন্থের জন্তে বসিয়া থাকিতে হয় তবে পাতার জোগাড় আগে হওয়া চাই তার পরে গাছের পালা এবং কূলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে" (শিক্ষার বাহন, ১৩২২)। সুতরাং প্রয়োজনই বাংলা ভাষায় অধিক সংখ্যক বৈজ্ঞানিক শব্দের উপযুক্ত সরস পরিভাষা ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা করিতে সাহায্য করিবে। প্রয়োজনের তাগিদে সব কিছু হয় বলিয়াই একথাও মনে রাখা উচিত যে, অল্প কয়েক দিনের মধ্যে বেশ কিছু টাকা খরচ করিলেই উপযুক্ত সরস পরিভাষা ও সুখপাঠ্য বিজ্ঞান গ্রন্থ হইবে না। সব কিছুই সময়সাপেক্ষ। ভাষাটা মানুষের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম। একে টাকা দিয়া কেনা যায় না। এর প্রকাশের জন্ত সময় লাগে। সুতরাং পরিভাষা রচনার আগে প্রচুর চিন্তার প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, পরিভাষা রচনা লইয়া বিভিন্ন পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়াছে। এক পক্ষ বলিতেছেন, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক শব্দের ইংরেজী নামই রাখা উচিত। প্রতিপক্ষ বলিতেছেন, বাংলায় পুরাপুরি নতুন পরিভাষা উদ্ভাবন করা উচিত। বর্তমান লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এই কথা বলা যায় যে, প্রকৃত পক্ষে অহেতুক পরিভাষার ব্যবহার না করাই ভাল। যেমন, যে সকল বৈজ্ঞানিক শব্দের ইংরেজী নাম বাংলায় বেশ ভালভাবে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের কোন পরিভাষার প্রয়োজন নাই। অন্তদিকে যে সকল শব্দ এখনও বাঙালীর কথায় বা লেখায় স্থান পায় নাই, তাহাদের সরস পরিভাষা করা উচিত। তবে ঐ সকল শব্দের পরিভাষা করিবার সময় মূল ইংরেজী শব্দের আভিধানিক অনুবাদ না করিয়া ইংরেজী ভাষাভাষী অঞ্চল ছাড়া পৃথিবীর অন্তান্ত উন্নত দেশে ঐ সকল শব্দকে কি বলে, তাহা জানিয়া ও শব্দগুলির অর্থের তাৎপর্য বোধগম্য করিয়া বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের সাহায্যে পরিভাষা সৃষ্টি করা উচিত। প্রয়োজন হইলে অর্থাৎ অল্প কথায় শুনিতে ভাল হইলে

*এখানে 'কোন' অর্থে খুব বেশী সংখ্যাকে বুঝান হইয়াছে। একটিও ছিল না, তাহা নহে।

যে কোন বিদেশী শব্দকেও গ্রহণ করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাউক, বাংলা ভাষায় যদি ফড়িং শব্দটি না থাকিত, তবে ইংরেজীর 'ড্রাগন ফ্লাই' ও 'ড্যামসেল ফ্লাই' শব্দ দুইটির বাংলা হইত ড্রাগন-মাছি ও ড্যামসেল-মাছি। কিন্তু জাপানীতে ফড়িংকে বলে টোম্বো। তখন ড্রাগন বা ড্যামসেল-মাছি ছাড়িয়া টোম্বো কথাটা গ্রহণ করা অনেক ভাল। অন্য দিকে জার্মেনীতে ইংরেজী নাইট্রিক অ্যাসিডকে বলে সলপিটার সয়রে। এই ক্ষেত্রে জার্মেনীর নাম গ্রহণ করা অপেক্ষা ইংরেজী নাম গ্রহণ করাই ভাল। আবার রেডিও-অ্যাক্টিভের বাংলা নাম তেজস্ক্রিয় যে রকম ছোট তেমনই শ্রুতিমধুর। ঠিক এই প্রকারে বিভিন্ন ভাষা হইতে শ্রুতিমধুর শব্দ চয়ন ও নূতন শব্দ সৃষ্টি করিতে পারিলেই বাংলা ভাষায় উপযুক্ত সরস পরিভাষার সৃষ্টি হইবে। অনর্থক বেশীর ভাগ বৈজ্ঞানিক শব্দের ইংরেজী উচ্চারণ রাখিলে আধুনিক শিক্ষক ও লেখকদের হয়তো কিছু সুবিধা হইবে, তবে কোন সুখপাঠ্য প্রবন্ধ বা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করা যে কোন লেখকের পক্ষে বেশ কষ্টকর হইবে বলিয়া মনে হয়।

সুতরাং বর্তমানে প্রচলিত দুর্বোধ্য পরিভাষা ব্যবহারের কষ্ট দূর করিতে হইলে সময় লইয়া পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার সাহায্যে পরিভাষা সৃষ্টি করিলেই বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিবে। তবে পরিভাষা যতই ছোট ও শ্রুতিমধুর হউক না কেন, প্রথম কয়েক বৎসর শিক্ষকদের আড়ষ্টতা থাকিবেই। কিন্তু বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষিত যে কোন শিক্ষকের নিকট ইহা দুর্বোধ্য বা অ-সুখপাঠ্য বলিয়া মনে হইবে না। ইংরেজী ভাষাভাষী অঞ্চল ছাড়া অন্য স্থানের শিক্ষকদের মাতৃভাষায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতে যে রকম অসুবিধা হয় না, পঞ্চাশ বৎসর পরে বাংলা ভাষায় মাধ্যমে শিক্ষিত বাঙালী শিক্ষকদেরও তদ্রূপ হইবে। ইহার প্রমাণস্বরূপ দেখা যায়, যদিও ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষিত শিক্ষকদের বাংলায় বিজ্ঞান পড়াইবার সময় ইংরেজীর আড়ষ্টতা কাটে নাই, কিন্তু বাংলা ভাষায় মাধ্যমে পঠিত উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বহু ছাত্র-ছাত্রী অনায়াসে পরিভাষা ব্যবহার করে। তবে ইহারও ব্যতিক্রম আছে। কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহার কারণ, তাহারা যে বই পাঠ করে, অনেক সময় তাহার লেখক অজ্ঞতা বা সুবিধাহেতু ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেন ও করিতে উৎসাহ দান করিয়া থাকেন। অনেক ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকগণ পছন্দ করেন যে, তাঁহাদের পুত্র-কন্যারা ইংরেজীর মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা করুক। তবে ঐ সকল ছাত্র-ছাত্রীরা বুঝিবার জন্য সব কিছুই বাংলায় চিন্তা করে, কেবল মাত্র বৈজ্ঞানিক শব্দগুলি ছাড়া। শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের এই আড়ষ্টতা কাটাই-বার দায়িত্ব শিক্ষকদের। তাঁহারা নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ উপায়ের সাহায্যে ইহাকে কমাইতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়।

(১) রাতারাতি শিক্ষার মাধ্যম পরিবর্তন না করা, (২) প্রত্যেক শ্রেণীর শিক্ষক যদি তাঁহাদের পছন্দমত বৈজ্ঞানিক বিষয়ের কঠিন কঠিন সমস্যাগুলির সমাধান সরল বাংলায় উপযুক্ত পরিভাষার সাহায্যে নিয়মিতভাবে লিখিবার অভ্যাস করেন। কারণ বাংলা ভাষায় কথা বলা ও পড়ানো এক জিনিষ নয়। সুতরাং যাহা পড়াইতে হইবে, তাহা যদি বাংলায় লিখিবার অভ্যাস থাকে, তবে পড়াইবার সময় আড়ষ্টতা কাটিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। শুধু প্রবন্ধ প্রকাশের সাহায্যেই নয়, বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অধ্যা-পকগণ বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিষদ আয়োজিত যে কোন আলোচনা সভায়

যদি বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির বিষয় আলোচনা করেন, তাহাতেও তাঁহাদের বর্তমান আড়ষ্টতা দূর হইবে বলিয়া মনে হয়। এই অভ্যাসের ফলে শিক্ষক এবং ছাত্র ছাড়াও দেশের অনেক উপকার হইবে। ভাষা, প্রকাশের বৈচিত্র্যতায় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিবে। বিজ্ঞানে অজ্ঞ ব্যক্তিরাও অধিক সংখ্যক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠের ফলে বিজ্ঞানের নূতন প্রগতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করিবার সুযোগ পাইবেন। সকলেই জানেন যে, প্রত্যেক দেশের বিজ্ঞানের অগ্রগতি নির্ভর করে, যত বেশী সংখ্যক মানুষ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে বিশ্বাস করেন ও দৈনন্দিন কর্তব্যসমূহে ব্যবহার করেন—তাহার উপর; কতজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক সেই দেশে বাস করেন বা কতগুলি মৌলিক গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেন, তাহার উপরে নয়। সুতরাং এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার সময় আড়ষ্টতা কাটাইবার জন্য সাধারণ লোকের মধ্যে বিজ্ঞানের নূতন চিন্তাধারা প্রচারের জন্য ও দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য শিক্ষক মহাশয়দের নিয়মিতভাবে মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিবার অভ্যাস করা উচিত। সরকার এই বিষয়ে সরকারী বৈজ্ঞানিক দপ্তরের বিজ্ঞানীদের নানা ভাবে উৎসাহিত করিতে পারেন। প্রয়োজন হইলে পদোন্নতির প্রলোভনও দেখাইতে পারেন।

দ্বিতীয় পক্ষ সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলে বলিতে হয় যে, যে সকল দেশে ইংরেজী ভাষা ব্যতীত মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই সকল দেশ কি পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, না সেই সকল দেশের কোন উন্নতি হয় নাই? ইংরেজী ভাষাভাষী অঞ্চল কি পৃথিবীর সব কিছুর আধার? তাহা নহে। ইংরেজীতে কথা না বলিলেও সূর্যকিরণ পাওয়া যায়, নদীর জলও পান করা যায়—ইহারা কোন বিশেষ অঞ্চলের জন্য নহে। বিজ্ঞান বা সত্যও ঠিক অনুরূপ ভাবে কোন দেশ বা ভাষার জন্য নহে। যদি তাহাই হইত, তবে এযাবৎ যত সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেইগুলি সবই ইংরেজী ভাষাভাষী অঞ্চল হইতেই হইত। কিন্তু তাহা তো নহেই বরং অন্যান্য দেশে কোন অংশে কম হয় নাই। বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক বা সাহিত্যিক যে রকম রোজ নূতন সত্য আবিষ্কার করিতে বা গল্প লিখিতে পারেন না বা নূতন সত্য আবিষ্কার বা নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিবার একমাত্র অধিকারী নহেন, ঠিক তেমনই পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধের অধিবাসীরা সকলের আগে আধুনিক বিজ্ঞানের অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছিল বলিয়াই তাঁহাদের ভাষা বিজ্ঞানের সত্য প্রকাশ করিবার একমাত্র ভাষা হইতে পারে না। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্যের সকলের আবার এক রকম ভাষা নহে। বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কার চিন্তাশক্তির উপর নির্ভর করে, কোন্ ভাষায় প্রকাশ হইবে, তাহার উপর নির্ভর করে না। সেই চিন্তা করিবার ক্ষমতাকে শক্তিশালী করিতে গেলে চাই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা। অতএব অতি জোরের সঙ্গেই বলা যায় যে, বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষা না দিলে বাংলা দেশে খুব বেশী সংখ্যক বৈজ্ঞানিক হইবে না এবং এই ভাষার বহুল প্রচার বা সমৃদ্ধি কোনটাই সম্ভব নহে। ইহাও সত্য যে, ভবিষ্যতে বাংলাও একটি আন্তর্জাতিক ভাষারূপে গণ্য হইবার ক্ষমতা রাখে। তবে তাহা নির্ভর করে বাঙালী সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানীদের উপর। সুতরাং ভবিষ্যতে বাংলা আন্তর্জাতিক ভাষারূপে গণ্য হইলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পণ্ডিতেরাও তাঁহাদের প্রয়োজনেই বাংলা ভাষা শিখিবেন এবং আমরাও প্রয়োজনের তাগিদে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশের ভাষা শিখিতে কুণ্ঠাবোধ করিব না। যদি তাহা না হইত, তবে রাশিয়ার

রবীন্দ্রনাথ বা অন্যান্য বাঙালী সাহিত্যিকদের লেখার অনুবাদ বা প্রচার কিছুই হইত না। শুধু বাংলা কেন, ভারতের অন্যান্য ভাষার সঙ্গে আমাদের তথাকথিত মৃত ভাষা সংস্কৃতের বহু বই বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। সুতরাং বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক ভাষারূপে উন্নত করিতে গেলে তাহাকে সর্বতোভাবে শক্তিশালী করিবার প্রয়োজন এবং সেই প্রচেষ্টা এখন হইতেই করিতে হইবে, অপেক্ষা করিবার সময় আছে বলিয়া মনে হয় না। এই বিষয় বর্তমান প্রবন্ধকারের অভিমত এই যে, প্রত্যেক বাঙালী বৈজ্ঞানিক তাঁহার কিছু কিছু আবিষ্কার বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিবেন এবং বিদেশে তাহা প্রচারের জন্য যে কোন আন্তর্জাতিক ভাষায় প্রবন্ধটির মূল কথা (Abstract) প্রবন্ধটির প্রারম্ভে বা শেষে, প্রকাশ করিবেন। ইহা ছাড়া বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহে বাংলায় প্রকাশিত প্রবন্ধকে প্রমাণপঞ্জীর তালিকাভুক্ত করিবেন। এইরূপ কিছুকাল চলিবার পর বাংলা ভাষা একটি আন্তর্জাতিক ভাষারূপে গণ্য হইবার সুযোগ পাইবে বলিয়া বিশ্বাস করা যায় এবং তখন বহু যুগান্তকারী আবিষ্কারের বিবরণ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিলেও বিদেশে অতি সহজে প্রচার লাভ করিবে। যে শিশুকে তাহার অভিভাবকগণ অবোধ বলিয়া সংসারের কোন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হইতে দেন না, সে বৃদ্ধ হইয়াও নাবালকের মত থাকিয়া যায়। পরন্তু শরৎচন্দ্রের "অভাগীর স্বর্গের" কাঙ্গালীর মত ছেলে এই সংসারে অল্প বয়সেই বৃদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং চিরকালই যদি বাংলা ভাষায় সব কিছু অসম্ভব বলিয়া বাংলা ভাষাকে দূরে সরাইয়া রাখা হয়, তবে বাংলা ভাষা কোন দিনই উচ্চবর্গের ভাষা গোষ্ঠীর সহিত এক সঙ্গে বসিতে পারিবে না এবং বেশীর ভাগ বাঙ্গালী ছাত্রকেই বিজ্ঞানের রসাল ডাঁটা চুষিয়া খাইয়াই শান্ত থাকিতে হইবে, চিবাইবার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। এক কালে বাংলার গদ্য বলিয়া কিছু ছিল না এবং শ্রীরামপুরের মিশনারীদের আগে বাংলা ভাষায় গদ্য লিখিবার সুদৃঢ় প্রচেষ্টা প্রায় কেহই করেন নাই। কিন্তু আজ দেড়শত বৎসরের মধ্যে রচিত বাংলার গদ্য, বাংলার ছোট গল্প পৃথিবীর যে কোন ভাষার সাহিত্যের তুলনায় কোন অংশে কম নয়। সুতরাং বাংলা ভাষাকে উন্নত করিবার দায়িত্ব এড়াইয়া না গিয়া প্রত্যেক বাঙালী বিজ্ঞানীর উচিত এখন হইতেই তাহার উন্নয়নের চেষ্টা করা। সে চেষ্টা যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন, ভবিষ্যতে তাহা বিরাট বটবৃক্ষের আকার ধারণ করিবে।

উপসংহারে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলা উচিত—

(১) মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থাকে স্বাগত জানাইয়া ক্রমে ক্রমে তাহার প্রচলন করা।

(২) বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক শব্দসমূহের পরিভাষা করিবার সময় ইংরেজী শব্দের আভিধানিক অনুবাদ না করিয়া অন্যান্য আন্তর্জাতিক ভাষার সাহায্য গ্রহণ করা ও শব্দের প্রকৃত অর্থকে ভিত্তি করিয়া নূতন শব্দ চয়ন ও সংকলন করা উচিত। তবে যে সকল শব্দ বাংলা ভাষায় বেশ ভালভাবে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের আর কোন পরিবর্তন করা উচিত নয়।

(৩) বাংলা ভাষায় পড়াইবার সময় ইংরেজীর আড়ষ্টতা কাটাইবার জন্য প্রত্যেক শিক্ষক ও বিজ্ঞানীর উচিত সরল বাংলায় নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করা।

(৪) বাংলাকে আন্তর্জাতিক ভাষার পর্যায়ে উন্নীত করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক বাঙালী বিজ্ঞানীর উচিত তাঁহার কিছু কিছু গবেষণার ফল বাংলায় প্রকাশ করা ও মূল কথাটি (Abstract) যে কোন আন্তর্জাতিক ভাষায় প্রকাশ করা, তাহা প্রচারের জন্য।

আশা করা যায়, এই কয়টি কথা যদি বাঙ্গালী বিজ্ঞানীরা চিন্তা করেন, তবে নিশ্চয়ই বাংলা ভাষা প্রকৃত পক্ষে সাহিত্যিকের ভাষার সঙ্গে বিজ্ঞানীর ভাষার পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারিবে।

খাদ্যোৎপাদনে জীবাণুর ভূমিকা

শ্রীসতীন্দ্রকিশোর গোস্বামী

বর্তমান পৃথিবীতে ক্ষুধার্ত ও অপরিপুষ্ট লোকের হার এত বেশী যে, খাদ্য-সমস্যা এক বিরাট সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। জনসমষ্টির দ্রুত বৃদ্ধি একে আরও বেশী ভয়াবহ করে তুলেছে। খাদ্য-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে বৈজ্ঞানিক তৎপরতা এত বেশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে যে, বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে চিন্তা করছেন, কেমন করে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। কর্ষিত ভূমির পরিমাণ, জলসেচ, উন্নত ধরণের বীজ প্রভৃতি চিরাচরিত পন্থা ছাড়াও অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব কিনা, তার উপর বিজ্ঞানীরা গুরুত্ব আরোপের চেষ্টা করছেন। মানবজাতি যে সব জীবাণুর সংস্পর্শে এসেছে, তাদের মধ্যে শত্রু ও মিত্র দুই-ই আছে। কেন না, এই জীবাণুরাই যেমন আমাদের দেহে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী বলে চিহ্নিত, ঠিক তেমনি এই জীবাণুসৃষ্ট বহু রাসায়নিক পদার্থ আবার রোগ ধ্বংসকারী বলে বর্ণিত; যেমন—পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন, টেরামাইসিন ইত্যাদি। সুতরাং এই জীবাণুগুলিকে যদি লুই ষ্টিভেনসন বর্ণিত ডাঃ জেকিল ও মিঃ হাইড বলে চিহ্নিত করা হয়, তবে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। খাদ্যের বেলায়ও জীবাণু সম্বন্ধে একই কথা বলা চলে। এরা যেমন খাদ্যের পচনে সাহায্য করে, তেমনি সুবাসিত ও বহু মুখরোচক খাদ্য সৃষ্টি করতেও এদের জুড়ি নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই জীবাণুগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই বর্তমান প্রবন্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই জীবাণুগুলি যে খাদ্যের পরিমাণ বাড়াতে বা খাদ্যের গুণ বৃদ্ধি করতে পারে, সেই সম্বন্ধে আলোকপাত করবার চেষ্টা করা হবে।

আমাদের খাদ্য সাধারণতঃ উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগৎ থেকে আহরণ করা হয়। উদ্ভিদ-জগতে দেখা যায় যে, মাঠে যখন ফসল বোনা হয়, তখন প্রচুর খাদ্যশস্য মাঠেই নষ্ট হয়। শুধু তাই নয়, মাঠের ফসল যখন গুদামজাত করা হয়, তখনও অনেক খাদ্য নষ্ট হয়। প্রাণী-জগতে দেখা যায় যে, উপযুক্ত খাদ্য ও পরিচর্যার অভাবে এরাও বহু রোগের শিকার হয় এবং এর ফলে প্রাণী-জগতের যে ক্ষতি হয়, তার প্রভাব খাদ্য আহরণের এক প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন যে, যদি এই সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা যায়, তবে খাদ্য ঘাটতির অনেকাংশ পূরণ করা সম্ভব হবে। এখন দেখা যাক, কি ভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগৎ এই ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে।

প্রতি বছর প্রচুর খাদ্যশস্য আহরণের পূর্বেই মাঠে নষ্ট হয়ে যায়। অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে যে, জীবাণুই হলো এর প্রধান কারণ। একটা সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, আমেরিকায় মাঠেই খাদ্যশস্য নষ্ট হয় বার্ষিক প্রায় ১.৯ বিলিয়ন ডলার মূল্যের। এই পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ছোট একটা দেশের খাদ্য-সমস্যার অনেকটা সমাধান করা যায়। এই উদ্ভিদ-রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুগুলির অধিকাংশই মাটিতে থাকে এবং গাছের কাণ্ড অথবা মাটির নীচের অংশকে আক্রমণ করে। আবার কতক-গুলি জীবাণু বাতাসে ভেসে বেড়ায় এবং বায়ু

বা কীট-পতঙ্গের দ্বারা বাহিত হয়ে গাছের ক্ষতি করে থাকে। অনেক সময় যদিও বা মাঠে জীবাণুর দ্বারা ক্ষয়ক্ষতি নিবারণ করা সম্ভব, তথাপি ঠিকভাবে শস্য-সংরক্ষণ না করতে পারলে আবার এই জীবাণুর শিকারে পরিণত হওয়া বিচিত্র নয়। এই অপচয়, এর সঠিক সমীক্ষা বহু দেশেই করা হয় না এবং যা-ও বা করা হয় তাও নির্ভরযোগ্য নয়। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) সমীক্ষকেরা যে বিবরণ পেশ করেছেন, তা মোটামুটি এক নজরে দেখা যাক। মানুষের প্রাথমিক খাদ্যশস্য যখন জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন খাদ্য যোগানের কি ভীষণ ক্ষতি হয়, তা সত্যই কল্পনা করা যায় না। সিরিয়েল রাষ্ট (Cereal rust) রোগের কবলে পড়ে ১৯৪৭-৪৮ সালে গমের যে ক্ষতি হয়েছিল, তাতে শুধু নিউ সাউথ ওয়েলসেরই প্রায় তিন লক্ষ লোকের খাদ্য যোগান দেওয়া সম্ভব হতো। আর্জেন্টিনায় প্রতি বছরই Stripe ও Stem rust-এ গমের ফলন নষ্ট হয় প্রায় ৪৭০,০০০ টন। সুতরাং এই যে জীবাণুসৃষ্ট রোগে গাছের ক্ষতি হচ্ছে, এটা শুধু এই দুটি দেশ বা এই শস্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। অন্যান্য দেশে এবং অন্যান্য শস্যের ক্ষেত্রেও এটা হওয়া সম্ভব। চাল, যেটা বহু দেশেরই প্রধান খাদ্য বলে বিবেচিত, এই জীবাণুর কবলে পড়ে কি ভীষণ খাদ্য-সঙ্কটের সৃষ্টি করতে পারে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো ১৯৫৬ সালে পর্তুগাল ও ভেনেজুয়েলায় Hoja blanca বলে এক রকম রোগ। এই রোগের কবলে পড়ে চালের ফলন নষ্ট হয়েছিল ৩৬-৪০%। সত্য কথা বলতে কি, অনেক দেশেই ১০% ফলন কম হলেই এক ভয়াবহ সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়। ১৯৩৫ সালে জামাইকায় 'পানামা রোগের' কবলে পড়ে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কলার ফলন হ্রাস পেয়েছিল। ক্যারেবিয়ান উপকূলবর্তী বহু দেশই তখন এই রোগের কবলে পড়ে অর্থসঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিল। এছাড়াও Wheat rust, Wheat bunt, Blast disease, মাইলো (চালের) প্রভৃতি রোগ ছত্রাকজাতীয় জীবাণু কর্তৃক সৃষ্ট হয়। এই সব জীবাণু ছাড়া নানারকম কীট-পতঙ্গও খাদ্য-শস্যের ফলন হ্রাসের সহায়তা করে। কীট-পতঙ্গের কবলে পড়ে উদ্ভিদের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। তারপর মাঠ থেকে খাদ্যশস্য যখন গুদামজাত করা বা সংগ্রহশালায় রাখা হয়, তখন যদি সঠিকভাবে সংরক্ষিত না হয়, তখনও এই সব জীবাণু এদের নষ্ট করতে অগ্রসর হয়। দেখা গেছে, জীবাণু গুদামজাত খাদ্যশস্যের উপর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে একপ্রকার বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত করে, যাকে টক্সিন বলা হয়। এই টক্সিনগুলির মধ্যে গুদামজাত চালে ছত্রাকজাতীয় জীবাণু কর্তৃক সৃষ্ট Aflatoxin অন্যতম।

প্রাণী-জগতে দেখা গেছে যে, এরাও জীবাণু-সৃষ্ট প্রায় দু-শ' রকমের নাম জানা অসুখের কবলে পড়তে পারে। এদের ভিতর প্রায় এক-শ' রোগ মানুষের ক্ষেত্রেও হতে পারে। Brucellosis ও Tuberculosis-এর কবলে পড়ে প্রায় প্রতি বছরই বহু প্রাণীর জীবন বিপন্ন হয়ে থাকে। সমীক্ষার ফলে দেখা গেছে, পশু-খাদ্যের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ করা সম্ভব, যদি এই সব রোগের সুষ্ঠু সমাধান করা যায়। প্রাণীদের রোগের বিশেষত্ব হলো এই যে, এগুলি হঠাৎ কোন একটা দেশে দেখা দেয় এবং পরে ধীরে ধীরে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন, দক্ষিণ আফ্রিকায় হঠাৎ ঘোড়ার মুখে ও পায়ে ঘা হতে সুরু করে এবং তা ধীরে ধীরে মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়ে গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি করে। আফ্রিকার সোয়াইন ফিভার স্পেন ও পর্তুগালে ছড়িয়ে পড়ে Bacon

শিল্পের (যেখানে শূকরের মাংস উৎপাদন করা হয়) প্রভূত ক্ষতি করেছিল। ইউরোপিয়ান ফাউল ব্রুড (Foul brood) হলো মৌমাছিদের এক রকম ছোঁয়াচে রোগ। ব্রুসেলোসিস-এ গবাদি পশু মারা যায় না সত্য, কিন্তু এতে সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং বাচ্চা না হবার ফলে তারা দুধ দেয় না। এই রোগে আক্রান্ত পশুর দুধ খেলে মানুষের কম্পজ্বর (Undulant fever) নামে এক রকমের রোগ হয়। এর কারণ এই যে, একই ব্যাক্টিরিয়া এই উভয় রোগেরই স্রষ্টিকারী। স্ক্র্যাপি বলে এক জাতীয় রোগ আছে, যা দীর্ঘস্থায়ী এবং স্নায়ুতন্ত্রের এক সাংঘাতিক রোগ। এতে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। যতদূর জানা গেছে, এতে সাধারণতঃ ছাগল এবং মেষই আক্রান্ত হয়। এছাড়া আছে সোয়াইন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, ভাইরাস নিউমোনিয়া, ছোঁয়াচে রোগ অ্যাট্রোফিক রাইনাইটিস, বোভাইন রাইনোট্রাকাইটিস, গরুর মিক্সোভাইরাস প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জা, ভাইরাস ডাইরিয়া, হগ্ কলেরা, রিণ্ডার পেষ্ট, পা ও মুখের ঘা, মুখের একৃজিমা প্রভৃতি।

মাছ ও সামুদ্রিক প্রাণী—যারা প্রাণীজ খাদ্যের এক প্রধান অংশ—জীবাণুসৃষ্ট রোগের শিকার হয়। দেখা গেছে যে, White catfish নামে এক জাতীয় মাছ জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হলে প্রথমে পিঠের পাখ্‌নার নীচে দু-পাশে বড় বড় সাদা দাগ দেখা দেয়। ধীরে ধীরে মাছের কর্মক্ষমতা লোপ পায় ও তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং মাথা উপরের দিকে রেখে ভাসতে থাকে। পেশী সঞ্চালন করবার ক্ষমতাও হ্রাস পায় এবং পাখ্‌নার সাহায্যে জল কেটে অগ্রসর হবার শক্তি থাকে না। তাছাড়া প্রথমে যে সাদা দাগ দেখা দেয়, সেগুলি ধীরে ধীরে ক্ষতের আকার ধারণ করে নানা ধারে রূপান্তরিত হয়। সমস্ত মাংস তখন পচ্‌তে থাকে এবং অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এছাড়া আরও অনেক রকম রোগের কবলে পড়ে মাছ ও সামুদ্রিক প্রাণীদের ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। শুধু এই নয়, মাছ ধরে যখন চালান দেওয়া হয়, তখনও জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ খাদ্যের এক বিরাট অংশ আমাদের অজ্ঞতা ও সময়োপযোগী যথাযথ সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। এই সমস্যার মোকাবিলা করতে পারলে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির সহায়তা হবে বলে মনে হয়। তাই খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির সহায়করূপে জীবাণুকে নিয়োক্ত ভূমিকায় অংশগ্রহণ করাবার বিষয় নিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করছেন ; যেমন—

(১) জীবাণুর সাহায্যে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা, (২) উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ সম্পদকে জীবাণুসৃষ্ট রোগ থেকে রক্ষা করা, (৩) যে সব জীবাণু ক্ষতিকারক জীবাণু, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতিকে ধ্বংস করতে সক্ষম, তাদের সাহায্য নেওয়া, (৪) সস্তা, অপ্রয়োজনীয় ও অব্যবহার্য বস্তুকে খাদ্যোপযোগী বস্তুতে রূপান্তরিত করা, (৫) জীবাণুর দ্বারা পচন ও টক্সিন্ তৈরি বা রোগ-উৎপাদক জীবাণুর কবল থেকে খাদ্যফসল সংরক্ষণ করা।

নাইট্রোজেন স্থায়িকরণ

উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্যে যার প্রয়োজন সর্বাধিক, সেটা হলো নাইট্রোজেন। যে মাটিতে নাইট্রোজেনের ঘাটতি আছে, সেখানে উদ্ভিদের বৃদ্ধি তো দূরের কথা, জন্মানোই এক মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং মাটির নাইট্রোজেন বাড়িয়ে (সেটা সার বা যে প্রকারেই হোক) উদ্ভিদের চাষ করাই যুক্তিসঙ্গত। অর্থনৈতিক দিক

থেকে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মাটির নাইট্রোজেনের সবচেয়ে মিতব্যয়ী উৎস হলো বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন, কিন্তু উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন প্রত্যক্ষভাবে আহরণ করতে পারে না। দেখা গেছে যে, অনেক জীবাণু, যাদের কতকগুলি মাটিতে বাস করে, বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে মাটিতে সংলগ্ন করবার ক্ষমতা রাখে। এদের মধ্যে ব্যাক্টিরিয়াই অন্যতম। এই সমস্ত ব্যাক্টিরিয়ার কতকগুলি উক্ত অঞ্চলের মাটিতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। অ্যানেরোবিক ব্যাক্টিরিয়ার (যাদের অক্সিজেনের প্রয়োজন নেই বললেই চলে) নাইট্রোজেন স্থায়ী করবার ক্ষমতা অপরিসীম। কয়েক জাতীয় অ্যাল্‌গি আছে, যারা নাইট্রোজেন স্থায়ীকরণে সক্ষম। কোন কোন ক্ষেত্রে এরা অন্য জীবাণু বা অন্য শস্যের (ধান) সাহচর্যে এই ক্ষমতা প্রকাশ করে। দেখা গেছে যে, এই অ্যাল্‌গির সাহায্যে জমির নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়িয়ে ধানের চাষ করে শস্যের পরিমাণ বহু গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে—এমন কি, এই অ্যাল্‌গিই মরুভূমির মাটিতে নাইট্রোজেন ও জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। যে সব মাটিতে বালির পরিমাণ বেশী, সেখানেও ব্যাক্টিরিয়ার সাহায্যে নাইট্রোজেনের মাত্রা বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। কতকগুলি ছত্রাক জাতীয় জীবাণুও জমির উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক। এছাড়াও কতকগুলি ব্যাক্টিরিয়া আছে, যারা শীম জাতীয় উদ্ভিদের মূলের গুটির মধ্যে অবস্থান করে। এরা বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন গ্রহণ করে জৈব পদার্থ যোগান দিয়ে জমির নাইট্রোজেন ঘাটতি পূরণে সক্ষম। সুতরাং শীম জাতীয় উদ্ভিদের, যাদের মূলে এই জাতীয় প্রচুর ব্যাক্টিরিয়া বিদ্যমান, তাদের চাষ করে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা খুবই সম্ভব। এছাড়াও কতকগুলি উদ্ভিদ আছে, যাদের পাতা ও মূলে গুটি থাকে। এই সমস্ত উদ্ভিদের গুটিতে যে ব্যাক্টিরিয়া থাকে, তারা নাইট্রোজেন সংস্থাপনে করতে সক্ষম, যদিও এর সঠিক কারণ সম্পূর্ণভাবে জানা সম্ভব হয় নি। এই সব উদ্ভিদ পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। এদের মধ্যে ১৯০টিই হলো গাছ অথবা গুল্ম। এদের ভৌগোলিক বন্টন হলো—কম তাপমাত্রা, কম শুষ্ক ও অ্যাসিড জাতীয় মাটি। এদের নাইট্রোজেন স্থায়ীকরণের ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রেই শীম জাতীয় উদ্ভিদের চেয়ে অধিক ফলপ্রসূ। এমন কতকগুলি অনাদৃত উদ্ভিদ আছে, যারা যে সব জায়গায় কোন উদ্ভিদ গজায় না, অর্থাৎ নাইট্রোজেন ঘাটতির জমিতেও তাদের জন্মানো সম্ভব হয়েছে। শুধু তাই নয়, এর ফলে ঐ মাটির উর্বরতা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, পরে সেখানে অন্য গাছ জন্মানোও সম্ভব হয়েছে। সুতরাং অনুর্বর জমিতে এদের গজিয়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে অন্যান্য প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ জন্মানো যায়।

জীবাণুর সার

কতকগুলি ব্যাক্টিরিয়া আছে, যারা জমির অদ্রাব্য ফস্‌ফরাস বা সিলিকেটকে দ্রাব্য পদার্থে পরিণত করবার ক্ষমতা রাখে। অদ্রাব্য ফস্‌ফরাস উদ্ভিদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং এদের যদি জীবাণুর সাহায্যে রাসায়নিক পরিবর্তন সাধন করে গাছের উপযোগী করে তোলা সম্ভব হয়, তবে সেখানে গাছ জন্মানো যেতে পারে। এছাড়াও যে সব জমিতে বালির ভাগ বেশী, সেখানে সিলিকেট দ্রবকারী ব্যাক্টিরিয়ার সাহায্যে বালির ভাগ কমিয়ে ফেলে জমির নাইট্রোজেন বৃদ্ধি করা সম্ভব। রাশিয়ান বৈজ্ঞানিকেরা উপরিউক্ত সত্যতা উপলব্ধি করেই জীবাণুর সাহায্যে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে শস্যের ফলন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। এদের মধ্যে ব্যাক্টিরিয়াই অন্যতম। পরীক্ষাগারে এদের

প্রথমে বৃদ্ধি করানো হয় এবং পরে অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে মিশিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। একেই জীবাণুর সার বলা হয়ে থাকে। জীবাণুর সাহায্যে যে সার তৈরি করা হয়, তাদের অ্যাজোটোব্যাক্টিরিন, ফস্‌ফোব্যাক্টিরিন প্রভৃতি বলা হয়। অনেক সময় সিলিকেট দ্রবকারী ব্যাক্টিরিয়া ও অন্যান্য মাটিতে অবস্থানকারী জীবাণুও সারের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। লক্ষ লক্ষ একর জমিতে প্রতি বছর এই জীবাণুর সার ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বিগত ২০ বছর ধরে রাশিয়ান বৈজ্ঞানিকেরা এই জীবাণুর সারের উপকারিতা লক্ষ্য করে আসছেন।

হিউমাস (Humus)

পৃথিবীপৃষ্ঠে অনেক জটিল জৈব পদার্থ ছড়িয়ে আছে। জীবাণুগুলি এই জটিল জৈব বস্তুকে রাসায়নিক উপায়ে রূপান্তরিত করে এমন এক পদার্থে পরিণত করে, যাদের হিউমাস বলা হয়ে থাকে। হিউমাসের রং ঘন কালো, জলে অদ্রাব্য, কিন্তু ক্ষারে গরম করলে সহজেই দ্রবীভূত হয়। এই হিউমাস তৈরি করবার প্রধান উৎস হলো গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত খাদ্যোপযোগী উদ্ভিদ ও প্রাণীর অবশিষ্টাংশ, কসাইখানা বা বাজারের অবিক্রীত পদার্থ, শস্যের অবশিষ্টাংশ, যেমন — পাতা, কাণ্ড প্রভৃতি। এদের এক জায়গায় স্তূপীকৃত করে জীবাণুর সাহায্যে রাসায়নিক রূপান্তর ঘটিয়ে হিউমাসের সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এই সকল উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ অবশিষ্টাংশের সম্পূর্ণ টাই জীবাণু কর্তৃক বিশ্লিষ্ট হয় না। এরা যে সব জৈব পদার্থ দিয়ে গঠিত, তাদের মধ্যে কতকগুলি অতি সহজেই জীবাণু কর্তৃক বিশ্লিষ্ট হয়, বাকীগুলি ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়। চিনি ও শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ অতি সহজেই রূপান্তরিত হয়ে থাকে; তারপর ধীরে ধীরে হেমিসেলুলোজ, প্রোটিন ও সেলুলোজের রূপান্তরণ হয়। লিগ্‌নিন, কয়েক জাতীয় প্রোটিন, মোমজাতীয় পদার্থ, ট্যানিন এবং অন্যান্য পদার্থ অবিকৃত থাকে এবং সেগুলি ধীরে ধীরে এক জায়গায় ঘন-সন্নিবিষ্ট হয়। এই রাসায়নিক রূপান্তরের সময় জীবাণুর কোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং কীট-পতঙ্গাদির জন্ম হয়। এই হিউমাস মাঠে ছড়িয়ে দিলে জমির উর্বরতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়।

এই হিউমাস মাটির রং, গঠন প্রভৃতি পরিবর্তন করে এবং মাটির জলীয় বাষ্প ধরে রাখে ও বায়ু চলাচলের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া মাটিতে যে সব খনিজ পদার্থ থাকে, তাদের দ্রবীভূত করতে সাহায্য করে। এর ফলে যে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়, তা গাছের পক্ষে অতি সহজেই গ্রহণীয় হয় এবং মাটির অ্যাসিড ও ক্ষারীয় অবস্থাকে সমভাবাপন্ন করতে সাহায্য করে। এই হিউমাস হলো উদ্ভিদের অত্যাবশ্যকীয় রাসায়নিক মৌলের এক সংরক্ষণশালা, বিশেষ করে কার্বন ও নাইট্রোজেনের। তাছাড়া P, Ca, Mg, Fe, Mn এবং অন্যান্য মৌলও সামান্য পরিমাণে থাকে। অতএব দেখা যাচ্ছে, জীবাণু জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম।

কীট-পতঙ্গাদির বিনাশসাধন

জীবাণুই যে কেবল খাদ্যশস্যের অপচয় করে তা নয়, কীট-পতঙ্গাদিও বহু ক্ষেত্রে খাদ্যশস্যের অনিষ্টসাধনে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করে। সুতরাং এই কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করবার জন্যে কিরূপ পন্থা অবলম্বন করলে সুফল পাওয়া যায়, বৈজ্ঞানিকেরা সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করছেন। পাস্তুর আবিষ্কার করেছিলেন যে, রেশমপোকা এক জাতীয় ব্যাক্টিরিয়া ঘটিত রোগে আক্রান্ত হয়। এই আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানীদের কাছে এক নতুন দ্বার উন্মুক্ত হয়। সেটা হলো কীট-পতঙ্গ

ধ্বংস করবার জন্যে জীবাণুর ব্যবহার। ১৮৩৮ সালে অ্যাগোষ্টিনো ব্যাসী প্রথম কীট-পতঙ্গ বিনাশের জন্যে জীবাণুর ব্যবহার করেন। এরপর বার্লিনার ১৯১১ সালে আবিষ্কার করেন, মেডিটারেনিয়ান ফ্লাওয়ার মথ ব্যাক্টিরিয়া কর্তৃক আক্রান্ত হয়। এই সব আবিষ্কারের ফল দেখে বৈজ্ঞানিকেরা কীট-পতঙ্গনাশক হিসাবে জীবাণু ব্যবহার করবার জন্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু করেন। এর ফলে Japanese beetle (এক জাতীয় গুবরে পোকা) ও Alfalfa caterpillar (এক জাতীয় গুটিপোকা) ধ্বংসকারী ব্যাক্টিরিয়ার খোঁজ পাওয়া গেল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কীট-পতঙ্গ ধ্বংসকারী ব্যাক্টিরিয়া, ভাইরাস বা ছত্রাক শস্য-বিনাশকারী কীট-পতঙ্গের হাত থেকে খাদ্যশস্য রক্ষা করতে সক্ষম। এই সকল কীট-পতঙ্গনাশক জীবাণু দু-রকম ভাবে ব্যবহার করা চলে; যথা—(১) জীবাণুগুলিকে মাঠে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে; (২) জীবাণু-নিঃসৃত টক্সিন পরীক্ষাগারে তৈরি করে সেগুলি মাঠে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

এই সব কীট-পতঙ্গনাশকের গুণ হলো—(১) এরা অন্য জীবের পক্ষে ক্ষতিকারক বা বিষাক্ত নয়; (২) এরা সুনির্দিষ্ট উপায়ে কাজ করে, অর্থাৎ এক জাতীয় জীবাণু নির্দিষ্ট এক জাতীয় কীট বা পতঙ্গকেই ধ্বংস করে, অন্যগুলির উপর এদের কোন প্রভাব নেই। এর ফলে যে সব উপকারী কীট-পতঙ্গ মাটিতে থাকে, এগুলি তাদের উপর কোন বিরূপ ক্রিয়া করে না; (৩) অতি সহজে ও অল্প অর্থব্যয়েই এদের তৈরি করা সম্ভব; (৪) এদের স্প্রে করে বা গুঁড়া করে অন্যান্য রাসায়নিক কীটনাশকের মতই ব্যবহার করা চলে; (৫) কীট-পতঙ্গেরা সাধারণতঃ এই সব জীবাণুর প্রতিরোধ-ক্ষমতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় না; (৬) খুব কম মাত্রায় এগুলি অনেক বেশী ধ্বংস করবার ক্ষমতা রাখে। তাই এই কীট-পতঙ্গনাশক জীবাণুগুলির ব্যাপক ব্যবহার করবার ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকেরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছেন।

জীবাণু শুধু জমির উর্বরতা বৃদ্ধিকারক বা কীটনাশকই নয়, সস্তা ও অপ্রয়োজনীয় পদার্থকে এরা খাদ্যোপযোগী পদার্থে রূপান্তরিত করতে সক্ষম। এর দৃষ্টান্ত হলো, জীবাণুসৃষ্ট প্রোটিন, ভিটামিন, এন্‌জাইম, মাসরুম প্রভৃতি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, খাদ্যোৎপাদনে জীবাণু এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। একদিকে এরা যেমন সংহারকারী, অপর দিকে তেমনি আবার সৃষ্টিকারী ও রক্ষাকারীও বটে।

আগামী দিনের চিকিৎসা

দীপ্তিময় দে

খবরের কাগজ খুললেই চোখে পড়ে দেশ-বিদেশে চিকিৎসার উন্নতির খবর। দেহের অকেজো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বদল করে দেওয়া আজ চিকিৎসকের পক্ষে কিছু শক্ত কাজ নয়। মানুষের বেঁচে থাকবার আকাঙ্খার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চিকিৎসকদের উদ্ভাবনী শক্তিরও ক্রমবিকাশ ঘটছে। মানুষকে মৃত্যুঞ্জয় করে তোলা অবশ্য এখনও সম্ভব হয় নি। তাই আগামী দিনের চিকিৎসকেরা যে সব হাতিয়ার নিয়ে মানুষের বিভিন্ন রোগে মোকাবেলা করবেন, সে সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা ও গবেষণার অন্ত নেই। যেমন— কিছুদিন আগে সুইডেনের ষ্টকহোমে চিকিৎসক ও জীববিদ্যা-সংক্রান্ত ইঞ্জিনিয়ারদের আন্তর্জাতিক অধিবেশনে তিরিশটি দেশের এক হাজার জন সমকর্মীকে আমেরিকান সার্জনেরা জেট-নাইফের ব্যবহার দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এই ছুরির ধারালো ফলা নেই। কিন্তু এই জেট-নাইফ থেকে জলন্ত গ্যাসের অতি সূক্ষ্ম যে স্রোত বেরিয়ে আসে, তা সহজেই মাংসপেশী অথবা হাড় কেটে ফেলতে পারে। জেট-নাইফ দিয়ে অপারেশনের সময় জলন্ত গ্যাসের অত্যধিক তাপমাত্রার দরুণ কাটা জায়গার রক্ত সঙ্গে সঙ্গেই শুকিয়ে যায়, তাই এই কাটাছেঁড়ার ব্যাপারটাও হয় অনেক পরিচ্ছন্ন। তাছাড়া প্রচলিত পদ্ধতির অপারেশনের চেয়ে এতে সময়ও অনেক কম লাগে। কারণ সার্জনকে অপারেশনের শতকরা ৭৫ ভাগ সময় দিতে হয় রক্তপাত বন্ধ করবার প্রচেষ্টায়।

জেট-নাইফের মত লেসার-নাইফ নিয়েও অনেক গবেষণা চলছে। এই দুটি যন্ত্রের ব্যবহার অনেকটা একই সূত্রের ভিত্তির উপর নির্ভরশীল। লেসার যন্ত্রের সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম ও ঘন আলোকরশ্মি সৃষ্টি করে এই কাজে ব্যবহার করা হয়।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে আমেরিকান সার্জনেরা এই আলোকরশ্মিকে ক্ষতিকর ক্যান্সারে আক্রান্ত দেহের অংশগুলিকে কেটে বাদ দেবার জন্যে ব্যবহার করে দেখেছেন। এমন কি, চোখের ক্ষেত্রেও আলগা হয়ে-যাওয়া রেটিনা জুড়ে দিতে এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। দেখা গেছে, এতে চোখের অন্যান্য সূক্ষ্ম অংশের কোন ক্ষতি হয় নি।

আগামী দিনের চিকিৎসা-প্রণালীর তালিকায় কেবল তাপই নয়, ঠাণ্ডাকেও রাখা হয়েছে। কাটাছেঁড়ার কাজে আইস-নাইফ ব্যবহার করে চমকপ্রদ ফল পাওয়া গেছে। আভিধানিক অর্থে আইস-নাইফ নামটি অবশ্য ঠিক নয়—কেন না, এটা ছুরিও নয় বা একে তৈরি করতে বরফেরও প্রয়োজন হয় না। আইস-নাইফ হচ্ছে পেন্সিলের মত একটি টিউব। এই টিউবের মধ্য দিয়ে -৩০০° ফাঃ বা -১৮৫° সেঃ তাপমাত্রায় তরল নাইট্রোজেনের (অথবা অনুরূপ ঠাণ্ডা অন্য কোন তরল পদার্থের) প্রবাহ চালানো হয়। এই অত্যধিক ঠাণ্ডার সংস্পর্শে জীবিত কোষগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। টিউবের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তরল নাইট্রোজেনের গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত করে টিউবের মুখের তাপমাত্রার তারতম্য ঘটানো হয়।

নিউ ইয়র্কের সেন্ট বার্নাবাস হাসপাতালের ডাঃ আরভিং এস. কুপারের নাম এই Cryosur-

gery-র (গ্রীক ভাষায় Kryos অর্থ ঠাণ্ডা) ক্ষেত্রে অগ্রণীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রচলিত যন্ত্রণাবিহীন উপায়ে মাথার খুলিতে ছিদ্র করে এই আইস-নাইফের সাহায্যে মস্তিষ্কের ভিতরকার টিউমারকে অসাড় করে দিতে সক্ষম হয়েছেন। এই অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় টিউমার ধ্বংস হয়ে যায়। কাজেই টিউমার-গুলিকে কেটে বাদ দেবার প্রয়োজন হয় না। টিউমারকে ঠাণ্ডার সংস্পর্শে এনে নষ্ট করে দেবার পর যা অবশিষ্ট পড়ে থাকে, শরীরের নিজের পরিস্রুত করবার ক্ষমতা তাকে ধীরে ধীরে পরিষ্কার করে নেয়।

মস্তিষ্কে পার্কিনসনিজম রোগের আক্রমণে দেহে ভয়াবহ কাঁপুনির সৃষ্টি হয়। ডাঃ কুপার এই রোগের চিকিৎসায় অনুরূপ অপারেশনের সাহায্যে পার্কিনসনিজমে আক্রান্ত ছোট ছোট জায়গাগুলিকে নষ্ট করে দিয়ে দেখেছেন যে, পুরাপুরিভাবে না হলেও এই রোগের কাঁপুনী এবং অন্যান্য উপসর্গ কমে যায়। এছাড়াও আধুনিক কালে এমন অনেক যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে, যার সাহায্যে, অপারেশন বিনা উপায় নেই—এমন রোগের চিকিৎসাও অপারেশন ছাড়াই করা সম্ভব হচ্ছে।

দেহের কোন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হলে তার প্রকৃত অবস্থা জানবার জন্যে অনুসন্ধান-মূলক কাটাছেঁড়ার প্রয়োজন হয়। আধুনিক কালে কাটাছেঁড়া ছাড়াও অন্য উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে, যার সাহায্যে সহজেই এই ধরণের অনুসন্ধান চালানো যায়। যেমন—লিভারের কোন গোলমাল হলে পেটে অপারেশন করে লিভার পরীক্ষা করে দেখতে হয়। এসব বেশ বড় রকমের অপারেশন। আর এসব ক্ষেত্রে অপারেশনের পর সুস্থ হয়ে উঠতেও বেশ সময় লাগে।

কিন্তু বর্তমানে চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকদের পক্ষে এসব কাজও অনেক সহজ হয়ে এসেছে—এমন কি, এখন অফিসে যাবার পথে ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়ে লিভার কি রকম কাজ করছে, তা দেখিয়ে আসা যায়। কাটাছেঁড়ার বালাই নেই—পরীক্ষা করতে গায়ে একটু আঁচড়ও লাগে না। এসব পরীক্ষার কাজে রেডিও-আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়। রেডিও-আইসোটোপ থেকে যে আণবিক বিচ্ছুরণ ঘটে, তাকে কাজে লাগানো হয়। বর্তমানে এই ধরণের পরীক্ষাকে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোগনির্ণয়ের কাজে লাগানো হচ্ছে।

শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরীক্ষার কাজে আল্ট্রাসাউণ্ডেরও (উচ্চ কম্পনবিশিষ্ট শব্দ, যা মানুষ কানে শুনতে পায় না) ব্যবহার আছে। এমন সব যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হয়েছে, যেগুলি শরীরের ভিতরকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে ফিরে আসা এই আল্ট্রাসাউণ্ডের প্রতিধ্বনি শুনতে পায়। এই সব যন্ত্র শব্দের এই সঙ্কেতগুলিকে চিত্রাকার দেয়। এর সাহায্যে যকৃৎ, প্লীহা, মূত্রগ্রন্থি প্রভৃতি শরীরের ভিতরকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করা সম্ভব। বৈসাদৃশ্যের অভাবের দরুণ সাধারণ এক্স-রে'র সাহায্যে পরীক্ষা করলে এগুলির দোষ-ত্রুটি প্রায়ই নজরে পড়ে না। কাজেই আল্ট্রা-সাউণ্ডের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিরাপদ। এক্স-রে অথবা রেডিও-আইসোটোপের বিচ্ছুরণ থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। গর্ভস্থ শিশু এই ধরণের বিচ্ছুরণের কবলে পড়লে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই কারণে আমেরিকায় মায়ের পেটে বাচ্চার অবস্থান নির্ণয়ের জন্যে আল্ট্রাসাউণ্ডের সাহায্যে ইকোগ্রাম (Echo-gram) তৈরি করা হয়। হৃৎপিণ্ড সংক্রান্ত রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আল্ট্রাসনিক ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়। এর সাহায্যে চালু থাকা অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের উপর নজর রাখা যায় এবং কোন দোষ থাকলে তা সহজেই চোখে পড়ে।

দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্তন ঘটাবার কাজেও রেডিও-আইসোটোপ এবং আল্ট্রাসাউণ্ডের ব্যবহার আছে। রেডিও-আইসোটোপকে দেহের মধ্যে এমন ভাবে স্থাপন করা হয়, যাতে এর বিচ্ছুরণ দেহের ক্যান্সার-আক্রান্ত কোষগুলিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। কয়েকটি ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলকভাবে ডাক্তারেরা আল্ট্রাসাউণ্ডের সাহায্যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে ক্যান্সারের গভীর ক্ষতস্থানের কোষগুলিকে ধ্বংস করা এবং মূত্রাশয় ও পিত্তকোষে জমা হওয়া পাথর গুঁড়া করবার কাজে সাফল্য লাভ করেছেন।

পার্কিনসনিজম এবং অন্যান্য স্নায়বিক রোগে মস্তিষ্কের সামান্য অংশ আক্রান্ত হলে ঐ অংশে আলট্রাসাউণ্ড প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া গেছে। কতকগুলি মানসিক রোগের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের বিশেষ কয়েকটি স্নায়ুর উপর আলট্রাসাউণ্ড ব্যবহার করে সেগুলিকে নষ্ট করে দিয়ে উপকার পাওয়া গেছে।

এসব রোগ নতুন নয়। নতুন হচ্ছে এই রোগের মোকাবেলা করবার জন্যে মানুষের চেষ্টায় যে সব কলাকৌশলের উদ্ভব হচ্ছে, সেগুলি। এই সব উপায়গুলি এখনও পুরাপুরি সাফল্য লাভ করে নি। কিন্তু যে সব রোগ এখনও মানুষের প্রবলতম শত্রুর তালিকায় রয়েছে, তাদের বশ মানাতে আগামী দিনের চিকিৎসায় বর্তমানের এই পরীক্ষামূলক কলাকৌশলগুলিই নিশ্চিতভাবে অপরিহার্য হয়ে উঠবে।

গণিতশাস্ত্রের একটি ধ্রুবক—π

অমিতোষ ভট্টাচার্য

গণিতশাস্ত্রের ধ্রুবকগুলির মধ্যে π (পাই-গ্রীক অক্ষর) স্মরণাতীত কাল থেকে প্রত্যেক বিজ্ঞানীর অনুসন্ধিৎসার বিষয় হয়ে আছে। π হলো বৃত্তের পরিধি আর ব্যাসের অনুপাত এবং সাধারণভাবে π-এর মান হলো ৩·১৪১৫৯২ ··। π-এর এই মানটিকে আরও বাড়িয়ে দশমিকের পর ৩২ অঙ্ক পর্যন্ত লিখলে আমরা পাই :

৩·১৪১৫৯২৬৫৩৫৮৯৭৯৩২৩৮৪৬২৬৪৩৩৮৩২৭৯৫০

আর্কিমিডিস থেকে সর্বাধুনিক কম্পিউটরের যুগ পর্যন্ত নানা প্রক্রিয়ায় π-এর মান নির্ণয়ের চেষ্টা হয়েছে। কিছুকাল আগে ১০০,০০০ দশমিক স্থান পর্যন্ত π-এর মান নির্ণয়ের মূল সূত্রগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে (D. Shanks & J. W. Wrench Jr.—Calculation of Pi to 100,000 Decimals. Math. of Computation, Jan. 62, Vol. 16, No-77, PP 67-99)। এই আলোচনার গ্রন্থি ধরে আমেরিকার Air borne Instrument গবেষণাগারে π-এর মান ১১,৯৪০ দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় করা হয়েছে। যে পদ্ধতি অনুসরণ করে π-এর এই দীর্ঘ মানটির নির্ধারণ সম্ভব হয়েছে, তা মোটামুটি নিম্নরূপ :

নিউটনের সমসাময়িক জার্মান গাণিতিক Leibnitz (১৬৪৬—১৭১৬) যে শ্রেণীটির সাহায্যে π-এর মান নির্ণয় করেন, তা হলো

$$\frac{\pi}{৪} = ১ - \frac{১}{৩} + \frac{১}{৫} - \frac{১}{৭} + \frac{১}{৯} - \cdots$$

$$= \sum_{n=0}^{n=\infty} (-১)^{n+১} \cdot \frac{১}{২n+১}$$

অবশ্য কেউ কেউ জেম্‌স্‌ গ্রেগরী (১৬৩৮-১৬৭৫) নামক একজন অঙ্কশাস্ত্রবিদ্‌কে এই শ্রেণীটির আবিষ্কর্তা বলে থাকেন। π-এর মান নির্ধারণ করা ছাড়াও এই শ্রেণীটির অন্য একটি বৈশিষ্ট্য আছে। গণিতের সমস্ত অযুগ্ম রাশির সঙ্গে π-এর একটি সম্পর্ক রয়েছে বলে এই শ্রেণীটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এখন Leibnitz-এর সূত্র অনুযায়ী π-কে ১১,৯৪০ অঙ্ক পর্যন্ত শুদ্ধভাবে নির্ণয় করতে মোট ৫×১০^{১৭৯৩৯}-টি পদের (Term) প্রয়োজন। আর এতগুলি পদবিশিষ্ট শ্রেণীটির মান নির্ণয়ে আলোচ্য কম্পিউটরটির সময় লাগতো $১০^{১৭৯২৬}$ বছর। কাজেই এই শ্রেণীটি সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে তাঁরা $Sin^{-1}x$-এর বিস্তৃতির (Expansion) সাহায্য নিয়েছেন। আমরা জানি

$$Sin^{-1}x = x + \frac{১}{২} . \frac{x^{৩}}{৩} + \frac{১ \cdot ৩}{২.৪.৫} x^{৫} + \cdots$$

এখন $x = ০\cdot৫০০০$ হলে

$$Sin^{-1}x = ৩০^{\circ} \quad বা \quad \frac{\pi}{৬}$$

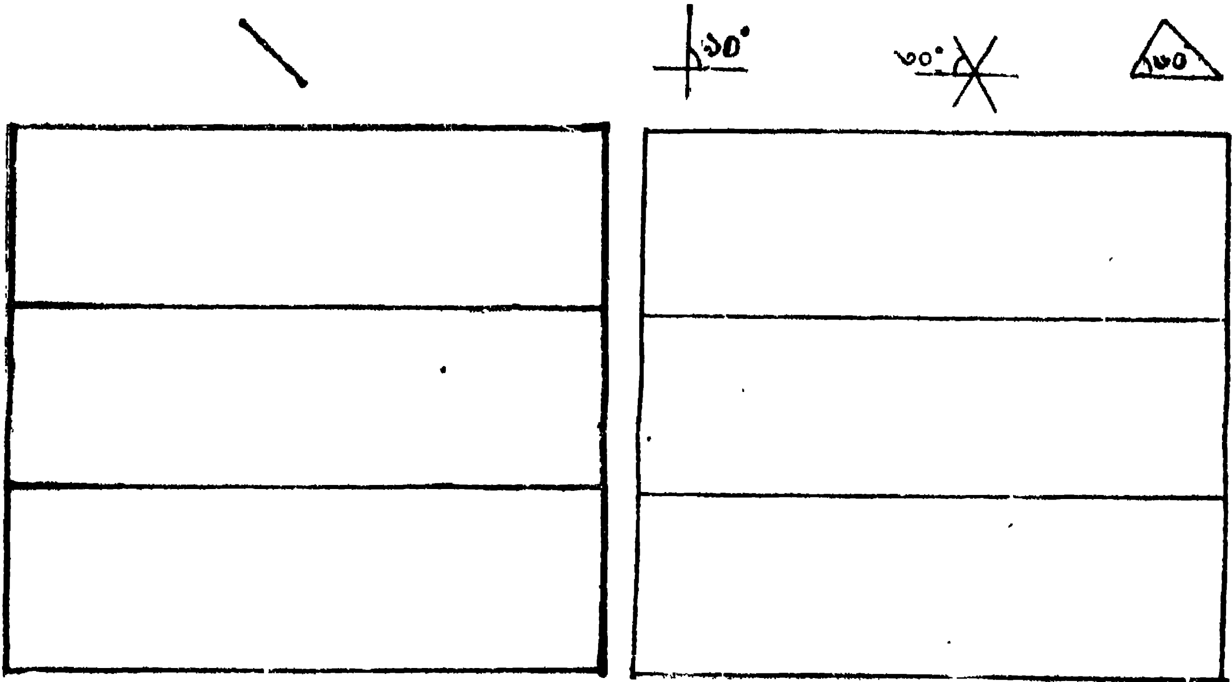
অর্থাৎ, $$\frac{\pi}{৬} = \frac{১}{২} + \frac{১}{২} . \frac{(0\cdot৫)^{৩}}{৩} + \frac{১ \cdot ৩}{২.৪.৫} (0\cdot৫)^{৫} + \cdots$$

এই বিস্তৃতির সাহায্য তাঁরা কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় ১৭,৯৪০ স্থান পর্যন্ত π-এর সর্বশেষ বৃহত্তম মানটি নির্ণয় করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও π-এর মান সম্পূর্ণভাবে জানা গেছে, এমন কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় নি।

এখন প্রশ্ন হলো, যে কোন পদ্ধতিতেই হোক π-এর মান দশমিক স্থানের পর অসীম অঙ্ক পর্যন্ত নির্ণয় করবার কোন সার্থকতা আছে কিনা? ধরা যাক, অসীম সংখ্যক অঙ্ক বলতে আমি দশমিক স্থানের পর হাজার অঙ্ক পর্যন্ত বোঝাতে চাইছি। কারণ ব্যবহারিক বিজ্ঞানে π-এর মান অনধিক কুড়ি অঙ্ক পর্যন্ত জানলেই চলে। আমাদের মাপক যন্ত্রপাতির সূক্ষ্মতা এমন স্তরে এসে পৌঁছায় নি, যার ফলে কোন রাশিকে দশমিক স্থানের কুড়ি অঙ্কের বেশী নির্ভুলভাবে মাপতে পারি। কাজেই যদি কোন বৈজ্ঞানিক সমস্যায় অন্যান্য পরীক্ষালব্ধ রাশির সঙ্গে π জড়িত থাকে, তাহলে π-এর মানের শুদ্ধতা পরীক্ষালব্ধ অন্যান্য রাশির মানের নির্ভুলতার চেয়ে বেশী হলে কোন লাভ নেই। কিন্তু সংখ্যাতত্ত্ববিদ্‌দের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক। π-এর মান এক-শ' হাজার স্থান পর্যন্ত জানলে ব্যবহারিক বিজ্ঞানে ভূমিকম্প ঘটবে কিনা, তা নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামান না। তাঁদের কাছে π-এর মান একটা দারুণ আকর্ষণের বস্তু; তাই তাঁরা π-এর এই ম্যারাথন মান নির্ণয় করেই যাবেন। দ্বিতীয়তঃ যাঁরা কম্পিউটরপ্রিয় লোক তাঁদের কাছে নব নব পদ্ধতিতে কম্পিউটর প্রোগ্রাম করে π-এর মান নির্ধারণও কম লোভনীয় নয়।

আজকাল কম্পিউটরের সাহায্যে এলোপাথারি সংখ্যা (Random Numbers) তৈরি করে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা, স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন কেন্দ্রে ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ, যুদ্ধ-কৌশল, রাস্তায় যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, পরমাণু-বিজ্ঞান গবেষণা ইত্যাদি নানা সমস্যা সমাধান করা হচ্ছে। (R. P. Chembers: Random Number Generation on Digital Computor: I E E E Spectrum Feb. 67, Vol. 2, No. 2, pp. 48—56) এলোপাথাড়ি সংখ্যা তৈরি করবার একটি পদ্ধতির নাম মন্টে-কার্লো পদ্ধতি (Monte-Carlo Method)। কিন্তু এই নামকরণের অনেক আগে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বৈজ্ঞানিক কাউন্ট বাফন π-এর মান নির্ণয় করেছিলেন। একটি সমতলের উপর কিছু সমদূরবর্তী সমান্তরাল সরলরেখা এঁকে সরলরেখাগুলির পারস্পরিক

দূরত্বের অর্ধেক দৈর্ঘ্যের একটি কাঠি বা ঐ জাতীয় একটা কিছু যদি ঐ সমতলের উপর এলোপাথাড়িভাবে অসংখ্য বার ফেলা হয়, তাহলে মোট টসের কতবার কাঠিটি সমান্তরাল সরলরেখাকে স্পর্শ (বা ছেদ) করে জেনে নিয়ে π-এর মান নির্ণয় করা যায় (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মার্চ, ১৯৬৭, পৃ: ১১৮-১৯৪)। এই পদ্ধতিটি আসলে আধুনিক মন্টে-কার্লো পদ্ধতি, এইভাবে কাঠি টস করে বেশ কিছু সংখ্যক এলোপাথাড়ি সংখ্যা তৈরি করা হয়েছিল। থাকে। মন্টে-কার্লো পদ্ধতির এই পরিবর্তিত কৌশলটির একটা গালভরা নাম রাখা হয়েছে Swindles (J. M. Hammersley & K. W. Morton : A New Monte Carlo Technique ; Proc. Cambridge Phil. Soc. 1957 Vol. 52, pt-3, pp-449-457)। এই পদ্ধতিতে প্রথমে দুটি সমান আকারের কাঠিকে একটা ক্রসের আকারে শক্ত করে বেঁধে এলোপাথাড়ি ভাবে সমতলের উপর ফেলতে হবে এবং আগের মত মোট টসের কতবার এই ক্রসটি সমান্তরাল সরল

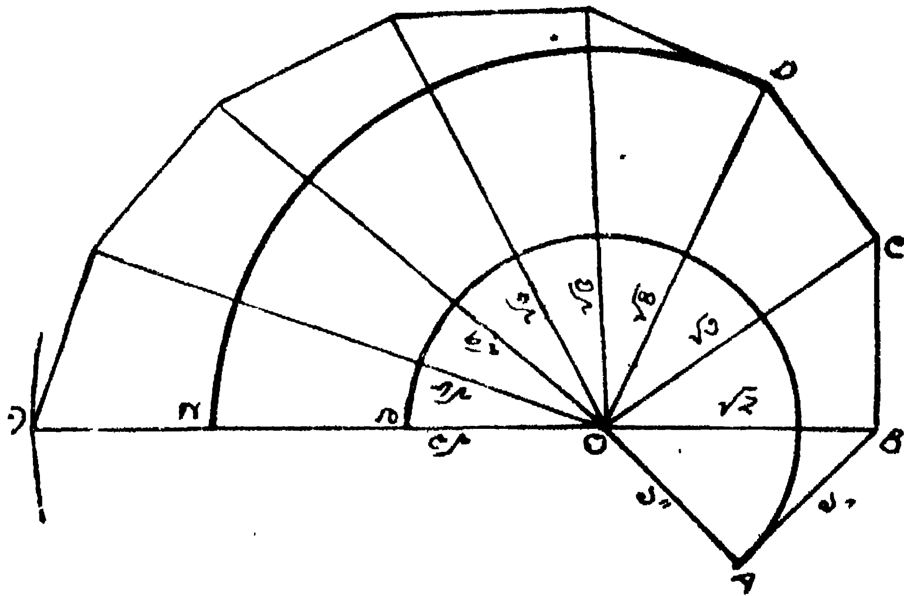


১নং চিত্র

(ক) সাধারণ মন্টে-কার্লো পদ্ধতিতে কাউন্ট বাফনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটা কাঠিকে অসংখ্য বার টস্ করতে হয়। (খ) পরিবর্তিত মন্টে-কার্লো পদ্ধতিতে কাঠির সংখ্যা বাড়িয়ে অনেক কম সংখ্যক বার টস্ করেও অনুরূপ শুদ্ধ মান পাওয়া যাবে। এই পরিবর্তিত পদ্ধতির নাম Swindles।

যাই হোক, পরে দেখা গেল কাউন্ট বাফনের পদ্ধতিকে যদি একটু মার্জিত করে নেওয়া যায়, তাহলে অসংখ্য বার কাঠি টস্ করবার পরিশ্রম থেকে অনেকটা রেহাই পাওয়া যায়, অথচ পরীক্ষালব্ধ ফলের শুদ্ধতাও বজায় রেখাকে স্পর্শ (বা ছেদ) করে, তার হিসাব রাখতে হবে। বলা বাহুল্য, কাঠির দৈর্ঘ্য এই ক্ষেত্রেও সরল রেখাগুলির পারস্পরিক দূরত্বের অর্ধেক হওয়া চাই। এতে দেখা গেল শুধু একটা কাঠি x সংখ্যক বার টস্ করে π-এর মানের যে শুদ্ধতা

পাওয়া যায়, দুটি কাঠিকে সমকোণে বেঁধে $\frac{x}{১২.২}$ বার টস্ করেও সেই মান পাবার সম্ভাবনা থাকে, অর্থাৎ টস্ করবার পরিশ্রম এই নতুন প্রক্রিয়ায় হবে শতকরা প্রায় ৯ ভাগ। কাঠির সংখ্যা বাড়িয়ে তিনটি করে কাঠি নিয়ে তিনটিকে সমান সমান কোণে বেঁধে টস্ করা হলে পরিশ্রম হবে $\frac{১}{৪৪.৩}$ ভাগ। একটা সমবাহু ত্রিভুজের চেহারা দিয়েও কাঠি তিনটিকে টস্ স্কেল আর কম্পাস দিয়ে বর্গক্ষেত্র আঁকা যায় না, কারণ π একটি অমূলদ রাশি (Irrational quantity) বলে এর মান একটি সাধারণ ভগ্নাংশের আকারে সচারাচর প্রকাশ করা হলেও এর দশমিক মানের কোন শেষ নেই। তাছাড়া π-কে বলা হয় Trancendental, অর্থাৎ π কোন বীজগাণিতিক সমীকরণের বীজ নয়। এই সব দিক থেকে π, $\sqrt{২}$, $\sqrt{৩}$ ইত্যাদি অমূলদ রাশি থেকে অনেক স্বতন্ত্র। পিথাগোরা-



২নং চিত্র

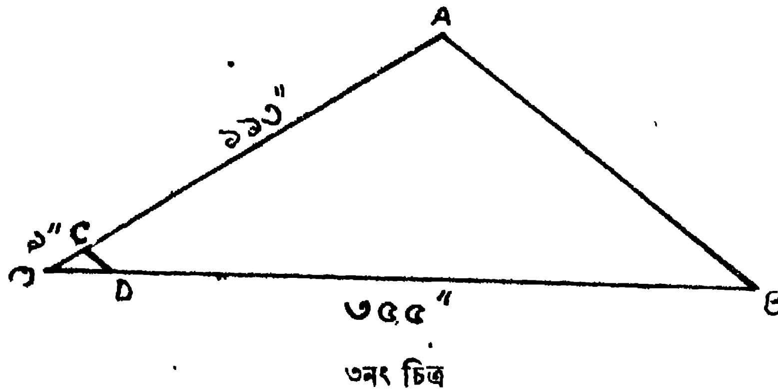
পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুসরণ করে $\sqrt{২}$, $\sqrt{৩}$ ইত্যাদি সাধারণ অমূলদ রাশিকে জ্যামিতিক দৈর্ঘ্যের দ্বারা শুদ্ধভাবে প্রকাশ করা সম্ভব। কিন্তু এই রকমের কোন জ্যামিতিক পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে অমূলদ রাশি হলেও π-কে শুদ্ধভাবে আঁকা যায় না।

করলে একই ফল পাবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু জেনে রাখা দরকার যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অন্যান্য পদ্ধতিতে এলোপাথাড়ি সংখ্যা তৈরি করবার যদি অবকাশ থাকে, তাহলে মন্টে-কার্লো পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয় না।

বিশুদ্ধ অঙ্কশাস্ত্রবিদেরা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন—কোন বৃত্তের সমান করে

সের উপপাদ্যের সাহায্য নিয়ে খুব সহজেই $\sqrt{২}$, $\sqrt{৩}$ ইত্যাদি অমূলদ রাশিকে জ্যামিতির দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব। পিথাগোরাসের উপপাদ্যের সত্যতা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই বলে জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য দিয়ে $\sqrt{২}$, $\sqrt{৩}$ ইত্যাদির মান নির্ণয়ের শুদ্ধতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না।

একটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজের সমান বাহু দুটির দৈর্ঘ্য যদি ১ ইঞ্চি হয়, তাহলে অতিভুজের দৈর্ঘ্য হবে $\sqrt{২}$ ইঞ্চি (চিত্র-২)। চিত্রে $\sqrt{২}$ ইঞ্চিকে OB দৈর্ঘ্যের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এখন $\sqrt{৩}$ পেতে হলে OB ভূমির উপর BC-কে ১ ইঞ্চি ধরে আর একটি সমকোণী ত্রিভুজ OBC আঁকতে হবে। এই নতুন সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ OC-র দৈর্ঘ্য হবে $\sqrt{৩}$ ইঞ্চি। পরবর্তী সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি হবে OC বা $\sqrt{৩}$, CD বাহুর দৈর্ঘ্য হবে ১ ইঞ্চি এবং তাহলে অতিভুজের দৈর্ঘ্য হবে $\sqrt{৪}$ ইঞ্চি—ইত্যাদি। এই পদ্ধতিতে যে কোন সাধারণ অমূলদ রাশিকে চেষ্টা করেন না। এটা গেল বিশুদ্ধ গণিতের চিন্তাধারা। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বৃত্তের প্রায় সমান করে বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্র আঁকা মোটেই অসম্ভব নয়। যদি সামান্য একটু ভুলকে উপেক্ষা করা যায়, তাহলে $\frac{৩৫৫}{১১৩}$-এর মত একটা উল্লেখযোগ্য ভগ্নাংশের সাহায্য নিয়ে এই প্রায়-অসম্ভব কাজটি করা যায়। কারণ $\frac{৩৫৫}{১১৩}$-এর মান হলো ৩.১৪১৫৯২৯২...আর এই মানটি আট দশমিক অঙ্ক পর্যন্ত π-এর আসল মান থেকে মাত্র ০.০০০,০০০,০৭ কম এবং এই অতিসূক্ষ্ম পার্থক্য ধরতে সক্ষম—মানুষের তৈরি এমন কোন যন্ত্রের কথা আজও অজানা। কাজেই π-এর



৩নং চিত্র

জ্যামিতির সাহায্যে π-কে প্রকাশ করতে হলে $\frac{৩৫৫}{১১৩}$ ভগ্নাংশটি আঁকতে হবে। কারণ π-এর মান থেকে এই ভগ্নাংশটি মাত্র ০.০০০,০০০,২৭ কম। $\frac{২২}{৭}$-এর মানের শুদ্ধতা এই ভগ্নাংশটির চেয়ে অনেক কম বলে বর্তমান ক্ষেত্রে $\frac{২২}{৭}$ ব্যবহার করা যাবে না।

জ্যামিতির সাহায্যে আঁকা যায়। এইভাবে অনেকগুলি রাশিকে পর পর এঁকে গেলে চিত্রটির চেহারা একটা ক্রমবর্ধমান শঙ্খিল রেখার (Spiral line) চেহারা নেবে (চিত্র-২ দ্রষ্টব্য)। শঙ্খিল রেখাটির উৎসবিন্দু হলো O আর O বিন্দু-স্থিত কোণগুলি ক্রমাগত ছোট হতে থাকবে।

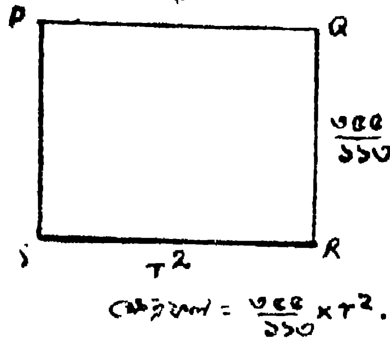
কিন্তু এই প্রকারের কোনও জ্যামিতিক প্রক্রিয়ায় π-কে প্রকাশ করা অসম্ভব বলে গণিতজ্ঞেরা বৃত্তের সমান করে বর্গক্ষেত্র অঙ্কনের প্রকৃত মানের বদলে $\frac{৩৫৫}{১১৩}$-কে যদি কাজে লাগানো যায়, তাহলে হিসেবের ভুল যা হবে, তা ধরা প্রায় অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ যদি আমরা π-এর বদলে $\frac{৩৫৫}{১১৩}$ ব্যবহার করে পৃথিবীর পরিধি মাপি, তাহলে আমাদের হিসেবের ভুল হবে ২৫,০০০ মাইলে মাত্র ১৪ ফুট এবং নিঃসন্দেহে এই ভুল নিতান্তই নগণ্য।

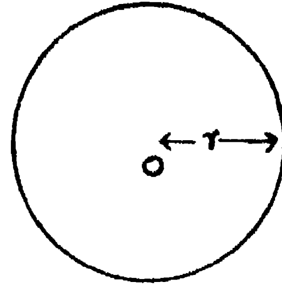
জ্যামিতির সাহায্যে π-কে আঁকতে হলে আমাদের চাই একটা মস্তবড় কাগজ, যার

উপর ৩৫৫ ইঞ্চি লম্বা একটা সরলরেখা আঁকা সম্ভব (চিত্র-৩)। এই সরলরেখার একটি প্রান্তে যে কোন কোণ করে আর একটা সরলরেখা আঁকা হলো, যার দৈর্ঘ্য ১১৩ ইঞ্চি। এখন এই দুটি সরলরেখার প্রান্তীয় বিন্দু A ও B যোগ করে দেওয়া হলো। OA সরলরেখার O-বিন্দু থেকে ১ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য কেটে নিয়ে AB সরলরেখার সমান্তরাল করে CD আঁকা হলো, তাহলে OD হবে $\frac{৩৫৫}{১১৩}$ বা ৩·১৪১৫৯২৯…এর সমান; অর্থাৎ OD রেখা π-এর মানের প্রায় সমান।

এখন r-ব্যাসার্ধ-বিশিষ্ট কোন বৃত্তের সমান করে আয়তক্ষেত্র আঁকতে হলে PQRS একটা আয়তক্ষেত্র আঁকা হলো, যার $PQ = r^2$ এবং $RQ = \frac{৩৫৫}{১১৩}$ (চিত্র-৪)। তাহলে এই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে $PQ \times RQ = r^2 \times \frac{৩৫৫}{১১৩} = \pi r^2$ (প্রায়)

$\frac{৩৫৫}{১১৩}$-কে π-এর বদলে ব্যবহার করলে আমাদের হিসাবের ভুল যে কত কম হতে পারে, তার আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। এক মাইল ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একই বৃত্তের ক্ষেত্রফল π এবং $\frac{৩৫৫}{১১৩}$ ব্যবহার করে আমরা পাব যথাক্রমে— $\pi \times ৫২৮০^২ = ৮৭৫৮২৫৮৪·৪৬০৯২$ বর্গফুট এবং $\frac{৩৫৫}{১১৩} \times ৫২৮০^২ = ৮৭৫৮২৫৭৬·৫৩৩৭৬$ বর্গফুট অর্থাৎ ৮৭,০০০,০০০ বর্গফুটে মাত্র ৮ বর্গফুটের মত কম-বেশী হিসাবের গরমিল হতে পারে এবং এই ভুল যন্ত্রের সাহায্যে নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব। তাহলে আমরা একটা বৃত্তের সমান একটা আয়তক্ষেত্র এঁকে প্রায় অসাধ্য-সাধন করলাম বলে যথেষ্ট গর্ববোধ করতে পারি। আর এই অসাধ্যসাধন করতে গিয়ে আমরা সামান্য যে ভুল করেছি, সেই ভুল কাগজে-কলমে ছাড়া অন্য কোন প্রক্রিয়ায় হয়তো ধরবার কোন উপায় নেই।





৪নং চিত্র

ক্ষেত্র PQRS এবং প্রদত্ত বৃত্তটির ক্ষেত্রফল প্রায় সমান। r = ২ ইঞ্চি ধরলে আয়তক্ষেত্র ও বৃত্তের ক্ষেত্রফলের তফাৎ হবে ৯,০০০,০০ বর্গ ইঞ্চিতে মাত্র ১ বর্গ ইঞ্চি।

কিন্তু সত্য সত্যই কি π-কে একটা সরলরেখার দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব? হাঁ, একজন ইঞ্জিনীয়ার বা সার্ভেয়ারের জন্যে যথেষ্ট শুদ্ধভাবে π-কে সরলরেখার দ্বারা সূচিত করা সম্ভব। কিন্তু বিশুদ্ধ গণিতশাস্ত্রের চিন্তাপ্রণালী একটু জটিল এবং সেখানে এই ধরণের কোন নমনীয়তার স্থান নেই। তাই একজন বিশুদ্ধ গাণিতিক প্রবন্ধের এই অংশটুকু মেনে নিতে পারবেন না, কারণ বিশুদ্ধ গণিত চিরকাল ২-কে ২ বলেই মনে করে এবং কখনো ১·৯৯৯৯৯…কে ২-এর মর্যাদা দেবে না।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল

শ্রীঅলোককুমার রায়চৌধুরী

যে বিস্তৃত গ্যাসীয় স্তর আমাদের পৃথিবীকে চাঁদোয়ার মত আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে বায়ুমণ্ডল বলা হয়। এই বায়ুমণ্ডল পৃথিবীরই একটি অংশ। তিন-চার শতাব্দী পূর্বেও মানুষ চিন্তা করিতে পারে নাই, যে বায়ু আমাদের চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহা পৃথিবীরই অংশ। মানুষ যেমন পর্বত বা সমুদ্রে অভিযান চালাইতেছে, তেমনি বায়ুমণ্ডল—এমন কি, বায়ুমণ্ডল ছাড়াইয়া মহাকাশেও অভিযান সুরু করিয়াছে। বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি বায়ুমণ্ডল এবং মহাকাশের দিকে নিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাঁহাদের গবেষণায় বহু তথ্যাদিও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পৃথিবী তাহার অভিকর্ষ বলের দ্বারা বায়ুমণ্ডলকে ধরিয়া রাখিয়াছে। বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থের সংমিশ্রণে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল গঠিত। ইহাতে প্রধানতঃ নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন রহিয়াছে। তাহা ছাড়া জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাইঅক্সাইড, কিছু হাইড্রোজেন এবং নিয়ন, জেনন, আর্গন প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য গ্যাসও রহিয়াছে। গাণিতিক উপায়ে বিজ্ঞানীরা নির্ধারণ করিয়াছেন যে, আয়তন হিসাবে বায়ুমণ্ডলে ২০% অক্সিজেন, ৭০% নাইট্রোজেন, ৪% জলীয় বাষ্প, ৫% কার্বন ডাইঅক্সাইড রহিয়াছে। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, সমুদ্রের উপরিতলের বায়ুর গঠন (উপাদানের অনুপাত হিসাবে) এবং উচ্চ বায়ুস্তরে অন্ততঃ ত্রিশ মাইল পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের গঠনে কোন পার্থক্য নাই। ত্রিশ মাইলের উপরে ওজোনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং একশত মাইলের উপরে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশী হয়। অবশ্য যে কোন উচ্চতায় নাইট্রোজেনের পরিমাণই সর্বাপেক্ষা বেশী।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে দুইটি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়; যথা—১। নিম্নাঞ্চল, ২। ঊর্ধ্বাঞ্চল। এই দুইটি অঞ্চলের আকার দুইটি শেলের (Shell) মত। ঊর্ধ্বাঞ্চলের শেলটি নিম্নাঞ্চলের শেলকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে। নিম্ন অঞ্চলকে বলা হয় ট্রপোস্ফিয়ার এবং ঊর্ধ্বাঞ্চলকে বলা হয় ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার। এই দুই অঞ্চল বিচ্ছিন্নকারী অঞ্চলকে বলা হয় ট্রপোপোজ। ট্রপোপোজ মেরু অঞ্চলে প্রায় ছয় মাইল এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রায় দশ মাইল উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলটি পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়া অবস্থান করিতেছে। এই অঞ্চলটি পরিচলনজনিত সাম্যাবস্থায় (Convective equilibrium বা Adiabatic equilibrium) রহিয়াছে। ইহার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন তাপমাত্রা বিদ্যমান এবং উচ্চতার সঙ্গে তাপমাত্রা হ্রাস পায়। ট্রপোস্ফিয়ারের বিভিন্ন স্তরে একাধিক কারণে তাপমাত্রার বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। প্রথমতঃ, সূর্যের তাপে পৃথিবীপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয় এবং ইহার সহিত সংলগ্ন বায়ুস্তরকে উত্তপ্ত করে। দ্বিতীয়তঃ, নিম্নাঞ্চলের বায়ুমণ্ডল সাধারণ তাপমাত্রায় যে পরিমাণ শক্তি গ্রহণ করে, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ শক্তি পরিত্যাগ করিয়া শীতল হয়। এই দুই রকমের প্রক্রিয়া চলিবার ফলে সর্বদা গ্যাসের ঘনত্বের তারতম্য ঘটে। ইহাতে একটি লম্ব অভিমুখী বায়ুর পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি হয় এবং নীচের উত্তপ্ত হাল্কা বায়ু উপরে উঠিয়া যায় এবং উপরের অপেক্ষাকৃত ভারী শীতল বায়ু নীচের

দিকে নামিয়া আসে। হাল্কা উষ্ণ বায়ু উপরে উঠিবার সময় Adiabtic expansion-এর ফলে শীতল হয় এবং ভারী শীতল বায়ু নীচে নামিবার সময় Adiabatic compression-এর ফলে উত্তপ্ত হয়। এই ভাবে তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। এই জন্য এই অঞ্চলকে কনভেকটিভ জোনও (Convective Zone) বলা হয়।

ট্রপোস্ফিয়ারের উপরের অঞ্চলকে বলা হয় ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। এই অঞ্চলে লম্ব অভিমুখী পরিচলন স্রোত খুবই দুর্বল এবং নাই বলিলেই চলে। এখানে বিকিরণের সাম্যাবস্থা বর্তমান। পরিচলন স্রোতের অনুপস্থিতির জন্য এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্তরে তাপমাত্রার পরিবর্তন দেখা যায় না। প্রায় ৩০ মাইল পর্যন্ত তাপমাত্রা -৫৫° সেন্টিগ্রেডে স্থির। ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ও ট্রপোস্ফিয়ারে সম্পূর্ণ পৃথক অবস্থা বর্তমান। ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার অপেক্ষাকৃত হাল্কা এবং শীতল। এখানে কোন মেঘ বা ঝড়-ঝঞ্ঝা নাই—এমন কি, আবহাওয়া বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার কিছুই নাই—সকল দিনই সমান। কোন দিনই আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখা যায় না। এই অঞ্চলে গভীর নীরবতা ও স্থিরাবস্থা বিরাজমান। তাপমাত্রার অভিন্নতার জন্য এই অঞ্চলকে আইসোথার্ম্যাল লেয়ার বা সমোষ্ণ স্তর (Isothermal layer বা Uniform temp. layer) বলা হয়। ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে বিভিন্ন প্রকার রশ্মি, যেমন—শক্তিশালী মহাজাগতিক রশ্মি, আল্‌ট্রাভায়োলেট রশ্মি, ইনফ্রারেড রশ্মি, ইলেকট্রনের স্রোত এবং আরও অনেক কণিকা রহিয়াছে, যাহা মানুষের নিকট আজও অজ্ঞাত। প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইলের উপর সক্রিয় ওজোন-স্তর রহিয়াছে, যেখানে বায়ু পৃথিবীর স্তরের ন্যায় উষ্ণ। আরও উর্ধ্বে প্রায় ষাট হইতে পঁয়ষট্টি মাইল উপরে এক অদৃশ্য ইলেকট্রন প্রতিফলক স্তর রহিয়াছে, যাহা হইতে বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত হইয়া পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে।

গত শতাব্দীর শেষভাগে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি বায়ুমণ্ডলের দিকে আকৃষ্ট হয়। বেলুন ও এরোপ্লেন তাঁহাদের অনুসন্ধান কার্যের প্রধান যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সেই প্রাথমিক যুগে বৈজ্ঞানিকেরা এইটুকু সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম হন যে, বায়ুমণ্ডলের বিস্তৃতির একটা সীমা আছে এবং মানুষ যদি খুব বেশী উচ্চতায় আরোহণ করে, তবে শ্বাসরোধের ফলে মৃত্যুও ঘটিতে পারে। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, বায়ু অবিভক্তভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ু শীতলতর ও ক্রমশঃ হাল্কা হইয়া গিয়াছে।

টি. ডি. বোর্ট (T. D. Bort) নামক একজন ভূতত্ত্ববিদ্ প্রথম অবিভক্ত বায়ুমণ্ডলের ধারণা দূরীভূত করেন। তিনি ১৮৯৬ সাল হইতে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রসমন্বিত আরোহীশূন্য বেলুন উর্ধ্বাকাশে প্রেরণ করেন। এই যন্ত্রে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন ভৌতিক অবস্থা ধরা পড়ে। এই যন্ত্রের চিত্রলিপি হইতেই প্রথম জানা যায় যে, ছয়-সাত মাইলের উপরে এক বিচিত্র বায়ুস্তর বর্তমান, যাহার অবস্থা আমাদের পরিচিত বায়ুর অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। টি. ডি. বোর্ট ও তৎকালীন ভূতত্ত্ববিজ্ঞানীরা এই অঞ্চলের তাপমাত্রার অভিন্নতার জন্য ইহার নাম দেন আইসোথার্ম্যাল বা সমোষ্ণ স্তর। পরবর্তী কালে তিনিই এই স্তরের ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার নাম দেন এবং পৃথিবী সংলগ্ন ঘন বায়ুস্তরের নাম দেন ট্রোপোস্ফিয়ার।

বোর্টের পূর্বে অনেক অভিযানকারী বেলুনে চড়িয়া ছয় হইতে আট মাইল উচ্চতায় আরোহণে সক্ষম হন। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যদিও এই সকল অভিযানকারীরা ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে পৌঁছাইতে সক্ষম হন, তথাপি তাঁহারা এই বিচিত্র বায়ুস্তর সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। ভূতত্ত্ববিজ্ঞানীরাই

ভূপৃষ্ঠ হইতে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রসমন্বিত আরোহী-শূন্য বেলুন পাঠাইয়া এই বায়ুস্তর আবিষ্কার করিয়াছেন। British Association for the Advancement of Science-এর পক্ষ হইতে গ্লাশিয়ার এবং কক্সওয়েল ঊর্ধ্বাকাশে আরোহণ করেন এবং প্রায় ১১ কিলোমিটার বা ৬·৮ মাইল আরোহণ করিবার পর অচেতন হইয়া পড়েন। বারসন ও সুরিং নামক দুই জন জার্মান অভিযানকারী ১০·৫ কিলোমিটার উর্ধ্বে আরোহণ করিবার পর অক্সিজেনের মুখোস থাকা সত্ত্বেও প্রায় আধঘণ্টা পর্যন্ত সংজ্ঞাহীন হইয়া ছিলেন। ১৯২৭ সালে ইউ. এস্. আর্মি কোরের হথোর্ন গ্রে একটি খোলা যানে প্রায় আট মাইল উর্ধ্বে আরোহণ করেন। কিন্তু হাল্কা বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মহা-জাগতিক রশ্মি আবিষ্কারের পর ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণা আরম্ভ হয়।

বজ্রপাত, মেরুজ্যোতি প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা হইতে বায়ুমণ্ডলে বিদ্যুতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। বায়ুমণ্ডলের এই তড়িৎ কোথা হইতে আসে? বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্ত করেন যে, জলীয় বাষ্প পৃথিবী হইতে তড়িৎ বহন করিয়া বায়ুমণ্ডলে লইয়া যায়। পরবর্তী কালে আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, পৃথিবীতে যে সকল তেজস্ক্রিয় পদার্থ রহিয়াছে, তাহা হইতে বিকিরিত রশ্মির দ্বারা বায়ুমণ্ডল আয়নিত হইবার ফলেই উহাতে তড়িৎ সৃষ্টি হয়। এই সিদ্ধান্তের পর বহু বৈজ্ঞানিক বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে আয়ননের পরিমাণ পরিমাপের জন্য পরীক্ষা চালাইতে থাকেন। থিওডোর উল্ফ্ কিছু যন্ত্রপাতি লইয়া প্যারিসের ইফেল টাওয়ারের উপরে উঠিয়া পরীক্ষা চালান এবং দেখেন যে, ভূমি অপেক্ষা সেখানে আয়ননের মাত্রা কম। তিনি এই রকম আশাই করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার মনে হয় যে, যতটা কম হওয়া উচিত ছিল, পর্য তত্তটা কম ধরা পড়ে নাই। ইহার পর সুইডেনের পদার্থবিদ্ গোয়েকেল বেলুনে চড়িয়া উপরে উঠিবার সময় বিভিন্ন স্থানের তেজস্ক্রিতার মাত্রা পরিমাপ করিতে থাকেন। তিনি প্রায় ১৩০০০ ফুট উর্ধ্বে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং লক্ষ্য করেন যে, প্রথমে তেজস্ক্রিয়তা কিছুটা কমিতে থাকে, কিন্তু পরে যত উপরে উঠা যায় এই আয়নন-প্রক্রিয়া ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

গোয়েকেলের পরীক্ষার ফলাফল লক্ষ্য করিয়া ভিক্টর পি. এফ. হেস্ এই বিষয়ে চিন্তা করিতে থাকেন। তিনি হিসাব করিয়া দেখেন যে, তেজস্ক্রিয় পদার্থের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী গামা রশ্মিও সমুদ্রতল হইতে কয়েক শত গজ উচ্চতার মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে শোষিত হইয়া যায়। অতএব হয় গোয়েকেলের পরীক্ষার ফলাফল ভুল, নচেৎ পুনরায় এই পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। হেস্ আরোহীশূন্য বেলুনে যন্ত্রপাতি বসাইয়া উর্ধ্বে প্রেরণ করেন এবং যন্ত্র কর্তৃক গৃহীত চিত্রলিপিতে গোয়েকেলের পরীক্ষার ফলাফল সমর্থিত হয়। তাহার পর হেস্ নিজে বেলুনে চড়িয়া প্রায় সাড়ে ছয় মাইল উর্ধ্বে আরোহণ করিয়া পরীক্ষা চালান এবং একই ফল লাভ করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, উপরের রশ্মিগুলির শক্তি ও ভেদকারী শক্তি গামা রশ্মি অপেক্ষা অনেক বেশী। ইহা যে পৃথিবীর তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে আসে নাই, সে বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত হন। হেস্ই প্রথম ধারণা করেন যে, এই রশ্মিগুলি কস্‌মস বা মহাকাশ হইতে আসিতেছে। এই রশ্মিগুলিই বায়ুমণ্ডলে তড়িতের অস্তিত্বের প্রধান কারণ।

বায়ুমণ্ডল জীব-জগতের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কোন জীবই বায়ু ব্যতীত বাঁচিতে পারে না, বায়ুমণ্ডলে যে অক্সিজেন-ভাণ্ডার রহিয়াছে, সেই ভাণ্ডার হইতে অক্সিজেন গ্রহ

করিয়া জীব-জগৎ জীবনধারণ করিতেছে। বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করিয়া উদ্ভিদ তাহার খাদ্য প্রস্তুত করে। বায়ুর নাইট্রোজেন হইতে প্রাকৃতিক উপায়ে সার উৎপাদিত হইয়া উদ্ভিদকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে।

বায়ুমণ্ডল একটি পুরু আবরণের মত বেষ্টন করিয়া বাহিরের প্রতিকূলতার হাত হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিতেছে। সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্রগুলিকে এক-একটি বিরাট পারমাণবিক চুল্লী (Atomic woven) বলিয়া ধরা যাইতে পারে। বিভিন্ন প্রকার বিক্রিয়ার ফলে এই সকল চুল্লী হইতে অবিরাম তীব্র শক্তিশালী তড়িতান্বিত কণিকা নিক্ষিপ্ত হইতেছে, যাহাদিগকে মহাজাগতিক রশ্মি বলা হয়। এই সকল কণিকা জীবের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। ইহা জমিকে অনুর্বর করে, জীবের শরীরে বিদ্যুৎশক্তির পরিমাণের পরিবর্তন ঘটাইয়া নানা প্রকার অস্বস্তির সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন প্রকার রোগের কারণ হয়। বায়ুমণ্ডলের ট্রপোস্ফিয়ারে বায়ুর অণু-পরমাণু এই সকল রশ্মিগুলিকে গ্রহণ করিয়া আয়নিত হইয়া যাইতেছে এবং পরিণামে পৃথিবীকে ইহাদের হাত হইতে রক্ষা করিতেছে। বায়ুর সহিত ধাক্কা খাইবার পর যে পরোক্ষ মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছায়, তাহার শক্তি অনেক কম।

বায়ু একটি কুপরিবাহী গ্যাসীয় পদার্থ। বায়ুর তাপ-কুপরিবাহিতার জন্য দিনের বেলায় পৃথিবী খুব বেশী উত্তপ্ত হইতে পারে না, আবার রাত্রিবেলায় পৃথিবী বেশী তাপ পরিত্যাগ করিয়া খুব বেশী শীতল হইতেও পারে না। বায়ুমণ্ডলের ট্রোপোস্ফিয়ারে পরিচলন স্রোতের উপস্থিতির জন্য বায়ু-প্রবাহ ঘটিতেছে, বৃষ্টিপাত হইতেছে।

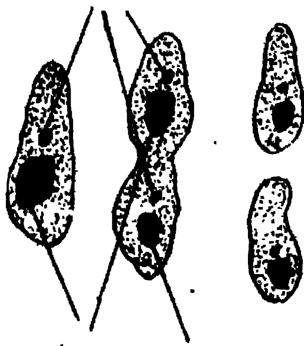
অমর জীবন

শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ

জীব-জগতে দেখা যায়, জীবের জন্মের পর তার দেহের বৃদ্ধি হতে থাকে। কিছুদিন পরে এই বৃদ্ধি একটা চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। তারপর দেহে জরার আক্রমণ সুরু হয় এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে সে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে দেহকোষের তন্তুগুলি কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং কোষবিভাজন বন্ধ হয়ে আসে। অবশেষে ঘনিয়ে আসে কোষের মৃত্যু। এই নিয়ম স্বাভাবিক মনে হলেও এমন কিছু বিশেষ ধরণের জীবকোষ ও ক্ষুদ্র জীব আছে, যারা একরূপ অমরত্ব নিয়েই জীবনধারণ করে। বার্ধক্য ও মৃত্যু স্পর্শ করবার পূর্বেই তারা বার বার পুনর্যৌবন লাভ করে। অবশ্য এরূপ অমরত্ব সম্পূর্ণ নিরালম্ব নয়—যে প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবন ধারণ ও পোষণ সম্ভব, তা যদি বদলে বা নষ্ট হয়ে যায়, তবে কোন জীবকোষের পক্ষেই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু জীব-বিজ্ঞানের একটি চরম সত্য এই যে, ক্ষুদ্রতম এককোষী জীবাণু থেকে আরম্ভ করে জটিলতম দেহধারী মনুষ্য পর্যন্ত প্রত্যেক জীবের মধ্যে জীবনকে চিরায়ত্ত করবার কোন না কোনরূপ দৈব ব্যবস্থা আছে।

তা না হলে কোটি কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীতে প্রাণকণিকার প্রথম আবির্ভাবের পর থেকে শত সহস্র প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিবেশ অগ্রাহ্য করে কোন জীবের পক্ষেই অভিযোজন ও উদ্বর্তনের ধারা আজও টিকিয়ে রাখা সম্ভব হতো না। জীবের মধ্যে এই যে অমরত্বের মূল সূত্র, একেই আমরা বলবো অমর জীবন—এর কথাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

প্রোটোজোয়া বা আদ্যপ্রাণী গোষ্ঠীর এক-কোষী প্রাণীদের জীবন-পর্যায় অতি সরল নিউক্লিয়াসটি দু-ভাগে ভাগ হয়ে যায়। তার পর কোষটির মধ্যবর্তী স্থান সঙ্কুচিত হতে থাকে এবং নিউক্লিয়াস দুটির এক একখণ্ড করে এক এক প্রান্তে সরে যায়। অবশেষে সঙ্কুচিত স্থানে কোষটি দু-খণ্ডে বিভক্ত হয়ে দুটি পৃথক কোষ উৎপন্ন করে। প্রত্যেক খণ্ডে আদি কোষের মতই একটি ছোট ও একটি বড় নিউক্লিয়াস থাকে। এই পদ্ধতিটি স্বদেহজ এবং অযৌন। এই পদ্ধতিতে পুনঃপুনঃ কোষ-বিভাজন হতে থাকে এবং তত্ত্বগতভাবে প্রমাণ করা যায় যে, এরূপ





ক খ

১নং চিত্র

(ক) প্যারামিসিয়ামের দ্বি-বিভাজন, (খ) প্যারামিসিয়ামের যৌনমিলন ও বিভাজন।

হলেও বিস্ময়কর। কারণ তত্ত্বগত দিক দিয়ে দেখানো যেতে পারে যে, এরা একরূপ অমর। এই গোষ্ঠীর প্যারামিসিয়াম নামক এককোষী প্রাণীর বংশবিস্তারের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এরা সাধারণ অবস্থায় মাতৃকোষের দ্বি-বিভাজন পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে। এদের কোষে দুটি নিউক্লিয়াস আছে—একটি বড় ও অন্যটি ছোট। কোষটি খাদ্য গ্রহণ করে আকারে বড় হয়। কোষ-বিভাজনের পূর্বে প্রথমে ছোট নিউক্লিয়াসটি এবং পরে বড় বিভাজন কোন দিনই থামবে না। সুতরাং প্যারামিসিয়ামের কোন দিনই মৃত্যু হবে না।

এরূপ অযৌন কোষ-বিভাজন প্যারামিসিয়ামের বংশবিস্তারের সাধারণ উপায় হলেও সংযোগ পদ্ধতিতেও এরা বংশবিস্তার করতে পারে। এই পদ্ধতিতে একই রকম কোষ পাশাপাশি সংলগ্ন হয়ে যায়। প্রত্যেক কোষের ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াসটি দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং প্রত্যেকের মধ্যে ক্রোমোসোমের অর্ধেক বস্তু থাকে। এরপর বিভক্ত নিউক্লিয়াসের একটি

অংশ সংযোগস্থল অতিক্রম করে অন্ত কোষের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তার স্থির অংশটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। তারপরে কোষ দুটি পৃথক হয়ে যায়। তখন প্রত্যেকের মধ্যে ক্রোমোসোমের মূল সংখ্যা ফিরে আসে। এর পরে কোষ দুটির মধ্যে নিউক্লিয়াস দুটির কতকগুলি পরিবর্তন হয়। অবশেষে আদি কোষ দুটির সম্পূর্ণ অনুরূপ দুটি কোষ উৎপন্ন হয়। এরপর প্রত্যেকটি কোষ আবার পূর্বোল্লিখিত সাধারণ বিভাজন পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করতে পারে। প্যারামিসিয়ামের স্ত্রী ও পুরুষ কোষের ভেদ নেই, তবুও উচ্চ-শ্রেণীর প্রাণীর যৌন-কোষের মিলনের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায় এই সংযোগকে যৌন-মিলনও বলা হয়। যৌন ও অযৌন উভয় পদ্ধতিতেই পুরাতন মাতৃকোষগুলির জীবন ও যৌবনের নবীভবন হয়। এদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, অযৌন পদ্ধতিতে স্বীয় নিউক্লিয়াসের বিভাজন ও সংযোগের ফলে এই নবীভবন হয়, কিন্তু যৌন পদ্ধতিতে ব্যাপারটি ঘটে দুটি পৃথক কোষের নিউক্লিয়াসের বিভাজন ও পারস্পরিক সংযোগে। তাছাড়া অযৌন পদ্ধতিতে এদের সংখ্যা এক থেকে দুই হয়। কিন্তু যৌন পদ্ধতিতে দুই থেকে দুই-ই সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন হচ্ছে—এই এককোষী প্রাণীদের অমরত্বের মূল সূত্র কোথায়? উচ্চ পর্যায়ের প্রাণীদের দেহ বহু কোষের সমষ্টি হওয়ায় বিশেষ বিশেষ কাজের জন্যে তাদের কোষগুলি বিশেষিত হয়ে যায়। কিন্তু এককোষী প্রাণীদের একটি মাত্র কোষের সাহায্যে তাদের সব কিছু কাজ করতে হয়, সুতরাং তাদের কোষটি সম্পূর্ণ প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। এরূপ কোষের পুনর্গঠন ও বংশবিস্তারের ক্ষমতা অপরিসীম, সে জন্যেই এরা একরূপ অমর।

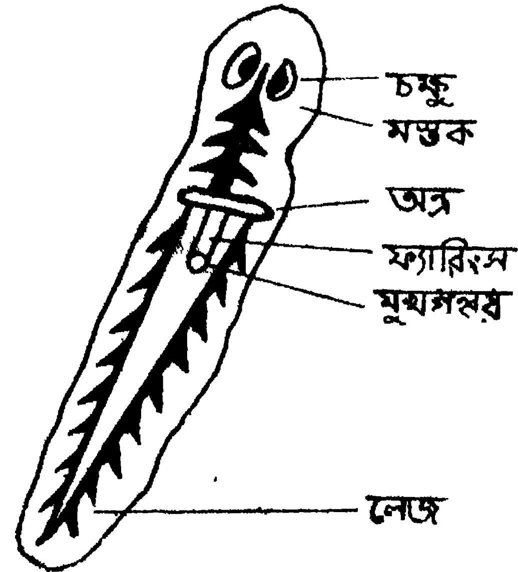
প্রাণী বলতে সাধারণতঃ আমাদের চোখে পড়ে উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী—পশু-পক্ষী, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী প্রভৃতি। এদের জীবনধারণ বলতে বাহ্য দেহটাই চোখে পড়ে। এই দেহের জন্ম, বৃদ্ধি, জরা ও মৃত্যুর উপর ভিত্তি করেই আমরা জীবন-মৃত্যুর তত্ত্বটি গড়ে তুলেছি। কিন্তু এই বিচার আংশিক সত্য মাত্র, নবজীবন ও দেহ সৃষ্টির মূল তথ্যটি এর মধ্যে বিচার করা হয় নি।

উচ্চ শ্রেণীর সকল প্রাণীই যৌন-পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে। প্রাণীদের পুরুষ ও স্ত্রী প্রত্যেকের দেহের মধ্যে দেহ-কোষ ব্যতীত আরও এক ধরণের কোষ তার যৌন গ্রন্থির মধ্যে অবস্থান করে। এগুলিকে আমরা যৌন-কোষ বা বংশবিস্তারের কোষ বলবো। পুরুষ প্রাণীর এই কোষের নাম শুক্রাণু, যা থাকে তার অণ্ডাশয়ের মধ্যে এবং স্ত্রী প্রাণীর এই কোষের নাম ডিম্বাণু, যা থাকে গর্ভাশয়ের মধ্যে। পুরুষ ও স্ত্রীর দৈহিক পরিণতির একটা বিশেষ পর্যায়ে এই যৌন-কোষগুলিও পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়। সেই সময়ে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলনে নবজীবের ভ্রূণের সৃষ্টি হয়। পুনঃপুনঃ কোষ-বিভাজনের ফলে ভ্রূণের দেহের বৃদ্ধি ঘটে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন ও বৃদ্ধি হয়। এই কোষ-বিভাজনের অতি আদি অবস্থাতেই কতকগুলি বিশেষ কোষের সৃষ্টি হয়—এগুলিই যৌন-কোষ। এগুলি দেহ-কোষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিশেষ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই যৌন-কোষগুলিই জীব সৃষ্টির সকল রহস্যের মূলে, এদের মধ্যেই নিহিত আছে নতুন প্রাণ ও দেহ সৃষ্টির মূল রহস্য এবং বংশগতির জটিল বিধান। এই যৌন-কোষগুলি একরূপ অমর। উপযুক্ত সময়ে যৌন-মিলনের সুযোগ পেলে এরা পুনঃপুনঃ নতুন জীব সৃষ্টি করে এবং নবজীবন ও যৌবন লাভ করে। দেহ-কোষগুলি জরা ও মৃত্যুর বশীভূত হলেও যৌন কোষগুলি যেন অনন্ত জীবন ও যৌবনের অধিকারী। এক কথায় বলা যেতে পারে, জীবের মরণশীল দেহটি তার অমর যৌন-কোষের একটি অস্থায়ী

বিকাশ মাত্র। একটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর অবশ্য বিজ্ঞানীর পক্ষে এখনও দেওয়া সম্ভব হয় নি—দেহ-কোষ ও যৌন-কোষের মধ্যে কি এমন মৌলিক পার্থক্য আছে, যার ফলে দেহ-কোষগুলি জরা ও মৃত্যুর বশীভূত হলেও যৌন-কোষগুলি এদের এড়িয়ে চলতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যতে হয়তো পাওয়া যাবে।

জীবন ও যৌবনকে দীর্ঘায়ত করবার বাসনা মানুষের মধ্যে অতি আদিম। এই কামনার প্রকাশ সকল জাতির প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীতেই পাওয়া যায়। গ্রীক পুরাণে 'লারনার হাইড্রা'র একটি কাহিনী আছে। এটি ছিল নয়টি মস্তকবিশিষ্ট একটি মহাসর্প। এর একটি মাথা কেটে ফেললে সেই স্থলে দুটি মাথা গজাতো। মহাবীর হারকিউলিস তরবারির এক কোপে এক সঙ্গে সব কয়টি মাথা কেটে ফেলে একে হত্যা করেন। আমাদের পুরাণে রাবণের দশ মাথার উল্লেখ আছে। তার একটি মাথা কেটে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে আবার মাথা গজিয়ে উঠতো। এসব অবাস্তব কল্পনা হতে পারে, কিন্তু সাপ বা মানুষের মত উচ্চস্তরের প্রাণীর ক্ষেত্রে না হলেও কতকগুলি নিম্নস্তরের মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে এরূপ অঙ্গ পুনর্গঠনের ব্যাপার বাস্তব সত্য। টিকটিকি ও গিরগিটির লেজ খসে গেলে আবার গজায়, কাঁকড়া ও চিংড়ির দাড়া ভেঙ্গে গেলে আবার উৎপন্ন হয়, কেঁচোর দেহের কিছুটা কেটে দিলে আবার গজায়, শামুকের মাথা কেটে দিলেও তার পুনর্গঠন হয়। এগুলি আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা। কোন কোন নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে যে বিস্ময়কর অঙ্গ-পুনর্গঠনের ক্ষমতা আছে, তা সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরীক্ষা করে দেখেন বিজ্ঞানী ট্রেম্বলি ১৭৪০-৪৪ সালের মধ্যে। তিনি জলচর অমেরুদণ্ডী প্রাণী হাইড্রার উপর পরীক্ষা করেন এবং প্রমাণ করেন যে, একটি হাইড্রাকে আড়াআড়ি দু-খণ্ডে কেটে ফেললে প্রত্যেক খণ্ড থেকে একটি নতুন হাইড্রার জন্ম হয়। তাছাড়া হাইড্রার দেহকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে দুটি খণ্ড জোড়া লাগিয়ে দিলে তা বেশ জুড়ে যায় এবং কিছুদিন পরে তা থেকে নতুন হাইড্রার উৎপত্তি হয়। ট্রেম্বলির এই আবিষ্কার তখনকার দিনে বিজ্ঞানী ও জনসাধারণের মধ্যে প্রচুর সাড়া জাগিয়েছিল এবং এর জন্যে তাঁকে যথেষ্ট ব্যঙ্গ ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

অঙ্গ-পুনর্গঠন তত্ত্ব প্রমাণ করবার জন্যে কোন জটিল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। প্ল্যানেরিয়া নামক এক জাতীয় ক্ষুদ্র চ্যাপ্টা কৃমি নিয়ে সহজেই এই পরীক্ষা করা যেতে পারে। প্ল্যানেরিয়া কয়েক জাতের হয়। এদের



২নং চিত্র

ইউপ্ল্যানেরিয়া লুগুব্রিসের লম্বচ্ছেদ।

দেহ লম্বা ও চ্যাপ্টা এবং কয়েক মিলিমিটার দীর্ঘ। দেহের রং গাঢ় বাদামী অথবা সাদাও হয়। এরা সাধারণতঃ পুষ্করিণীর জলের মধ্যে নুড়ি বা পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে। প্ল্যানেরিয়ার বিস্ময়কর পুনর্গঠন ক্ষমতার পরীক্ষা সর্বপ্রথম

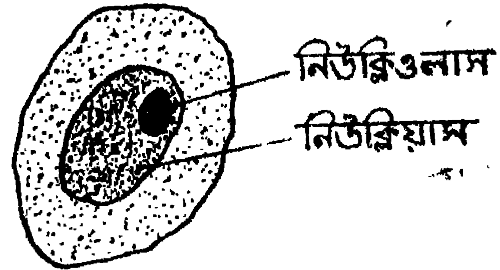
করেন রেমার ১৯৪১ সালে। ২নং ছবিতে ইউ-প্ল্যানেরিয়া লুগুব্রিস (Euplanaria lugubris) নামক এক জাতের প্ল্যানেরিয়ার লম্বচ্ছেদ দেখানো হয়েছে।

এর মস্তকের অংশটিই প্রধান। এর মধ্যে দুটি চোখ, মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুকেন্দ্র অবস্থিত। কিন্তু এর মুখটি মস্তকের অংশে অবস্থিত নয়, সেটি থাকে পেটের মধ্যস্থলে। মুখ থেকে যে ছোট একটি সরু নালী বেরিয়ে গেছে, তার নাম ফ্যারিংস। অভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি প্যারেনকাইমা নামক এক বিশেষ ধরণের হাল্কাভাবে সংবদ্ধ কোষগুচ্ছের মধ্যে নিহিত থাকে।

প্ল্যানেরিয়ার মাথার একটু নীচে কোন সূক্ষ্ম ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেটে ফেললে দেখা যায় যে, মস্তকহীন প্রাণীটি নড়াচড়া বা আহার গ্রহণ প্রায় বন্ধ করে দেয়। তারপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ক্ষত শুকিয়ে যায় এবং একটি সাদা আস্তরণ পড়ে। পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে এর উপর দুটি চোখ গজিয়ে ওঠে। তিন সপ্তাহের মধ্যে মস্তকের অংশটি সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত হয়। তখন আসল প্রাণী ও পুনর্গঠিত প্রাণীটির মধ্যে কোন পার্থক্য ধরা যায় না। এই প্রাণীটিকে যত রকম উপায়ে সম্ভব কেটে দেখা হয়েছে। আড়াআড়ি, লম্বালম্বি ও তেরছা যে কোন রকমে কাটা হোক না কেন, প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, কর্তিত যে কোন অংশ থেকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীটি আবার উৎপন্ন হয়েছে।

প্ল্যানেরিয়ার এই অদ্ভুত পুনর্গঠন ক্ষমতা কি ভাবে সম্ভব? সকল প্রাণীর এই ক্ষমতা নেই কেন? প্ল্যানেরিয়ার মাথা কেটে নিলে কেমন করে বাকী অংশটা বুঝে নিতে পারে যে, তার মাথা নেই এবং একটা মাথা গঠিত হবার পর আর একটা মাথারই বা সৃষ্টি হয় না কেন? এসব প্রশ্ন জীব-বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট চিন্তার কারণ হয়েছে। তবে তাঁরা অবশ্য এসব প্রশ্নের মোটামুটি সন্তোষজনক একটা ব্যাখ্যাও দিয়েছেন।

প্রথম প্রশ্ন, দেহ পুনর্গঠনের যান্ত্রিক ব্যবস্থাটি কি? আমরা দেখেছি ইউপ্ল্যানেরিয়া লুগুব্রিসের দেহের মধ্যে হাল্কাভাবে সংবদ্ধ প্যারেনকাইমা নামক এক ধরণের কোষ আছে। এই সকল কোষের মধ্যে অন্য এক ধরণের কোষ থাকে, যেগুলি প্যারেনকাইমার মধ্য দিয়ে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারে। এই কোষগুলিই হলো দেহ পুনর্গঠনের মূলে। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, এই কোষগুলি অবিশেষিত (Non-specialised), অর্থাৎ এরা দেহের কোন বিশেষ অঙ্গ গঠনের জন্যে নির্দিষ্ট হয় নি। তার অর্থ এই যে, এই অবিশেষিত কোষগুলি প্রয়োজনমত যে কোন অঙ্গ গঠন করবার ক্ষমতা রাখে। এই কোষগুলি গোলাকার এবং এদের নিউক্লিয়াসটিও এবং তন্মধ্যে অবস্থিত নিউক্লিওলাসটিও বেশ বড়। যে



৩নং চিত্র
পুনর্গঠিত কোষ

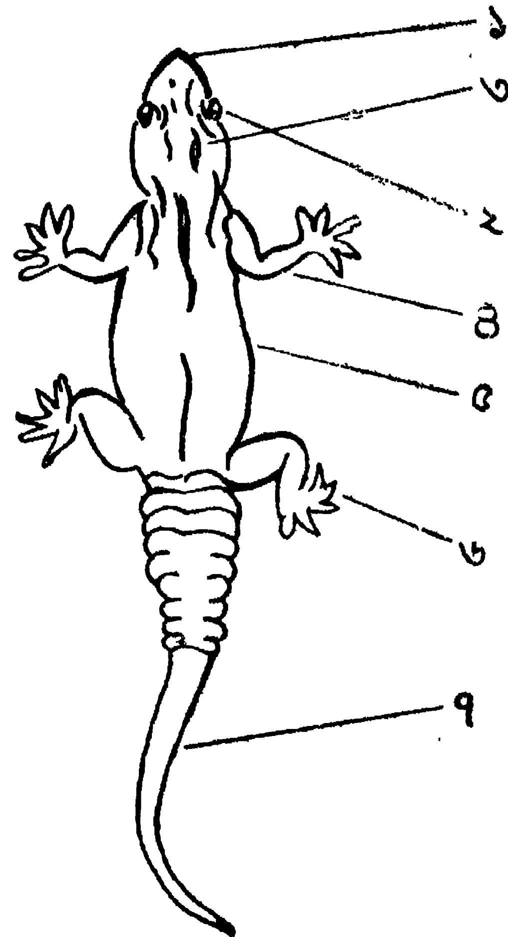
কোন ভ্রূণের মধ্যে এরূপ অবিশেষিত কোষের দেখা পাওয়া যায়। তবে উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীর ভ্রূণের এরূপ কোষগুলি ক্রমে ক্রমে বিশেষ অঙ্গ গঠনের জন্যে বিশেষিত হয়ে যায়, প্ল্যানেরিয়ার দেহের মধ্যে প্রচুর অবিশেষিত কোষ থেকে যায়। এই কোষগুলিকে বলা হয় পুনর্গঠন কোষ (Regeneration cell)।

প্ল্যানেরিয়ার মস্তকচ্ছেদনের পরে ক্ষতস্থানটি

একটি পাতলা চামড়ার আবরণে ঢেকে যায়। ক্ষতস্থানের নিকটস্থ যে সকল পুনর্গঠনের কোষ আছে, সেগুলি ঐ স্থানের দিকে দলে দলে ধাবিত হয় এবং একটি গুটিকার মত পদার্থ তৈরি করে, যাকে বলা যায় পুনর্গঠন কুঁড়ি (Regeneration bud)। এই কুঁড়ির মধ্যে কোষগুলি ক্রমশঃ বিভাজিত হয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমশঃ চর্ম, পেশী, মস্তিষ্ক, চক্ষু, চক্ষুর রঞ্জক পদার্থ প্রভৃতি উৎপন্ন হয় এবং অবশেষে সম্পূর্ণ মস্তিষ্কটি পুনর্গঠিত হয়। সুতরাং বোঝা গেল যে, প্রয়োজন হলে প্ল্যানেরিয়ার অবিশেষিত কোষগুলি বিশেষ বিশেষ অঙ্গ গঠনের জন্যে বিশেষিত হয়ে যায়। উচ্চশ্রেণীর প্রাণীর ক্ষেত্রে এরূপ অবিশেষিত কোষের অভাবই তাদের অঙ্গ পুনর্গঠনের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

এর পরে প্রশ্ন ওঠে—পুনর্গঠনের কোষগুলি যে বিশেষ দিকে ধাবিত হয়, তাদের চালিত করে কে? কিভাবে তারা টের পায় যে, তাদের একটা বিশেষ অঙ্গের অভাব ঘটেছে? এটা নিশ্চিত যে, ছিন্ন অংশ থেকে পুনর্গঠনের কোষগুলি পর্যন্ত কোন যোগাযোগের সূত্র আছে। কিন্তু এই সূত্রটি কি? কেউ কেউ মনে করেন, প্ল্যানেরিয়ার স্নায়ুতন্ত্রই এই যোগাযোগের সূত্র। আবার কেউ কেউ মনে করেন, কোন রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণের ফলে এটা সম্ভব হয়। আবার স্নায়ুতন্ত্র ও রাসায়নিক পদার্থ উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায়ও এটা সম্ভব হতে পারে। এই সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত তথ্য প্রয়োজন। মস্তক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ পরীক্ষায় দেখা গেছে, পুনর্গঠন কোষগুলি প্রথমে মস্তিষ্ক গঠন করে, তারপর মস্তিষ্কের নির্দেশে এরূপ কোষ থেকে চোখ গঠিত হয়। মস্তিষ্ক না থাকলে চোখের গঠন সম্ভব হয় না। সুতরাং স্নায়ুতন্ত্র যে অন্ততঃ চোখের গঠনের জন্যে দায়ী, তা বোঝা যায়।

তৃতীয় প্রশ্ন হলো, প্ল্যানেরিয়ার মাথা কেটে দিলে তার জায়গায় একটি মাথাই উৎপন্ন হয়, দুটি বা তিনটি হয় না কেন? এর উত্তরে বিজ্ঞানীরা বলেন যে, একটি মাথা উৎপন্ন হবার পর মস্তিষ্ক থেকে এমন কোন রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়, যা আর একটি মাথা উৎপন্ন হতে বাধা দেয়। এই রাসায়নিক পদার্থ প্রথমোক্ত রাসায়নিক পদার্থ থেকে পৃথক ও বিপরীত-ধর্মী।



৪নং চিত্র

বিচ্ছিন্ন অঙ্গ পুনর্গঠনকারী প্রাণীর পুনর্গঠনক্ষম অঞ্চল
১। ঠোঁট, ২। চোখ, ৩। মাথা, ৪। সামনের পা, ৫। বুক ও পেট, ৬। পিছনের পা, ৭। লেজ
[৩ ও ৫ নং অঞ্চলের পুনর্গঠনের ক্ষমতা নেই]

কারণ প্রথমোক্ত পদার্থটি পুনর্গঠনের আনুকূল্য করে, কিন্তু দ্বিতীয়টি করে প্রতিকূলতা। এই দ্বিতীয় পদার্থটি না থাকলে পুনর্গঠনের কোন সামঞ্জস্য থাকতো না, অর্থাৎ পুনর্গঠিত প্রাণীটি

মূল প্রাণী থেকে আকারে সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারতো—তার একটি মাথা ও লেজের স্থলে বহু মাথা ও বহু লেজ হতে পারতো। দ্বিতীয় পদার্থটি প্রাণীটিকে এরূপ দৈহিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে নিউটের কতকগুলি অঙ্গ পুনর্গঠনের বিস্ময়কর ক্ষমতা আছে। এরা ঠোঁট, চোখ, চারটি পা এবং লেজ পুনর্গঠন করতে পারে। এই পুনর্গঠনের ক্ষমতা প্রত্যেকের নিজস্ব অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ কর্তিত চোখের অঞ্চল থেকে চোখই উৎপন্ন হবে, নাক নয়—বাঁ পা থেকে বাঁ পা-ই হবে, ডান পা নয়। আবার মাথা, বুক ও পেটের অংশের পুনর্গঠন ক্ষমতা একেবারেই নেই। ৪নং চিত্রে অঙ্গ পুনর্গঠনকারী প্রাণীর পুনর্গঠনের অঞ্চলগুলি দেখানো হয়েছে।

একটা জিনিষ বোঝা যাচ্ছে যে, উদ্বর্তনের পথে জীব যত উচ্চতর পর্যায়ে উঠেছে, ততই অঙ্গ পুনর্গঠনের ক্ষমতা কমে এসেছে এবং সীমাবদ্ধ হয়েছে। উচ্চতর জীবের দেহ-কোষগুলি অত্যন্ত বিশেষিত হয়ে যায় বলে এরূপ হয়। তবে উচ্চতর জীবের ক্ষেত্রে এরূপ ক্ষমতা একেবারে নেই, এমন বলা যায় না। আমাদের দেহের চামড়ার যথেষ্ট পুনর্গঠনের ক্ষমতা আছে। কোন স্থানে চামড়া ছিঁড়ে গেলে কয়েক দিনের মধ্যে আবার নতুন চামড়া গঠিত হয়। ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগে, কারণ ভাঙ্গা স্থানে নতুন হাড়ের কোষতন্তু গঠিত হয়, চুল ও নখ কাটলে আবার বাড়ে, ক্ষতিগ্রস্ত পেশীতন্তু আবার গঠিত হয়।

সুতরাং দেখা গেল যে, উচ্চ শ্রেণীর জীবের মধ্যে—এমন কি, মানুষের মধ্যেও দেহের কোন কোন অংশের পুনর্গঠন ক্ষমতা আছে, যদিও তা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। আমাদের আঙ্গুল কেটে গেলে তা আবার গজায় না। এই বিষয়ে প্রকৃতির প্রবল বাধা আছে। মানুষের একটি আঙুলেরই যেখানে পুনর্গঠনের সম্ভাবনা নেই, সেখানে রাবণের মত কাটা মাথা গজাবার স্বপ্ন তার চিরদিন স্বপ্নই থেকে যাবে। তবে একটি সান্ত্বনা নিয়ে আমরা মরতে পারবো, আমরা—মানুষ ও অন্যান্য সমস্ত জীব পৃথিবীতে জন্মাবো ও মরবো, কিন্তু আমাদের মৃত্যুঞ্জয়ী যৌন-কোষের মাধ্যমে দেহ থেকে দেহান্তরে, প্রাণ থেকে প্রাণান্তরে আমরা অমর জীবনকে চিরায়ত করে যাব, যতদিন এই জীবধাত্রী ধরিত্রী জীবন-ধারণের অনুকূল পরিবেশ রক্ষা করে চলবে।

সঞ্চয়ন

সাংবাদিক বৈঠকে চন্দ্রলোক প্রত্যাগত মহাকাশচারীত্রয়

চন্দ্রলোক প্রত্যাগত মার্কিন মহাকাশচারী নীল এ. আর্মষ্ট্রং, এডুইন ই. অলড্রিন (জুনিয়ার) এবং মাইকেল কলিন্স সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে চলচ্চিত্র ও স্লাইড সহযোগে তাঁদের বিস্ময়কর সফরের বর্ণনা দেন। ছবিগুলি ছিল খুবই স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। তাঁদের কারিগরী থেকে দার্শনিক বিষয় পর্যন্ত নানা ধরণের প্রায় ২৯টি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

অ্যাপোলো-১১-এর মূল যান কলাম্বিয়ায় মহাকাশচারী কলিন্স যখন চাঁদের কক্ষপথে চন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করছিলেন, মহাকাশচারী আর্মষ্ট্রং ও অলড্রিন তখন ছোট চান্দ্রযান ঈগলের সাহায্যে অ্যাপোলো-১১ থেকে নেমে এসে চাঁদের বুকে পদচারণা করছিলেন। চাঁদে গিয়ে তাঁদের বহু রকমের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে—একথা যাত্রার পূর্বে তাঁদের বলা হয়েছিল—বাস্তবে কিন্তু তা হয় নি।

আর্মষ্ট্রং এই প্রসঙ্গে বলেছেন—চাঁদের অভিকর্ষ, আবহাওয়া ও পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এজন্যে যাঁরা চাঁদের বুকে নেমে তথ্য সংগ্রহ করতে যাবেন, তাঁদের হয়তো বহু রকমের বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে—বেশ কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞের এই ভবিষ্যদ্বাণী কিন্তু কার্যতঃ প্রমাণিত হয় নি।

আর্মষ্ট্রং আরও বলেন—চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের পর চন্দ্রের অভিকর্ষের আওতায় এসে আরামই বোধ করছিলাম। ঐ অবস্থা, ভারশূন্য অবস্থায় এবং পৃথিবীর অভিকর্ষের মধ্যে থাকবার তুলনায় আমাদের কাছে অধিকতর আরামপ্রদ মনে হয়েছিল।

চান্দ্রযানটি সম্পর্কে আর্মষ্ট্রং বলেন, চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের সময় এর পাদানি চন্দ্রের মৃত্তিকায় ঢুকে যেতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তা হয় নি এবং যানটিরও কোন ক্ষতি হয় নি, সেটি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় চাঁদের বুকে দাঁড়িয়েছিল।

তিনি চন্দ্রপৃষ্ঠে তথ্যানুসন্ধান প্রসঙ্গে এই বলে দুঃখ প্রকাশ করেন যে, সেখানে অসংখ্য কাজ করবার ছিল, কিন্তু হাতে সময় ছিল খুবই কম। আমাদের অবস্থাটা হয়েছিল ঠিক মিষ্টির দোকানের সামনের একটি পাঁচ বছরের বালকের মত—এত জিনিষ, কোন্‌টা খাব?

বেশ কয়েক-শ' সাংবাদিক হিউষ্টনে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। মহাকাশচারীরা যে সকল ফটো ও চলচ্চিত্র চন্দ্রলোক থেকে তুলে নিয়ে এসেছেন, প্রথমতঃ সে সকল সাংবাদিকদের দেখানো হয়। এই সকল ছবিতে মূল মহাকাশযান অ্যাপোলো-১১ কলাম্বিয়া থেকে চান্দ্রযানটির চন্দ্রের মহাকাশে পৃথক হয়ে যাওয়া, চান্দ্রযান ঈগলের চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ, মহাকাশচারীদ্বয়ের চন্দ্রপৃষ্ঠের তথ্যাদি সংগ্রহের কাজকর্ম এবং চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে যাত্রা করে মূল যান কলাম্বিয়ায় ফিরে আসা—প্রভৃতি দেখানো হয়েছে।

মহাকাশচারীরা চান্দ্রযান ঈগল থেকে চাঁদে নেমে বাঁ-দিকের সামনের জানালা থেকে চন্দ্রপৃষ্ঠের ঢেউখেলানো বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ছবি তুলেছেন। মহাকাশচারী আর্মষ্ট্রং বলেন যে, চান্দ্রযানের দক্ষিণ দিকের জানালা দিয়ে দেখে চন্দ্রপৃষ্ঠকে এক অসীম সমতল প্রান্তর বলে মনে হয়েছে। তিনি বাঁ-দিক থেকে তোলা

ঢেউখেলানো বিশাল প্রান্তরের ছবির সঙ্গে ডান দিকের জানালা দিয়ে দেখা দৃশ্যের তুলনা করেন।

চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের স্থান সম্পর্কে তাঁরা যে নির্দেশ পেয়েছিলেন, তদনুযায়ী সেখানে অবতরণ না করে তাথেকে আরও দূরে একটি বিরাট গহ্বরের একেবারে গায়ে এসে অবতরণ করেছিলেন। ঐ গহ্বরের মুখের ব্যাস ২৪ মিটার অর্থাৎ ৩০ ফুট। ঐ গহ্বরের ছবিটিও তাঁরা তুলেছেন।

অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরে মহাকাশচারীরা বলেন যে, তাঁরা প্রায় ১০০০ ছবি তুলেছেন। এই সকল ছবি চন্দ্রপৃষ্ঠের বিভিন্ন ধরণের রহস্যময় গহ্বর সম্পর্কে বহু তথ্যের সন্ধান দিবে। ভূবিজ্ঞানীরাই এই সকলের উপর আলোকপাত করতে পারবেন বলে আমরা আশা করে আছি।

চন্দ্রপৃষ্ঠে তথ্য সংগ্রহের পর চান্দ্রযানে ওঠবার সময় মহাকাশচারীরা দেখেন যে, তাঁদের পিঠে যে অক্সিজেনের ব্যাগটি ছিল, তার গ্যাস অনেকটা কমে গেছে।

যদিও পৃথিবীতে চন্দ্রের অভিকর্ষ ও আলোক সৃষ্টি করে তার মধ্যে চন্দ্রলোক যাত্রার পূর্বে তাঁদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, তথাপি তাঁরা যখন চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করেন, তখন তাঁদের মনে হয়েছিল—এরূপ দৃশ্য জীবনে আর কোন দিনই প্রত্যক্ষ করেন নি—এমন কি, আলো-অন্ধকারের এমন অপরিচিত প্রকৃতিরও সম্মুখীন হন নি।

যন্ত্রযুগে আওয়াজের সমস্যা ও তার প্রতিকার

ফিস্ ফিস্ করে কথা বলবার দিন শেষ হয়ে গেছে বলে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন। কারণ বর্তমান যন্ত্রযুগে হৈ চৈ আর গোলমালের জন্যে চড়া সুরে কথা না বললে কেউ আর তা শুনতে পায় না। এমন দিন হয়তো আসবে, যখন কণ্ঠস্বর সর্বোচ্চ মাত্রায় তুলে ধরলেও সেটা হয়তো অপরের শ্রুতিগোচর হবে না।

ধারণাটা একটু মাত্রাতিরিক্ত হলেও একজন মার্কিন বিজ্ঞানী বলেছেন, গত ৩০ বছরে যুক্তরাষ্ট্রে গাড়ী, লরী ও কলকারখানার শব্দ প্রচুর বেড়ে গেছে। এই বিজ্ঞানী গত ৪০ বছর ধরে মানুষের জীবনে উৎকট শব্দের সমস্যা নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি বলেন, গত ৩০ বছর ধরে প্রতি বছর এক ডেসিবেল (শব্দের পরিমাণ) করে শব্দ বাড়ছে।

মানুষের জীবনে শব্দের এই সমস্যা হ্রাস পাবার কোন সম্ভাবনা নেই, ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে এবং যাবেও। কলকারখানা এবং গাড়ী চলাচলের শব্দ তো আছেই, অধিকন্তু তার সঙ্গে প্রতিদিন যোগ হচ্ছে আরও উৎকট রকমের নানা রকম শব্দ।

বিরক্তিকর হরেক রকমের শব্দের সঙ্গে কেবল শহরবাসীরাই পরিচিত নয়, আজ সুদূর পল্লীতে এবং বলতে গেলে যেখানেই মানুষের বসতি গড়ে উঠেছে, সেখানেই শব্দ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। পল্লী অঞ্চলে গেলে শোনা যাবে কৃষি-যন্ত্রপাতির শব্দ, সড়ক দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ধাবমান গাড়ীর শব্দ, শোনা যাবে মাথার উপরে বিমানের শব্দ।

এমন বহু অফিস আছে, যেখানে নিম্নস্বরে স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বললে কেউ শুনতে পায় না। টাইপ রাইটারের শব্দ, এয়ার কণ্ডিশনিং মেশিনের শব্দ এবং আরও হরেক রকম যন্ত্রপাতির শব্দে মানুষের কণ্ঠস্বর সেখানে ডুবে যায়।

বাড়ীতে ঘাস কাটার যন্ত্রের শব্দ, ওয়াশিং

মেশিনের শব্দ, ভেন্টিলেটিং ফ্যানের শব্দ এবং আশেপাশে কলকারখানার শব্দ বাড়ীর শান্ত ও নিস্তব্ধ পরিবেশকে বিপর্যস্ত করে দেয়।

যন্ত্রবিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে পৃথিবীতে হৈ চৈ ও গোলমাল যেমন বাড়ছে, মার্কিন বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনীয়ারগণ তেমনি তা কমাবার জন্যে নিরন্তর গবেষণা করে চলেছেন।

উন্নতিশীল যে সব রাষ্ট্র নিজেরা কলকারখানা গড়ে তুলছে, উৎকট শব্দের সমস্যার প্রতি লক্ষ্য রেখে চললে তারা লাভবানই হবে।

সাধারণতঃ শব্দের পরিমাপ করা হয় ডেসিবেলে। ফিস্ ফিস্ করে কথা বললে যে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তার পরিমাপ প্রায় ৩০ ডেসিবেল।

শব্দ যত জোরে ও বেশী হয়, মানুষের অস্বস্তি তত বেশী বাড়ে। আকাশে ওড়বার পূর্ব মুহূর্তে বিমান যে শব্দের সৃষ্টি করে, তার পরিমাণ ১২০ ডেসিবেল। শব্দের মাত্রা যদি ১৫০ ডেসিবেলের বেশী হয়, তাহলে কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে অথবা এমন ক্ষতি হতে পারে, যাতে মানুষ চিরকালের জন্যে বধির হয়ে যেতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ১৭৫ ডেসিবেল শব্দে ইঁদুর মরে যায়।

যে শব্দ প্রাণে সাড়া জাগায় না, তাই বিরক্তিকর। রেডিওর সামনে বসে একজন তন্ময় হয়ে গান শুনছে, কিন্তু পাশে পাঠরত বা নিদ্রিত ব্যক্তির নিকট ঐ মধুর সঙ্গীতই বিরক্তিকর। কিন্তু সাময়িকভাবে বিরক্তিকর শব্দ নিয়ে গবেষকেরা মাথা ঘামাচ্ছেন না। তাঁদের গবেষণার বিষয় হলো, যে শব্দ মানুষের মনকে পীড়িত ও দেহকে ক্লান্ত করে, সেই শব্দ দমাবার উপায়ের সন্ধান করা।

বিরক্তিকর শব্দ মানুষের দেহে স্নায়বিক দৌর্বল্য এনে দেয়, তাকে সহজেই ক্ষিপ্ত করে তোলে।

শব্দের দাপটে ঘুম না ভাঙলেও সুনিদ্রার অভাবে কর্মদক্ষতা হ্রাস পায়, কাজকর্মে ভুল-ভ্রান্তি ঘটে, সৃজনশীল প্রতিভা হ্রাস পায় এবং দেহ অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, প্রচণ্ড শব্দ মানুষের দেহে এমন কতকগুলি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, যা খুবই ক্ষতিকর হয়ে থাকে। শব্দের প্রতিক্রিয়া বন্য প্রাণীর উপরেও ঘটে কিনা, তা এখনো যাচাই করা হয় নি, তবে কোন কোন কৃষক বলেছেন, বিমান এবং বড় রাস্তায় চলাচলকারী মোটর লরীর প্রচণ্ড গর্জন হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু উৎপাদনের পক্ষে ক্ষতিকর।

ডাঃ অস্টিন হেনশেল নামে জনৈক বিজ্ঞানী বলেছেন, বিরক্তিকর শব্দ প্রতিকূল আবহাওয়ার মতই স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। অনবরত বিকট শব্দ মানসিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, রক্তের চাপ বৃদ্ধি করে, হৃদ্‌রোগে আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দেয় এবং শ্রবণশক্তির ক্ষতি করে।

ডাঃ হেনশেল যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশন্যাল সেন্টার ফর আরবান অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল হেল্‌থ-এর অকুপেশন্যাল হেলথ প্রোগ্রামের প্রধান। ওহিয়োর সিনসিনাটির এই সংস্থাটি বর্তমানে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে শব্দের সমস্যা নিয়ে গবেষণা করছে।

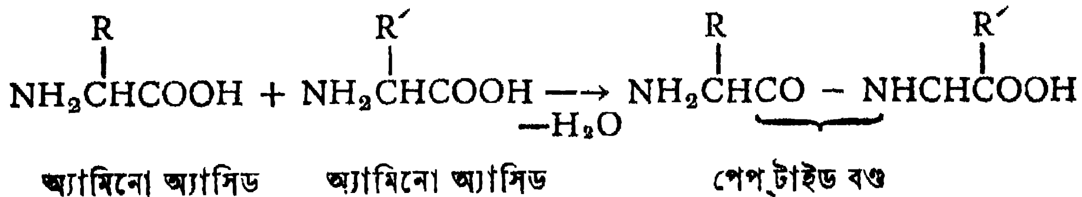
যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন অঞ্চলে শব্দ নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট আইন কার্যকরী করা হচ্ছে। অনবরত শব্দের মধ্যে কাজ করেও শ্রমিকেরা যাতে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে, তার জন্যে মালিকেরা কর্মীদের 'ইয়ার প্লাগ' দিচ্ছেন। শব্দ প্রতিরোধক উপকরণ দিয়ে কলকারখানার বাড়ী তৈরি হচ্ছে, যাতে ভিতরের শব্দ বাইরে গিয়ে জনসাধারণের বিরক্তি উৎপাদন করতে না পারে।

পেট্রোলিয়াম থেকে প্রোটিন উৎপাদন

পরিমল চট্টোপাধ্যায়

যে সব কোষ দিয়ে জীবদেহ তৈরি, তার একটি প্রধান উপাদান হলো প্রোটিন। মাংস-পেশী দেহতন্তু এবং দেহাভ্যন্তরীয় মূল্যবান তরল পদার্থসমূহ, যেমন—রক্ত প্রভৃতি উৎপত্তির মূলে রয়েছে প্রোটিন। এথেকে জীবদেহ গঠনে প্রোটিনের দান কতটা, তা সহজেই অনুমান করা যায়। জীবের পুষ্টি এবং বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজন খাদ্যের। এই সব খাদ্যদ্রব্য হজমের সহায়ক জৈব প্রক্রিয়াগুলিতে এন্‌জাইম নামে একপ্রকার জৈব অনুঘটক (Biocatalyst) অংশ গ্রহণ করে। এই এন্‌জাইমগুলিও মূলতঃ প্রোটিন-জাতীয়। জীবদেহের রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতার জন্যে যে সব অ্যান্টিবডি দায়ী, তাও প্রোটিনের দ্বারা গঠিত। আমরা জানি, জীব-দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে যে সব জিনিষের প্রয়োজন অর্থাৎ প্রোটিন, শর্করা, স্নেহজাতীয় পদার্থ—খাদ্যপ্রাণ এবং ধাতব লবণসমূহ, তার প্রায় সবটাই খাদ্যদ্রব্য থেকে সংগৃহীত হয়। তাই প্রোটিনকে খাদ্যদ্রব্যের একটি প্রধান উপা-দান বলে ধরা যেতে পারে। তাছাড়া খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যে শর্করা এবং স্নেহজাতীয় পদার্থই জীবদেহের প্রয়োজনীয় শক্তি জোগায় বলে সে ক্ষেত্রে প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তাও অপেক্ষা-কৃত অনেক কম।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে Emil Fischer এবং Franz Hofmeister প্রোটিনের রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে পরীক্ষা করতে গিয়ে বলেছেন যে, প্রোটিন কতকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিডের সমষ্টি। একটি অ্যামিনো অ্যাসিড ($NH_2\underset{|}{\overset{}{}}CHCOOH$ with R) অপরটির সঙ্গে পেপ্‌টাইড বণ্ড দিয়ে যুক্ত; যেমন—



প্রোটিনে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি পর পর শৃঙ্খলের মত সাজানো রয়েছে এবং তার আণবিক ওজন কয়েক হাজার থেকে কয়েক লক্ষও হতে পারে। পরবর্তী কালে Sanger প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষাও তাঁদের এই ধারণার সত্যতা প্রমাণিত করেছে।

খাদ্যদ্রব্যে যে সব প্রোটিন আছে, তা বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে গঠিত এবং এই জন্যে তাদের পুষ্টিমানও বিভিন্ন। দেহতন্তু যে সব অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি, তার যতই খাদ্যদ্রব্যজাত প্রোটিনের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকবে, খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টির মান ততই বেশী হবে। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে খাদ্যদ্রব্যের হজমকারিতাও বিবেচনা করতে হবে। সেই কারণে শাক-সব্জী বা ফলমূলজাত প্রোটিন থেকে প্রাণীজ প্রোটিনের পুষ্টির মান বেশী। নীচে বিভিন্ন দেশের

অধিবাসী কর্তৃক গৃহীত গড় দৈনিক ক্যালোরি থেকে সংগৃহীত হয়, তার একটি তালিকা দেওয়া এবং তার শতকরা কত ভাগ প্রাণীজ প্রোটিন হলো—

১নং তালিকা

মাথাপিছু দৈনিক গৃহীত ক্যালোরি ও শতকরা গৃহীত প্রাণীজ প্রোটিনের তালিকা

দেশ	সাল	দৈনিক ক্যালোরি মোট	দৈনিক ক্যালোরি %প্রাণীজ	প্রোটিন গ্র্যাম / দিন
অষ্ট্রেলিয়া	'৬৪-'৬৫	৩১৬০	৪৩	৯০
অষ্ট্রিয়া	'৬৫-'৬৬	২৯৭০	৩৪	৮৭
ব্রেজিল	১৯৬২	২৮৫০	১৫	৬২
ক্যানাডা	'৬৪-'৬৫	৩০৯০	৪৩	৯৫
চীন (তাইওয়ান)	১৯৬৪	২৩৪০	১৩	৫৯
ডেনমার্ক	'৬৪-'৬৫	৩৩৩০	৪৪	৯৩
ফ্রান্স	'৬০-'৬২	৩০৫০	—	৯৯
জার্মেনী (ফে. রি.)	'৬৫-'৬৬	২৯০০	৩৭	৭৯
ভারত	'৬৩-'৬৪	১৯৮০	৬	৪৯
জাপান	১৯৬৪	২৩২০	১১	৭৪
নিউজিল্যাণ্ড	১৯৬৪	৩৪১০	৫২	১১০
পাকিস্তান	'৬৪-'৬৫	২২৬০	১১	৫১
আমেরিকা	১৯৬৫	৩১৪০	৩৮	৯২
বৃটিশ যুক্তরাজ্য	'৬৪-'৬৫	২৩৬০	৪২	৮৯
যুগোশ্লাভিয়া	১৯৬৪	৩১৭০	১৮	৯৫
দক্ষিণ আফ্রিকা	'৬০-'৬১	২৮২০	২০	৮০

উপরের তালিকা থেকে সহজেই বোঝা যায়, ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে এত পুষ্টির অভাব কেন।

শাকসব্জী যত তাড়াতাড়ি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেই তুলনায় প্রাণীর বৃদ্ধি অনেক কম; কাজেই প্রাণীজ প্রোটিন, যেমন—মাংস, মাছ, ডিম ইত্যাদির দাম শাকসব্জীর চেয়ে খানিকটা বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। এদিকে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীজ প্রোটিনের চাহিদা দিনদিন বেড়েই চলেছে। এই সব কারণে অন্ত উপায়ে প্রোটিন উৎপাদনের জন্তে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন। গত কয়েক বছর ধরেই বিভিন্ন দেশে চেষ্টা চলেছে, যাতে কম খরচে পুষ্টিকর প্রোটিন উৎপাদন করা যায়।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ঈষ্ট (Yeast) নামক এককোষী জীবাণুর কোষে যে প্রোটিন রয়েছে, তাতে প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিমাণ সয়াবিন বা ফিস্‌মিলে (Fishmeal) যে সব প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে, তার প্রায় সমান। এই প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিমাণের একটি তুলনামূলক তালিকা দেওয়া হলো—

২নং তালিকা

পেট্রোলিয়াম থেকে উৎপন্ন ঈষ্টে প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিমাণ

অ্যামিনো অ্যাসিড	গ্র্যাম / ১৬ গ্র্যাম নাইট্রোজেন		
	পেট্রোলিয়াম জাত ঈষ্ট প্রোটিন	ফিস্‌মিল	সয়াবিন মিল
আইসোলিউসিন	৫·৩	৪·৬	৫·৪
লিউসিন	৭·৮	৭·৩	৭·৭
ফিনাইল অ্যালানিন	৪·৮	৪·০	৫·১
টাইরোসিন	৪·০	২·৯	২·৭
থ্রিয়োনিন	৫·৪	৪·২	৪·০
ট্রিপ্‌টোফেন	১·৩	১·২	১·৫
ভ্যালিন	৫·৮	৫·২	৫·০
আরজিনিন	৫·০	৫·০	৭·৭
হিষ্টিডিন	২·১	২·৩	২·৪
লাইসিন	৭·৮	৭·০	৬·৫
সিষ্টিন	০·৯	১·০	১·৪
মিথায়োনিন	১·৬	২·৬	১·৪
সিষ্টিন + মিথায়োনিন	২·৫	৩·৬	২·৮

এথেকে সহজেই বোঝা যায়, পেট্রোলিয়াম-জাত ঈষ্ট প্রোটিন, ফিস্‌মিল বা সয়াবিন মিলের পরিবর্তে অনায়াসেই ব্যবহার করা যেতে পারে।

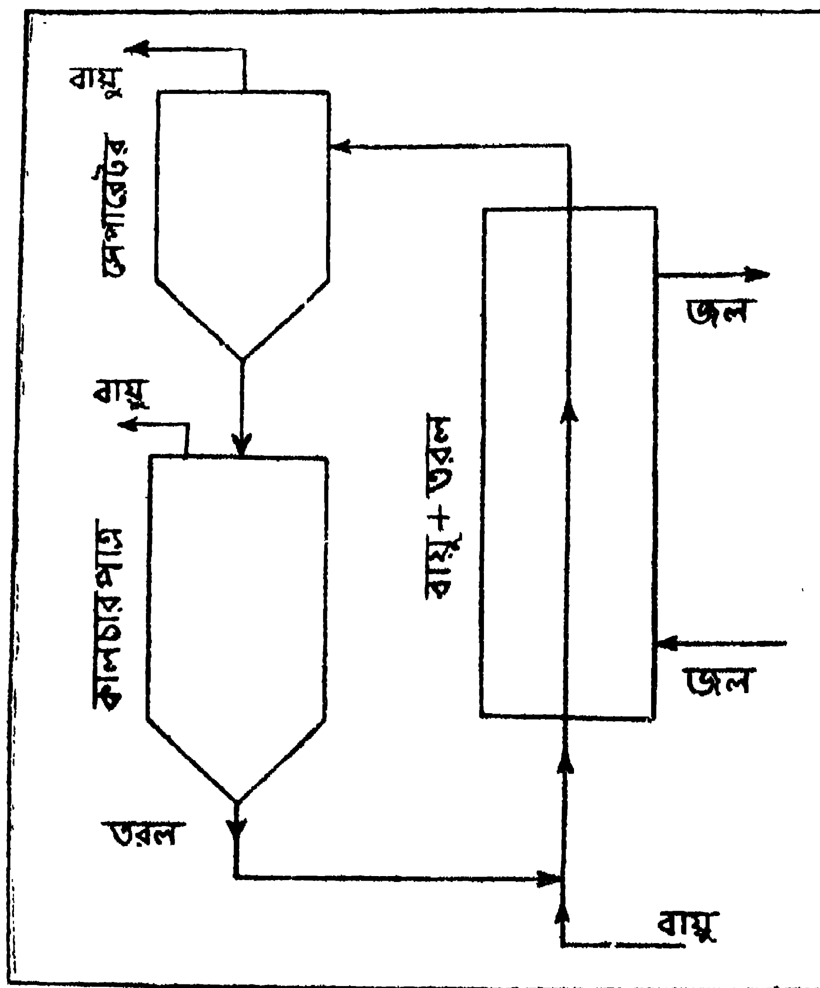
গত ছয় বছর ধরে কয়েকটি বিদেশীয় তৈল কোম্পানীগুলি চেষ্টা করছে, যাতে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারের অনুপযোগী তেলকে ঈষ্ট উৎপাদনে ব্যবহার করা যায়। বিজ্ঞানী Champagnat বলেছেন, এরূপ তেল থেকে বছরে ২০০ লক্ষ টন ঈষ্ট প্রোটিন তৈরি করা সম্ভব। এতে পৃথিবীতে বর্তমানে যে খাদ্যের, বিশেষভাবে প্রোটিনের যে ঘাটতি রয়েছে, তা পূরণ করা সম্ভব।

এই জাতীয় প্রোটিন উৎপাদন-শিল্পে কয়েকটি অসুবিধা হতে পারে। প্রথমতঃ, ক্রেতারা এই রকম প্রোটিন জাতীয় খাদ্য ক্রয় করবেন কিনা? দ্বিতীয়তঃ, এসব প্রোটিনের জীবদেহের উপর কোন বিষক্রিয়া রয়েছে কিনা? যে সব পেট্রোলিয়াম হাইড্রোকার্বন থেকে বিষক্রিয়া হতে পারে, সেগুলিকে ঈষ্টকোষ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করতে হবে। দেখা গেছে, ঈষ্টকোষে খুব বেশী পরিমাণে পিউরিন এবং পিরিমিডিন থাকায় মাথাপিছু দৈনিক ১০০ গ্র্যামের বেশী এই জাতীয় প্রোটিন গ্রহণ করা উচিত নয়। তা না হলে জীবদেহের যকৃতে বিষক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

পেট্রোলিয়াম হাইড্রোকার্বন থেকে ঈষ্ট উৎপাদনের পদ্ধতি:—খনি থেকে পেট্রোলিয়াম উত্তোলনের পর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তাকে শোধন করা হয়। এই শোধিত পেট্রোলিয়াম বিমান ও মোটরের জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হয়। জ্বালানীরূপে ব্যবহারের অনুপযোগী অংশে n-

অ্যালকেনেস (n-Alkanes), আইসোঅ্যালকেনেস (Isoalkanes), অ্যালকিনেস (Alkenes) সাইক্লোঅ্যালকেনেস্ (Cycloalkanes) এবং অন্যান্য অ্যারোমেটিক (Aromatics) প্রভৃতি জৈব পদার্থ রয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এসব জৈব পদার্থ নানাপ্রকার জীবাণুর বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় কার্বনের উৎস হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছাড়া আরও লক্ষ্য করা হয়েছে যে, এই সব জৈব পদার্থে যদি প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হলো না। সাধারণ কিণ্বন-পদ্ধতি (Fermentation) থেকে এই প্রকার জৈব যৌগের কিণ্বন-পদ্ধতির অনেকাংশে পার্থক্য রয়েছে।

সাধারণতঃ কিণ্বন-প্রক্রিয়ায় জীবাণুর বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ জলে দ্রবীভূত হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ঐ সকল হাইড্রো-কার্বনগুলি জলে অদ্রবণীয় বলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ জীবাণুর বৃদ্ধির



১নং চিত্র

ধাতব লবণগুলি যোগ করা যায় এবং দ্রবণের অম্লত্ব (Acidity) নির্দিষ্ট রাখা যায়, তবে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ঈষ্ট জাতীয় জীবাণু অস্বাভাবিক-রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পরীক্ষার পর দ্রবণে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়, যাতে ঈষ্টের উৎপাদন সবচেয়ে বেশী হয়ে থাকে। সেই জন্যে এই বিষয়ে বিশেষ সহায়ক হবার সম্ভাবনা কম। এই কারণে এই জাতীয় কিণ্বন-প্রক্রিয়া এমনভাবে পরিচালনা করা হয়, যাতে এই সকল হাইড্রোকার্বন জীবাণুর বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থের জলীয় দ্রবণের সংস্পর্শে বেশীক্ষণ থাকে। এই সকল হাইড্রোকার্বনের মধ্য দিয়ে উচ্চচাপে বায়ু বুদ্বুদের আকারে পাঠিয়ে জীবাণুর আশায়-

রূপ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা হয়েছে এবং শিল্পেও এই পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহে পেট্রোলিয়াম থেকে ঈষ্ট উৎপাদনের জন্যে এক বিশেষ ধরণের কিথন-যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। ১নং চিত্রে এই প্রকার প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা দেখানো হলো।

এই প্রক্রিয়ায় হাইড্রোকার্বনকে একটি তাপ-বিনিময়কারী প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রায় আনা হয় এবং হাইড্রোকার্বনের প্রবাহ অব্যাহত রাখবার জন্যে বায়ু-উত্তোলক (Air lift) ব্যবহার করা হয়।

আমাদের দেশে জোড়হাটে আঞ্চলিক গবেষণাগারে পেট্রোলিয়াম হাইড্রোকার্বন থেকে ঈষ্ট উৎপাদনের চেষ্টা করা হচ্ছে। আসামের পেট্রোলিয়াম পরিশোধনাগারের কাছাকাছি অঞ্চলের মাটি থেকে এক প্রকার ঈষ্টের সন্ধান পাওয়া গেছে, যা হাইড্রোকার্বন ব্যবহারে বিস্তার লাভ করতে পারে এবং বিজ্ঞানীরা তা থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ঈষ্ট উৎপাদনে সক্ষম হয়েছেন। যে দেশে প্রোটিনের এত অভাব রয়েছে, সেখানে বিজ্ঞানীদের এই ধরণের প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়।

আয়নোস্ফিয়ারের কথা

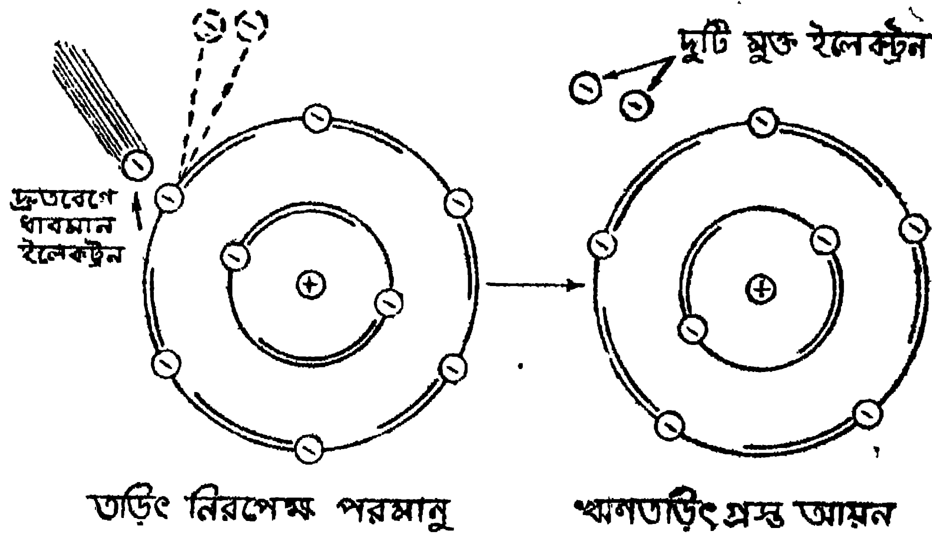
পঙ্কজনারায়ণ সমাদ্দার

আমাদের এই পৃথিবী এক বায়ু-সমুদ্রে ঘেরা, যাকে আমরা বলি বায়ুমণ্ডল। মানুষ, জন্তুজানোয়ার ও গাছপালা এই বাতাসের জন্যেই বেঁচে আছে। তাছাড়া দিনে সূর্যের কিরণ থেকে এবং রাত্রে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার হাত থেকে বায়ুমণ্ডলই আমাদের রক্ষা করে। এই বায়ুমণ্ডলের সব স্তরের অবস্থা সমান নয়, বিভিন্ন স্তরের অবস্থা ও ঘনত্ব বিভিন্ন। ভূপৃষ্ঠ থেকে ৪০-৪৫ মাইল পর্যন্ত উচ্চতা বাদ দিয়ে তার পরের স্তরের নাম আয়নোস্ফিয়ার বা আয়নমণ্ডল। কারণ এই অংশের বায়ুকণাগুলি আয়নিত বা তড়িতাবিষ্ট অণু বা পরমাণুরূপে থাকে। কোন পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণিকার নাম পরমাণু। এই ক্ষুদ্রতম কণিকাগুলি নিউট্রন, প্রোটন, ইলেকট্রন ইত্যাদির দ্বারা গঠিত। কিন্তু পরমাণুর এই ক্ষুদ্রতম কণিকাগুলিকে সহজে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এই কণিকাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে প্রয়োজন প্রচণ্ড শক্তির। ভূপৃষ্ঠ থেকে অত উঁচুতে এই শক্তি কোথা থেকে আসে? আয়নোস্ফিয়ারের এই ব্যাপারটি ঘটে সূর্যের আলোবিকিরণের ফলে।

সূর্য অবিরাম যে সকল শক্তিশালী রশ্মি-প্রবাহ বিকিরণ করে, তার মধ্যে কতকগুলি অদৃশ্য রশ্মি আছে, যার ক্রিয়ার ফলে আমাদের গায়ের রং গাঢ় হয়ে যায়। এই রশ্মি অতিবেগুনী রশ্মি নামে পরিচিত। বেশী মাত্রায় এই রশ্মি জৈব পদার্থের প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটাতে পারে। অতিবেগুনী রশ্মির ক্রিয়া থেকে বায়ুমণ্ডলের আয়নিত স্তরটি আমাদের রক্ষা করে। আয়নোস্ফিয়ারের স্তরটি এই রশ্মিগুলিকে পৃথিবীতে পৌঁছুতে না দিয়ে নিজেই শোষণ করে নেয়। এই শোষিত রশ্মির শক্তি ব্যয় হয় আয়নোস্ফিয়ারের গ্যাসের অণুগুলিকে আয়নিত করবার কাজে।

কিন্তু এর জন্যে কেবলমাত্র সূর্যই দায়ী নয়। রাতের বেলায় আকাশে যে সকল তারকা দেখা যায়, সেগুলিও এর জন্যে কম-বেশী দায়ী। অতি-বেগুনী রশ্মি ছাড়াও সূর্য মহাশূন্যে তড়িৎ-নিরপেক্ষ-কণিকা, ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি কণিকা বিকিরণ করে। অতি সূক্ষ্ম এই সব কণিকার প্রবাহও বায়ুমণ্ডলের স্তরকে আয়নিত করে। তড়িৎ-নিরপেক্ষ অণু বা পরমাণু ভেঙ্গে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসবার ব্যাপারটাকে বলে আয়নন-ক্রিয়া।

এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আয়নোস্ফিয়ারে এই যে অবিরাম পরমাণু ভেঙ্গে যাচ্ছে, সেই সব মুক্ত ইলেকট্রন আর আয়নগুলির বদ্‌লায়। মুক্ত অবস্থায় ধাবমান একটি ঋণাত্মক তড়িৎবিশিষ্ট ইলেকট্রন যখন একটি ধনাত্মক তড়িৎবিশিষ্ট আয়নের সঙ্গে ধাক্কা খায়, তখন তারা পরস্পরকে আকর্ষণ করে একটি তড়িৎ-নিরপেক্ষ পরমাণুর সৃষ্টি করে। আবার এই আয়ন একটি পরমাণুতে পুনর্গঠিত হয়। এই ভাবে আয়নিত ইলেকট্রনের সংখ্যা কমতে থাকে এবং তড়িৎ-নিরপেক্ষ পরমাণুর সংখ্যা বাড়তে থাকে। বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরে এইভাবে যে আয়নন-ক্রিয়া চলছে, তার ভারসাম্য রক্ষা পাচ্ছে পরমাণুর পুনর্গঠনের দ্বারা। সুতরাং কখনও পৃথিবীর কাছাকাছি বায়ুমণ্ডলে



১নং চিত্র
পরমাণু কিভাবে আয়নিত হয়।

অবস্থা কি রকম দাঁড়ায়? বাতাসের অণুগুলি এই ভাবে আয়নিত হওয়ায় সেগুলি যে পৃথিবীতে নেমে আসবে না, তারই বা ঠিক কি?

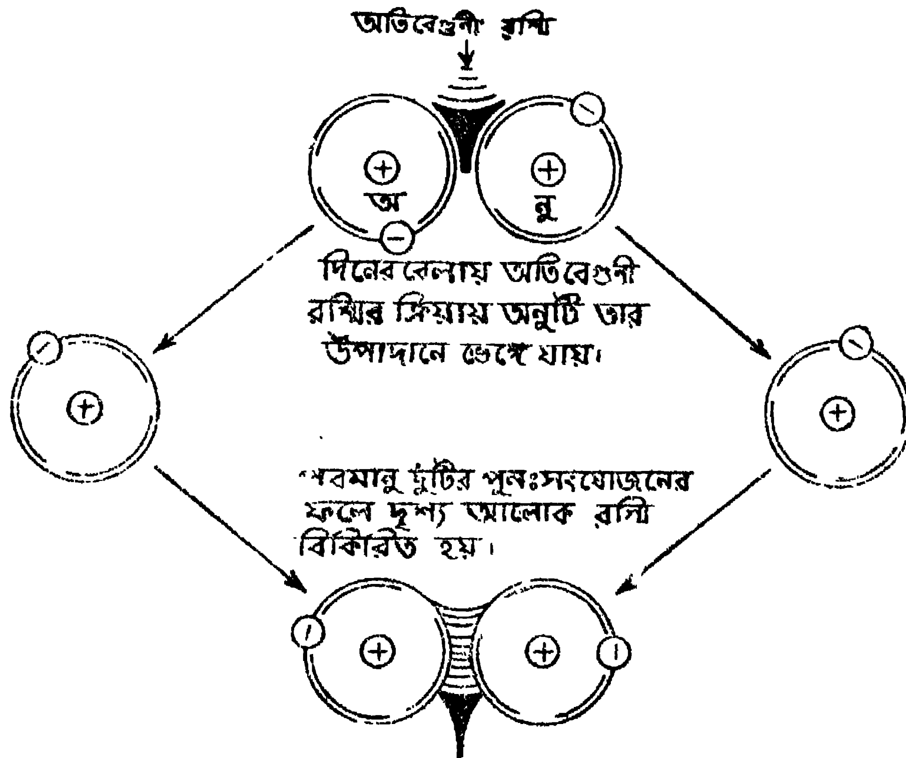
আয়নিত কণিকাগুলি উপরের বায়ুমণ্ডলে অবিরাম ছুটে বেড়াচ্ছে, এই ছোট্‌বার কোন দিক ঠিক নেই। যত দিকে যত রকমভাবে ছোটা সম্ভব, সেভাবে সেগুলি সর্বদাই ছুটতে থাকে। এই ছোটাছুটির ফলে সেগুলি অনবরত পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খায়, আর অনবরত দিক এই আয়নন-ক্রিয়া হবে না।

আয়নোস্ফিয়ার আবার D, E, F_1, F_2—এই চার ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে D স্তরটি আবিষ্কার করেন অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র। বিভিন্ন স্তরের ঘনত্বও বিভিন্ন। তাই প্রথম স্তরে বেশী সংখ্যক পদার্থ-কণিকা থাকায় সেখানকার কণাগুলির মধ্যে বেশী সংখ্যক ধাক্কাধাক্কি চলে। পরমাণুর পুনর্গঠনও চলে তাড়াতাড়ি, আর

উপরের কম ঘনত্বের স্তরে এই ক্রিয়া ঘটে খুব ধীরে ধীরে।

রাতের আকাশের আলো থেকে আয়নোস্ফিয়ার সম্বন্ধে কি জানা যায়? চাঁদহীন অর্থাৎ অন্ধকার রাতে তারকা-খচিত আকাশের ঔজ্জ্বল্য এমন কিছু বেশী নয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন যে, সমস্ত তারকা, গ্রহ, নীহারিকাপুঞ্জ থেকে অন্ধকার রাতে যেটুকু ঔজ্জ্বল্যের সৃষ্টি হয়, তা প্রায় তার দ্বিগুণ।

আয়নোস্ফিয়ারের ঐ স্তরে আলোক-ঔজ্জ্বল্যের কারণ অনেক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মতে—বাতাসের গ্যাসের কণাগুলি অতিবেগুনী রশ্মির দ্বারা আয়নিত হয়। সেই সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বাংশে সূর্যের বিকিরণের প্রভাবে বাতাসের অণুগুলি পরমাণুতে বিভক্ত হয়। বায়ু-কণিকাগুলির বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পুনর্গঠনও চলতে থাকে। যখন এই রকম ভাঙ্গাগড়া চলতে থাকে, তখন দৃশ্যমান আলো



২নং চিত্র
রাতের বেলায় বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলি যেভাবে আলোক-উদ্ভাসিত হয়।

এই বাড়্তি আলোটুকু আসে কোথা থেকে? বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলেই এর উৎপত্তি হয়। সোভিয়েট বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য ভি. জি. ফেসেনকফ ১৯১৬ সালে আবিষ্কার করেন যে, বায়ুমণ্ডলের আলোক-উদ্ভাসিত স্তরটি রয়েছে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১১০ মাইল উঁচুতে।

শক্তিরূপে ছাড়া পায়। এই আলোই রাতের আকাশের ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে তোলে।

বর্ণালী-বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়, কোন্ কোন্ ধরণের অণু-পরমাণু এই ভাস্বরতার সৃষ্টি করে। আবার বায়ুমণ্ডল থেকে যে আলো আসে, সেই আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করে ঐ আলোক-উদ্ভাসিত স্তরের গঠন-উপাদানও নির্ণয়

করা যায়। আগে মনে করা হতো যে, খুব উপরের দিকে বায়ুমণ্ডলে প্রধানতঃ হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম—এই হাল্কা গ্যাস দুটিই রয়েছে। কিন্তু বর্ণালী বিশ্লেষণের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, খুব উঁচুতে হাল্কা গ্যাস প্রায় নেই। নীচের স্তরগুলির মতই সেখানকার বাতাস প্রধানতঃ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের দ্বারা গঠিত। এর কারণ, আয়নোস্ফিয়ার এবং বায়ুমণ্ডলে মাঝে মাঝে প্রবল বায়ু-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। এই বায়ু-প্রবাহ বায়ুমণ্ডলের হাল্কা গ্যাসগুলিকে উপরে ভেসে উঠতে এবং উপরের ভারী গ্যাসগুলিকে নীচে থিতিয়ে পড়তে বাধা দেয়। প্রমাণিত হয়েছে যে, বায়ুমণ্ডলের এই বিরাট পুরু চাদরের উপর-নীচ সকল স্থানই প্রধানতঃ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের দ্বারা তৈরি।

এই আয়নোস্ফিয়ার আবার বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত করতে পারে। তাই আমরা ঘরে বসে অনেক দূরের সংবাদ পাই। তা না হলে অর্থাৎ প্রতিফলিত না করলে ঐ তরঙ্গগুলি পৃথিবীর বুকেই হারিয়ে যেত—আমরাও আর দূরের সংবাদ রেডিওতে ধরতে পারতাম না।

লাইকেন

শ্রীগৌরচন্দ্র দাস

গাছের পাতা, ছাল এবং মৃত গাছের গুঁড়িতে সময় সময় এমন এক জাতীয় উদ্ভিদ জন্মায়, যেখানে অন্য কোন রকম উদ্ভিদের বৃদ্ধি অসম্ভব। এই উদ্ভিদ শ্যাওলা ও ছত্রাকজাতীয় দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদের সমন্বয়ে গঠিত এবং ইহারা পরস্পরের সাহায্য ব্যতিরেকে বাঁচিতে পারে না। এই জাতীয় উদ্ভিদকে বলা হয় লাইকেন (Lichens)। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র লাইকেন দেখিতে পাওয়া যায়।

লাইকেনের শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদটিকে ছত্রাক জাতীয় অপর একটি উদ্ভিদ বেষ্টন করিয়া থাকে। ইহারা এমনভাবে পরস্পরের সহিত মিশিয়া থাকে যেন একটি উদ্ভিদ বলিয়াই মনে হয়। ছত্রাক অংশটি জলীয় বাষ্প শোষণ করে এবং শৈবাল অংশটি আলোকসংশ্লেষণের সাহায্যে শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে। প্রধান প্রধান লাইকেন-গুলির মধ্যে এণ্ডোকারপন (Endocarpon), গ্র্যাফিনা (Graphina) প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

লাইকেন সাধারণতঃ দুইটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—

(১) অ্যাস্‌কোলাইকেন (Ascolichens)—ছত্রাকটি যদি অ্যাস্‌কোমাইসিটিস (Ascomycetes) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

(২) ব্যাসিডোলাইকেন (Basidolichens)—লাইকেনের শ্যাওলার অংশটি যদি ব্যাসিডোমাইসিটিস (Basidomycetes) শ্রেণীর ছত্রাক বেষ্টিত থাকে।

থ্যালাসের প্রকৃতি অনুযায়ী অ্যাস্কোলাইকেনকে আবার তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা—

১। ক্রাসটোজ (Crustose)—এই প্রকার লাইকেনের থ্যালাসটি খোলকের ন্যায় এবং নিম্নতলের সহিত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত থাকে।

এই প্রকার লাইকেনে শৈবাল ও ছত্রাকের অংশ সমভাবে বিস্তৃত থাকে।

২। ফোলিয়োজ (Foliose)—যখন থ্যালাসটি পত্রের ন্যায় দেখিতে হয়। অন্তর্ভাগে পৃথক এবং নিম্নতলের সহিত মূলের ন্যায় রাইজাইন দ্বারা যুক্ত থাকে।

৩। ফ্রাকটিকোজ (Fructicose) –থ্যালাসটির অন্তর্ভাগ পৃথক, নলের ন্যায় শাখা-প্রশাখাযুক্ত এবং নিম্নতলের সহিত থ্যালাসের নিম্নের অংশ যুক্ত অথবা খাড়া থাকে বা ঝুলিতে দেখা যায়।

লাইকেনের শৈবাল অংশটি যদি থ্যালাসের মধ্যে সমভাবে বিস্তৃত থাকে, তবে ঐ প্রকার লাইকেনকে হোময়োমেরাস (Homoiomerous) বলা হয়। শৈবাল অংশটি যদি থ্যালাসের বহিঃস্তরের নিম্নে কোন স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে ঐ প্রকার লাইকেনকে হেটারোমেরাস (Heteromerous) বলা হয়।

অধিকাংশ ফোলিয়োজ লাইকেনের থ্যালাস অন্তর্ভাগে চারিটি বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত থাকে। উপরের অংশটিকে উপরের কর্টেক্স (Upper cortex) বলা হয় এবং উহা দীর্ঘাকার হাইফির (Hyphae) দ্বারা গঠিত। ইহার চতুর্দিকে বহিঃস্তরের ন্যায় এক স্তরবিশিষ্ট হাইফি থাকে। এই অংশের নিম্নে হাইফি ও শৈবাল মিলিত অবস্থায় থাকে এবং উহাকে শৈবাল-স্তর (Algal layer) বা গোনিডিয়াল স্তর বলা হয়। তৃতীয় স্তরটি অ্যালগা প্রভৃতির হাইফির দ্বারা গঠিত এবং উহাকে মেডুলা বলা হয়। চতুর্থ বা সর্বনিম্ন স্তরটি খুব ঘন হাইফির দ্বারা গঠিত এবং এই স্তরটিকে নিম্ন কর্টেক্স বলা হয়। এই স্তর হইতে মূলের ন্যায় রাইজাইন উৎপন্ন হয়।

অনেক ফোলিয়োজ ও ফ্রাকটিকোজ লাইকেনের উপরের স্তরে শ্বাসরন্ধ্র থাকে। এই সকল রন্ধ্রের সাহায্যে বায়ুর আদান-প্রদান হয়। অনেক সময় লাইকেনের গায়ে প্রবালের ন্যায় পদার্থ উদ্‌গত হয়। সেগুলিকে ইসিডিয়া বলে। ইহারা আলোকসংশ্লেষণে সাহায্য করে এবং মুক্ত হইলে অঙ্গজ জনন সম্পন্ন করে। কখনও কখনও থ্যালাসে 'গলের' ন্যায় স্ফীত অংশ দেখা যায় এবং উহাকে সেফালোডিয়া বলা হয়।

লাইকেন তিনটি পদ্ধতিতে প্রজনন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে; যথা—(১) অঙ্গজ জনন (Vegetative reproduction); (২) অযৌন জনন (Asexual reproduction); (৩) যৌন জনন (Sexual reproduction)।

(১) অঙ্গজ জনন—এই প্রকার জননক্রিয়ায় লাইকেনের থ্যালাসটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয় এবং প্রত্যেক খণ্ড হইতে নতুন থ্যালাস উৎপন্ন হয়। অঙ্গজ জনন ইসিডিয়া বা সোরেডিয়ার দ্বারা হইতে পারে। সোরেডিয়ামগুলি থ্যালাসের উপরিভাগ হইতে ছোট ছোট মুকুলের ন্যায় উদ্‌গত হয়। ইহাদের প্রত্যেকটি এক বা একাধিক শৈবাল কোষ এবং তাহাকে বেষ্টন করিয়া কয়েকটি ছত্রাক কোষ লইয়া গঠিত।

(২) অযৌন জনন—অ্যাস্‌কোলাইকেনের ছত্রাক অংশটি অয়ডিয়া বা পিক্‌নো বীজরেণু উৎপন্ন করে। ঐ রেণু সহজেই অঙ্কুরিত হইয়া হাইফি উৎপন্ন করে এবং হাইফিগুলি শৈবালের সংস্পর্শে আসিয়া নতুন লাইকেনের সৃষ্টি করে। অনেক সময় লাইকেন অযৌন জননে জুস্পোর উৎপন্ন করে।

(৩) যৌন জনন—যৌন জননে লাইকেনের ছত্রাক অংশটি স্পারমোগোনিয়া এবং অ্যাস্কোগোনিয়া উৎপন্ন করে। স্পারমোগোনিয়া নামক পুং-জননেন্দ্রিয়টির আকৃতি ফ্লাস্কের ন্যায় এবং ইহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে স্পারমাটিয়া নামক পুংজনন কোষ থাকে। অ্যাস্কোগোনিয়া নামক স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়টি বহুকোষী। ইহার নিম্নের অংশটি

পাকানো এবং ইহাকে আর্কিকার্প বলে। উহার উপরের অংশটিকে ট্রাইকোজিন বলা হয়। স্পারমাটিয়া ট্রাইকোজিনের অগ্রভাগের সংস্পর্শে আসে এবং উহাদের ভিতরকার কোষ-প্রাচীর দুইটি দ্রবীভূত হইয়া যায়। স্পারমাটিয়ার প্রোটো-প্লাজম ট্রাইকোজিনের মধ্যে প্রবেশ করে। ইহার পরের নিষেকক্রিয়া সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নাই।

নিষিক্ত হইবার পর অ্যাস্কোগোনিয়ামের নিম্নদেশ হইতে প্রচুর অ্যাস্কোগোনীয় হাইফি এবং পরিশেষে অ্যাস্কোকার্প উৎপন্ন হয়। ইহা দুই প্রকারের—পেয়ালার ন্যায় অ্যাপোথেকিয়াম অথবা ফ্লাস্কের ন্যায় পেরিথেকিয়াম। অ্যাস্কো-কার্পের মধ্যে প্রচুর অ্যাস্কাস এবং সূত্রাকৃতির প্যারাফাইসেস দেখা যায়। প্রত্যেক অ্যাস্কাস আটটি অ্যাস্কোস্পোর লইয়া গঠিত। অনুকূল পরিবেশে অ্যাস্কোস্পোর অঙ্কুরিত হইয়া নূতন হাইফি উৎপন্ন করে। এই হাইফিগুলি শৈবালের সংস্পর্শে আসিয়া নূতন লাইকেন গঠন করে।

বেগুনী রং প্রস্তুত করিতে লাইকেনের প্রয়োজন হয়। ইহা সুগন্ধি দ্রব্য এবং ঔষধ প্রস্তুতের কাজেও লাগে। গ্রীনল্যাণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে লাইকেন বল্গা হরিণের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

একবিংশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন, ১৯৬৯

পরিষদ ভবন

২৩শে অগাষ্ট, ১৯৬৯
শনিবার, ৩-৩০টা

কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের এই একবিংশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে মোট ৪০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং নির্দিষ্ট কার্যসূচী অনুসারে সভার কার্যাদি পরিচালনা করেন। অধিবেশনের নিয়মিত কার্যাদি আরম্ভ করিয়া সভাপতি মহাশয় আলোচ্য বছরে পরিষদের কাজকর্ম ও অবস্থাদি সম্পর্কে পরিষদের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিবার জন্য কর্মসচিব মহাশয়কে আহ্বান জানান।

১। কর্মসচিবের বার্ষিক বিবরণী

পরিষদের কর্মসচিব শ্রীজয়ন্ত বসু মহাশয় এই সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যগণকে স্বাগত জানাইয়া গত ১৯৬৮-'৬৯ সালের জন্য পরিষদের বিবিধ কাজকর্ম ও আর্থিক অবস্থাদি সম্পর্কে তাঁহার লিখিত বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। এতৎসম্পর্কে তিনি বলেন যে, গত মার্চ '৬৯ মাসে পরিষদের একবিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠানের সভায় পঠিত বার্ষিক বিবরণীতে আলোচ্য বছরে পরিষদের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টা ও আর্থিক অবস্থাদির বিবরণী বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছিল এবং তাহাই মোটামুটি-ভাবে ১৯৬৮-'৬৯ সালের বার্ষিক বিবরণী হিসাবে

গণ্য করা যাইতে পারে। সেই জন্ম বর্তমান এই বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের সভায় তিনি পরিষদের কাজকর্ম ও অবস্থাদি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দান করিবেন।

এই বিবরণী প্রসঙ্গে কর্ম সচিব মহাশয় পরিষদের আদর্শানুযায়ী আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাসিক পত্রিকা, জনপ্রিয় বিজ্ঞান-পুস্তক ও বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশন ও বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা দান, পাঠাগার পরিচালনা প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার উল্লেখ করেন। পরিষদের নবনির্মিত ভবনে পরিষদ কার্যালয় স্থানান্তরণের পরে যে সব সুবিধা-অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী বিবিধ কাজের বাস্তব রূপায়ণে যে সব আর্থিক দায়-দায়িত্ব বর্তিয়াছে, বা বর্তিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া কর্মসচিব মহাশয় সভ্যবৃন্দের সাহায্য ও সহযোগিতা আহ্বান করেন। পরিশেষে পরিষদর অধিকতর কর্ম প্রসার ও সুশৃঙ্খল পরিচালনার জন্ম বর্তমান আর্থিক সঙ্কট ও মূল্য বৃদ্ধির যুগে সভ্যগণকে বিশেষ ভাবে সক্রিয় হইতে অনুরোধ করেন এবং তাঁহাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা কামনা করেন।

২। হিসাব বিবরণী ও ব্যয়-বরাদ্দ

পরিষদের গত ১৯৬৮ সালের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে নির্বাচিত হিসাব পরীক্ষক (অডিটর) প্রতিষ্ঠান মেসার্স মুখার্জী গুহঠাকুরতা অ্যাণ্ড কোং কর্তৃক পরিষদের গত ১৯৬৮-'৬৯ সালের পরিক্ষিত হিসাব বিবরণী ও উদ্বর্ত পত্র (ব্যালান্স সিট) পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ মহাশয় সভার অনুমোদনের জন্ম উপস্থাপিত করেন। পরিষদের বিভিন্ন তহবিলের উক্ত পরীক্ষিত হিসাব-বিবরণী ও উদ্বর্তপত্র মুদ্রিতাকারে সভ্যগণের বিবেচনার জন্ম যথাসময়ে নিয়মানুযায়ী প্রেরণ করা হইয়াছিল। কোষাধ্যক্ষ মহাশয় সাধারণভাবে বিবরণীগুলি পাঠ করেন কবং উপস্থিত সভ্যগণের অনুমোদন প্রার্থনা করেন। অতঃপর যথোচিত আলোচনা ও বিবেচনার পরে উক্ত পরীক্ষিত হিসাব বিবরণীগুলি উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

অতঃপর কোষাধ্যক্ষ মহাশয় পরিষদের বিদায়ী কার্যকরী সমিতি কর্তৃক রচিত ও অনুমোদিত বর্তমান ১৯৬৯-'৭০ সালের জন্ম পরিষদের বিভিন্ন তহবিলের আনুমানিক ব্যয়-বরাদ্দ বা বাজেটপত্র সভ্যগণের অনুমোদনের জন্ম সভায় পেশ করেন। পরীক্ষিত হিসাব-বিবরণীর সঙ্গে এই বরাদ্দ পত্রগুলিও সভ্যগণের বিবেচনার জন্ম মুদ্রিতাকারে পাঠানো হইয়াছিল। যথোচিত আলোচনার পরে উক্ত ব্যয়বরাদ্দ পত্রগুলিও উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

৩। কার্যকরী সমিতি গঠন

বর্তমান ১৯৬৯-'৭০ সালের জন্ম পরিষদের নূতন কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলীসহ কার্যকরী সমিতির সদস্যপদে মনোনয়নের জন্ম সভ্যগণের নিকট যে মনোনয়ন-পত্র প্রেরিত হইয়াছিল তাহার মাধ্যমে প্রেরিত বিভিন্ন সভ্যের মনোনীত নামগুলি ও বিদায়ী কার্যকরী সমিতির এতদ্বিষয়ক সুপারিশ সমূহের সমন্বয়ে গঠিত নূতন কার্যকরী সমিতির কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও সাধারণ সভ্যগণের নামের চূড়ান্ত তালিকা কর্মসচিব মহাশয় সভার অনুমোদনের জন্ম উপস্থাপিত করেন। এই তালিকা মুদ্রিতাকারে বর্তমান অধিবেশনের বিজ্ঞপ্তি পত্রের সঙ্গেই সভ্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। উক্ত তালিকানুযায়ী নামগুলি উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয় এবং বর্তমান

১৯৬৯-৭০ সালের জন্ত পরিষদের নূতন কার্যকরী সমিতির কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলীর বিভিন্ন পদে ও সাধারণ সভ্যরূপে উক্ত তালিকা অনুযায়ী সদস্তগণের নিম্নলিখিত নাম সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হইল বলিয়া সভায় ঘোষিত হয় :

কার্যকরী সমিতি

কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী :

সভাপতি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু
সহঃ সভাপতি—শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র
শ্রীসুশীলরঞ্জন মৈত্র
শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত
কোষাধ্যক্ষ—শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ
কর্মসচিব—শ্রীজয়ন্ত বসু
সহযোগী কর্মসচিব—শ্রীপঙ্কজনারায়ণ রায়
শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সাধারণ সদস্ত

শ্রীদিলীপকুমার ঘোষ
শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ কর
শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়
শ্রীরাধাকান্ত মণ্ডল
শ্রীযুগলকান্তি রায়
শ্রীঅনাদিনাথ দাঁ
শ্রীশুভেন্দুকুমার দত্ত
শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীশ্যামসুন্দর দে
শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত
শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র
শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী
শ্রীঅমূল্যধন দেব

৪। সারস্বত সংঘের সংঘসচিব নির্বাচন

পরিষদের সারস্বত সংঘের গত ১৯৬৮-৬৯ সালের বিদায়ী সংঘসচিব শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহার কাজকর্মের জন্ত ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিয়া কর্মসচিব মহাশয় বর্তমান ১৯৬৯-৭০ সালের জন্ত শ্রীশ্যামসুন্দর দে মহাশয়কে সংঘসচিব পদে নির্বাচনের জন্ত প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং পরিষদের নিয়মতন্ত্রের বিধান অনুসারে নব-নির্বাচিত সংঘসচিব শ্রীশ্যামসুন্দর দে মহাশয় বর্তমান বর্ষের জন্ত সংঘ গঠন ও সারস্বত কর্তব্যাদি সম্পাদন করিবেন বলিয়া স্থির হয়।

৫। হিসাব পরীক্ষক নির্বাচন

পরিষদের বিভিন্ন তহবিলের বর্তমান ১৯৬৯-৭০ সালের হিসাবপত্র পরীক্ষা করিবার জন্ত হিসাব পরীক্ষক (অডিটর) নির্বাচন বিষয়ে যথোচিত আলোচনার পরে এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পরিষদের পূর্বতন হিসাব পরীক্ষক প্রতিষ্ঠান মেসার্স মুখার্জী গুহঠাকুরতা অ্যাণ্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস গত কয়েক বৎসর যাবৎ যথোচিত দক্ষতার সহিত পরিষদের হিসাবপত্র পরীক্ষা করিয়াছেন; অতএব উক্ত প্রতিষ্ঠানই বর্তমান বর্ষের জন্তও পরিষদের হিসাব পরীক্ষক পদে নির্বাচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় হইবে। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে অতঃপর উক্ত মেসার্স মুখার্জী গুহঠাকুরতা অ্যাণ্ড কোং বর্তমান ১৯৬৯-৭০ সালের জন্ত পরিষদের হিসাব পরীক্ষক পদে সভায় সর্ব-সম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন।

৬। অনুমোদকমণ্ডলী নির্বাচন

পরিষদের নিয়মতন্ত্রের বিধান অনুসারে এই বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলীর অনুলিপি চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের জন্ত নিম্নলিখিত সদস্যগণ অনুমোদক হিসাবে সভার সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন

১। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী
২। " গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
৩। " রমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র
৪। " মৃণালকুমার দাশগুপ্ত
৫। " মণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়

নিয়মানুসারে অধিবেশনের সভাপতি ও কর্মসচিবসহ উপরিউক্ত নির্বাচিত পাঁচ জন অনুমোদকের দ্বারা এই অধিবেশনের কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত হইলে তাহা পরিষদ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। সভাপতির ভাষণ

বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের এই সভার সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উপস্থিত সভ্যগণকে ও অন্যান্য ব্যক্তিদের পরিষদের প্রতি তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিষদের নবনির্মিত গৃহের জন্য তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন, তবে বর্তমান আর্থিক সঙ্কটের দিনে পরিষদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখিবার জন্ত সকলের সক্রিয় সহযোগিতা যে একান্ত প্রয়োজন, সেই দিকে সভ্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি তাঁহার ভাষণ শেষ করেন।

স্বাঃ সত্যেন বোস	স্বাঃ জয়ন্ত বসু
সভাপতি	কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ	বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

অনুমোদকমণ্ডলীর স্বাক্ষর

স্বাঃ জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী
" শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
" রমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র
" মৃণালকুমার দাশগুপ্ত
" মণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়

ভারতের চতুর্থ রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি. ভি. গিরি

১৯৬৯ সালের ২০শে অগাষ্ট ঘোষণা করা হয় যে, ভারতের চতুর্থ রাষ্ট্রপতি পদে শ্রী ভি. ভি. গিরি নির্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীগিরি ১৮৯৪ সালের ১০ই অগাষ্ট উড়িষ্যার অন্তর্গত বহরমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বহরমপুরের কালিকোট্টা কলেজ হইতে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ডাবলিন (আয়ারল্যাণ্ড) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি বার-অ্যাট-ল ডিগ্রী লাভ করেন।

ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রী গিরি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। অল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে মেন্স ফেডারেশন গঠনের ব্যাপারে শ্রী গিরির দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি জেনেভায় অনুষ্ঠিত (১৯২৭) আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ১৯৩১ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় গোলটেবিলে বৈঠকে শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন।

১৯৩৭ সালে তিনি মাদ্রাজ বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হইবার পর মাদ্রাজের শ্রম, শিল্প ও সমবায় মন্ত্রী হন (১৯৩৭-৩৯) এবং ১৯৪৬ সালেও তিনি মাদ্রাজ বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং প্রায় এক বৎসর মাদ্রাজের প্রকাশম মন্ত্রীসভার শ্রমমন্ত্রী ছিলেন।

১৯৪৭ সালে প্রকাশম মন্ত্রীসভা হইতে পদত্যাগের পর শ্রীগিরি সিংহলে ভারতের হাই কমিশনার নিযুক্ত হন (১৯৪৭-৫১)। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে তিনি মাদ্রাজ হইতে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৫২ সালের মে মাস হইতে ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত তিনি কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী ছিলেন। ব্যাঙ্ক রোয়েদাদ সম্পর্কে মন্ত্রী সভার সহিত মতানৈক্যের ফলে তিনি মন্ত্রীসভা হইতে পদত্যাগ করেন। তিনি উত্তর প্রদেশ (১৯৫৭-৬০), কেরালা (১৯৬১-১৯৬৫) ও মহীশূরের (১৯৬৫-৬৭) রাজ্যপাল ছিলেন। ১৯৬৭ সালের ৬ই মে শ্রী ভি. ভি গিরি ভারতের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনের মৃত্যুর পর তিনি ১৯৬৯ সালের ৩রা মে হইতে তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ চালান। রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হইবার জন্য তিনি উপরাষ্ট্রপতি এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দেন।

শ্রীগিরি সঙ্গীত ও ভ্রমণে উৎসাহী এবং টেনিস খেলিতেও ভালবাসেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ 'ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিলেসন্স' এবং 'লেবার প্রব্লেম্স্ ইন ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রি'।

শোক-সংবাদ

অধ্যাপক ডি. এন. ওয়াদিয়া

১৫ই জুন (১৯৬৯) জাতীয় অধ্যাপক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ভূতাত্ত্বিক ও পারমাণবিক শক্তি কমিশনের উপদেষ্টা প্রখ্যাত বিজ্ঞানী দারাশ নশেরওয়ান ওয়াদিয়া পরলোক গমন করেছেন।

অধ্যাপক ওয়াদিয়া ১৮৮৩ সালের ২৩শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের



অধ্যাপক ডি. এন. ওয়াদিয়া

বরোদা কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ছাত্রজীবন শেষ হবার পর তিনি জম্মুর প্রিন্স অব ওয়েলস্ কলেজে ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে (১৯০৭-২০) যোগদান করেন। ১৯২১ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং পিরপাঞ্জাল, হাজারা, কাশ্মীর, হিমালয় এবং অন্যান্য অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা-কার্য পরিচালনা করেন। তিনি 'Geology of India' নামক গ্রন্থের লেখক। এছাড়া তিনি খনিজবিদ্যা, ষ্ট্রাকচারাল জিওলজি, বিশেষতঃ হিমালয় অঞ্চলের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক মৌলিক গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ২৯তম অধিবেশনের (১৯৪২) তিনি মূল সভাপতি ছিলেন। ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়ার তিনি সভাপতি ছিলেন (১৯৪৫-৪৬)। ১৯৬৪ সালে নূতন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক কংগ্রেসের দ্বাদশতম অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯৬৮ সালে প্রাগে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক কংগ্রেসের ত্রয়োদশতম অধিবেশনে যোগদানকারী ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন অধ্যাপক ওয়াদিয়া।

তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলো ছিলেন। ১৯৩৪ এবং ১৯৪৩ সালে তিনি যথাক্রমে লণ্ডনের রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির বাক (Back) পুরস্কার এবং লণ্ডনের জিওলজিক্যাল সোসাইটির লায়েল (Lyell) পদক লাভ করেন।

অধ্যাপক ওয়াদিয়া ১৯৫৮ সালে পদ্মভূষণ উপাধি-ভূষিত হন এবং ১৯৬৩ সালে জাতীয় অধ্যাপকের গৌরব লাভ করেন।

অধ্যাপক ওয়াদিয়া সি. এস. আই. আর-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি জার্ন্যাল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ এর সম্পাদকমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন এবং

কয়েক বছর সায়েণ্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ-এর বোর্ড ও গভর্নিং বডির সদস্য ছিলেন। তিনি ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব ওশেনোগ্রাফীর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল, সমুদ্র সম্পর্কিত গবেষণার জন্য ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কমিটি এবং জিওলজিক্যাল অ্যাণ্ড মিনারেলজিক্যাল রিসার্চ কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি হায়দরাবাদের ন্যাশন্যাল জিওফিজিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন।

অধ্যাপক সি. এফ. পাউয়েল

প্রখ্যাত বৃটিশ পদার্থ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক সিসিল ফ্র্যাঙ্ক পাউয়েল গত ১০ই অগাষ্ট ইটালীর মিলান শহরে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। পরমাণু-বিজ্ঞান ও মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্যে ১৯৫০ সালে তাঁকে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

১৯০৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর পাউয়েল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষাজীবন সুরু হয় কেণ্টের টনব্রিজ স্কুলে এবং তারপর সেখান থেকে কেম্ব্রিজের সিড্‌নী সাসেক্স কলেজে শিক্ষার্থী হিসাবে যোগদান করেন। তখন কেম্ব্রিজে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড রাদারফোর্ড পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও ক্যাভেণ্ডিশ গবেষণাগারের অধ্যক্ষ। ১৯০৯ সালে রাদারফোর্ড আলফা কণিকার দ্বারা নাইট্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রীনকে আঘাত করে তাকে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পরমাণুতে রূপান্তরিত করেন। কৃত্রিম উপায়ে পরমাণুর রূপান্তর ঘটলো এই প্রথম। কেম্ব্রিজে পাউয়েল যখন শিক্ষা গ্রহণ করছেন, তখন অ্যাস্টন, ব্ল্যাকেট, কক্রফ্‌ট, স্যাড্‌উইক এবং সি. টি. আর উইলসন পরমাণু-বিজ্ঞানে তাঁদের গবেষণার দ্বারা বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন।

পাউয়েল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ট্রাইপোজ পরীক্ষার উভয় অংশে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ উত্তীর্ণ হন। মেঘ-প্রকোষ্ঠের উদ্ভাবক অধ্যাপক সি. টি. আর. উইলসনের অধীনে তিনি প্রথমে গবেষণা আরম্ভ করেন। ১৯২৮ সালে অধ্যাপক এ. এম. টিণ্ডেলের সহকারী গবেষকরূপে তিনি বৃস্টলে গমন করেন এবং ১৯৩১ সালে সেখানে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময়ে বিশুদ্ধ গ্যাসে ধনাত্মক আয়নের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর গবেষণার জন্যে তিনি খ্যাতি লাভ করেন।

লর্ড রাদারফোর্ডের পরমাণু বিভাজন এবং ১৯৩২ সালে কক্রফ্‌ট ও ওয়ালটনের গবেষণার পর পদার্থ-বিজ্ঞানীরা পরমাণুর কেন্দ্রীন সম্পর্কিত গবেষণায় গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। দুটি বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হয় এবং পরমাণু-বিজ্ঞানে নতুন নতুন দিক ও সম্ভাবনার ক্ষেত্র খুলে যায়। এই সম্পর্কে ডক্টর পাউয়েলের আলোকচিত্র-পদ্ধতির উদ্ভাবন এই ক্ষেত্রে এক মূল্যবান অবদান। পরমাণু কণিকার গতিপথের চিত্র ধরে রাখবার জন্যে উইলসনের মেঘ-প্রকোষ্ঠ-পদ্ধতির পরিবর্তে তিনি সাধারণ আলোকচিত্রের প্লেটের অবদ্রবে সেগুলির গতিপথের চিত্র তোলবার এক অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।

এই সময় প্রখ্যাত জাপানী পদার্থ-বিজ্ঞানী ইকাওয়া কথিত অপর একটি মহাজাগতিক রশ্মি-কণিকার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। এই কণিকা ইলেকট্রনের চেয়ে ভারী কিন্তু প্রোটনের চেয়ে

হাল্কা। এর নাম দেওয়া হয় মেসন। এই ক্ষেত্রে পাউয়েল ও তাঁর সহকর্মীরা আলোকচিত্র-পদ্ধতির দ্বারা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বিশেষভাবে সাহায্য করেন।

পাউয়েল প্রথমে সাধারণ আলোকচিত্রের প্লেট নিয়ে গবেষণা করেন। তারপর ইলফোর্ড কোম্পানী কর্তৃক উদ্ভাবিত বিশেষ ধরণের অবদ্রব-আবৃত প্লেটের সাহায্যে তিনি দু রকম মেসন কণিকার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। এর মধ্যে যেটি ইলেকট্রনের চেয়ে ১০০০ গুণ ভারী, সেই কণিকাটি কে-মেসন নামে অভিহিত।

সাম্প্রতিক কালে ডক্টর পাউয়েল ঊর্ধ্বাকাশে বেলুনের সাহায্যে মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কিত গবেষণার আরও অগ্রগতি সাধন করেন। তিনি স্বদেশে ও বিদেশে বহু বৈজ্ঞানিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং নোবেল পুরস্কার ছাড়া আরও বহু আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করেন। ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তিনি বৃটেনের বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থার পরমাণু-বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলবার ব্যাপারে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ডক্টর পাউয়েল পরমাণু-বিজ্ঞান ও মৌলিক কণিকা সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।

বিজ্ঞান-সংবাদ

বিমান বনাম কুয়াশা

বিমানের একটি সর্বনাশা শত্রু হচ্ছে কুয়াশা। কুয়াশার দরুণ বিমানের ওঠা-নামায় দেরী হয়, নির্দিষ্ট বিমান-বন্দর ছেড়ে অন্য বন্দরে চলে যেতে হয়—এমন কি, অনেক সময় বিমান চলাচল বন্ধ করেও দিতে হয়।

বিমানের শত্রু এই কুয়াশা দূর করবার এক সফল পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন পশ্চিম জার্মেনীর অধ্যাপক শ্রিয়েস্চেক। তাঁর কুয়াশা-বিহীন করবার যন্ত্রটি বিমানের ওঠা-নামার পথে প্রোপেলারের সাহায্যে কুয়াশাপূর্ণ বায়ু টেনে নেয় এবং একটি সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে একটি ছাঁকনি-যুক্ত চাকার দিকে জোরে ঠেলে দেয়। তখন দ্রুত ঘূর্ণমান চাকার ছাঁকনির জালে শিশির-কণাগুলি আটকে যায় ও কুয়াশামুক্ত বাতাস জোরে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বিমান ওঠা-নামার পথ পরিষ্কার করে দেয়। শ্রিয়েস্চেকের উদ্ভাবিত এই রকম চারটি যন্ত্রের সাহায্যে খুব ঘন পুরু কুয়াশা হলেও বিমান ওঠা-নামার পথ পরিষ্কার রাখা যাবে।

মঙ্গলগ্রহের দক্ষিণ মেরু অঞ্চল জমাট কার্বন ডাইঅক্সাইডে আবৃত

মঙ্গলগ্রহের আলোকচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, ঐ গ্রহের দক্ষিণ মেরু জমাট কার্বন ডাই-অক্সাইডের পুরু আস্তরণে আবৃত।

জলবিহীন হিমমুকুট দেখতে পাওয়ার ফলে মঙ্গলগ্রহে জীবনের অস্তিত্বের সম্ভাবনা আরও কমে গেল।

ক্যালিফোর্নিয়ার পাসাডেনায় অবস্থিত জেট প্রোপালসন নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে মেরিনার-৭ কর্তৃক প্রেরিত মঙ্গলগ্রহের যে সকল আলোকচিত্র পাওয়া গেছে, সেগুলি বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞেরা উক্ত সিদ্ধান্তে এসেছেন।

গত ৫ই অগাষ্ট সকালে আমেরিকার মেরিনার-৭ মঙ্গলগ্রহের সবচেয়ে কাছে এসেছিল এবং

সেই সময় মেরিনার ৩১ খানি ছবি তুলেছিল। এই ছবিগুলির মধ্যেই মঙ্গলগ্রহের দক্ষিণ মেরুর এই নাটকীয় ক্লোজআপগুলি পাওয়া গেছে। টেপের মাধ্যমে রক্ষিত ছবিগুলি ঐদিন রাত্রে পাঠানো হয়। ছবিগুলি সারা দেশে টেলিভিশনে দেখানো হয়েছে।

হিমমুকুটটিকে দেখাচ্ছিল যেন দক্ষিণ মেরুর উপর বরফের ঝালরের মত। কতকগুলি ছবিতে সাদা অংশ ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশের অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরগুলির উপর, আবার কতকগুলি ছবিতে দক্ষিণ মেরুর উপর আবছা মেঘের মত দেখাচ্ছিল।

মেরিনার সম্পর্কে টেলিভিশন ছবির গবেষক ডাঃ রবার্ট লেটন বলেন, মঙ্গলগ্রহের দক্ষিণ মেরু অবশ্যই শুষ্ক তুষার বা জমাট কার্বন ডাইঅক্সাইডে আবৃত। মঙ্গলগ্রহের দক্ষিণ মেরুর হিমমুকুটটি জলপূর্ণ বরফ বা শুক্‌নো বরফ অথবা এই দুয়েরই সংমিশ্রণে গঠিত কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখাই মেরিনার-৭ উপগ্রহের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

মেরিনার কর্তৃক প্রেরিত মঙ্গলগ্রহের ঐ অঞ্চলের উত্তাপ সম্পর্কিত তথ্যাদির সঙ্গে ঐ সব আলোকচিত্রের তুলনামূলক আলোচনার পর ডাঃ লেটন ও তাঁর সহযোগী বিজ্ঞানীরা এই সম্পর্কে আরও মতামত দেবেন। মঙ্গলগ্রহের দক্ষিণ গোলার্ধের উপর দিয়ে যাবার সময় মেরিনার তার অবলোহিত তাপ পরিমাপকের সাহায্যে ঐ অঞ্চলের তাপমাত্রা লিপিবদ্ধ করেছে।

তবে ডাঃ লেটন কার্বন ডাইঅক্সাইডে আবৃত অঞ্চলটি সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতে পৃথিবীর জীবনের মত কোন জীবনের অস্তিত্ব মঙ্গলগ্রহে আছে কিনা, সে বিষয়ে অনেক সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কারণ, যে কোন ধরণের জীবনের পক্ষে জলের প্রয়োজন অত্যাবশ্যক।

টেলিভিশনের ছবিতে দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ মেরু অঞ্চল রুক্ষ ও গহ্বরে আকীর্ণ। কতকগুলি গহ্বর অংশতঃ তুষারপূর্ণ।

মেরিনার-৬ ও মেরিনার-৭ মোট ১১৮টি আলোকচিত্র পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। এগুলি দিয়ে মঙ্গলগ্রহের একটা মোটামুটি মানচিত্র তৈরি করা যাবে এবং এই মানচিত্র আগামী কয়েক দশক পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের গবেষণার খোরাক যোগাবে।

এদের পাঠানো ছবিগুলিতে মঙ্গলগ্রহের ২০ শতাংশ অঞ্চলের চেহারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। পৃথিবীর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে গৃহীত ঐ গ্রহের সর্বোৎকৃষ্ট আলোকচিত্র অপেক্ষা ১০০ গুণ অধিক স্পষ্ট হয়েছে এই ছবিগুলি এবং ১৯৬৫ সালে মেরিনার-৪ কর্তৃক গৃহীত আলোকচিত্রগুলি অপেক্ষা ১০ গুণ অধিক স্পষ্ট হয়েছে।

আগে মনে করা হতো, দক্ষিণ মেরুর মুকুটটি সুগোল, কিন্তু নতুন ছবিতে দেখা যাচ্ছে, এর ধারগুলি খাঁজকাটা।

গ্রহবিশেষজ্ঞদের অধিকাংশেরই ধারণা ছিল, এর তুষারাবরণ পাত্‌লা। কিন্তু দেখা গেল তা নয়, আবরণ বেশ পুরু।

আর একটি বড় আবিষ্কার হলো এই যে, চাঁদের মতই মঙ্গলগ্রহও গহ্বরে পূর্ণ। এতদিন ধারণা ছিল, মঙ্গলগ্রহ অনেকটা পৃথিবীরই অনুরূপ এবং সম্ভবতঃ ঐ গ্রহে জীবনের অনুকূল পরিবেশ আছে।

ডাঃ লেটন বলেন, এবারের ছবিগুলিতে তিনি যা লক্ষ্য করেছেন, তাতে মঙ্গলগ্রহে কোন প্রকার জীবন—এমন কি, গাছপালারও অস্তিত্ব থাকা সম্ভব, একথা বিশ্বাস করা কঠিন।

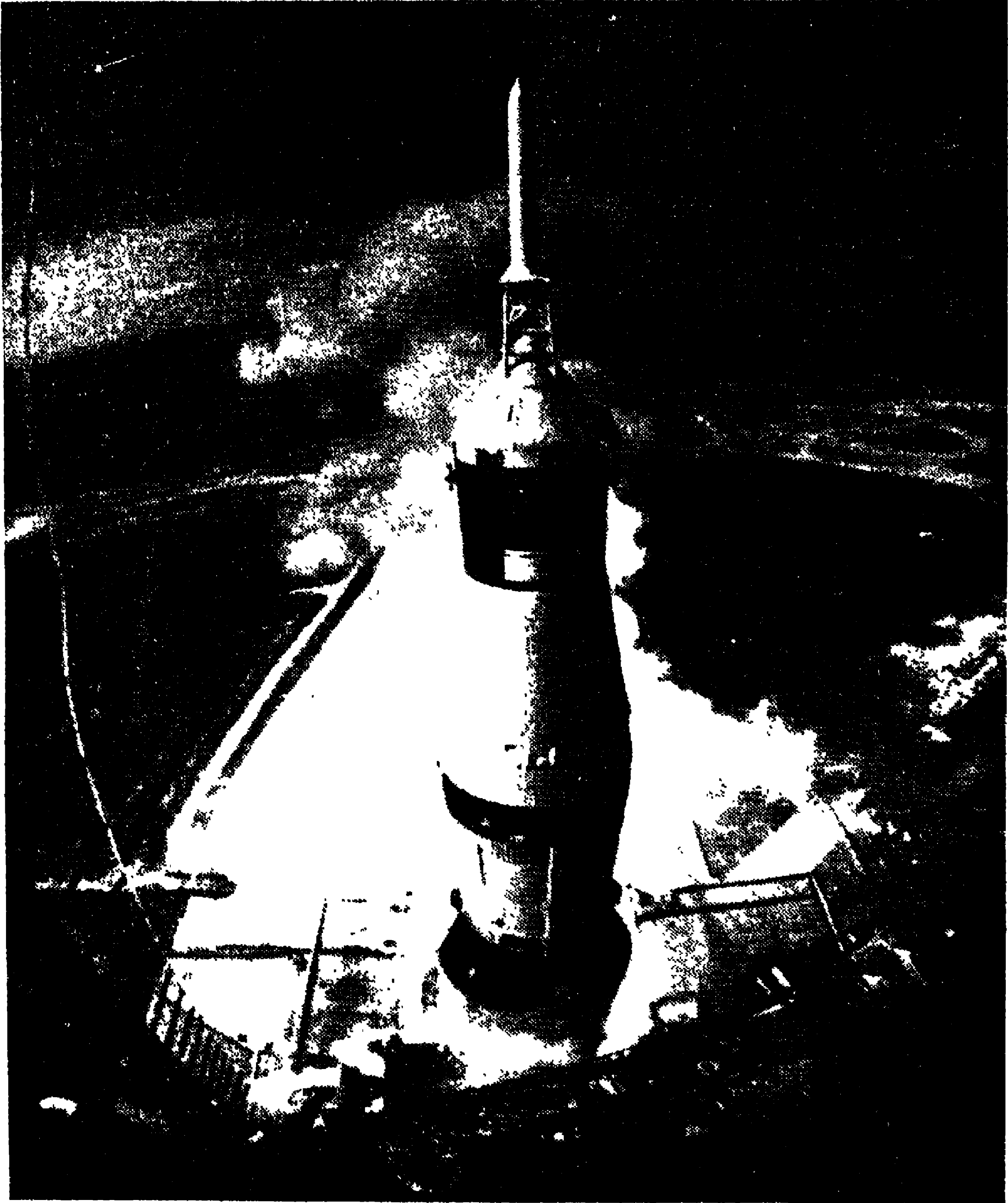
১৯৭১ সালে উন্নততর মহাকাশযান পাঠিয়ে আমেরিকা মঙ্গলগ্রহ সন্ধানের কাজে আরও এগিয়ে যাবে। তারপর ১৯৭৩ সালে ঐ গ্রহপৃষ্ঠে আরোহীবিহীন যান অবতরণের পরিকল্পনাও রয়েছে। এই সব পরিকল্পনা মার্কিন কংগ্রেসে অনুমোদিত হয়েছে এবং এজন্যে কিছু পরিমাণ অর্থ বরাদ্দও হয়েছে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সেপ্টেম্বর—১৯৬৯

২২শ বর্ষ : ৯ম সংখ্যা



বিশাল আকৃতির স্যাটার্ন-৫ রকেট অ্যাপোলো-১১-কে মাথায় নিয়ে ১৬ই জুলাই চন্দ্র যাবার জন্যে কেপ কেনেডীর উৎক্ষেপণ মঞ্চ থেকে যাত্রা করছে।

অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের কাহিনী

পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশের মধ্যে সবচেয়ে ছোট মহাদেশটির নাম অষ্ট্রেলিয়া—একথা সকলেরই জানা আছে, কিন্তু এই মহাদেশটির আবিষ্কার হয়েছিল কি ভাবে, সে বিষয়ে অনেকেই কিছু জানে না। আজ সেই কথাই এখানে বলছি।

যতদূর জানা যায়, অষ্ট্রেলিয়ার আবিষ্কার হয় ১৬০৬ সালে। আবিষ্কারক হচ্ছেন হল্যাণ্ডের একজন অধিবাসী—নাম উইলিয়াম জন্সজুন। অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের কাছে যে দ্বীপটি তাসমানিয়া নামে পরিচিত, সেটিও প্রথম আবিষ্কার করেন একজন হল্যাণ্ডবাসী—নাম আবেল তাসমান। তবে এঁরা শুধু আবিষ্কার করেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন, মহাদেশটি সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য জানবার আগ্রহ তাঁদের ছিল না অথবা বোধ হয় জানবার ব্যবস্থা তাঁরা করে উঠতে পারেন নি।

এই বিষয়ে প্রথম চেষ্টা হয় ১৭৭০ সালে। এর পথপ্রদর্শক হচ্ছেন একজন দুঃসাহসী ইংরেজ নাবিক—নাম জেম্‌স্ কুক এবং আর একজন বিজ্ঞানী—নাম সার জোসেফ ব্যাঙ্কস। এই মহাদেশটির বিচিত্র পুষ্পসম্ভার দেখে এঁরা মুগ্ধ হয়ে তার নাম রাখেন Botany Bay বা উদ্ভিদ উপসাগর। এইখানেই সর্বপ্রথম একটি বিচিত্র জীব তাঁদের চোখে পড়ে—সেটি দেখতে অনেকটা ইঁদুরের মত, কিন্তু গ্রেহাউণ্ড কুকুরের মত বিশাল তার দেহ, দু-পায়ে হাঁটে অথচ বিদ্যুৎগতিতে ছুটে বেড়ায়। এই জন্তুটিই হচ্ছে বিশ্ববিখ্যাত ক্যাঙ্গারু, যা একমাত্র অষ্ট্রেলিয়ারই নিজস্ব সম্পদ।

ক্রমে এই মহাদেশে সভ্যজাতির পদার্পণ সুরু হয় এবং তাদের বসতিবিস্তার চলতে থাকে। এরা প্রথমে উপকূল অঞ্চলে, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলেই বসতিবিস্তার করতে থাকে। মহাদেশের অন্তর্ভাগ সম্বন্ধে জানবার জন্যে আগ্রহ বা কৌতূহল তাদের ছিল না, উপরন্তু ছিল এক বিশেষ ধরণের ভীতি। কারণ এখানকার আদিবাসীরা প্রস্তর যুগের মানুষের মত অনুন্নত, বিদেশীয়দের নির্বিচারে হত্যা করতে এরা কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। আরেকটি প্রধান বাধা ছিল—জল। দেশের অভ্যন্তরে সভ্য মানুষের উপযোগী পানীয় জলের অভাবই ছিল প্রথম ও প্রধান অন্তরায়। তাই অষ্ট্রেলিয়ার বিচিত্র ভৌগোলিক তথ্য জানবার চেষ্টায় প্রথম কাজই হলো নদী আবিষ্কার করা। এই চেষ্টা অনেকেই সুরু করেছিলেন। কিন্তু প্রথমে যিনি সাফল্য লাভ করেন, তাঁর নাম হলো ষ্টার্ট। তিনি ১৮২৮-৩০ সালে অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্দেশে সর্বপ্রথম দুটি নদী আবিষ্কার করেন এবং তাদের নাম দেন ডার্লিং ও মুরে। আর এই দুটিকে সংযোগ করেছে যে নদী, তার নাম দেন মুরুম্বুজি। এর পরে উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছে ডাঃ লিচার্ড। অজানা মহাদেশটিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবার উদ্দেশ্যে

১৮৪৪ সালের একদিন তিনি অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল থেকে যাত্রা সুরু করেন। তারপর দীর্ঘ দিন তাঁর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি। পনেরো মাস পরে অর্ধমৃত ও অর্ধউলঙ্গ অবস্থায় তিনি এসে পৌছুলেন মহাদেশের উত্তর উপকূলে—কার্পেন্টারিয়া উপসাগরের কাছে, যেখানে জন্সজুনের পর আর কোন শ্বেত মানুষের আবির্ভাব ঘটে নি; অর্থাৎ প্রায় আড়াই-শ' বছরের ব্যবধান। ১৮৪৮ সালে তিনি আবার অভ্যন্তরে অভিযান সুরু করেন, কিন্তু তারপর আর কোন খবর পাওয়া যায় নি।

এবার একটি সজ্ঘবদ্ধ অভিযান সুরু হলো। ১৮৬০ সালে ভিক্টোরিয়ার ঔপনিবেশিকেরা একটি অভিযানের সঙ্কল্প করলেন, যাতে সমগ্র মহাদেশটির দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত অনুসন্ধান চালানো যায়। এই অভিযানের নেতা ঠিক হলেন রবার্ট বার্ক নামে একজন পুলিশ কর্মচারী এবং উইলিয়াম উইল্‌স্ নামে একজন আবহবিদ্। ডার্লিং নদীর ধারে মোনাণ্ড নামে একটি জায়গায় তাঁরা প্রথম ঘাঁটি স্থাপন করেন। এখান থেকে তাঁরা যাত্রা সুরু করেন উত্তর দিকে। সাতজন সঙ্গী নিয়ে পাঁচটি ঘোড়া আর ষোলটি উটের পিঠে নানা প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র চাপিয়ে বার্ক যাত্রা সুরু করলেন উত্তর দিকে। ঘাঁটিতে পাহারায় রেখে গেলেন রাইটকে এবং ঠিক হলো উত্তরে একটি সুবিধামত জায়গা পেয়ে গেলে রাইটকে খবর দিলে তিনি ঘাঁটি উঠিয়ে নতুন জায়গায় এসে দলের সঙ্গে মিলিত হবেন। যাই হোক, বার্কের যাত্রার সুরুতেই সফলতার মুখ দেখলেন। উত্তর দিকে বেশ কিছুদূর গিয়ে বার্ক একটি পরিষ্কার জলাশয় দেখতে পেলেন, পাশেই একটি বিশাল তৃণভূমি। জায়গাটির নাম কুপার্স ক্রীক। বার্ক দলবল নিয়ে এখানেই এসে বিশ্রাম নিলেন এবং রাইটকে সংবাদ দিলেন তাঁদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে রাইট সে আদেশ মান্য না করে নিজের প্রথম ঘাঁটিতে থেকে গেলেন। বার্ক তখন উইল্‌স্ ও আরও দু-জন সঙ্গী নিয়ে আরও উত্তরে যাত্রা সুরু করলেন। বাকী সকলে দ্বিতীয় ঘাঁটিতেই থেকে গেলেন। সঙ্গে সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে গেল শুধু একটি ঘোড়া আর বারোটি উট। অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁরা অভিযান চালাতে লাগলেন। এইভাবে ম্যাক্‌কীন্‌লে পর্বতমালা পার হয়ে তাঁরা এসে পৌছুলেন ফ্লণ্ডার নদীর কাছে। নানা জনপদ ও বনপথ পার হয়ে এই নদীটি মহাদেশের উত্তর প্রান্তে কার্পেন্টারিয়া উপসাগরে এসে পড়েছে। এইবার তাঁদের উদ্দেশ্য সহজেই সিদ্ধ হলো—উত্তর উপকূলে সহজেই পৌছে গেলেন তাঁরা।

এবার ফেরবার পালা। তাঁরা পিছনে ফেরা সুরু করলেন ১৮৬১ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এবার গ্রে নামক তাঁদের এক সঙ্গী অসুস্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত মারা গেলেন। বাকী সকলে, অর্থাৎ বার্ক, উইল্‌স্ কিং মৃতপ্রায় অবস্থায় কুপার্স ক্রীকের ঘাঁটিতে এসে পৌছুলেন। কিন্তু এখানেও দুর্ভাগ্য তাঁদের

প্রতারণা করলো। এই ঘাঁটিতে তাঁরা যাঁকে রেখে গিয়েছিলেন, দীর্ঘদিন ধরে অগ্রগামী অভিযাত্রীদের কাছ থেকে কোন সংবাদ না পেয়ে তিনি মনে করলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই পথ হারিয়েছেন অথবা মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিয়েছেন। অথচ তাঁদের খোঁজ নেবার কোন ব্যবস্থাই তিনি করলেন না। অধৈর্য হয়ে তিনি ফিরে গেলেন, সঙ্গে নিয়ে গেলেন যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম ও খাদ্যসম্ভার অথচ ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস—সেই দিনই কয়েক ঘণ্টা পরে শ্রান্ত, ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত অভিযাত্রীরা সফল অভিযানের শেষে ঘাঁটিতে ফিরে এসে দেখেন তা জনশূন্য। চূড়ান্ত হতাশায় তাঁরা ভেঙ্গে পড়লেন। মেনিণ্ডিতে যাবার মত শারীরিক সামর্থ্যও তখন তাঁদের ছিল না। প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়নায় ক্লান্ত, দুর্বল শরীর নিয়ে তাঁরা ইতস্ততঃ খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, কিন্তু উপযুক্ত খাবারও তাঁদের চোখে পড়লো না। ফলে অনাহারে মারা গেলেন তাঁদের মধ্যে দু-জন—বার্ক ও উইল্‌স্ কিং কোন রকমে ধুঁকতে ধুঁকতে সাহায্যের আশায় চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

এদিকে সময় চলে যায় অথচ তাঁদের কোন সংবাদ এসে পৌঁছায় না। তাই দুর্ঘটনার আশঙ্কায় এই অভিযানের উদ্যোক্তারা তাঁদের খোঁজ নেবার জন্যে দিকে দিকে নানা দলে লোক পাঠালেন। তাঁদের একটি দল খোঁজ করে অবশেষে মৃতপ্রায় অবস্থায় কিং-এর দেখা পেলেন। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করে তাঁকে সুস্থ করে তোলা হলো। তারপর তাঁর কাছ থেকে নির্দেশ নিয়ে কুপার্স ক্রীকের কাছে গিয়ে তাঁরা বার্ক আর উইল্‌স্-এর মৃতদেহ দেখতে পেলেন। সেই অমর অভিযাত্রী দু-জনের মৃতদেহ তাঁরা বহন করে নিয়ে এলেন মেলবোর্নে এবং পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে সেখানে তাঁদের সমাহিত করলেন। সমাধি দুইটি ঘিরে তৈরি হলো একটি মনুমেণ্ট। বিশ্বের অভিযাত্রীবৃন্দ আজও সেখানে গেলে কিছুক্ষণ শ্রদ্ধায় মাথা নত করেন।

এইভাবেই অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের পথ সুগম হলো, আর তার ফলেই পরবর্তী কালে আরও অনেক অভিযাত্রীদল অষ্ট্রেলিয়ার অভ্যন্তরে গিয়ে ক্রমশঃ এই মহাদেশটির ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক ও সামাজিক সমস্ত তথ্যই সভ্য সমাজের গোচরে আনয়ন করেন।

আরতি দাশ

মাপজোখের কথা

তুমি যদি বল লোহাটা ভারী, দিল্লী অনেক দূর বা দিল্লী মেল খুব জোরে যায়—এসব কথার কোন মানে হয় না। তোমাকে বলতে হবে, লোহাটার ওজন এত সের বা দু-পাউণ্ড, রেলপথে হাওড়া ও দিল্লীর দূরত্ব ৯০৩ মাইল আর ঐ পথটা যেতে ট্রেনের সময় লাগে ২৫ ঘণ্টা।

ঠিক এভাবে ছোট-বড় যাবতীয় ঘটনা প্রকাশ করতে গিয়ে আমরা দেখি—সবার মূলে আছে মাত্র তিনটি কথা—দূরত্ব, ওজন ও সময়। এখন দেখা যাক, দূরত্ব, ওজন ও সময়ের একক মানুষ কিভাবে ঠিক করেছে।

আগের দিনের মানুষ তার নিজের দেহের একটা অঙ্গকে দৈর্ঘ্যের একক হিসাবে ধরে নিয়েছে। পায়ের দৈর্ঘ্যকে একক ধরেছে, হাতের কনুই থেকে বুড়ো আঙ্গুলের ডগা অবধি দূরত্বকে একক ধরেছে। এই সম্বন্ধে কয়েকটি গল্প বলছি—শোন।

চতুর্দশ শতাব্দীর কথা। প্রথম হেনরী ছিলেন তখন ইংল্যাণ্ডের রাজা। তিনি ছিলেন খুবই খেয়ালী। একদিন তাঁর খেয়াল হলো—দৈর্ঘ্য মাপবার একক ঠিক করতে হবে। তাই তিনি আদেশ জারী করলেন—তাঁর নাকের ডগা থেকে হাতের বুড়ো আঙুল পর্যন্ত মেপে যে দৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে, সেটাই হবে দৈর্ঘ্যের একক বা ইয়ার্ড, বাংলায় যাকে আমরা গজ বলে থাকি। এভাবে তিনি গজের প্রচলন করলেন। কিন্তু বেশী দিন চললো না।

এর প্রায় এক-শ' বছর পরের কথা। এলিজাবেথ তখন ইংল্যাণ্ডের রাণী। তিনি গজের হিসাবে দৈর্ঘ্য মাপবার প্রথা বাতিল করে এক নয়া আদেশ জারী করলেন। তিনি বললেন—একটা নির্দিষ্ট রবিবারে উপাসনার শেষে লোকজন যখন গির্জা থেকে বেরিয়ে আসবে, তখন তাদের মধ্য থেকে ষোলজনকে এক সারিতে এমনভাবে দাঁড় করাতে হবে, যাতে একজনের বাঁ-পা, তার সামনে দাঁড়ানো আর একজনের বাঁ-পা স্পর্শ করে। এভাবে যে দূরত্ব পাওয়া গেল, তার নাম দিলেন তিনি রড। আর এই রডের ষোল ভাগের এক ভাগ হবে এক ফুট।

শোনা যায়, রোমানরা তিনটি যব পরপর সাজিয়ে যে দূরত্ব পেয়েছিল, তার নাম দিয়েছিল ইঞ্চি।

প্রাচীন কালে আমাদের দেশেও ক্রোশ শব্দটা ব্যবহার করা হতো; দূরত্ব বোঝাবার জন্যে। এখনো আমরা ক্রোশ শব্দ ব্যবহার করি, কিন্তু প্রাচীন কালে ক্রোশের দূরত্ব বোঝাতো—ডাক দিলে যতটা দূর পর্যন্ত শোনা যায়।

তখন যোজন শব্দটাও ব্যবহার করা হতো। ঘোড়াকে একবার গাড়ীতে জুড়ে দেবার পর সে যতটা পথ যেতে পারে, এতে ততটা দূরত্ব বোঝাতো।

এমনি বহু ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে, যা থেকে মনে হয়, দৈর্ঘ্য মাপবার একক বা ইউনিট ঠিক করবার ব্যাপারটা সেকালের মানুষের খেয়ালখুসীর উপর নির্ভর করতো। বিজ্ঞান আজ সমস্ত পৃথিবীকে এক সূত্রে বাঁধতে চলেছে, কাজেই মাপজোখ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসা দরকার, যা পৃথিবীর সব জায়গায় এক রকম হবে।

এই ব্যাপারে এগিয়ে এলেন ফরাসী দেশের কয়েকজন বিজ্ঞানী। তাঁরা আলোচনা করে ঠিক করলেন, দৈর্ঘ্যের একক হবে মিটার এবং এক মিটার হবে পৃথিবীর পরিধির এক-চতুর্থাংশের এক কোটি ভাগের একভাগ। কিন্তু পৃথিবী মাপা তো সহজ কথা নয়। সেটা কি সম্ভব?

বিজ্ঞানীরা অবশ্য এই অসম্ভবকে সম্ভব করলেন। ১৭৯৯ সালের ২২শে জুন তারিখে মিটারের মাপ ঠিক হলো এবং মিটার মাপের একটা প্ল্যাটিনাম দণ্ড ঠিক করা হলো। আজও সেটা সযত্নে রক্ষিত আছে।

আর সময়ের মাপকাঠি ঠিক করবার জন্যে বিজ্ঞানীরা এমন ঘটনার সাহায্য নিলেন, যা নির্দিষ্ট ব্যবধান অন্তর অন্তর ঘটে চলেছে। পৃথিবী পুরা একটা পাক খাচ্ছে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর। সেইটিকে ধরে সময়ের মাপকাঠি ঠিক করলেন বিজ্ঞানীরা। সূর্য একবার ঠিক মাথার উপর আসবার পর, পরদিন আবার মাথার উপর আসতে যে সময় লাগে, সেই সময়টাকে ২৪ ভাগে ভাগ করে যতটা সময় পাওয়া যায়, সেটা হলো ঘণ্টা—তার ৬০ ভাগের এক ভাগ হলো মিনিট, এক মিনিটের ৬০ ভাগের এক ভাগ হলো সেকেণ্ড। সেকেণ্ডই হলো সময়ের এককের মাপকাঠি।

দৈর্ঘ্য, ওজন ও সময় মাপবার আর এক রকম পদ্ধতির প্রচলন করেন বিজ্ঞানীরা, যাকে এখন আমরা বলি মেট্রিক পদ্ধতি। এই মেট্রিক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য মাপবার একক হলো মিটার। এক মিটারের সমান হলো প্রায় ৩৯.৩৭ ইঞ্চি।

এমনি করেই সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ মাপজোখের ব্যবস্থা করে সমস্ত পৃথিবীকে এক সূত্রে বেঁধেছেন।

সুনীল সরকার

সেপটিক ট্যাঙ্ক

আমাদের পরিবেশকে স্বাস্থ্যকর করে তোলবার জন্যে পরিত্যক্ত মলমূত্র নিষ্কাশনের জন্যে ভূগর্ভে বড় বড় নর্দমা বা ড্রেন তৈরি করা হয়। কাজেই শহরে সেপটিক ট্যাঙ্ক বা মলশোধনাশয়ের দরকার হয় না। কিন্তু গ্রামে বা শহরতলীতে যেখানে ভূগর্ভস্থ পাইপ বা নর্দমার সাহায্যে মলমূত্র নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই, সেখানে সেপটিক ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা হয়।

সাধারণতঃ সেপটিক বলতে আমরা বুঝি এমন কোন বস্তু, যার সাহায্যে জৈব পদার্থকে পচিয়ে ফেলা যায়। সেপটিক ট্যাঙ্ক বা মল শোধনাশয় হচ্ছে এমনই এক প্রকার ট্যাঙ্ক, যার মধ্যে অবস্থিত ঐ বিশেষ বস্তুর সাহায্যে আমাদের মলমূত্রস্থিত জৈব পদার্থকে নানা প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পচিয়ে ফেলা যায়। সেপটিক ট্যাঙ্কের নির্মাণ-প্রণালী জানবার পূর্বে মলমূত্র এবং মল শোধনাশয়ে কিভাবে মল-মূত্রস্থিত জৈব পদার্থের পচন হয়, তা জানা দরকার।

মানুষের মলমূত্রে সাধারণতঃ ৬৫% থেকে ৭০% খনিজ পদার্থ এবং ৩০% থেকে ৩৫% জৈব পদার্থ থাকে। ট্যাঙ্কের মধ্যে মলমূত্রের পচনের সময় খনিজ পদার্থের কোন রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না—কেবলমাত্র জৈব পদার্থই তরল ও গ্যাসে পরিবর্তিত হয়। এই জৈব পদার্থ সাধারণতঃ প্রোটিন, চর্বি ইত্যাদি নিয়ে গঠিত। পচন-ক্রিয়ার সময় এই সব পদার্থ নানারকম পরিবর্তনের মাধ্যমে নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন, গন্ধক, ফস্‌ফরাস ইত্যাদিতে পরিবর্তিত হয় এবং সর্বশেষে রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে খনিজ পদার্থে রূপান্তরিত হয়। মলমূত্রস্থিত জৈব পদার্থকে খনিজ পদার্থে পরিবর্তিত করবার জন্যে একপ্রকার জীবাণুর দরকার। এই জীবাণুগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(ক) এরোবিক ব্যাক্টিরিয়া (Aerobic bacteria) ও (খ) অ্যানেরোবিক ব্যাক্টিরিয়া (Anærobic bacteria)। অ্যানেরোবিক ব্যাক্টিরিয়া আলো-বাতাসের সংস্পর্শ ছাড়াই দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম এবং এই জীবাণুগুলিই জৈব পদার্থকে পচন-ক্রিয়ার মাধ্যমে তরল ও গ্যাসে পরিবর্তিত করে এবং মলমূত্রকে শোধন করে।

মলমূত্র ট্যাঙ্কের প্রবেশদ্বার দিয়ে ট্যাঙ্কে প্রবেশ করে। জৈব এবং অজৈব পদার্থ স্লাজের আকারে ট্যাঙ্কের নীচে জমা হয়, কিছু কিছু উপরে ভেসে থাকে এবং অবশিষ্ট তরল পদার্থ নির্গমন-পথ দিয়ে ট্যাঙ্কের বাইরে চলে যায়। ট্যাঙ্ক ব্যবহার করবার উদ্দেশ্য হলো, তরল পদার্থের গতিরোধের নিমিত্ত একটি আধার তৈরি করা, যাতে জীবাণুগুলি সমস্ত কঠিন পদার্থকে তরলে পরিবর্তিত করবার অধিকতর সুযোগ

পায় এবং জীবাণুগুলির দ্রুত বংশবৃদ্ধির জন্যে একটি উৎকৃষ্ট প্রজনন-ক্ষেত্র তৈরি করে—কেন না, কঠিন পদার্থকে দ্রুত তরল পদার্থে পরিবর্তিত করতে হলে অধিক সংখ্যক জীবাণুর দরকার। যে সব হাল্কা কঠিন পদার্থ তরলের উপরে ভেসে থাকে, সেগুলি একত্রিত হয়ে একটি পুরু স্তরের সৃষ্টি করে। ঐ স্তরকে বলা হয় গাদ। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ট্যাঙ্কের মধ্যে জৈব পদার্থের পচনের ফলে নানা প্রকার গ্যাসের সৃষ্টি হয়। এই সব গ্যাস গাদের উপরে সঞ্চিত হতে থাকে। সুতরাং পচন-ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন গ্যাস সঞ্চয়ের জন্যে গাদের উপরে অতিরিক্ত জায়গা ফাঁকা রাখতে হয়। জীবাণুর দ্রুত বংশবৃদ্ধির জন্যে মলমূত্রের প্রবেশ ও নির্গমন-পথ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, যাতে গাদ এবং স্লাজের কোন পরিবর্তন না হয় এবং ট্যাঙ্কে আলো-হাওয়া ঢুকতে না পারে। সেই জন্যে সাধারণতঃ প্রবেশ-পথ এবং নির্গমন-পথ একই সমতলে রাখা হয়।

এবার সেপটিক ট্যাঙ্কের নির্মাণ-প্রণালী নিয়ে আলোচনা করা যাক। সেপটিক ট্যাঙ্ক সাধারণতঃ ইট এবং কংক্রিট দিয়েই তৈরি করা হয় এবং মাটির নীচে বসানো হয়ে থাকে। ট্যাঙ্ক নানা আকৃতির হতে পারে, তবে আয়তাকার (Rectangular) ট্যাঙ্কই সবচেয়ে বেশী প্রচলিত। সেপটিক ট্যাঙ্ক বিভিন্ন পরিবারের জন্যে বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। তবে ট্যাঙ্কের আকার এমনই হওয়া দরকার, যাতে ২৪ ঘণ্টায় যে পরিমাণ মলমূত্র ট্যাঙ্কে প্রবেশ করবে তার সঙ্কুলান হয়। কেন না, মলমূত্রের পচনের জন্যে প্রায় ২৪ ঘণ্টার দরকার হয়। ট্যাঙ্কগুলি এক-কক্ষ, দ্বি-কক্ষ এবং বহুকক্ষ নিয়ে গঠিত হতে পারে। কিন্তু এক-কক্ষ ট্যাঙ্কের তুলনায় দ্বি-কক্ষ ট্যাঙ্ক অধিকতর কার্যকরী বলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ট্যাঙ্কগুলি দুটি কক্ষের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়। অনেক সময় সেপটিক ট্যাঙ্ক বাড়ীঘরের অতি নিকটে তৈরি করা হয়। কিন্তু বাড়ীঘর এবং পানীয় জলের উৎস, যেমন—নলকূপ, পাতকুয়া ইত্যাদি থেকে অন্ততঃ ৫০ ফুট দূরে তৈরি করা উচিত। অনেক সময় বিভিন্ন আকারের তৈরি ট্যাঙ্ক ফ্যাক্টরিতে বা দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। তবে প্রায় সকল ক্ষেত্রে বাড়ী তৈরির স্থানে সেপটিক ট্যাঙ্ক তৈরি করেই ব্যবহার করা হয়। কেন না, এতে একদিকে যেমন নির্মাতার ইচ্ছানুযায়ী ট্যাঙ্কের আকার বাড়ানো-কমানো যায়, তেমনি অপর দিকে তৈরি ট্যাঙ্ক স্থানান্তরিত করতে প্রচুর খরচ এবং ট্যাঙ্ক নষ্ট হবার হাত থেকেও রেহাই পাওয়া যায়। ট্যাঙ্কের ভিতরের চারপাশের দেয়াল ও মেঝে প্রথমে সিমেন্ট প্লাস্টার করে এবং পরে শুধু সিমেন্ট কাদা ঘষে ভাল করে মসৃণ করে নিতে হয়, যাতে ময়লা বা আবর্জনা কংক্রিট বা দেয়ালের গায়ে আটকে থাকতে না পারে। নবনির্মিত কোন সেপটিক ট্যাঙ্ক কাজে লাগাবার পূর্বে সেটাকে জল দিয়ে ভর্তি করে নিতে হয় এবং যাতে তার মধ্যে কোন প্রকার বালি, কাদা ইত্যাদি প্রবেশ

করতে না পারে, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রতিনিয়ত ট্যাঙ্কের নীচে স্লাজ জমা এবং পুরু স্তর তৈরি হওয়ায় এর কার্যকরী গভীরতা কমতে থাকে এবং সেই সঙ্গে ট্যাঙ্কের কার্যকরী ক্ষমতাও কমতে থাকে। সুতরাং ট্যাঙ্কের কার্যকরী ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে মাঝে মাঝে ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করা উচিত। সেপটিক ট্যাঙ্কে যাতে কোন প্রকার জীবাণুনাশক পদার্থ প্রবেশ করতে না পারে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। পরিশেষে আমরা এই কথাই বলতে পারি যে, গ্রাম বা শহরতলীতে ভূগর্ভস্থ পাইপের মাধ্যমে মলমূত্র নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকলেও সুপরিকল্পিতভাবে সেপটিক ট্যাঙ্ক বা মল শোধনাশয় তৈরি করে আমরা মলমূত্র নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে আমাদের পরিবেশকে স্বাস্থ্যকর করে তুলতে পারি।

রণধীর দেবনাথ

গণিতের যাদুকর—শ্রীনিবাস রামানুজন

ভারতীয় গণিত-বিজ্ঞানী শ্রীনিবাস রামানুজনের নাম হয়তো তোমরা অনেকেই শুনেছ। রামানুজনকে গণিতের যাদুকর বলা হতো। জটিল গাণিতিক সমস্যা সমাধানে রামানুজন যে অসাধারণ প্রতিভা ও মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা তাঁকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতবিদের সম্মান দিয়েছিল। মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে এই তীক্ষ্ণধী গণিত-বিজ্ঞানী পরলোক গমন করেন। উচ্চতর গনিতশাস্ত্রে রামানুজনের অবদান আজও বিজ্ঞানীদের গবেষণার আলোচ্য বিষয় হয়ে আছে। রামানুজন মাত্র ১১ বছরে গণিতশাস্ত্রে যা দিয়ে গেছেন, তা সারা বিশ্বের গণিত-বিজ্ঞানীরা দীর্ঘকালের চেষ্টায়ও দিতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

১৮৮৭ সালের ২২শে ডিসেম্বর মাদ্রাজের ইরোদ গ্রামে রামানুজন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একটি ধর্মভীরু পরিবারের ন্যায়নিষ্ঠ পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন। রামানুজন নিজে নামগিরি নামক দেবীর পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন দরিদ্র কেরাণী। দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়ে রামানুজনের বাল্যশিক্ষা সুরু হয়। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময়েই রামানুজনের অঙ্কে প্রবল অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটলো সেদিন, যখন বিদ্যালয়ের গণিত-শিক্ষক দেখলেন রামানুজন ১২ বছর বয়সে লোনীর (একজন ইংরেজ গণিতের পুস্তক প্রণেতা) ত্রিকোণমিতি পুস্তকখানি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করে ফেলেছে (বর্তমানে পুস্তকটি বি.এস-সি. ক্লাসের পাঠ্য)। উচ্চবিদ্যালয়ে পড়বার সময় রামানুজন বিশুদ্ধ ও

ফলিত গণিতে কার-এর সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ পাঠ করেন এবং সেই সময়েই তিনি উচ্চতর গণিতের কয়েকটি উপপাদ্য ও সমাধান আবিষ্কার করেন। বিদ্যালয়ে পড়বার সময় তিনি উচ্চতর গণিত নিয়ে এমনভাবে মেতে ওঠেন যে, ইতিহাস ও সাহিত্যে মোটেই মনোযোগ দিতে পারেন নি। এর ফলে ১৯০৭ সালে এফ.এ. পরীক্ষায় তিনি অকৃতকার্য হন এবং তাঁর স্কলারশিপ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এই নিদারুণ ব্যর্থতাও তাঁকে উচ্চতর গণিতের গবেষণা থেকে নিবৃত্ত করতে পারে নি। ১৯০৭ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত রামানুজন সংখ্যার খেলায় মত্ত হয়ে রইলেন। বেশীর ভাগ সময়ই তিনি গণিতের বিভিন্ন শাখার আঙ্কিক তত্ত্ব (Continued Fractions, Hypergeometric series, Elliptic integrals ইত্যাদি) নিয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত থাকতেন। গবেষণার ফলাফল তিনি একটি নোট বইয়ে লিখে রাখতেন। বাহ্যিক জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি উচ্চতর গণিতের নতুন নতুন সমস্যা সমাধানে নিবিষ্ট হয়ে থাকতেন। এই সময়ে তিনি চরম অর্থকষ্টের সম্মুখীন হন। চরম অর্থাভাব ও দারিদ্র্যের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ১৯১২ সালের মার্চ মাসে রামানুজন মাদ্রাজের পোর্ট ট্রাস্ট অফিসে মাসিক ২৫ টাকা বেতনে কেরাণীর পদ গ্রহণ করেন। প্রায় এক বছর তিনি চাকুরী করেছিলেন এবং অবসর সময়ে গবেষণা চালিয়ে গেছেন। এই সময়ে রামানুজনের গণিত-প্রতিভা মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯১৩ সালে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাসিক ৭৫ টাকার একটি রিসার্চ স্কলারশিপ পান এবং পূর্ণোদ্যমে গবেষণা চালাতে থাকেন।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন বিখ্যাত গণিত-বিজ্ঞানী অধ্যাপক জি. এইচ. হার্ডি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে এসে রামানুজনের অসাধারন প্রতিভার পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হন। অধ্যাপক হার্ডি রামানুজনকে বার্ষিক ২৫০ পাউণ্ড বৃত্তি দিয়ে ১৯১৪ সালের ১৭ই মার্চ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যান। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হার্ডি ও অধ্যাপক লিট্‌লউড রামানুজনের ভারতবর্ষে থাকাকালীন গবেষণালব্ধ ফলাফল দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। এর কিছুদিন পরে অধ্যাপক হার্ডি মন্তব্য করেছিলেন—রামানুজনকে পড়াতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, তাঁকে আমি যত না শিখিয়েছি তাঁর কাছ থেকে আমি শিখেছি অনেক বেশী।

রামানুজনের অসাধারন প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯১৮ সালের ১৩ই অক্টোবর মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে রামানুজন রয়েল সোসাইটির ফেলো (এফ. আর. এস.) নির্বাচিত হন। এরপর তিনি ট্রিনিটি কলেজের ফেলো নির্বাচিত হন এবং বার্ষিক ২৫০ পাউণ্ডের একটি ফেলোশিপ পান। কিন্তু যে আত্মভোলা বৈজ্ঞানিক গণিতচর্চার মধ্যে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন, অর্থের প্রতি কি তাঁর কোন মোহ থাকতে পারে? রামানুজন যখন বুঝলেন, এই অর্থ তাঁর জীবনধারণের পক্ষে অতিরিক্ত, তখনই তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের

রেজিষ্ট্রারের নিকট এক পত্র লিখলেন (৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮ সাল)—যে অর্থ আমাকে দেওয়া হচ্ছে, তা আমার প্রয়োজনের পক্ষে অতিরিক্ত। আমি আশা করি, আমার ইংল্যাণ্ডে বাস করবার ন্যূনতম ব্যয় মিটিয়ে বছরে ৫০ পাউণ্ড আমার বাবা-মাকে দেওয়া হবে এবং অবশিষ্ট অর্থ শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিসাধনে ব্যয়িত হবে—বিশেষ করে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের বেতন হ্রাস ও পুস্তক ক্রয় ইত্যাদি বাবদ।

ঠিক এই সময় ভাগ্যবিধাতা রামানুজনের সঙ্গে এক নিষ্ঠুর পরিহাস করলেন, রামানুজন এক দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পড়লেন। ১৯১৮ সালে অক্টোবর মাসে চিকিৎসকগণ ঘোষণা করলেন, রামানুজন যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েছেন। রোগাক্রান্ত হয়ে রামানুজনের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে এবং তাঁর গবেষণা-কার্যও ব্যাহত হয়। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে বাধ্য হয়ে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। সে যুগে সম্ভাব্য সকল রকম চিকিৎসা ব্যবস্থাতেও তাঁকে বাঁচানো গেল না।

১৯২০ সালের ২৬শে এপ্রিল গণিতের এই যাদুকর জন্মভূমির বুকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

জ্যোতির্ময় দুই

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। ব্রঙ্কাইটিস রোগটা কি?

রেবা চক্রবর্তী
দেরাদুন।

প্রশ্ন ২। কৃত্রিম উপগ্রহ কিভাবে কক্ষপথে বিচরণ করে?

শ্রীধর পাল
উলুবেড়িয়া

উঃ ১। ব্রঙ্কাইটিস কথাটার শব্দগত অর্থ হচ্ছে ব্রঙ্কাসের প্রদাহ। আমরা শ্বাসগ্রহণের সঙ্গে যে বাতাস গ্রহণ করি, তা শ্বাসনালীর মাধ্যমে ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে। বক্ষপিঞ্জর পর্যন্ত যাবার পর শ্বাসনালী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে দু-পাশের ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে। এই দুই বিভক্ত অংশকে যথাক্রমে বাম ব্রঙ্কাস ও দক্ষিণ ব্রঙ্কাস বলা হয়। এগুলি ফুস্‌ফুসের মধ্যে প্রবেশ করে নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়। শ্বাসনালীর গঠন থেকে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, নাক দিয়ে আমরা যে বাতাস গ্রহণ করি, তা শ্বাসনালীর মাধ্যমে ফুস্‌ফুসে পৌঁছায়।

এই রোগের একটা শ্রেণী আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল। এই বিশেষ শ্রেণীকে বলা হয় ক্যাটার্যাল ব্রঙ্কাইটিস। আর্দ্র ও কুয়াশাচ্ছন্ন এলাকায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। এই রোগের আর একটা শ্রেণীর (যেটা সাধারণতঃ ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস নামে পরিচিত) দ্বারা সাধারণতঃ বয়স্ক লোকেরাই আক্রান্ত হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এটা বংশানুক্রমিক রোগ হিসাবেও দেখা দেয়।

রোগাক্রমণের সুরুতেই জ্বর, হাতে-পায়ে যন্ত্রণা ও প্রচণ্ড কাশিই হচ্ছে এই রোগের উপসর্গ। এই রোগে আক্রান্ত রোগীর থুথু পরীক্ষা করে নিউমোকক্কাই, ষ্ট্রেপটোকক্কাই, ফ্রি ল্যাণ্ডারস ব্যাসিলি প্রভৃতি জীবাণু পাওয়া যায়। কিন্তু অনেক বিশেষজ্ঞের মতে—এদের আক্রমণে ব্রঙ্কাইটিস হয় না. তবে এই রোগাক্রমণের পর এরা রোগটাকে জটিল করে তোলে। আধুনিক গবেষণার ফলে এই রোগের মূল হিসাবে এক বিশেষ ধরণের ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গেছে।

সাধারণতঃ ব্রঙ্কাইটিস রোগীকে আলো-হাওয়াযুক্ত ঘরে এবং শুক্‌নো আবহাওয়াতেই রাখা উচিত। এই রোগের চিকিৎসা বিভিন্নভাবে আজকাল সহজেই করা হয়ে থাকে।

উঃ ২। পৃথিবী থেকে যে সব কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণ করা হয়, তাদের যদি বিশ্বের সমস্ত বস্তুর আকর্ষণের আওতার বাইরে নিয়ে যাওয়া হতো, তবে তাদের গতিপথ হতো সোজা, কিন্তু এই সমস্ত কৃত্রিম উপগ্রহগুলিকে বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহের মাধ্যাকর্ষণের আওতার মধ্যে দিয়ে চলতে হয় বলে এদের গতিপথ হয় জটিলতর।

পৃথিবী থেকে যে সমস্ত কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠানো হয়, তাদের দুটি শ্রেণী আছে। কতকগুলি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে থেকে এর চারপাশে উপবৃত্তাকার অথবা বৃত্তাকার পথে ঘুরে বেড়ায় আর অন্যগুলি মাধ্যাকর্ষণের বাঁধন ছাড়িয়ে চিরদিনের জন্যে পৃথিবী থেকে উধাও হয়ে যায়।

পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যবর্তী দূরত্ব প্রায় ২,৪০,০০০ মাইল। এর মধ্যে পৃথিবী থেকে সুরু করে প্রায় প্রথম ২,১৬,০০০ মাইল পর্যন্ত পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব আর বাকী প্রায় ২৪,০০০ মাইল পর্যন্ত চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব কার্যকরী। পৃথিবী থেকে ২,১৬,০০০ মাইল দূরে ও চাঁদ থেকে ২৪,০০০ মাইল দূরে যেখানে চাঁদ ও পৃথিবীর আকর্ষণ পরস্পরকে বাতিল করে দিচ্ছে, সে জায়গাটাকে বলা হয় নিরপেক্ষ অঞ্চল। কৃত্রিম উপগ্রহ যতক্ষণ পর্যন্ত নিরপেক্ষ অঞ্চল অতিক্রম না করছে, ততক্ষণ এর বিপরীতমুখী গতির জন্যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছে এবং এর গতিবেগও ক্রমশঃ কমছে। নিরপেক্ষ অঞ্চল অতিক্রম করবার পর চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের আওতায় গিয়ে এর গতিবেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়।

গ্রহগুলি যে নিয়মে সূর্যের চারপাশে ঘোরে, সেই একই নিয়ম পৃথিবীর চারপাশে ঘুরতে থাকা কৃত্রিম উপগ্রহের ক্ষেত্রেও খাটে। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ R ধরলে পৃথিবীর

মাধ্যাকর্ষণের দরুণ উপগ্রহের ত্বরণ হবে $g = \frac{\mu}{R^2}$, অর্থাৎ $\mu = gR^2 = GM$। G=মহাকর্ষীয় ধ্রুবক। M=পৃথিবীর ভর। এখানে কৃত্রিম উপগ্রহের ভর পৃথিবীর ভরের তুলনায় অনেক কম—তাই কৃত্রিম উপগ্রহের ভর এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে r দূরত্বে যদি কোন উপগ্রহ ঘুরতে থাকে এবং তার গতিবেগের বর্গ v^2 যদি $\frac{2\mu}{r}$ হয়, অর্থাৎ $\frac{2gR^2}{r}$-এর সমান হয়, তবে সেটি অধিবৃত্তাকার পথে পৃথিবী থেকে উধাও হবে। পৃথিবী থেকে যদি কৃত্রিম উপগ্রহকে সেকেণ্ডে ৭ মাইল বেগে ছুঁড়ে দেওয়া যায়, তবে সেটা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব থেকে চিরদিনের জন্যে মুক্ত হয়ে যাবে। এই নির্দিষ্ট গতিবেগকে বলা হয় নির্গমন গতিবেগ। কিন্তু v^2 যদি $\frac{2gR^2}{r}$-এর থেকে বড় হয়, তবে উপগ্রহটি পরাবৃত্তাকার পথে পৃথিবী থেকে মহাশূন্যে উধাও হয়ে যাবে। এই ঘটনা সম্ভব হয় যদি, কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবী থেকে সেকেণ্ডে ৭ মাইলের বেশী বেগে ছুঁড়ে দেওয়া যায়। কৃত্রিম উপগ্রহকে যদি ৭ মাইলের কম বেগে ছোঁড়া হয়, অর্থাৎ যদি v^2 $\frac{2gR^2}{r}$-এর থেকে ছোট হয়, তবে পৃথিবীর কেন্দ্রকে এক ফোকাসে ও উৎক্ষেপণ স্থানের কাছাকাছি জায়গাকে অন্য ফোকাসে রেখে পৃথিবীর চারপাশে উপগ্রহের কক্ষপথ হবে উপবৃত্তাকার।

নির্গমন গতিবেগের চেয়ে বেশী বেগে কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবী থেকে ছোঁড়া হলে সেটা পরাবৃত্তাকার পথে উধাও হয়ে যায়—একথা আগেই বলেছি। কিন্তু উপগ্রহটি পৃথিবীর আকর্ষণের বাইরে চলে গেলেও সূর্যের আকর্ষণমুক্ত হতে না পেরে সূর্যের চারপাশে ঘুরতে থাকবে। সূর্যের আকর্ষণমুক্ত হবার জন্যে উপগ্রহটির গতিবেগ সেকেণ্ডে প্রায় ২৭ মাইল হওয়া দরকার।

বৃত্তাকার কক্ষপথে উপগ্রহটিকে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরাবার প্রয়োজন হলে একে সেকেণ্ডে ৫ মাইল বেগে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে উৎক্ষেপণ করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে উপগ্রহটিকে পৃথিবীর কেন্দ্র ও উৎক্ষেপণ স্থান সংযোগকারী সরলরেখার সঙ্গে ৯০° ডিগ্রী কোণ করে উৎক্ষেপণ করতে হবে। বৃত্তাকার পথে ঘোরাবার জন্যে গতিবেগের পরিমাপ কম হলেও এক্ষেত্রে কয়েকটা অসুবিধা আছে। কারণ, উপগ্রহটি একবার পুরাপুরি ঘুরে আসবার আগেই পৃথিবীতে এসে ধাক্কা খাবে। এই কারণে বিভিন্ন ধাপে গতি বাড়িয়ে উপগ্রহটিকে নির্দিষ্ট উচ্চতায় তোলা হয়। রকেটের সাহায্যে প্রথমে উপগ্রহকে লম্বভাবে নির্দিষ্ট উচ্চতায় তোলা হয়। এরপর সেটাকে ৯০° ডিগ্রী কোণ করে ছুঁড়লে সেটা বৃত্তাকার পথে ঘুরতে সুরু করে। তবে এছাড়াও অন্য একটা পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতিতে উপগ্রহকে লম্বভাবে নিক্ষেপ করে ও ধাপে ধাপে এর গতিবেগ বাড়িয়ে বৃত্তাকার কক্ষপথে স্থাপন করা হয়।

শ্যামসুন্দর দে

বিবিধ

ছয়জন বিজ্ঞানীর ভাটনগর স্মৃতি পুরস্কার লাভ

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গত ২৮শে জুলাই নূতন দিল্লীর ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল লেবরেটরিতে আয়োজিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে ছয়জন কৃতী বিজ্ঞানীকে ১৯৬৫ সালের শান্তি-স্বরূপ ভাটনগর স্মৃতি পুরস্কার বিতরণ করেন। প্রতিটি পুরস্কারের মূল্য নগদ দশ হাজার টাকা।

বোম্বাইয়ের ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারের ইলেকট্রনিক্স অ্যাণ্ড ডাইরেক্টরেট অব রেডিয়েশন প্রোটেকশন-এর ডিরেক্টর শ্রী এ. এস. রাওকে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

রসায়নে পুরস্কার পেয়েছেন রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আর. সি. মেহরোত্রা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগেরর অধ্যাপক সাধন বসু।



বাম হইতে দক্ষিণে—অধ্যাপক আর. সি. মেহরোত্রা, শ্রী এ. এস. রাও, অধ্যাপক ভি. কে. আর ভি. রাও, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, অধ্যাপক বি. রামচন্দ্র রাও, অধ্যাপক সাধন বসু, ডক্টর ভি. রামলিঙ্গস্বামী, ডক্টর আ্যারাম, ডক্টর এন. কে. দত্ত

বিজ্ঞানের চারিটি বিভাগে মোট ছয়জন বিজ্ঞানী এই পুরস্কার পেয়েছেন এঁরা হলেন—অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক বি. রামচন্দ্র রাওকে পদার্থবিদ্যায় এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে পুরস্কার পেয়েছেন বোম্বাইয়ের হফকিন্ ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর ডক্টর নির্মলকুমার দত্ত এবং অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সের প্যাথোলজির অধ্যাপক ডক্টর ভি. রামলিঙ্গস্বামী।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। শ্রীত্রিদিবরঞ্জন মিত্র
পি-৩১৮, দমদম পার্ক
কৃষ্ণপুর কলোনী
কলিকাতা-৫৫

২। শ্রীসতীন্দ্রকিশোর গোস্বামী
ডিপার্টমেন্ট অব ফুড টেক্‌নোলজী
অ্যাণ্ড বায়োকেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা-৩২

৩। শ্রীদীপ্তিময় দে
১৪।৩, নারায়ণ রায় রোড
কলিকাতা-৮

৪। শ্রীঅমিতোষ ভট্টাচার্য
ডিফেন্স ইলেকট্রনিক্স রিসার্চ লেবরেটরী
চন্দ্রায়ন গুট্টা লাইনস্
হায়দরাবাদ-৫

৫। শ্রীঅলোককুমার রায়চৌধুরী
অবধায়ক/শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী
ডাকঘর—বারাসত (ইটনা কলোনী)
২৪ পরগণা

৬। শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ
বালিচক বি. এইচ. ইনষ্টিটিউশন
পোঃ—বালিচক,
জেলা—মেদিনীপুর

৭। পরিমল চট্টোপাধ্যায়
ফুড টেক্‌নোলজী ও বায়োকেমিক্যাল
ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্ট
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
যাদবপুর, কলিকাতা-৩২

৮। পঙ্কজনারায়ণ সমাদ্দার
অবধায়ক/সমীরণ সমাদ্দার
নবউন্নয়ন পল্লী
কলিকাতা-৮

৯। গৌরচন্দ্র দাস
৩১, ছুতার পাড়া লেন
কলিকাতা-১২

১০। সুনীল সরকার
B. P. C. Junior Tech. School
P. O. Krishnagar,
Dist. Nadia

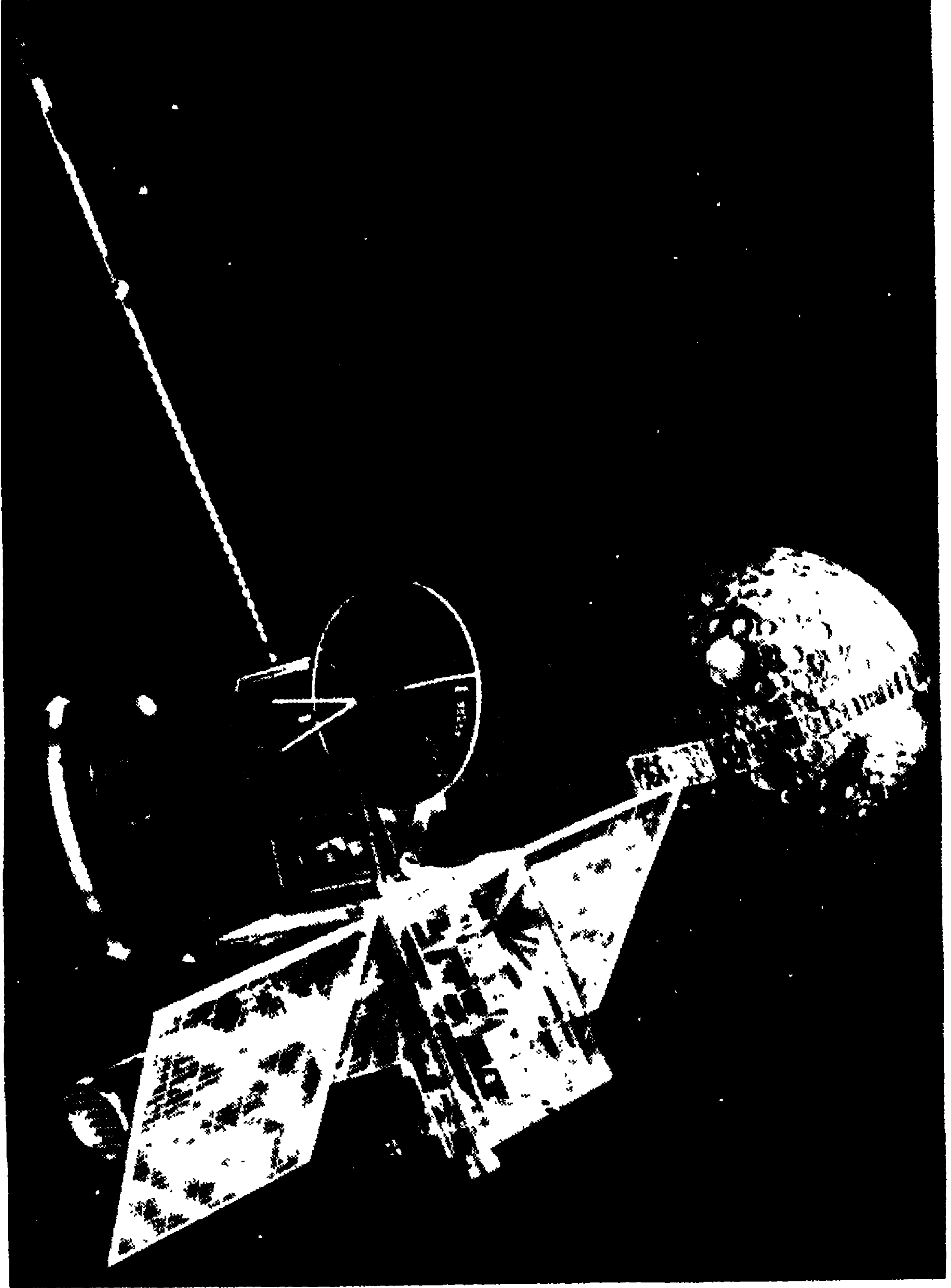
১১। আরতি দাশ
১৩৫, রিজেন্ট এস্টেট
কলিকাতা-৩২

১২। জ্যোতির্ময় হুই
ডাকঘর—বুনিয়াদপুর
জেলা—পশ্চিম দিনাজপুর

১৩। রণধীর দেবনাথ
আচার্য প্রফুল্ল নগর
পোঃ হাবড়া, ২৪ পরগণা

১৪। শ্যামসুন্দর দে
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স; বিজ্ঞান কলেজ
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত



বুধগ্রহের হালচাল লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে ১৯৭৫ সাল নাগাদ 'মেসো' নামে 'মার্কারী মডিউল' মহাকাশে পাড়ি জমাবে। এই মডিউলের ওজন ৮০০ পাউণ্ড। বুধগ্রহের জমি, আবহাওয়া ও অন্যান্য তথ্য সরেজমিনে পরীক্ষা করার জন্যে এই ক্ষুদ্রতম গ্রহটিকে তৈরি করা হচ্ছে। সরাসরি ছবি পাঠাবার জন্যে এতে থাকবে একটি টেলিভিশন ক্যামেরা। এই অভিযানের উদ্যোক্তা হচ্ছেন ইওরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা।

শারদীয়

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাবিংশ বর্ষ | অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৬৯ | দশম-একাদশ সংখ্যা

নিবেদন

'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র শারদীয় সংখ্যার জন্য ক্রমবর্ধমান আগ্রহ ও চাহিদা বৃদ্ধির ফলে গুরুতর আর্থিক দায়িত্বের ঝুঁকি লইয়াও আমরা বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশ করিতেছি।

এই সংখ্যায় জনসাধারণের জন্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে সরল ভাষায় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা লিখিত কতকগুলি রচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাঁহারা এই সকল বিষয় জানিতে উৎসুক, তাঁহারা ইহা হইতে কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে পারিবেন বলিয়াই আশা করি। কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তরে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সরল আলোচনা, ধাঁধাঁ প্রভৃতি ও প্রশ্নাদির উত্তর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীরা এইগুলি পাঠ করিয়া বৈজ্ঞানিক বিষয়ের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইবে বলিয়াই মনে হয়। এইভাবে তাহারা বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্যাদি জানিবার জন্য উত্তরোত্তর আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলে আমাদের পরিশ্রম বহুলাংশে সার্থক জ্ঞান করিব।

দেশের জনসাধারণ আজ নানাবিধ সমস্যায় বিব্রত ও বিপর্যস্ত। সর্বস্তরে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও জনমনে নিশ্চয়তাবোধের অভাব সর্বক্ষেত্রেই আজ সঙ্কটের তীব্রতা বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। আমাদের বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদও ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত নহে।

এই প্রতিষ্ঠান বর্তমানে গুরুতর অর্থসঙ্কটের সম্মুখীন। তৎসত্ত্বেও এই পত্রিকার প্রতি অনুরাগী গ্রাহক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতার আনুকূল্য, বিশেষতঃ অন্যান্য বারের মত পশ্চিম বঙ্গ সরকারের আর্থিক সাহায্যের ভরসা করিয়াই এই শারদীয় সংখ্যাটি প্রকাশিত হইল।

পূর্বের মত বর্তমান বৎসরের শারদীয় সংখ্যাটিও জনসাধারণের নিকট আদৃত হইবে বলিয়াই আশা করি।

সৌরশক্তির সঞ্চয়ন ও ব্যবহার

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

সূর্য থেকে পৃথিবী পায় আলোক এবং তাপ। উদ্ভিদ ও যাবতীয় জীবজন্তু এবং মানুষের জীবন এবং অস্তিত্ব এথেকেই হয়েছে সম্ভব। উদ্ভিদের হরিৎ পত্রে সবুজ রঙের কণিকার (ক্লোরোফিল-Chlorophyll) সংস্পর্শে সূর্যালোকের প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের অঙ্গারাম্ল গ্যাস (কার্বন ডাই অক্সাইড) ও জলীয় বাষ্পের জটিল রাসায়নিক সংশ্লেষণের ফলে উদ্ভিদদেহে সৃষ্টি হয় সেলুলোজ (Cellulose) নামক পদার্থের। সেলুলোজ থেকে পরিশেষে ফলেমূলে গড়ে ওঠে শ্বেতসার (Starch) ও শর্করা। সেলুলোজ, শ্বেতসার এবং শর্করা জীবের খাদ্যের একটি প্রধান উপাদান। প্রকৃতির রাজ্যে উদ্ভিদদেহের কারখানায় জীবের খাদ্যের এই উপাদান অহরহ সৃষ্টি হচ্ছে। সূর্যের আলোক যোগায় সৃষ্টির শক্তি এই কারখানায়। বাঁচবার জন্যে যেমন মানুষের খাদ্যের আবশ্যকতা, সেরূপ জ্বালানীরও (Fuel) প্রয়োজন হয় তার নিত্য প্রয়োজনের বহু সামগ্রী নির্মাণে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে জ্বালানিদ্রব্যের ব্যবহারও ক্রমশঃ দ্রুতবেগে বেড়ে চলেছে। বিচিত্র রকমের শিল্পসামগ্রী, ঔষধ, যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র গোলা-বারুদ ইত্যাদি নির্মাণের কারখানা পরিচালনের জন্যে যে শক্তির দরকার, তা সাধারণতঃ আসে কয়লা বা খনিজ তেল পুড়িয়ে। ভূগর্ভে দীর্ঘ-কালব্যাপী প্রোথিত উদ্ভিদদেহের রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয় কয়লা ও খনিজ তেলের। সুতরাং বলা যায় যে, কয়লা বা খনিজ তেল পুড়িয়ে যে তাপশক্তি পাওয়া যায়, তাকে সঞ্চিত সূর্যালোকের প্রকারভেদ বলে গণ্য করা চলে। সুতরাং দেখা যায় যে, বাঁচবার জন্যে ও জীবনযাত্রা নির্বাহ এবং তার উন্নয়নকল্পে মানুষকে নির্ভর করতে হয় শেষ পর্যন্ত সৌর-শক্তির উপর।

বর্তমান সভ্যতার যুগে খাদ্যের জন্যে এবং জ্বালানিদ্রব্যের জন্যে কি পরিমাণ শক্তি প্রত্যেক মানুষের জন্যে আবশ্যক হয়, তার একটি হিসাব বিশেষজ্ঞেরা করেছেন। জনপ্রতি পৃথিবীর লোকের দৈনিক যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হয়, শক্তির মানে বা মাপকাঠিতে তাকে প্রকাশ করা যায় ২,৫০০ কিলোক্যালরিতে (Kilocalorie)। এক কিলোক্যালরি হচ্ছে এক হাজার ক্যালরি। বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীরা জানেন যে, এক ক্যালরি হচ্ছে তাপশক্তি পরিমাপের একক। এক ঘন সেণ্টিমিটার (1cc.) জলের তাপমাত্রাকে ১৫° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড থেকে ১৬° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড বাড়াতে যে পরিমাণ তাপশক্তির প্রয়োজন হয়, তাকেই বলা হয় এক ক্যালরি বা এক গ্র্যাম ক্যালরি। বর্তমানে পৃথিবীর লোকসংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৩০০ কোটি। এদের জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্য এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষাকল্পে সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র, গোলাগুলি, বারুদ ও অন্যান্য বিস্ফোরক পদার্থ নির্মাণের জন্যে যে পরিমাণ জ্বালানিদ্রব্যের (Fuels) আবশ্যক হয়, শক্তির মানে তাকে প্রকাশ করলে দাঁড়ায় জনপ্রতি দৈনিক প্রায় ২৫,০০০ কিলোক্যালরি। মোটের উপর খাদ্যোৎপত্তি ও জ্বালানিদ্রব্য মিলে পৃথিবীর অধিবাসী বর্তমানে দৈনিক জনপ্রতি প্রায় ৩০,০০০ কিলোক্যালরি পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করছে। এই শক্তির অভিন্ন উৎস হচ্ছে সূর্যদেহ থেকে

বিকিরিত আলোক এবং তাপ। বৈদ্যুতিক শক্তি, জলপ্রবাহ (Hydraulic) ও বায়ুপ্রবাহ (Wind) জনিত শক্তি ইত্যাদি সকল শক্তিই মূলতঃ সৌর শক্তির রূপান্তর। জীবনরক্ষার জন্যে খাদ্যোৎপাদনে এবং আধুনিক উন্নত মানে জীবনযাত্রার জন্যে মানুষ যে পরিমাণ শক্তির ব্যবহার করছে, তাকে ব্যবসায় বুদ্ধিতে দু-শ্রেণীতে ভাগ করা চলে; যথা—অর্জিত (Income) এবং গচ্ছিত (Capital) শক্তি। অর্জিত শক্তির উদাহরণ হচ্ছে জ্বালানি কাঠ, জল ও বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি। গচ্ছিত শক্তির দৃষ্টান্ত কয়লা ও তৈল। সম্প্রতি এক নূতন প্রকার শক্তির, যার উৎস হচ্ছে ইউরেনিয়াম ধাতুর পরমাণু—ব্যবহার চালু হয়েছে। একে নিউক্লিয়ার শক্তি (Nuclear energy) বলা হয়। এথেকেই আসে পরমাণু বোমার শক্তি। ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভাঙন (Fission) থেকেই সৃষ্টি হয় এই শক্তির। এই শক্তিকে তাপ ও বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে কলকারখানা, যানবাহন, জাহাজ ও রণতরী ইত্যাদি পরিচালনার কাজে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এটাও একটি গচ্ছিত শক্তি; ভূগর্ভস্থ ইউরেনিয়ামঘটিত খনিজ পদার্থের ইউরেনিয়ামই এর একমাত্র আধার। ব্যবহারের ফলে যাবতীয় গচ্ছিত শক্তির পরিমাণে ক্রমশঃ হ্রাস ঘটছে। উপরে বলা হয়েছে যে, বর্তমানে পৃথিবীর অধিবাসীরা (প্রায় ৩০০ কোটি) জনপ্রতি দৈনিক মোট প্রায় ৩০,০০০ কিলোক্যালরি পরিমাণ শক্তির ব্যবহার করছে, তাদের আপন খাদ্যসংস্থান, প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটাবার জন্যে। এর বেশীর ভাগই (শতকরা ৯০ ভাগ) আসে গচ্ছিত সৌরশক্তির আধার কয়লা ও তেল থেকে। বাকী ১০ ভাগ আসে অর্জিত সৌরশক্তি—কাঠকয়লা, কৃষিজাত অপ্রয়োজনীয় পদার্থ, জল ও বায়ুপ্রবাহ, সৌরতাপের পরোক্ষ সঞ্চয়ন ইত্যাদি থেকে। নিউক্লিয়ার বা পরমাণু শক্তির ব্যবহারের পরিমাণ বর্তমানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলা চলে না। তবে এর ব্যবহার যে ক্রমশঃ বেড়ে চলবে, এই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কয়লা ও তৈলরূপী গচ্ছিত সৌরশক্তি ও ইউরেনিয়ামরূপে গচ্ছিত পরমাণু শক্তির মোট পরিমাণ অপরিসীম নয়। পৃথিবীর লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর যেভাবে বেড়ে চলেছে এবং তার সকল রাষ্ট্রে শিল্পোন্নতি ও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাকল্পে প্রবল উদ্যমে যেরূপ প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে, তাতে গচ্ছিত সৌরশক্তি (কয়লা এবং তৈল) এবং পরমাণু শক্তির (খনিজ ইউরেনিয়াম) ভাণ্ডার অদূর ভবিষ্যতে নিঃশেষিত হয়ে যাবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখা যায়। বর্তমানে পৃথিবীর লোকসংখ্যা প্রায় ৩০০ কোটি। যে হারে এ লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে, তা অব্যাহত থাকলে একশত বছর পরে অর্থাৎ ২০৭০ সালে পৃথিবীর লোকসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় আট থেকে নয় শত কোটিতে। পৃথিবীব্যাপী সকল রাষ্ট্রে শিল্পোদ্যোগ যেরূপ দ্রুতবেগে বেড়ে উঠেছে, তাতে শক্তির চাহিদাও পরিমাণে তদনুরূপ যাচ্ছে বেড়ে। ফলে, এসব কারণে ভবিষ্যতে মানুষের উন্নত জীবনযাত্রার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ শক্তির অভাবে তার সমাজে ও সভ্যতায় যে এক সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সৃষ্টি হবে, এই বিষয়ে বিজ্ঞানীরা সজাগ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এতে তাঁরা আশঙ্কিত হন নি। গচ্ছিত সৌরশক্তি ও পরমাণু শক্তির ভাণ্ডার নিঃশেষিত হলেও অর্জিত সৌরশক্তির উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে সঞ্চয়ন ও ব্যবহারের উপায় উদ্ভাবনে তাঁরা সক্ষম হবেন, এরূপ প্রত্যাশা করেন। কারণ আলোক ও তাপরূপে সূর্য থেকে পৃথিবীতে অহরহ যে পরিমাণ শক্তি বিকিরিত হয়ে আসছে, পরিমাণে তা বর্তমান সভ্য মানুষের মোট প্রয়োজনের উপযোগী শক্তির চেয়ে বহু গুণে বেশী। এর অতি সামান্য অংশই এখন মানুষের ব্যবহারে ব্যয়িত হচ্ছে, একথা আগেই বলা হয়েছে। এই বিকিরিত সৌরশক্তির

কখনো অভাব বা তার পরিমাণের ঘাটতি হতে পারে না। যতদিন পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন অবধি সে এই শক্তি ব্যবহারে বঞ্চিত হবে না।

এই প্রসঙ্গে কি পরিমাণ শক্তি সূর্যদেহ থেকে বিকিরিত হয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠে পড়ে, সংক্ষেপে তার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা সঙ্গত মনে করি। সৌরজগতের অধিপতি সূর্য হচ্ছে প্রচণ্ড তাপে দীপ্যমান একটি বিরাট বাষ্পপিণ্ড। বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় নির্ণীত সূর্যের পৃষ্ঠদেশের উষ্ণতা হচ্ছে প্রায় ৬,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (°C), অভ্যন্তরে কেন্দ্রের অভিমুখে এই উষ্ণতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। কেন্দ্রের সন্নিহিত প্রদেশের তাপমাত্রার হিসাব হচ্ছে প্রায় চারকোটি (৪০ মিলিয়ন) ডিগ্রী। এই প্রচণ্ড তাপে কোন কঠিন বা তরল পদার্থ অবস্থান করতে পারে না। সূর্যের ব্যাস হচ্ছে প্রায় ৮,৬৪,০০০ মাইল (প্রায় ১৩ লক্ষ কিলোমিটার)। আকারে তা পৃথিবীর প্রায় ১৩ লক্ষগুণ বড়। এই কারণে সূর্যের কেন্দ্রে তার বিশাল দেহের ভারের চাপ হচ্ছে অপরিমিত প্রবল। বিজ্ঞানীদের হিসাবে এই চাপ প্রায় ৪ হাজার কোটি বায়ুমণ্ডলের চাপের সঙ্গে তুলনীয়। এর ফলে সূর্যদেহ বাষ্পময় হলেও এর গুরুত্ব পৃথিবীর যে কোন গুরুভার কঠিন পদার্থ থেকে অনেক বেশী। সূর্যের ওজন পৃথিবীর ওজনের ৩ লক্ষ বত্রিশ হাজার (৩,৩২,০০০) গুণ। পৃথিবীদেহের প্রত্যেক আউন্স (২৮ গ্রাম) ওজনের পদার্থের বিনিময়ে সূর্যদেহের পদার্থের ওজন হবে এক টন (প্রায় ১০৩১ কিলোগ্রাম)। পৃথিবীতে যে সব মৌলিক পদার্থ দেখা যায়, সূর্যদেহেও তাদের সকলের অস্তিত্ব পরীক্ষায় পাওয়া যায়। বর্ণবিশ্লেষক যন্ত্রে (Spectroscope) এর প্রমাণ মেলে। কিন্তু অপরিসীম তাপের প্রভাবে সূর্যদেহের বাষ্পময় পিণ্ডে এসব মৌলিক পদার্থের অণু-পরমাণুগুলি অক্ষত বা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে পারে না। পরমাণুর বহির্মণ্ডলের এক বা ততোধিক ইলেকট্রন (না-ধর্মী বিদ্যুৎ কণিকা) পরমাণু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছুটে পালায়। শুধু বিভিন্ন মৌল পরমাণুর কেন্দ্রবস্তু তার অসম্পূর্ণ ইলেকট্রন সংখ্যার আবরণ নিয়ে সূর্যমণ্ডলে অস্বাভাবিক প্রচণ্ড বেগে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করতে থাকে।

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব প্রায় ৯,২৯০০,০০০ মাইল (১৩,৯৫,০০,০০০ কিলোমিটার)। এরূপ অপরিসীম দূরত্ব সত্ত্বেও বিরাট সূর্যদেহের প্রচণ্ড তাপের দরুণ সূর্য থেকে পৃথিবী যে বিকিরিত আলোক ও তাপশক্তি পায়, তা পরিমাণে এত বেশী যে, ভবিষ্যতে মানুষের সর্ববিধ প্রয়োজনের জন্যে শক্তির চাহিদা মিটিয়েও তার কখনো শেষ হবে না। পৃথিবীপৃষ্ঠে গড়পড়তা প্রতি বর্গসেন্টিমিটার স্থানে মেঘবিনির্মুক্ত আকাশ থেকে দৈনিক প্রায় ৬০০ গ্রাম ক্যালরি পরিমাণ সৌরশক্তি এসে পড়ে। অবশ্য স্থান ও ঋতুবিশেষে এর অনেক তারতম্য ঘটে। গ্রীষ্মপ্রধান মণ্ডলে—মধ্যআফ্রিকা, আরেবিয়া এবং ভারতবর্ষে এর দ্বিগুণ বা তিন গুণ শক্তি পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং প্রতি ১০০ বর্গফুটে (৯ বর্গমিটার) প্রত্যেক মেঘমুক্ত দিনে ৫৪,০০০-১৪০,০০০ কিলোক্যালরি সৌরশক্তির বর্ষণ ঘটে। আগে বলা হয়েছে যে, বর্তমানে পৃথিবীর অধিবাসীর যাবতীয় প্রয়োজনের জন্যে জনপ্রতি ৩০,০০০ কিলোক্যালরি শক্তির আবশ্যক হয়। তাই বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, সৌরশক্তিকে যদি স্বল্পব্যয়ে সংগৃহীত করে তার সংরক্ষণ করবার উপায় উদ্ভাবন করা যায়, তবে কয়লা, তৈল ও ইউরেনিয়াম ধাতু সর্বদা ব্যবহারের ফলে কখনো নিঃশেষিত হয়ে গেলেও শক্তির অভাবে মানুষকে বিপন্ন হতে হবে না। গত ৩০।৪০ বছরব্যাপী এসম্বন্ধে বহু পরীক্ষা চলেছে। তারই কিঞ্চিৎ আলোচনা হচ্ছে বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সৌরশক্তির ব্যবহারের যে সব প্রচেষ্টা চলছে

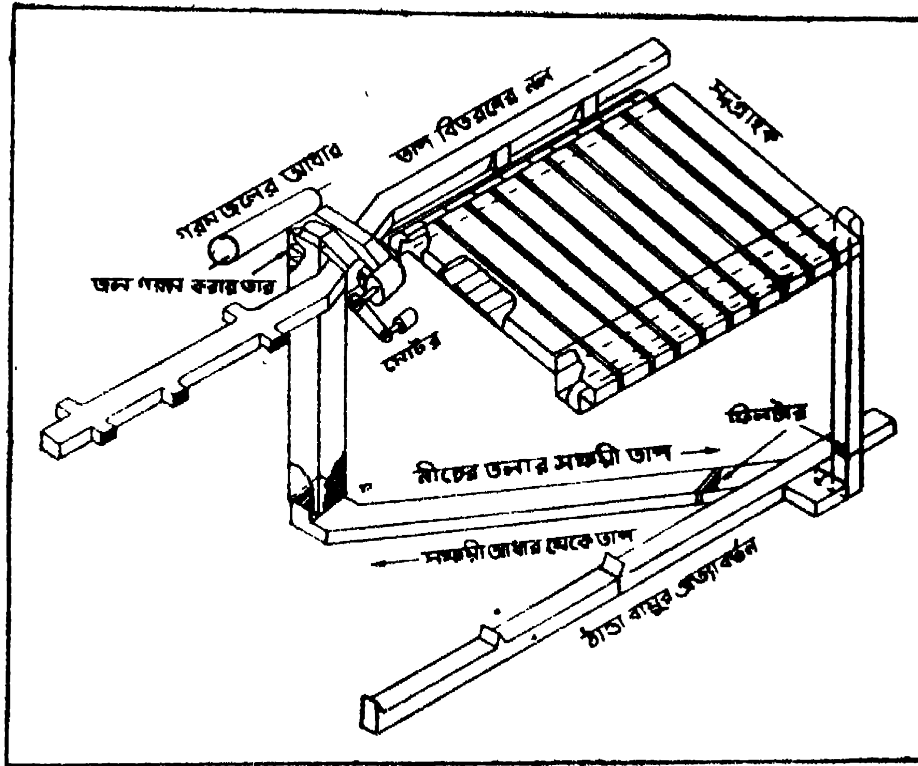
তাদের মধ্যে বাসগৃহকে শীতের দিনেও শীতের দেশে গরম রাখবার এবং গ্রীষ্মকালেও গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীতল রাখবার ব্যবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সৌরশক্তি মানবজীবনের একটি প্রধান কল্যাণ-প্রদ অবলম্বন। প্রকৃতির এমনই সুব্যবস্থা যে, পৃথিবীর অনুন্নত অঞ্চলসমূহেই এই শক্তির প্রাচুর্য দেখা যায়। কিন্তু মানুষ এযাবৎ প্রকৃতির এই অকৃপণ দানকে আপন কল্যাণের জন্যে ব্যবহার করতে সক্ষম হয় নি। শীতের দিনে সৌরশক্তির সাহায্যে ঘর গরম করবার একাধিক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এর মধ্যে যা অপেক্ষাকৃত বেশী কার্যকরী অথচ সহজ ও অল্পব্যয়সাধ্য বলে গণ্য হয়েছে, সংক্ষেপে তারই একটি বর্ণনা দেওয়া হলো এখানে। এই পদ্ধতিতে একটি সৌরশক্তির সংগ্রাহক (Collector) ও একটি তার সঞ্চয়ী (Heat-storage) আধার থাকে। সংগ্রাহক আধারে বায়ুপ্রবাহকে কয়েক সারি উপর্যুপরি সমান্তরাল আংশিক কৃষ্ণকায় রৌদ্রতপ্ত কাচের পাতের সংস্পর্শে উত্তপ্ত করে বাসগৃহের বিভিন্ন কক্ষে পরিচালিত করা হয়। বাসগৃহ থেকে বিনির্গত অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ুপ্রবাহ নালীপথে অবশেষে সংগ্রাহক আধারে প্রত্যাবর্তন করে। সংগ্রাহক আধারে তা আবার উত্তপ্ত হয়ে পুনরায় বাসগৃহের বিভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করে। সারা দিনব্যাপী যখন রোদ থাকে, তখন বাসগৃহকে এ-ভাবে গরম রাখা যায়। এই সময়ে উত্তপ্ত বায়ু-প্রবাহের এক অংশ সংগ্রাহক থেকে সঞ্চয়ী আধারেও পরিচালিত করা হয়। সঞ্চয়ী আধার থাকে বহু উপলখণ্ডে ভর্তি। উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ ঐ উপলখণ্ডের সংস্পর্শে এসে তাদের উত্তপ্ত করে। এভাবে সমস্ত দিনব্যাপী (অর্থাৎ যতক্ষণ রোদ থাকে) সঞ্চয়ী আধারের উপলখণ্ডগুলি গরম হতে থাকে। রাতের বেলায় যখন সূর্যকিরণের অভাব ঘটে, তখন বায়ুপ্রবাহকে সঞ্চয়ী আধারের মধ্য দিয়ে পরিচালিত করে উত্তপ্ত করা হয় এবং ঐ উত্তপ্ত বায়ু নালীপথে বাসগৃহে প্রবেশ করে তার বিভিন্ন কক্ষকে গরম রাখে। বাসগৃহে থেকে অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু পুনরায় সঞ্চয়ী আধারে প্রত্যাবর্তন করে। এভাবে বায়ু চলাচলের ফলে রাতের বেলাতেও বাসগৃহ গরম থাকে। নালী-পথে চক্রবৎ বায়ুপ্রবাহের পুনঃপুনঃ পরিচালনার জন্যে একটি পাম্প ব্যবহার করতে হয়। সংগ্রাহক ও সঞ্চয়ী আধার দুটি সাধারণতঃ বাসগৃহের ছাদে বসানো থাকে। সংগ্রাহক আধার হচ্ছে ৪ ফুট লম্বা, ২ ফুট চওড়া এবং চার ইঞ্চি গভীর একটি খোলা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র। এর অভ্যন্তরে সমান্তরাল উপর্যুপরি আংশিক কৃষ্ণকায় কাচের পাতের সারি সাজানো থাকে। পাত্রটির মুখ মোটা স্বচ্ছ কাচের পাতে ঢাকা থাকে। সূর্য-কিরণ উপর থেকে পড়ে আভ্যন্তরীণ সারি সারি কাচের পাতগুলিকে উত্তপ্ত করে। কালো রঙের পদার্থমাত্রই তাপ শোষণে বিশেষ উপযোগী। এই কারণে ঐ পাতগুলিকে আংশিক কালো করা হয়। ১নং চিত্রে বিভিন্ন অংশ ও সমগ্র প্রণালীর একটি নক্সা দেখানো হয়েছে।

এভাবে সৌরশক্তি সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে তাকে বাষ্পীয় শক্তিতে পরিণত করা যায়। কারণ, সৌরশক্তিতে উত্তপ্ত বায়ুর সাহায্যে জলকে অনায়াসে বাষ্পে পরিণত করা চলে। এভাবে শৈত্যোৎপাদক যন্ত্রের (Refrigerator) পরি-চালনার জন্যেও সৌরশক্তির ব্যবহার চলে।

সৌরশক্তির (Storage) হিসাবে উপলখণ্ডের পরিবর্তে বহু সল্ট হাইড্রেটের (Salt hydrate) ব্যবহার অধিকতর কার্যকরী হবে আশা করা যায়। বহুজাতীয় লবণের দানায় একাধিক জলের অণু সংশ্লিষ্ট থাকে। এই সব লবণ উত্তাপে গলে তরল হয়। এই গলন-প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট পরিমাণে তাপ শোষণ ঘটে। একে গলনের লীন তাপ (Latent heat of fusion) বলা হয়। অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসব গলিত

লবণ পুনরায় যখন দানার আকারে কঠিনাবস্থায় পরিণত হয়, তখন তার লীনতাপ মুক্ত হয়ে ঐ শীতল বায়ুকে উত্তপ্ত করে। সৌরশক্তির সঞ্চয়নকল্পে ব্যবহৃত এই জাতীয় কয়েকটি লবণের দৃষ্টান্ত হচ্ছে : $CaCl_2 \cdot 6H_2O$; $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ (সোডা) ; $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$.

সালে আমাদের দেশে ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল লেবোরেটরিতে (National Physical Laboratory) উদ্ভাবিত হয়। পরে ব্যবসায়ের জন্যে কারখানায় তৈরি হয় বহুল পরিমাণে। এই উনুনের জন্যে দরকার হয় একটি তাপঅন্তরক (Insulated) ও বায়ুরোধক (Airtight) বাক্স।



১নং চিত্র
সৌরশক্তির সাহায্যে একতলা-বিশিষ্ট বাসগৃহ গরম রাখবার সমগ্র প্রণালীর নক্সা

বাসগৃহের বায়ুতে আর্দ্রতা কমাবার জন্যে ঘরের দেয়ালে কোন প্রকার জলীয় বাষ্পশোষক (Dehydrating agent) পদার্থ অনুপ্রবিষ্ট করা হয়। সৌরশক্তির প্রভাবে ঐ সব ব্যবহৃত পদার্থকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়।

রান্নার জন্যে সৌর উনুনের (Solar Cooker) ব্যবহার এখন এক প্রকার চালু হয়ে গেছে। এই বিষয়ে ভারতবর্ষ হচ্ছে অগ্রণী। এক সহজ ও সুলভ সৌর উনুনের নির্মাণ প্রণালী ১৯৫২

বাক্সটির আভ্যন্তরিক পৃষ্ঠদেশে কালো রঙের ঘন প্রলেপ দেওয়া থাকে এবং মুখে একাধিক স্বচ্ছ কাচের পাতের ঢাক্‌নি থাকে। রান্নার দ্রব্যাদি পাত্রসমেত এই বাক্সে রাখা হয়। বাক্সটি মুক্ত সূর্যালোকে ব্যবহারের উপযোগী। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবতল (Concave) দর্পণের (Mirror) সাহায্যে সূর্যকিরণ ঘনীভূত বা কেন্দ্রীভূত করে বাক্সের উপর নিক্ষেপ করা যায়।

শীতের দিনে জল গরম করবার একটি সহজ

পরীক্ষাতেও ভারতবর্ষের ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল লেবোরেটরির বিজ্ঞানীরা বেশ ভাল ফল পেয়েছেন। আমাদের দেশে ঘরের ছাদ বেশীর ভাগই কংক্রিটের (Concrete) ঢালাই করা। ঢালাইয়ের সময় যদি ওর ভিতর কয়েকটি জল চলাচলের নল (Pipe) বসানো হয় এবং ছাদটিতে যদি আলকাতরা বা পিচ ও বালির আস্তরে কালো করে দেওয়া যায়, তবে দিনের বেলায় ছাদটি যখন রোদে উত্তপ্ত হয়, তখন ওর আভ্যন্তরিক নলের ভিতর জল পরিচালিত করলে ঐ জল যথেষ্ট পরিমাণে উত্তপ্ত হতে পারে।

সৌরশক্তির সঞ্চয়ন ও ব্যবস্থাকল্পে ইজ্‌রায়েলি বিজ্ঞানীরা এক অভিনব কৌশলের পরীক্ষা করে বিশেষ সুফল পেয়েছেন। এই ব্যবস্থার নাম দিয়েছেন তাঁরা সৌর জলাশয় (Slar pond)। এর জন্যে দরকার হয় বৃহদাকার একটি জলাশয় খনন—২৫ মিটার দৈর্ঘ্য, ২৫ মিটার প্রস্থ এবং ২মিটার গভীর। জলাশয়টির তলদেশ ও চারদিকের পার্শ্বদেশ সিমেন্ট দিয়ে আস্তর করে তলদেশে কালো রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়। এই জলাশয়ের নিম্নার্ধ ঘন লবণ জলে এবং উপরার্ধ নির্মল জলে ভর্তি থাকে। সূর্যকিরণে জল যখন গরম হতে থাকে, তখন দেখা যায় যে, তলদেশে বা নিম্নার্ধে জলের তাপমাত্রা জলাশয়ের উপরার্ধে নির্মল জলের তাপমাত্রা থেকে অনেক বেড়ে যায়। লবণ জলের ঘনত্বের আধিক্যের দরুণ গরম লবণ জল উর্ধ্বে পরিবাহিত হয়ে বাতাসের সংস্পর্শে তার তাপ হারাতে পারে না। এই উপায়ে তলদেশের জলের উষ্ণতা প্রায় জলের স্ফুটনাঙ্কের (১০০° সেন্টিগ্রেড) কাছাকাছি অবধি উঠতে পারে। তাপবিনিময় পদ্ধতির কৌশল প্রয়োগে লবণ জল থেকে তাপ শোষণ করে তাকে বাষ্পীয় বা বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করা যায়।

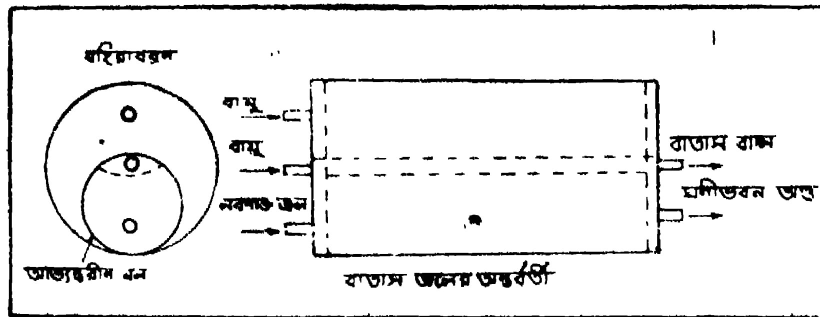
বয়লারে (Boiler) জল ফুটিয়ে সৌরশক্তিকে বাষ্পীয় শক্তিতে রূপান্তরিত করে কারখানায় যন্ত্রপাতি চালাবার ব্যবস্থাও উদ্ভাবিত হয়েছে। এই জাতীয় সৌরযন্ত্রের (Solar machine) বহু পেটেন্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে দেখা যায়। এসব যন্ত্রে সৌরশক্তিকে কেন্দ্রীভূত (Focus) করে বয়লারের গায়ে ফেলা হয়। এর জন্যে বেলনাকার (Cylindric) অবতল (Concave) অধিবৃত্তরূপী (Parabolic) দর্পণের আবশ্যক হয়। উজ্জ্বল মসৃণ অ্যালুমিনিয়াম পাতেই দর্পণের কাজ চলে। দর্পণের ব্যাস হচ্ছে ১০—১১ ফুট। দর্পণ থেকে প্রতিফলিত সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত (Focus) হয়ে নির্বাত অন্তরকে (Vacuum jacketted) ঢাকা একটি পাইরেক্স কাচের নলের উপর পড়ে। ঐ নলটি উচ্চ স্ফুটনাঙ্কের একটি কালো রঙের তরল পদার্থে ভর্তি থাকে। দর্পণটি স্বচালিত (Automatic) কৌশলে পাতিত (Incident) সূর্যরশ্মির সঙ্গে সতত সমকোণ রক্ষা করে ঘুরতে পারে। সৌরশক্তিতে উত্তপ্ত তরল পদার্থটি নলাকার তাপ বিনিময়কারী (Heat Exchanger) বিধানের সাহায্যে শক্ত ইস্পাতের বয়লারের জলের মধ্যে চক্রপথে প্রবাহিত হয়।

সৌরশক্তির প্রভাবে লবণাক্ত সমুদ্রজলের বিশোধন বা পাতনের পরীক্ষা চলেছে অনেক দেশে। এভাবে নির্মল পানীয় জলের একটি সহজ প্রস্তুত-প্রণালী এখানে বর্ণনা করা হলো।

৪ ইঞ্চি ব্যাসের একটি প্লাষ্টিকের চোঙ্গা কালো রংকরা লবণজলে বেশীর ভাগ ভর্তি করে আর একটি অপেক্ষাকৃত বড় (ব্যাস ৬½ ইঞ্চি) ঐ জাতীয় চোঙ্গার মধ্যে বসানো হয়। বড় চোঙ্গাটিকে বাতাসের চাপে ফুলিয়ে রাখা হয়। দুটি চোঙ্গার উভয় প্রান্তে বৃত্তাকার কাঠের ঢাকনি থাকে। একটি কাঠের টেবিলের উপর তাদের লম্বা করে রাখা হয়। চোঙ্গাদুটিসহ টেবিলখানি রোদে রেখে অন্তর্বর্তী চোঙ্গার লবণজলের উপর

বায়ুপ্রবাহ পরিচালিত করলে ঐ বায়ু উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পে সম্পৃক্ত (Saturated) হয়ে বেরিয়ে আসে এবং প্রবেশমুখী লবণজলের সংস্পর্শে শীতল হয়ে ঘনীভবন ভাণ্ডে প্রবেশ করে। ঐ ভাণ্ডে জলীয় বাষ্প তরল জলরূপে ঘনীভূত হয়ে জমা হয় (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

এথেনবাসীরাও ভেষ্টা (Vesta) দেবীর পবিত্র বহ্নিশিখা এভাবে প্রজ্বলিত করতো। পরবর্তী-কালে ফ্লোরেন্স (Florence) সহরে ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে এভারনি (Averani) ও টারগিয়নি (Targioni) একটি বড় লেন্সের সাহায্যে সূর্যকিরণ কেন্দ্রীভূত করে এক খণ্ড হীরক পুড়িয়ে বিনষ্ট করেন।



২নং চিত্র
সৌরশক্তি সদ্ব্যবহারের প্লাস্টিক আধারের সমাবেশ

সূর্যকিরণকে অবতল দর্পণের বা উত্তল (Convex) লেন্স (Lens)-এর সাহায্যে কেন্দ্রীভূত করে স্বল্পায়তন ক্ষেত্রে আবদ্ধ করলে ৩,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের উষ্ণতার সৃষ্টি করা যেতে পারে। সৌর চুল্লী (Solar furnace) নির্মাণের জন্যে এই উপায় অবলম্বন করা হয়।

প্রাচীন কালে (২১৫ খৃঃ পূঃ) গ্রীক বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস (Archimedes) একটি বৃহৎ ষড়ভুজাকৃতি দর্পণের সাহায্যে সূর্যকিরণ কেন্দ্রীভূত করে সাইরাকিউস (Syracuse) সহর বেষ্টনে রত রোমের রণতরীসমূহকে পুড়িয়ে ধ্বংস করেন— এরূপ কিংবদন্তী আছে। কথিত আছে, খৃঃ পরবর্তী ৫১৪ সালে প্রোকাস (Procus) এভাবে পিতলের পাত্ থেকে নির্মিত দর্পণ ব্যবহার করে কনষ্টান্টিনোপল (Constantinople) অবরোধে রত রণতরীগুলিকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। মসৃণ সোনার পাত থেকে প্রতিফলিত ও কেন্দ্রীভূত সূর্যকিরণের সাহায্যে পুরাকালে গ্রীসদেশে

বর্তমানে সৌরচুল্লী নির্মাণের জন্যে সুদূরপ্রসারী সন্ধানী আলোকে (Search-light) ব্যবহৃত দর্পণের মত বৃহদাকার একাধিক দর্পণের সমাবেশ করা হয়। এসব দর্পণের ব্যাস সাধারণতঃ ২-৩ মিটার এবং তাদের কাচের পাতের পশ্চাতে রূপার আস্তরণ দেওয়া থাকে। কখনো পালিশ অ্যালুমিনিয়াম পাত্ও দর্পণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। স্বচালিত যান্ত্রিক কৌশলে এসব দর্পণ সূর্যকিরণের অভিমুখে ঘুরতে থাকে।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, সূর্যালোকে গাছের পাতায় সবুজ কণিকা ক্লোরোফিলের সাহায্যে বাতাসের অঙ্গারায় বা কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) এবং জলীয় বাষ্প (H_2O) থেকে গাছের উপাদান বা জীবের খাদ্য সেলুলোজ (Cellulose), শ্বেতসার ও শর্করার সৃষ্টি হয়। এই রাসায়নিক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে সৌরশক্তির সঞ্চয়ন ও ব্যবহারের চেষ্টা চলছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্য কয়েকটি দেশে।

$CO_2 + H_2O$ + Chlorophyll + light
$= (H_2CO) + O_2$ + Chlorophyll (H_2CO)
= সেলুলোজ—6 বা শর্করার একক

ক্লোরেলা (Chlorella) নামক এক জাতীয় উদ্ভিজ্জাণু (শ্যাওলা জাতীয় জলজ উদ্ভিদ) সূর্যালোকে দ্রুতবেগে বেড়ে যায়। ২৪ ঘণ্টায় এসব জীবাণুর এমন বংশবৃদ্ধি হয় যে, এদের পরিমাণ যায় সাতগুণ বেড়ে। বিস্তৃত জলাভূমিতে ক্লোরেলার চাষ করে সূর্যকিরণ সঞ্চয়নের চেষ্টা চলছে বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ক্লোরেলা একটি প্রোটিন ও স্নেহবহুল পদার্থ। মানুষের খাদ্য হিসাবে একটি মূল্যবান পদার্থরূপে গণ্য হতে পারে। এভাবে সৌরশক্তির সঞ্চয়ন মানুষের খাদ্যসমস্যার সমাধানে বিশেষ কার্যকরী হবার সম্ভাবনা আছে।

তাপশক্তি থেকে সোজাসুজি বৈদ্যুতিক শক্তির সৃষ্টির উপায় বিজ্ঞানের একটি পরিচিত পদ্ধতি। দুটি বিভিন্ন ধাতু বা ধাতু-সঙ্করের তারের দুই প্রান্ত জুড়ে দিয়ে যদি ঐ সংযুক্ত প্রান্ত দুটি বিভিন্ন উষ্ণতায় উত্তপ্ত করা হয় তবে ঐ প্রান্ত দুটিতে তড়িচ্চালক শক্তির (Electromotive force) তারতম্য ঘটে। ফলে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তড়িৎপ্রবাহ পরিচালিত হতে পারে। এই উপায়ে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তিকে তাপজ-বিদ্যুৎ (Thermoelectricity) বলা হয়। তাপের পরিবর্তে সৌরশক্তির ব্যবহারেও অনুরূপ ফল পাওয়া যায়; অর্থাৎ ধাতুদ্বয়ের সংযুক্ত প্রান্ত দুটির একটিকে যদি কেন্দ্রীভূত সূর্যকিরণে উত্তপ্ত করা যায়। এভাবে ধাতুদ্বয়ের একদিকের বহু সংযুক্ত প্রান্তকে এক সঙ্গে উত্তপ্ত করলে এবং অন্য দিকের প্রান্তসমূহকে অনুত্তপ্ত রাখলে দু-ধারের সংযুক্ত প্রান্তসমূহের মধ্যে বিদ্যুচ্চালক শক্তির তারতম্য বহুগুণে বাড়াতে পারা যায়। ফলে উভয় প্রান্তের মধ্যে তড়িৎপ্রবাহের তীব্রতাও যায় বেড়ে।

আলোকশক্তিকে সোজাসুজি বা সাক্ষাৎ ভাবে বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করবার বহু পরীক্ষা হয়েছে। এই প্রকারে উৎপাদিত বৈদ্যুতিক শক্তির কোষকে (Cell) বলা যায় আলোকসম্ভূত বা তেজজ বিদ্যুৎ-কোষ (Photo-voltaic cell)। এই জাতীয় বিদ্যুৎ-কোষে এক প্রকারের দুটি তড়িৎ-দ্বার (Electrode) কোন নিষ্ক্রিয় মাধ্যমের (Inert electrolyte) মধ্যে নিমজ্জিত করে রাখা হয়। কপার অক্সাইডের (Copper oxide) সূক্ষ্ম আস্তরণ (Film) দেওয়া তামার পাত এরূপ তড়িৎ-দ্বারের জন্যে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। এই জাতীয় বিদ্যুৎ-কোষে একটি তড়িৎ-দ্বারকে আলোকিত করা হয় এবং অন্যটি থাকে অন্ধকারে। এই অবস্থায় উভয় তড়িৎ-দ্বারকে সরু তামার তার দিয়ে সংযুক্ত করলে ওদের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলতে থাকে। সম্প্রতি দেখা গেছে যে, দুটি বিভিন্ন মন্দ বিদ্যুৎপরিচালক (Semi-conductor) পদার্থের পাত পাশাপাশি পরস্পরের সংস্পর্শে রেখে আলোকিত করলে বিদ্যুৎশক্তির উৎপত্তি হয়। জার্মেনিয়াম (Germanium) এবং সিলেনিয়ামের (Selenium) বহুল ব্যবহার হচ্ছে এই জাতীয় বিদ্যুৎ-কোষ নির্মাণের জন্যে। সৌরশক্তিকে এভাবে সোজাসুজি বিদ্যুৎ শক্তিতে পরিণত করায় এ হচ্ছে সহজ ও শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু এটা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। কারণ এর জন্যে দরকার হয় অতি বিশুদ্ধ মন্দ পরিচালক পদার্থের—সিলেনিয়াম ও জার্মেনিয়াম ধাতুর। রেডিও ও গ্রহ-পরিক্রমার যানে (Satellite) এই জাতীয় বিদ্যুৎ-কোষের ব্যবহার হচ্ছে। এসব বিদ্যুৎ-কোষ আয়তনে খুব ছোট হয়। বেল টেলিফোন কোম্পানীর (Bell Telephone Company) বোরন-সিলিকন (Boron-Silicon) দিয়ে নির্মিত তেজজ-বিদ্যুৎ-কোষ সবচেয়ে বেশি কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এই জাতীয় বিদ্যুৎ-কোষ

আয়তনে অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলে তাথেকে খুব কম শক্তিরই বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়।

আলোক-তরঙ্গ শোষণের ফলে পদার্থবিশেষের জলীয় দ্রবে যে সব রাসায়নিক প্রক্রিয়া বা বিশ্লেষণ ঘটে, তাকে আশ্রয় করে সৌরশক্তির সঞ্চয়ন ও ব্যবহারের অনেক পরীক্ষা চলেছে। এক্ষেত্রে সৌরশক্তি প্রথমে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ রাসায়নিক শক্তির বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণতি ঘটে। এই জাতীয় বিদ্যুৎ-কোষ পূর্বোক্ত বিদ্যুৎ-কোষের মত তেজস্ক বিদ্যুৎ-কোষ হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। এই কারণে পূর্বোক্ত বিদ্যুৎ-কোষকে বলা হয় ফটোভলটেইক সেল (Photovoltaic cell) এবং শেষোক্তটিকে বলা হয় ফটোগ্যালভেনিক সেল (Photogalvanic cell)। এই প্রকারের বিদ্যুৎ-কোষের একটি দৃষ্টান্ত দিলে পার্থক্যটি সহজে বোঝা যাবে। ফেরাস ক্লোরাইড (Ferrous chloride) এবং থাইয়োনিন (Thionine—গাঢ় লাল রঙের একটি জৈব পদার্থ) জলে গুলে যদি সূর্যালোকে রাখা হয়, তবে তাদের মধ্যে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে, তাতে থাইয়োনিন অণুগুলি বিজারিত (Reduced) হয়ে বর্ণহীন লিউকোথাইয়োনিন (Leucothionine) অণুতে পরিণত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ফেরাস ক্লোরাইড অক্সিডাইস্‌ড্ (Oxidized) হয়ে বা ইলেকট্রন বর্জন করে ফেরাস ক্লোরাইড হয়ে যায়; অর্থাৎ সূর্যকিরণে আলোকিত হবার আগে যে জলীয় দ্রব ছিল গাঢ় লাল, তা সূর্যালোকে বর্ণহীন হয়ে যায়। কিন্তু ২।১ সেকেণ্ডের মধ্যে দ্রবটি আবার লাল হয়ে ওঠে। কারণ প্রথম প্রক্রিয়ায় যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটেছিল, অনতিবিলম্বে আবার তার বিপরীত পরিবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ঐ রঙীন দ্রবে যদি দুটি তামার তড়িৎ-দ্বার ডুবিয়ে রেখে তাদের বহিঃপ্রান্ত দুটি একটি সরু তামার তার দিয়ে জুড়ে ঐ দ্রবকে সূর্যালোকে রাখা যায়, তাহলে দেখা যায় যে, বাইরের তারের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে একটি বিদ্যুৎপ্রবাহ চলতে থাকে। এই অবস্থায় দ্রবটি বর্ণহীন থাকে। কারণ, সৌরশক্তি শোষণের ফলে ঐ জলীয় দ্রবের উপাদানের মধ্যে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে, তার বিপরীত প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবার আর সুযোগ থাকে না।

উপসংহারে বলা যায় যে, বিস্তৃতভাবে সৌর শক্তির সঞ্চয়ন ও ব্যবহার অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। এই কারণে সৌরশক্তির ব্যবহার এখনো কার্যকরী হয় নি। তবে যে সব অঞ্চলে কয়লা, তেল বা জলপ্রবাহের শক্তি দুর্লভ অথচ সৌরশক্তির প্রাচুর্য, সে সব জায়গায় সৌরশক্তির সঞ্চয়ন ও ব্যবহার কার্যকরী হতে পারে। ইজরাইলে এর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ভারতবর্ষের বহু স্থানে অনুর্বর মরুপ্রান্তর রয়েছে, সেখানে সৌরশক্তি অপ্রতুল নয়, অথচ কয়লা ও তেল থেকে বা অন্যবিধ উপায়ে শক্তি উৎপাদনের সুবিধা নেই, এসব জায়গায় সৌরশক্তির সঞ্চয়ন ও ব্যবহারের প্রচেষ্টা বাঞ্ছনীয় মনে করি।

ভারতে শণের চাষ

বলাইচাঁদ কুণ্ডু

ভারতে তুলা ও পাটের চাষ সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে হলেও আরো অনেক রকম তন্তু বা আঁশ উৎপাদনকারী গাছ, যথা—মেস্তা, শণ, সিসল, র‍্যামিরও চাষ অল্পাধিক পরিমাণে অনেক জায়গাতে হয়। শণ বা শণ-পাট (Crotalaria junced) নামে অতসী ফুল জাতীয় এক প্রকার গাছের ছাল থেকে উৎপাদন করা হয়। এর ইংরেজী নাম Sunn hemp। ইংরেজী hemp শব্দটি নানাবিধ তন্তু সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়; যেমন—সিসলকে Sisal hemp। Musa textilis বা কলা জাতীয় গাছের পাতার গোড়ার থেকে সাধারণতঃ ফিলিপাইনে প্রস্তুত তন্তুকে Manila hemp, Hibiscus বা জবা জাতীয় গাছের ছাল থেকে প্রস্তুত মেস্তাপাটকে Deccan, amberi hemp ও শণকে Sunn hemp, Bomby hemp,' Brown hemp ও Banaras hemp বলা হয়। প্রকৃত hemp সাধারণতঃ ইউরোপীয় দেশসমূহে জন্মে ও Cannabis sativa অর্থাৎ গাঁজা গাছের ডাঁটার ছাল থেকে প্রস্তুত হয়।

শণের চাষ বহুকাল থেকে ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানে হতে দেখা যায়। ভারতে বর্তমানে যত প্রকার তন্তু উৎপাদনকারী গাছের চাষ হয়, তন্মধ্যে শণই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রয়েল (Royl) ভারতবর্ষের বিভিন্ন তন্তু উৎপাদনকারী গাছ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা ও আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, ৪০০ শত বছর আগের বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থে শণ-পাটের বহুল উল্লেখ আছে। মনুর স্মৃতিশাস্ত্রে অনুশাসন ছিল যে, ক্ষত্রিয় বা রাজপুতদের উপবীত শণের আঁশ থেকে প্রস্তুত করতে হবে। ওয়াট (Watt) তাঁর Economic products of India ও Commercial products of India নামক বহুল প্রচারিত গ্রন্থদ্বয়ে এই সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে রচিত আইন-ই-আকবরী নামক গ্রন্থে দুই প্রকার তন্তুজাতীয় উদ্ভিদের উল্লেখ আছে। একপ্রকার—যেগুলির ফুল তুলার ফুলের মত, আর একপ্রকার যেগুলির ফুল উজ্জ্বল হলুদে রঙের হয়। প্রথমটি নিঃসন্দেহে মেস্তা বা মেস্তাজাতীয় গাছ এবং অপরটি শণ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। উইসেট (Wisset) তাঁর ১৮০৮ সালে প্রকাশিত Treatise on hemp নামক গ্রন্থে পৃথিবীর সকল প্রকার hemp জাতীয় উদ্ভিদের সব রকম বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থে তিনি শণের উৎকর্ষ, প্রয়োজনীয়তা ও বহুবিধ ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন, কিন্তু তিনি পাট সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই লেখেন নি, শুধু মাত্র সংক্ষিপ্তভাবে এর উল্লেখ করেছেন। ঊনবিংশ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে রক্সবার্গ (Roxburgh) যখন কলকাতার কোম্পানীর বাগানের (বর্তমানের Indian Botanic Gardens) অধিকর্তা ছিলেন, তখন শণ-পাট সম্বন্ধে—নানাবিধ গবেষণা করেছিলেন। ইউরোপীয় hemp-এর আঁশ থেকে শণ যে নিকৃষ্ট নয়, তা তিনি প্রমাণ করেছিলেন। ১৬৪ বছর আগে প্রকাশিত তাঁর "Observations on the substitute fibres for hemps and flex"

নামক গ্রন্থে এসম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন।

শণগাছ

এরা Pepidio naceae বর্গের অন্তর্গত মটরজাতীয় গাছ। আমাদের খুব পরিচিত অতসী গাছ, যাতে উজ্জ্বল হলুদে রঙের ফুল হয়, শণগাছ তার সমজাতীয়। গাছগুলি লম্বায় প্রায় ১০ সেণ্টিমিটার থেকে ২৫ সেণ্টিমিটার পর্যন্ত হয়। এদের মূলও বেশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং শাখা মূলগুলিতে বহুল পরিমাণে ছোট ছোট প্রায় গোলাকার নডিউল থাকে। এই সব নডিউলে একপ্রকার ব্যাক্‌টিরিয়া থাকে, যারা বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন নিয়ে মাটিতে স্থাপন (fix) করে। এর ফলে জমির উর্বরতা শক্তি বেশ বাড়ে।

গাছের ডাঁটাগুলি সরলভাবে উপরে ওঠে এবং শণ চাষ করলে শাখা-প্রশাখা তেমন হয় না। পাতাগুলি সরু ও তাদের উপর রেশমের মত লোম থাকে। এক একটি ফুলের গুচ্ছে ১০ থেকে ২০টি ফুল হয়। ফুলগুলি উজ্জ্বল হলুদে রঙের এবং দেখতে অনেকটা অতসী ফুলের মত। ফলের শুঁটিগুলি মটরশুঁটির মত, তবে কিছুটা গোলাকার ও লম্বায় ৩ থেকে ৬ সেণ্টিমিটার ও চওড়ায় প্রায় এক সেণ্টি-মিটারের মত। ফলের মধ্যে ১০ থেকে ২০টি বীজ থাকে, ফল পাকলে শুঁটির বীজগুলি আল্‌গা হয়ে খুলে যায় ও নাড়া দিলে ঝুমঝুমির মত শব্দ হয়।

শণের চাষ

ভারতে প্রায় সর্বত্র শণের চাষ হয়। তবে বিভিন্ন স্থানের জমি ও আবহাওয়ার পার্থক্য আছে। প্রায় সব রকম জমিতে শণ চাষ করা যেতে পারে। তবে জলাজমিতে সম্ভব নয়। পাট বা অন্য শস্যের চাষের জমিতে যেমন অনেক চাষ দিয়ে মাটির দানাগুলি খুব সূক্ষ্ম করা আবশ্যক, শণ চাষের জন্যে সে রকম করার দরকার হয় না। বার দুই লাঙ্গল দিয়ে সেই জমিতেই সাধারণতঃ বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সাধারণতঃ এটা খরিপ শস্য হিসাবে জন্মানো হয়। বাংলা, বিহার ও মহারাষ্ট্রের কোন কোন স্থানে এগুলি রবিশস্য বা শীতকালীন শস্য হিসাবেও জন্মানো হয়। অক্টোবর বা নভেম্বর মাসে লাগিয়ে ফেব্রুয়ারী মাসে কাটা হয়।

একর প্রতি ৩০ থেকে ৪০ কিলোগ্র্যাম বীজের আবশ্যক হয়। বাংলা ও উড়িষ্যার কোন কোন অঞ্চলের—কৃষকগণ একর প্রতি প্রায় ৬০ কিলোগ্র্যাম বীজ লাগান। আবার মাদ্রাজের কোন কোন স্থানের কৃষকেরা প্রায় ১২।১৩ কিলো-গ্র্যাম বীজ বপন করেন। মধ্যপ্রদেশের কৃষি বিভাগ কয়েক বছর ধরে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, উৎকৃষ্ট তন্তু পেতে হলে একর প্রতি ৪০ কিলোগ্র্যাম বীজের আবশ্যক। বর্তমান লেখক বারাকপুর পাট কৃষি গবেষণাগারে কয়েক বছর ধরে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, একর প্রতি ৩০ কিলোগ্র্যাম বীজই যথেষ্ট এবং একর প্রতি ৩০ ও ৪০ কিলোগ্র্যাম বীজ লাগালে তন্তু উৎপাদনের বিশেষ পার্থক্য হয় না।

একবার লাগাবার পর চারাগাছগুলির আর কোন যত্ন নেওয়া হয় না। সাধারণতঃ শণ চাষের জন্যে কোন সেচ দেওয়া হয় না। তবে সেচের ব্যবস্থা থাকলে গাছগুলি অপেক্ষাকৃত বড় হয় ও তন্তু উৎপাদন কিছু বাড়ে।

শণ কাটবার সময়

উৎকৃষ্ট তন্তু বা আঁশ পেতে হলে ঠিক উপযুক্ত সময়ে গাছগুলি কাটতে হবে। কাটবার উপযুক্ত সময় সম্বন্ধে ভারতের বিভিন্ন স্থানে নানারকম মত আছে। মাদ্রাজে গাছগুলিতে

ফুল ধরবার পর শণ গাছ কাটা হয়। উত্তর প্রদেশে ও মধ্যপ্রদেশ গাছে যখন শুঁটি ধরে, বিহারে শুঁটিগুলি পরিণত হলে এবং মধ্য প্রদেশের কোন কোন স্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও বাংলা দেশে শুঁটিগুলি সম্পূর্ণ পাকবার পর শণ কাটা হয়।

মধ্যপ্রদেশের কৃষি বিভাগে কয়েক বছর ধরে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, যখন গাছে শুঁটি ধরেছে, সেই সময় কাটলে তন্তু খুবই ভাল হয়। ফল পাকবার পর যে আঁশ পাওয়া যায়, তাথেকে এই অবস্থায় কাটা গাছ থেকে পাওয়া আঁশের রং খুব ভাল ও উজ্জ্বল এবং দৃঢ় হয়। বর্তমান লেখক পাট কৃষি গবেষণাগারে যে পরীক্ষা করেছিলেন, তাতে তিনি দেখেছিলেন যে, ফলগুলি সম্পূর্ণ পাকলে সেই অবস্থায় গাছগুলি কাটবার পর যে তন্তু পাওয়া যায়, তা শুঁটিধরা অবস্থায় বা সম্পূর্ণ ফুল ফোটা অবস্থায় গাছ কাটবার পরে যে আঁশ পাওয়া যায়, তাথেকে খারাপ হয় না। ফল পাকলে বীজ বিক্রয় করে চাষীরা কিছু আয় করতে পারে। এজন্যে তিনি এই সব গাছ কাটা অনুমোদন করেছিলেন।

শণ গাছের ডাঁটাগুলি মাটির একেবারে কাছে কাস্তে দিয়ে কাটতে হয়। তারপর ২।৩ দিন মাঠে ফেলে রাখলে পাতাগুলি শুকিয়ে ঝরে পড়ে যায়। তখন অনেকগুলি ডাঁটা এক সঙ্গে আঁটি বেঁধে নিকটবর্তী কোন জলা বা পুকুরে পচাবার জন্যে ভিজিয়ে দেওয়া হয়। আঁটিগুলি যাতে জলের নীচে থাকে, সে জন্যে সেগুলির উপর মাটির চাপ্‌ড়া, ইট, পাথর বা কাঠ চাপা দেওয়া হয়।

আঁশ ছাড়াবার প্রক্রিয়া

পাটের মত শণের ডাঁটাগুলির ছাল থেকেই আঁশ পাওয়া যায়। পাটের ছাল বেশ পুরু হয়; অর্থাৎ আঁশগুলি অনেক স্তরে আবৃত থাকে। শণগাছের ছালে আঁশ সাধারণতঃ একটি স্তরে থাকে ও তার নীচে একটি পাত্‌লা স্তর থাকে। এজন্যে এর আঁশ ছাড়ানো পাটের আঁশ ছাড়াবার পদ্ধতির মত হলেও খুব সাবধানে আঁশ ছাড়াতে হয়। ছাড়াবার পদ্ধতি প্রায় একই, তবে বিভিন্ন দেশের প্রথার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে সাধারণতঃ তিন থেকে পাঁচ দিন পরেই ডাঁটাগুলি পচে গিয়ে আঁশ ছাড়াবার উপযুক্ত হয়। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে যখন বায়ুমণ্ডলের তাপ কমে যায়, তখন বেশী সময়, সাধারণতঃ ১২ থেকে ১৫ দিন লাগে। কাদা জলে ডাঁটা ভিজালে আঁশের রং খারাপ হয়। স্বল্পস্রোতা খাল বা বিল অথবা গভীর পুষ্করিণীতে যেখানে পরিষ্কার জল আছে, সেখানে ভিজালে আঁশের রং খুবই উজ্জ্বল হয় এবং গুণের দিক দিয়ে আঁশ খুব উৎকৃষ্ট হয়।

ছাড়াবার পর আঁশগুলি ভাল করে ধুয়ে শুকানো হয়। অন্ধ্রপ্রদেশ ছাড়া ভারতের প্রায় সব দেশেই শুষ্ক আঁশগুলি পাকিয়ে ছোট ছোট বোঝাতে বাঁধা হয়। তারপর সেগুলি বাজারে বিক্রয়ের জন্যে পাঠানো হয়। অন্ধ্র-প্রদেশের প্রায় সমস্ত আঁশগুলি না পাকিয়ে এমনি বোঝা বাঁধা হয়।

রোগ ও কীট-পতঙ্গের আক্রমণ

কয়েক প্রকার ছত্রাক ও ভাইরাসের আক্রমণে শণ গাছ সময় সময় খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফুল-ভিন

রকম কীটের আক্রমণেও শস্য নষ্ট হয়। ছত্রাকজনিত রোগ ও কীটের আক্রমণ প্রতিরোধ করা কিছু সম্ভব, কিন্তু ভাইরাসজনিত রোগে গাছের পাতা কুঁকড়ে যায়, গাছ ছাটাই হয় ও শুকিয়ে যায়। এই রোগ হলে প্রতিকার প্রায় অসম্ভব এবং সে জন্যে শস্যহানি হয়।

উৎপাদন ভারতের প্রধানতঃ ১৯টি প্রদেশে প্রায় ৫০০,০০০ একর জমিতে শণ চাষ হয় এবং প্রায় ৭৭,০০০ টন তন্তু উৎপাদিত হয়। শণের উৎপাদনের হার খুবই কম (একর প্রতি সাধারণতঃ ১৭০ কিলোগ্র্যাম আঁশ পাওয়া যায়)। মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশে কোন কোন স্থানে প্রতি একরে ৩৫০ কিলোগ্র্যাম পর্যন্ত আঁশ উৎপন্ন হয়।

উন্নত জাতের বীজ

অনেক দিন আগে উত্তর প্রদেশের কৃষি বিভাগে K12 নামে একরকম উন্নত জাতের বীজ উৎপন্ন হয়েছে। এই বীজ থেকে উৎপাদিত গাছ স্থানীয় বা দেশীয় বীজ থেকে উৎপাদিত গাছ থেকে অনেক ভাল হয় ও এদের রোগ ও কীটের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার কিছু ক্ষমতা আছে। এদের ফলনও অনেক ভাল হয়। এই বীজ উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশের চাষীরা খুবই ব্যবহার করেন। লেখক ও তাঁর সহকারীগণ পাট কৃষি গবেষণাগারে কয়েক বছর ধরে গবেষণা করে চারটি উন্নত ধরণের বীজ ST42, ST55, ST112 ও ST95 উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, প্রথম তিনটি এদেশের বীজ থেকে নির্বাচন করে। কিন্তু ST95 ফরমোজা থেকে আনীত বীজ থেকে নির্বাচন করে উৎপাদন করা হয়েছিল। উত্তর প্রদেশে বিভিন্ন স্থানে এগুলি কয়েক বছর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এগুলির কোন কোনটা K12-এর সমান ফলন দেয় এবং কোন কোন স্থানে K12 অপেক্ষা বেশী ফলন দিয়েছে। এদের কোন কোনটার রোগ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা K12 অপেক্ষাও বেশী।

কেন্দ্রীয় পাট গবেষণাগারের অধিকর্তা থাকাকালীন লেখক শণ সম্বন্ধে আরো অধিক গবেষণা আবশ্যক মনে করে একটি পরিকল্পনা করেছিলেন। সুখের বিষয় ভারত সরকার সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড় নামক স্থানে কেন্দ্রীয় পাট গবেষণাগারের অধীনে শণের উৎকর্ষ সাধনের জন্যে একটি কৃষি গবেষণাগার স্থাপন করেছেন। এখানে শণ-পাট সম্পর্কীয় সকল প্রকার গবেষণা চলছে।

শণের ব্যবহার

শণের আঁশ থেকে প্রধানতঃ বিবিধ প্রকারের রজ্জু বা মোটা সুতা প্রস্তুত হয়। দেশের উৎপন্ন সমগ্র তন্তুর প্রায় ১০ শতাংশ এই সব কাজের জন্যে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া সকল প্রকার মাছ ধরবার জালের সুতা তৈরির জন্যে শণের চাহিদা খুব বেশী। কার্পেট তৈরির জন্যে অল্প কিছু শণ পশমের সঙ্গে মিশিয়ে সুতা প্রস্তুত করা হয়। উচ্চ গুণসম্পন্ন কাগজ, যেমন—ব্যাঙ্ক নোটের কাগজ, সিগারেট তৈরির কাগজ ইত্যাদি শণ থেকেই তৈরি হয়। কলকাতার নিকটবর্তী একটি

কারখানাতে শণ ও শণের তৈরি পুরনো দড়ি থেকে আজকাল প্রচুর পরিমাণে এই কাগজ তৈরি হচ্ছে। শণ ইংল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও অন্যান্ত কয়েকটি ইউরোপীয় দেশে রপ্তানী হয়। সেখানে এটা প্রকৃত hemp অর্থাৎ Cannebis sation থেকে তৈরি আঁশের পরিবর্তে নানাবিধ দ্রব্য, যথা—ত্রেরপল, কম্বল, কার্পেট, হোস পাইপ, জুতা ও চপ্পলের সোলিং, সমুদ্রগামী জাহাজের জন্যে মোটা দড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হচ্ছে। পাট থেকে তৈরি দড়ি লোনাজলে ব্যবহার করা যায় না। ভারতীয় শণ বা ইউরোপীয় হেম্প থেকে প্রস্তুত দড়ি লোনাজলে সহজে নষ্ট হয় না। দেখা গেছে, ভারতের শণ থেকে তৈরি দড়ি ইউরোপীয় ও রুশ দেশের হেম্প থেকে প্রস্তুত দড়ি অপেক্ষা লোনা জলে বেশী দিন স্থায়ী হয়। অবশ্য এসব কাজে সিসল ও ম্যানিলা হেম্প আরও বেশী উপযোগী।

আঁশ ছাড়াবার পর যে কাঠি থাকে, সেগুলি সাধারণতঃ কৃষকগণ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করেন। কখন কখন চালাঘর ও ছাতের কাজেও লাগায়। কেন্দ্রীয় পাট গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এই কাঠি থেকে যে মণ্ড (Pulp) তৈরি হয়, তাথেকে ভাল কাগজ প্রস্তুত হতে পারে।

সবুজ সার হিসাবে শণের চাষ ভারতের প্রায় সর্বত্র হয়। শস্য চাষ করবার প্রায় মাস দুই আগে ঘন করে শণ বুনে দিয়ে পরে গাছ-গুলি যখন প্রায় এক বা দু-হাতের মত লম্বা হয়, তখন সেগুলি কেটে লাঙল দিয়ে জমিতে মিশিয়ে দিলে জমির উর্বরতা শক্তি অনেক বাড়ে।

গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবেও শণের ব্যবহার খুবই হয়। কাঁচা অবস্থায় অথবা গাছগুলি কেটে শুকিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

পরিভাষা

জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী

একদা প্রাণিবিদ্যা বিষয়ক বাংলা পরিভাষা নিয়ে কিছু মাথা ঘামিয়েছিলাম। ডক্টর সত্য-চরণ লাহা সম্পাদিত 'প্রকৃতি' পত্রিকার অকাল মৃত্যু হওয়াতে দেড়-শতাধিক শব্দের আলোচনার পর তা বন্ধ হয়ে যায়। সে সময় বাংলা পরি-ভাষার একটি গ্রন্থপঞ্জী (তালিকা) 'প্রকৃতি'তে প্রকাশ করেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, বাংলা পরিভাষা সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রকাশিত তালিকাসমূহ অবহিত হয়ে লেখকদের নতুন রচনায় প্রবৃত্ত করা। কোন উদ্দেশ্যই সফল হয় নি। সকলেরই স্ব স্ব স্বতন্ত্র মত। এমন কি, সমিতি করে যে সকল শব্দ প্রচলনের ব্যবস্থা হয়েছিল, তাও চলে নি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা সমিতি যে সকল তালিকা প্রকাশ করেছিলেন, তা সেকালীন এবং একালীন পাঠ্যপুস্তক বা বিজ্ঞান প্রবন্ধে লেখকেরা হুবহু গ্রহণ করেন নি। এখনও পর্যন্ত বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। বলা বাহুল্য, তাহলেও বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা প্রভূত পরিমাণে বেড়ে গেছে।

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮ সালে 'বাংলা পরিভাষা' নিয়ে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রথম বছরের প্রথম সংখ্যায় এক প্রবন্ধে নতুন করে আর্জি পেশ করেছিলাম। তাতেও কোন সুফল হয় নি।

ইতিমধ্যে স্কুলে বাধ্যতামূলক না হোক, মাতৃ-ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুটা অনুপ্রবেশ করলেও উচ্চস্তরে প্রবর্তিত হয় নি, তবে প্রস্তুতি চলছে।

নিম্নস্তরে মাতৃভাষার সাহায্যে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা হোক, সে বিষয়ে দ্বিমত নেই—যদিও বিভিন্ন বিষয়ে পারিভাষিক শব্দাবলী নিয়ে যথেষ্ট মতানৈক্য আছে (পাঠ্যপুস্তকসমূহ দ্রষ্টব্য)। উচ্চস্তরে কোন্ অবধি হবে বা হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে বহু মত। কে বা কারা নির্দেশ দিয়ে উচ্চস্তরে বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন করবে, তা আজও বিবেচনাধীন। যেটুকু এগিয়েছি বা পিছিয়েছি, তা জোড়াতালি দিয়ে প্রবন্ধাদিতে ব্যবহৃত হয়েছে।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার, তথা বাংলা সরকার (কেন্দ্রের অর্থানুকূল্যে) মাতৃভাষার সাহায্যে সর্বস্তরে শিক্ষা প্রবর্তনের হুমকি দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও এই বিষয়ে তৎপর হতে চাইছেন। চাইছেন কেন, হয়েছেন।

সর্বস্তরে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তন একটি সমস্যা নয়, বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে—কি কি, তা সবিশেষ আলোচনার অবকাশ হয়তো এখানে হয়ে উঠবে না। কারণ বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে মূল শিক্ষার সমস্যাও অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত। মাতৃভাষাকে শিক্ষার ভাষা বলে স্বীকার করে নিলেও বিদেশী (এখানে ইংরেজী) ভাষার স্থান কোন্ পর্যায়ে থাকবে, তাও নির্ধারণ করে নিতে হবে। আশু দ্রষ্টব্য তো শুধু বাংলা পরিভাষা নয়, সামগ্রিক শিক্ষায় বাংলা ভাষার সঙ্গে অন্যান্য ভাষা। বিদেশী ভাষা হটাও হটাও করতে করতে নিজেরাই না হটে যাই, সেটাও বিশেষ বিবেচনার সঙ্গে ভেবে দেখতে হবে। (ত্রিভাষার ধাতু দিয়ে ভারতের ভারতীকে তৈরি করে পূজা করতে হবে—বিভিন্ন রাষ্ট্রে এমনি একটা কথা উঠেছে)।

মনের ভাব ও জ্ঞান প্রকাশ এবং বিনিময়ের জন্যে ভাষা। স্বাধীন শিক্ষা ও স্বাধীন চিন্তার জন্যে মাতৃভাষা যে প্রশস্ত এবং সর্বাপেক্ষা অনুকূল একথা প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন। কিন্তু বিভিন্ন দেশ বা রাষ্ট্রের ভাষাভাষীদের মধ্যে জ্ঞান ও ভাব বিনিময় এবং বিস্তারের জন্যে কি ভাষা (এক না একাধিক) প্রচলন করা কর্তব্য, সে সম্বন্ধে সুষ্ঠু পরিকল্পনার দরকার।

ইংরেজী ভাষার সাহায্যে আর কিছু না হোক, আমরা জ্ঞানের অব্যাহত গতি রক্ষা করে চলেছি। আজ সেটাকে বর্জনের সময় আসে নি। সেটাকে মাতৃভাষার সাহায্যে কেমন করে সদ্ব্যবহার করা যায়, সেটাই ভেবে দেখবার সময় এসেছে।

একটা ভাষা শেখবার পর দ্বিতীয় একটা ভাষা শিখতে বেশী সময় লাগে না, এরূপ মত অনেকেই পোষণ করেন। কিন্তু শিক্ষার্থী কোন্ স্তরে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা করতে সুরু করবে, সেটার পরীক্ষা বহু বার বহু রকমে হওয়া সত্ত্বেও সঠিক স্তর এখনও পর্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নি বলে মনে হয়—বয়স হিসাবে হবে, না শিক্ষার স্তর হিসাবে হবে, তা এখনও মতসাপেক্ষ। স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির শিক্ষায় দুটি ভাষা নিয়ে আমরা লড়ালড়ি করি, কসরৎ করি। ফলে দেখা গেছে যে, কোন এক ভাষা দিয়ে ভাব প্রকাশের দুর্বলতাই আমাদের কাবু করে ফেলেছে। শিক্ষার্থীর প্রতি অহেতুক অত্যাচার আমরা অনেক করেছি এবং এখনও পর্যন্ত করে চলেছি।

বাংলা ভাষা এখনও পর্যন্ত গড়া হচ্ছে, পেটা হচ্ছে, রচনা শৈলী চলছে নানান চালে। সাহিত্যিকদের ভাষা এক নয়। কেউ চলিত বাংলার পক্ষপাতী, কেউ বা সাধুভাষার। আবার এই দুই রকমের মধ্যেও কিছু কিছু রকমফের বা তারতম্য আছে। এদের সঙ্গে মৌখিক ভাষারও যোগাযোগ আছে। বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক কি রকম ভাষায় লেখা উচিত, তার কি কোন নির্দেশ দেবার আবশ্যকতা নেই? সাধু বনাম চলিত বাংলা নিয়ে মতভেদ আছে, যদিও ইদানীং সকলেই বলছেন চলিত বাংলা চালাও। সাহিত্যের ভাষা একদিকে চলতে থাকলে হয়তো বা সমস্যা খানিকটা সরল হতো।

এই প্রসঙ্গে বানান সমস্যার কথা ভুললে চলবে না। একই শব্দের নানান রকম বানান শিক্ষার পথে যে অন্তরায়, সে কথা অনস্বীকার্য, বিশেষতঃ শিশুদের পক্ষে। বানানের প্রতি উদাসীনতা সংক্রামক ব্যাধির মত বেড়েই চলেছে; প্রতিকারের কোন চেষ্টা অদ্যাপি চোখে পড়ে নি। এর উপর বানান সরলীকরণ চলেছে খবরের কাগজের মাধ্যমে। উচ্চারণানুগ বানান—সেও এক বিশ্রী ব্যাপার। যুক্তবর্ণ ও দ্বিত্বের সরলীকরণ হলেও বাংলা টাইপ রাইটারের জন্যে বর্ণ ও সঙ্কেত সরলীকরণের ব্যবস্থা দরকার। বিজ্ঞানের বহু ইংরেজী শব্দ আমদানী হবে, তাদের বানান সম্বন্ধে আমাদের হুঁসিয়ার হতে হবে। বানান নিয়ন্ত্রিত হওয়া কিছুটা দরকার কি না, ভেবে দেখতে বলি।

পরিভাষা সঙ্কলিত হবার পর পাঠ্যপুস্তক লেখা সুরু হবে, না তার আগে? বিজ্ঞানের পরিভাষা যদি মুখ্যতঃ ইংরেজী শব্দ অক্ষরান্তরিত করে নেওয়াই সাব্যস্ত হয়, তাহলে মনে হয় কালবিলম্ব না করে পাঠ্যপুস্তক লেখা আরম্ভ করা উচিত। তবে যে সকল পারিভাষিক শব্দ আমরা পাঠ্যপুস্তকে গ্রহণ করেছি, তার জন্যে একটি শব্দকোষ বা শব্দ ব্যাখ্যার (Glossary) অভিধান সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করা উচিত বলে মনে করি। এই কাজটা কারা করবেন সেটাও বিবেচ্য। পাঠ্যপুস্তক প্রণেতারা যদি তাঁদের পাঠ্যপুস্তকে একটি শব্দ-ব্যাখ্যা যুক্ত করে দেন, তবে কাজটা একটু তাড়াতাড়ি এগুতে পারে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিখে বিদেশী ভাষায় বিজ্ঞান পড়ে তাদের সঙ্গে জ্ঞান বিস্তারে তৎপর হতে হবে। শুধু মাত্র বিদেশীদের আবিষ্কারের বিষয় বাংলা ভাষায় পড়ে এবং আউড়ে এগুনো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যাতে তাদের সঙ্গে সমান তালে চলতে পারি, সেই উদ্দেশ্য মনে রেখে আমাদের পরিভাষা তৈরি করতে হবে, পাঠ্য-পুস্তক লিখতে হবে।

সমস্যা উপস্থাপিত করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি নি। জানি, তাতে কেবল তর্কাতর্কি ও নানা মতের ছড়াছড়ি হবে। দুই ভাষা শিক্ষার মধ্যেও আমরা কেউ কেউ দৈবযোগে পণ্ডিত হয়ে উঠেছি। কিন্তু এখন সকলের পথ সুগম না হোক, বহুর পথ সুগম করবার জন্যে আমাদের ভাবনা। কি উপায় বা বিধিতে অগ্রসর হলে আমরা আশু কিছু ফললাভ করতে পারি, সেটাকেই আমি প্রথম স্থান দিতে চাই। যে উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে লেখা বা ভাষা গড়ে বেড়ে উঠছে, তার মধ্যে কিছু শৃঙ্খলা আনয়ন করা অসমীচীন মনে করি না।

আমাদের দেশে আলোচনা-চক্রের হুল্লোড় চলেছে। বহু সভা, সমিতি, উপসমিতি গঠন করা হয়েছে বা হচ্ছে। কিন্তু কার্যকরী কিছু করতে পারা গেছে কিনা, বলতে পারি না। একক প্রচেষ্টা যে বিফল হয়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ। তাঁর 'শিক্ষা' পুস্তকের বহু প্রবন্ধ আমার কথা প্রমাণিত করবে। তাঁর উপদেশ, তাঁর প্রস্তাব কোনটারই আমরা পরীক্ষা করে দেখি নি। সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই এই বই পড়েছেন। তাই বলছি যে, সর্বস্তরে, সর্ববিষয়ে বাংলা ভাষা প্রবর্তনকল্পে আমরা যে আবার চেঁচামেচি সুরু করেছি এবং সভা-সমিতি করে আরও করবো মনে করেছি, তারই সূচনায় রবীন্দ্র-নাথের কথাগুলি সকলকে পুনরায় পড়ে নিতে অনুরোধ করি।

মনোরাজ্যে আপেক্ষিকতা

রমেশ দাশ

বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্রতা, রহস্যময়তা ও সৌন্দর্য অনাদি কাল থেকে মানুষকে অভিভূত করে আসছে। কবি, শিল্পী, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, সাধক ঋষি নিরন্তর বন্দনা করে চলেছেন বিশ্বপ্রকৃতির, তাঁদের বিচিত্র ভঙ্গিমায়। এমন মানুষ নেই যাকে প্রকৃতি মুগ্ধ করে নি। প্রকৃতির ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারটি কখনো নিঃশেষিত হয় না।

কিন্তু এই যে বিস্ময়ভরা সুন্দর বিশ্বপ্রকৃতি, যা এমন করে মানুষের মনটিকে কেড়ে নিয়েছে, তার অস্তিত্ব কি মনুষ্য-নিরপেক্ষ? পৃথিবীতে যদি মানুষের আবির্ভাব না ঘটতো, তাহলে কি আকাশে রামধনুর রং ফুটতো, জ্যোৎস্নার প্লাবন ছুটতো, গোলাপের রং লাল হতো, তুষারের রং সাদা হতো, জল ঠাণ্ডা লাগতো, আগুন গরম ঠেকতো? বিশ্বপ্রকৃতি কি তার অজস্র রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শের বিচিত্র ঐশ্বর্যে বিমণ্ডিত হয়ে এমন মনোহারিণী হয়ে উঠতে পারতো?

পারতো না। কারণ "একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুইজনে; গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেক জন গাইবে মনে।" একথা শুধু কবি, শিল্পী, দার্শনিকেরই কথা নয়, বিজ্ঞানীরও কথা। মনুষ্য-নিরপেক্ষ যে বস্তুজগৎ, সেটি বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ, ধ্বনিহীন একটি সত্তা। বস্তুজগতের সংস্পর্শে এলে মানুষের মস্তিষ্কে যে সব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তারই ফলে উদ্ভব ঘটে বিচিত্র বর্ণের, সহস্র গন্ধের, অজস্র ধ্বনির, অসংখ্য স্বাদের, আর বিবিধ স্পর্শানুভূতির। "তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে সে কলতান উঠে বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে তবে সে মর্মর ফুটে।" কলতান তটেরও বৈশিষ্ট্য নয়, তরঙ্গেরও নয়, উভয়ের একত্রিত হবার ফল মাত্র। শুধু বাতাস বা শুধু বনস্পতি পারে না মর্মর সঙ্গীত সৃষ্টি করতে। এই অপূর্ব সৃষ্টি সম্ভব হয় দুয়ের মিলনে। বিজ্ঞানীরা বলেন, বিভিন্ন বস্তু থেকে বিভিন্ন দৈর্ঘ্য ও উচ্চতাবিশিষ্ট আলোক-তরঙ্গ (Light wave) বিচ্ছুরিত হয়। সেই সব আলোক-তরঙ্গ আমাদের চক্ষুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের মধ্যে যে উত্তেজনার সৃষ্টি করে তারই ফলে আমাদের বিভিন্ন রং ও ঔজ্জ্বল্যের (Brightness) অনুভূতি জেগে ওঠে। সবুজ রংটা গাছের পাতায় নেই। গাছের পাতায় আছে শুধু নির্দিষ্ট প্রকৃতির আলোক-তরঙ্গের বিচ্ছুরণ। সেই বিচ্ছুরণ যখন আমাদের মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে, তখন আমাদের যে অনুভূতি হয়, সেই অনুভূতিটাই সবুজ রঙের অনুভূতি। সুতরাং সবুজ রংটা পাতায় নেই, আছে আমাদের দেখায়। এটাও আমরা লক্ষ্য করেছি যে, কোন একটি বস্তুর রং সব সময় একই রকম থাকে না। আলোর তারতম্য একই বস্তুর রঙেরও তারতম্যে ঘটে। প্রায়ান্ধকারে যে পাতাটিকে প্রায় কালো মনে হয়, উজ্জ্বল আলোয় তাকেই দেখি ফিকে সবুজ; আবার দিনের আলো ম্লান হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ফিকে সবুজ ক্রমে ক্রমে গাঢ় সবুজে পরিণত হতে থাকে। সেই একই পাতার রঙে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটে, যখন তার উপর রামধনুর প্রতিফলন ঘটে অথবা জোৎস্নার আলো এসে পিছলে পড়ে। তাই বলা যেতে পারে, নির্দিষ্ট বস্তুর সুনির্দিষ্ট কোন রং নেই। আলোর বিভিন্ন অবস্থায় একই বস্তু থেকে বিভিন্ন প্রকৃতির আলোক-তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়,

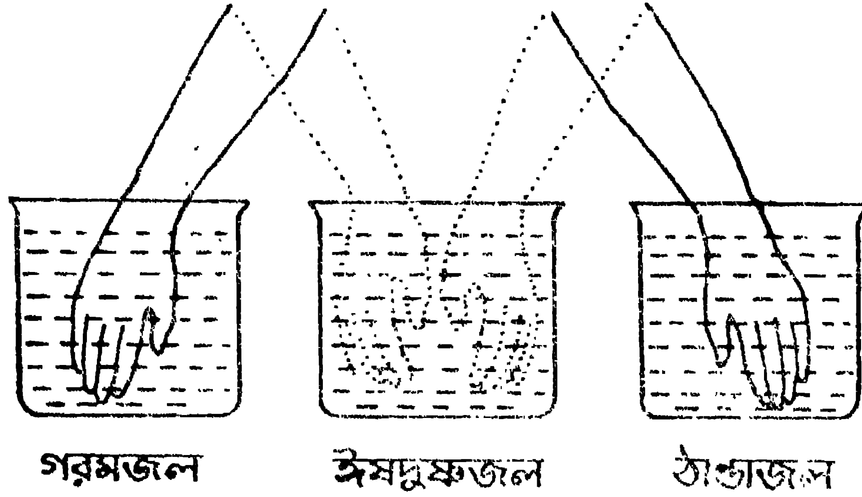
আর তার প্রভাবে বিভিন্ন সময়ে তাকে কেন্দ্র করে আমাদের বিভিন্ন রঙের অনুভূতি ঘটে। এমনও হতে পারে যে, যে আলোক-তরঙ্গ মানুষের মনে সবুজ রঙের অনুভূতি জাগায়, অন্য প্রাণীর মস্তিষ্কের গঠন ভিন্নতর বলে সেই আলোক-তরঙ্গই তাদের মনে অন্য রঙের অনুভূতির সঞ্চার করে। হারমোনিয়ামের রীডে সা-রে-গা-মা যেমন বাজে, এস্রাজের তারে তেমন করে বাজে না। অন্য প্রাণীর কথা স্বতন্ত্র। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন—এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা সম্পূর্ণ বা আংশিভাবে বর্ণান্ধ (Colour blind)। অনেকে আছেন যাঁরা কোন রংই দেখতে পান না; তাঁরা বিভিন্ন বস্তুকে তাদের উজ্জ্বলতার (রঙের নয়) তারতম্যানুসারে আলাদা আলাদা করে দেখেন। অনেকে আছেন যাঁরা বিশেষ বিশেষ রং দেখতে পান না—যেমন লাল এবং সবুজ রং দেখতে পান না (Red-green blind)। একই উজ্জ্বলতা-বিশিষ্ট লাল এবং সবুজ রঙের একই আকারের দুটি বস্তুর (যেমন একই ঔজ্জ্বল্য ও আকারবিশিষ্ট একটি লাল ও একটি সবুজ রঙের কাগজ) মধ্যে তাই তাঁরা কোন পার্থক্য বুঝতে পারেন না।

দৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ানুভূতির ক্ষেত্রেও তেমনি। প্রতিনিয়ত কত বিচিত্র ধ্বনিই না আমরা শুনতে পাচ্ছি! কিন্তু বস্তুজগতে ধ্বনি বলে কিছু নেই—আছে বস্তুর কম্পন, আর তজ্জনিত বায়ু-তরঙ্গ। বিভিন্ন বস্তুর বিচিত্র কম্পনের ফলে বায়ুসমুদ্রে বিচিত্র তরঙ্গের উদ্ভব হয়। সেই সব তরঙ্গ আমাদের কানে এসে আঘাত করলে মস্তিষ্কে যে পরিবর্তন ঘটে, তারই ফলে আমরা বিচিত্র ধ্বনির অনুভূতি লাভ করি। তরল অবস্থায় কোন বস্তু যখন জিহ্বার সংস্পর্শে আসে, তখন জিহ্বান্তর্গত সংশ্লিষ্ট স্বাদ-কোষকগুলির মধ্যে যে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তার দ্বারা মস্তিষ্ক প্রভাবিত হলে আমাদের বিশেষ বিশেষ স্বাদের অনুভূতি হয়। কোন বস্তু থেকে নির্গত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বাষ্প-কণা যখন নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে বিশেষ বিশেষ ঘ্রাণ-কোষকে উত্তেজিত করে এবং সেই উত্তেজনা মস্তিষ্কে বাহিত হয়ে বিশেষ ধরণের পরিবর্তন ঘটায়, তখন আমাদের নির্দিষ্ট প্রকারের ঘ্রাণের অনুভূতি জন্মে। ত্বকের সঙ্গে বস্তুর সংযোগ ঘটলে ত্বকের সংশ্লিষ্ট অংশে যে ধরণের উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং তার প্রভাবে মস্তিষ্কের যে ধরণের পরিবর্তন ঘটে, তারই ফলে জেগে ওঠে আমাদের শৈত্য, তাপ, স্পর্শ অথবা যন্ত্রণার অনুভূতিগুলি।

সুতরাং স্পষ্টতঃই দেখতে পাচ্ছি, বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে বিচিত্র রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের যে ঐশ্বর্য প্রত্যক্ষ করে আমরা বিমুগ্ধ হচ্ছি, সে ঐশ্বর্য নিছক বিশ্ব-প্রকৃতি বা নিছক মানব-মস্তিষ্ক কারও নয়, এই দুয়ের মিলিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ারই ফল। এই কথাটা যে কত সত্য, সেটা অতি সহজেই বুঝতে পারি যখন দেখি, যে ব্যক্তি জন্মান্ধ বিশ্ব-জগৎ তার কাছে বর্ণহীন, যে জন্মবধির জগৎ-সংসার তার কাছে নিঃশব্দ, নীরব। পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং মস্তিষ্কের গঠন অনুসারে একই বিশ্ব-প্রকৃতি বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিভিন্ন প্রাণীর কাছে স্বভাবতঃই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হবে। অন্ধের জগৎ আর চক্ষুষ্মানের জগৎটা যেমন এক হতে পারে না, ঠিক তেমনি এক হতে পারে না মানুষের চোখে দেখা আর পাখীর চোখে দেখা জগতের চেহারাটা।

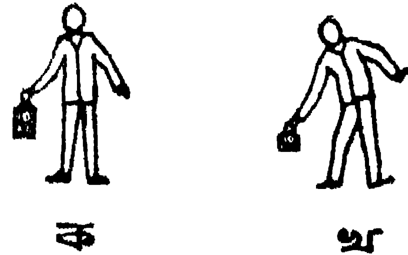
প্রত্যক্ষণ (Perception), অনুভবন (Affect) এবং চেষ্টন (Conation)—মনের প্রধান তিনটি ক্ষেত্র। তিনটি ক্ষেত্রেই আমরা যেসব অভিজ্ঞতা লাভ করি, সেগুলি বহুলাংশে আপেক্ষিক (Relative)। এপ্রসঙ্গে সুপরিচিত এবং অত্যন্ত সহজ কতকগুলি পরীক্ষণ ও উদাহরণের উল্লেখ

করা যেতে পারে। তিনটি পাত্র নেওয়া হলো। বাম দিকের পাত্রে ঠাণ্ডা জল, ডান দিকের পাত্রে ঈষদুষ্ণ জল ভরা হলো। বাম হস্ত বাম দিকের পাত্রে এবং দক্ষিণ হস্ত ডান দিকের পাত্রে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখবার পর উভয় হস্ত একই সঙ্গে যদি মধ্যবর্তী পাত্রে ডোবানো যায়, তাহলে উক্ত পাত্রের জল বাম হস্তে গরম এবং দক্ষিণ হস্তে ঠাণ্ডা ঠেকবে, যদিও জলটা একই জল এবং উভয় ক্ষেত্রেই তার নিজস্ব তাপের মাত্রাটি অভিন্ন (১নং চিত্র)। অনুরূপভাবে অন্ধকার থেকে ঈষৎ আলোকিত স্থানে এলে সেখানকার বস্তুগুলিকে স্পষ্ট দেখায়, কিন্তু আলোকিত স্থান থেকে ঈষৎ আলোকিত স্থানে এলে উক্ত বস্তুগুলিকে অস্পষ্ট দেখি। মিষ্টি খাবার পর নোন্‌তা খেতে যেমন লাগে, টকের পরে নোন্‌তার স্বাদটি ঠিক তেমন লাগে না। যে বন্ধুকে প্রতিদিন দেখছি, তাকে দেখে সচরাচর যে আনন্দ পাই, দীর্ঘকালের অদর্শনের পর তাকে দেখলে আনন্দের পরিমাণ সে তুলনায় অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। যেখানে হাজারটা বাতি জ্বলছে, সেখানে আরও দুটা বাতি রাখলে আমরা আলোর কোন বৃদ্ধি ঠাহর করতে পারি না, কিন্তু যেখানে দুটা বাতি জ্বলছে, সেখানে যদি আরও দুটা জ্বেলে দেওয়া যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই আলোর বৃদ্ধিটা আমাদের অনুভূতিতে ধরা পড়ে।



১নং চিত্র

একই ওজন অথচ ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতাবিশিষ্ট দুটি পাত্র যদি পর পর কাউকে তুলতে বলা হয়, তাহলে অপেক্ষাকৃত ছোট পাত্রটিকে তার বেশী ভারী মনে হবে (Size-weight illusion)। তার কারণ ছোটর ওজন বড়র তুলনায় সাধারণতঃ কম হয়ে থাকে, এই ধারণা তার মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে। তাই বড় পাত্রটিকে তোলবার জন্যে সে



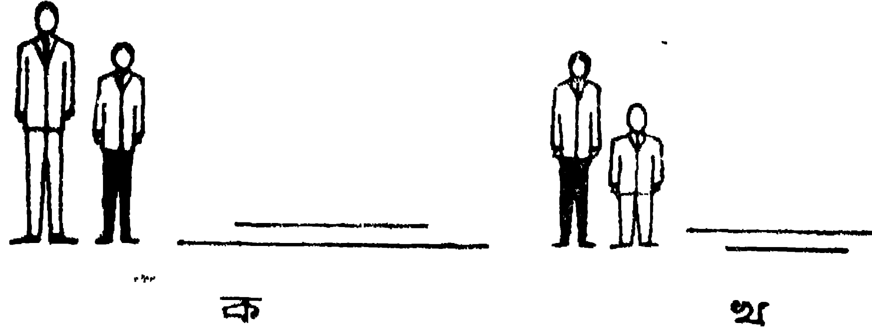
২নং চিত্র

অজ্ঞাতসারেই অধিক শক্তি এবং ছোট পাত্রটিকে তোলবার জন্যে অল্প শক্তি প্রয়োগ করবে। কিন্তু পাত্র দুটির ওজন সমান; তাই অধিক শক্তি প্রয়োগ করবার জন্যে বড় পাত্রটিকে হাল্কা এবং অল্প

শক্তি প্রয়োগ করবার জন্তে ছোট পাত্রটিকে ভারী মনে হবে (২নং চিত্র)।

একটি বড় রেখার পাশে একটি বিশেষ রেখাকে যত ছোট মনে হয়, সেই বিশেষ রেখাটিকে তার তুলনায় ছোট অন্য একটি রেখার পাশে তত ছোট মনে হয় না। একটি লম্বা লোকের পাশে একটি বেঁটে লোককে ছোট দেখায়, কিন্তু একটি বামনের পাশে সেই লোকটিকেই লম্বা মনে হয় (৩নং চিত্র)। একের পাশে যাকে ফর্সা মনে হয়, অন্যের পাশে তাকেই কালো দেখায়।

সমান দৈর্ঘ্যের শূন্য স্থানকে (Empty space) পূর্ণ স্থানের (Filled space) তুলনায় ছোট মনে হয় (৪নং চিত্র)। কিন্তু নানা রকম আকর্ষণ থাকবার জন্তে ঘর-বাড়ীতে ভরা শহরের মধ্যে দিয়ে দু-মাইল রাস্তা হাঁটতে কষ্ট হয় না, অথচ শূন্য মাঠের উপর দিয়ে হাঁটবার সময় দু-মাইল দূরত্বটাকে বেশ দীর্ঘ মনে হয়। নানান কাজের ব্যস্ততার মধ্যে যখন একটি ঘন্টা কাটিয়ে দিই, তখন কোথা দিয়ে সময় কেটে যায় টের পাই না, কিন্তু হাতে যখন কোন কাজ থাকে না, তখন সেই একটা ঘন্টাই যেন আর কাটতে চায় না। অনুরূপভাবে আনন্দের ভিতর দিয়ে যে সময়টুকু অতিবাহিত হয়, দুঃখের ভিতর দিয়ে অতিবাহিত সমপরিমাণ সময়ের তুলনায় তাকে হ্রস্বতর মনে হয়। এই জন্তে কথায় বলে, "সুখের দিন তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়, কিন্তু দুঃখের নিশি যেন পোহাতে চায় না।"



৩নং চিত্র

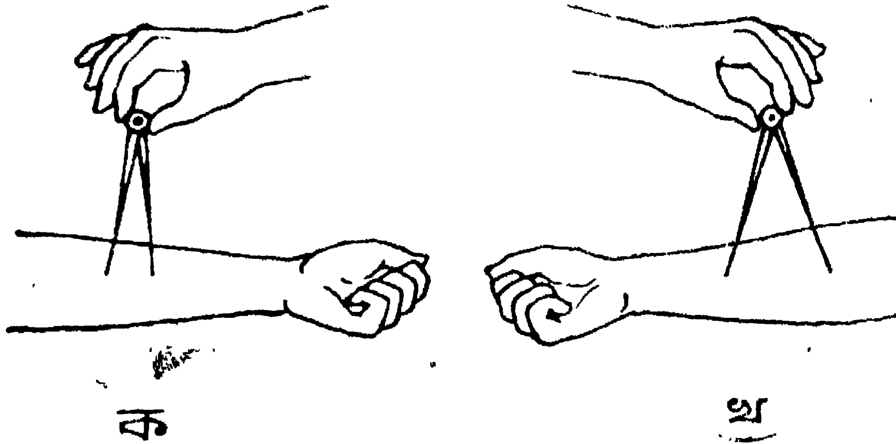
মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মৌলিক রং চারটি— লাল, সবুজ, হল্‌দে, নীল। এগুলির মধ্যে লাল এবং সবুজ পরস্পরের সম্পূরক; অনুরূপভাবে হল্‌দে এবং নীল—এরাও পরস্পরের সম্পূরক (Complementary)। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, কোন একটি রঙের বিশেষ একটি বস্তুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর যদি সাদা বা ধূসর কোন ক্ষেত্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায়, তাহলে তার উপর উক্ত বস্তুটির একটি প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে— কিন্তু প্রকৃত বস্তুটির যে রং প্রতিচ্ছবিটির রং তার সম্পূরক। যেমন লাল একটি গোলাপের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর যদি সাদা



৪নং চিত্র

কাগজে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তাহলে কাগজের উপর একটি সবুজ গোলাপের ছবি ভেসে উঠবে। এই রকম অভিজ্ঞতার নাম দেওয়া হয়েছে সংবেদনোত্তর অভিজ্ঞতা (After-sensation or After-image)। পরীক্ষা করে এও দেখা গেছে যে, সাদা বা ধূসর কাগজের উপর আট্‌কানো একটা রঙীন কাগজের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে তার চারপাশে সম্পূরক রঙের একটা বিচ্ছুরণ দেখতে পাওয়া যায়। রঙীন কাগজটার রং যদি হলদে হয়, তাহলে তার চারপাশে একটা নীল রঙের ছটা দেখতে পাওয়া যাবে। এই ধরণের একই কারণে নীল আকাশে হলুদ রঙের চাঁদটি আরও হলদে এবং তার চতুষ্পার্শ্বস্থ আকাশটি আরও নীল মনে হয়। সবুজ গাছপালার দিকে তাকাবার পর যখন লাল জামার উপর চোখ পড়ে, তখন জামাটাকে যতটা লাল দেখি আসলে সেটা তত লাল নয়।

অভিযোজন (Adaptation) বলতে যা বোঝায়, সেটাও একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। বাইরের আলো থেকে অন্ধকার ঘরে এসে ঢুকলে ঘরের ভিতর কিছুই ভাল দেখা যায় না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে অন্ধকারটা চোখে সয়ে যায় এবং অস্পষ্ট



৫নং চিত্র

অভিজ্ঞতার নাম দেওয়া হয়েছে সমকালীন বর্ণবৈষম্য (Simultaneous colour contrast)। এসব পরীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, কোন একটি রঙের দ্বারা প্রভাবিত হবার অব্যবহিত পরে চোখের মধ্যে তার সম্পূরক রংটির একটি আবেশের সঞ্চার হয় এবং তার ফলে আমাদের প্রত্যক্ষণও প্রভাবিত হয়। স্বভাবতঃই সবুজ পাতার মধ্যে লাল ফুলটিকে যখন দেখি, তখন পাতাগুলি প্রকৃত পক্ষে যতটা সবুজ, তাদের তার চেয়ে বেশী সবুজ দেখি এবং ফুলটি আসলে যতটা লাল সেটি তার চেয়ে বেশী লাল দেখায়। বস্তুগুলি স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে। ছুটির ঠিক পরেই কাজে মন বসে না, কিন্তু কাজ করতে করতে কাজেই মন ডুবে যায়। গরমের দেশের মানুষ শীতের দেশে গিয়ে পড়লে প্রথম প্রথম শীতটা অসহ্য বলে মনে হয়, কিন্তু ক্রমেই সেটা সহ্য হয়ে যায়। যারা ঘরে বসে কাজ করে, তাদের যখন প্রচণ্ড গ্রীষ্মে বাইরে বেরোতে হয় তখন খুব কষ্ট হয়, কিন্তু ঘরের বাইরে যাদের কাজ করা অভ্যাস তাদের কাছে গ্রীষ্মের তাপ ততটা প্রখর হয়ে অনুভূত হয় না। আবার ঘরের ভিতর যাদের কাজ করা অভ্যাস, তাদের যদি বাইরে কাজ

করতে হয়, তাহলে প্রথম প্রথম যতটা কষ্ট হয়, বাইরে কাজ করতে করতে ক্রমে ক্রমে সে কষ্টটা লঘু হয়ে আসে।

ওয়েবার-ফেক্‌নার সূত্রে (Weber-Fechner Law) বলা হয়েছে বস্তুজগৎ আর মনোজগতের সম্বন্ধটা সমান্তরাল নয়, অর্থাৎ বস্তুর প্রতিটি বৃদ্ধি (বা হ্রাস) মনোজগতে ধরা পড়ে না। নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বস্তু জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেলে (Geometrical progression) সংবেদনের (Sensation) গাণিতিক হারে বৃদ্ধি ঘটে (Arithmetical progression)। খুব ক্ষীণ শব্দ আমরা শুনতে পাই না, খুব ক্ষুদ্র বস্তু দেখতে পাই না, খুব অল্প দূরত্ব ঠাহর করতে পারি না।

কোন ব্যক্তিকে চোখবাঁধা অবস্থায় তার হাতের উপর ডিভাইডারের দুটি কাঁটা যদি অতি অল্প দূরত্বে ঠেকানো যায়, তাহলে বস্তুতঃ দুটি বিন্দু স্পর্শ করা হলেও তার মনে হবে যেন একটি মাত্র বিন্দুকে স্পর্শ করা হয়েছে, অর্থাৎ সে দুটি কাঁটাকে একটি মাত্র কাঁটা রূপে অনুভব করবে। ক্রমে ক্রমে দূরত্বটা বাড়িয়ে গেলে একটা সময় আসবে, যখন সে দুটি কাঁটাকে একটি কাঁটা রূপে অনুভব না করে দুটি কাঁটারূপেই অনুভব করবে। তার পরেও কিন্তু দূরত্বের প্রতিটি বৃদ্ধি সে বুঝতে পারবে না—একটা নির্দিষ্ট হারে দূরত্বটাকে বাড়াতে হবে, তবেই সে বুঝতে পারবে যে দূরত্বটা বেড়েছে (৫নং চিত্র)।

মনোজগতে আপেক্ষিকতার আরও অজস্র উদাহরণ দেওয়া যেতে পারতো, কিন্তু তার আর প্রয়োজন দেখছি না। উপরের আলোচনা থেকে পাঠক-পাঠিকা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, বস্তু-জগৎ যেমন করে আমাদের মনে প্রতিভাত হয়, সেটাই তার প্রকৃত স্বরূপ নয়, আমাদের মস্তিষ্ক বস্তুজগতের প্রতি যে রকম প্রতিক্রিয়া করে, সেই ভাবে সেটা প্রতিফলিত হয় আমাদের চেতনায়।

এক-মেরু চুম্বক

সূর্যেন্দুবিকাশ কর

বিজ্ঞানে আজব কোন কিছুরই স্থান নেই। হয়তো পরীক্ষায় আজ কোন নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল, তত্ত্বের (Theory) কষ্টি-পাথরে তাকে যাচাই করে তার সত্যতা প্রমাণ করবার চেষ্টা বিজ্ঞানের কাজ। আবার তত্ত্বের ভিত্তিতে নতুন কিছু পাওয়া গেলে পরীক্ষায় প্রমাণ হচ্ছে না বলে তার সত্যতা উড়িয়ে দেওয়াও বিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভব নয়। পরীক্ষায় প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত যা আজব বলে মনে হচ্ছে, তা যে পরীক্ষাগারে একদিন ধরা পড়বে না, তারই বা নিশ্চয়তা কি?

পজিট্রনের কথা ধরা যাক। ১৯৩১ সালে বিজ্ঞানী ডির‍্যাক (Dirac) এরকম একটি কণিকার কথা তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রমাণ করেছিলেন। তখন এর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ ছিল যথেষ্ট। কিন্তু মেঘকক্ষে (Cloud chamber) সত্যই একদিন এর অস্তিত্ব ধরা পড়লো। একে একে অ্যান্টি-প্রোটন, অ্যান্টিনিউট্রন ইত্যাদি অনেক বিপরীত কণাই এখন পাওয়া গেছে।

এখন ডির‍্যাকের আর একটি সিদ্ধান্তের কথায় আসা যাক। তিনি বলেছেন, বিদ্যুতের যে রকম ইলেট্রন, প্রোটন প্রভৃতি মৌলিক কণা আছে, চুম্বকেরও সে রকম চৌম্বক আধান থাকবে। এই আধান উত্তর বা দক্ষিণ মেরু হতে পারে—কিন্তু এরকম মুক্ত এক-মেরু চুম্বক (Magnetic monopole) থাকা তত্ত্বের দিক দিয়ে খুবই স্বাভাবিক। বর্তমান জগতে দেখতে পাই, তড়িৎ ও চুম্বকত্বের পরস্পর সম্বন্ধ থাকলেও একটা জায়গায় বেশ অমিল আছে। গতিশীল আহিত কণা (Charged particle) থেকে চুম্বকত্বের সৃষ্টি—একটি আহিত কণা তড়িৎ ক্ষেত্রেরই উৎপাদন করে—চুম্বকত্ব উৎপাদন কিছুটা গৌণ ব্যাপার।

প্রকৃতিতে সুসমতা (Symmetry) মেনে চলবার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক দেখা যায়। মৌলিক কণার বিভিন্ন ধর্মের যথেষ্ট সুসমতা রয়েছে। এক্ষেত্রেও সুসমতার খাতিরে আমরা আশা করতে পারি যে, চুম্বক-কণা থেকে চৌম্বক ক্ষেত্র ও গতিশীল চুম্বক-কণা থেকে তড়িৎ ক্ষেত্রের সৃষ্টি হচ্ছে। আহিত কণিকার মত চুম্বক কণিকারও সুসম ধর্ম থাকা সমীচীন। ইলেকট্রন-তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ (Electromagnetic wave), আলোর বিকিরণ (Radiation) বা শোষণ (Absorption) করে; চুম্বক কণিকারও সে রকম ধর্ম থাকা প্রয়োজন। শক্তিশালী ফোটন (Photon) থেকে ইলেকট্রন-পজিট্রনের যে রকম জুড়ির (Pair) গঠন হয়, ফোটন থেকে উত্তর ও দক্ষিণ এক-মেরু চুম্বকের জোড়া পাওয়াও উচিত।

অনেক আগেই পজিট্রন পাওয়া গেছে, কিন্তু এক-মেরু চুম্বক আজও আজব হয়ে আছে। পরীক্ষাগারে এর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। কেন পাওয়া যাচ্ছে না, তার কারণও খুঁজে বের করা সম্ভব হয় নি।

আমরা ইলেকট্রেটের কথা জানি। রজন মিশ্রিত কারনিউবা ওয়াক্স (Carnuba wax) জাতীয় পদার্থে ধন ও ঋণ আধান তড়িৎ ক্ষেত্রের দুটি মেরুর সৃষ্টি করে। স্বভাবতঃ ইলেক-

ট্রেটের (Electret) মত দ্বিমেরু আহিত বস্তু বিরল, অথচ দ্বিমেরু চুম্বক তৈরি করা খুবই সহজ। এদিকে আবার এক আধানবিশিষ্ট কণা, যেমন—ইলেট্রন, প্রোটন ইত্যাদি সহজেই পাওয়া যায়, কিন্তু এক-মেরু চুম্বক শুধু বিরল নয়—একটি আজব বস্তু। তবে ডিরাকের মত বিজ্ঞানী যদি তত্ত্বের ভিত্তিতে এরকম আজব জিনিষের কথা বলেন, তবে খুঁজে দেখতে অসুবিধা কি? আজ ৩০।৩৫ বছর ধরে তন্ন তন্ন করে খোঁজ করেও এরকম এক-মেরু চুম্বক পাওয়া যায় নি।

আবার এখন এসম্পর্কে পরীক্ষাগারে খোঁজ নেবার নতুন আগ্রহ দেখা দিয়েছে। তার কারণ হলো, ব্রুকহাভেন (Brookhaven) ও সার্নে (CERN) ৩০ বিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট কণাত্বরণ যন্ত্র চালু হয়েছে, রাশিয়াতে একটি ৭০ বিঃ ইঃ ভোঃ কণাত্বরণ যন্ত্র তৈরি হচ্ছে। নভোরশ্মি গবেষণায় এখন নতুন নতুন কলাকৌশলের আমদানী হয়েছে। এই সব যন্ত্র ও কলাকৌশলের সাহায্যে নতুন করে এক-মেরু চুম্বকের খোঁজ করবার কৌতূহল হওয়া বিজ্ঞানীদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। তাছাড়া মৌলিক কণা গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে পদার্থ-বিজ্ঞানে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে পদার্থ-জগৎকে বিশ্লেষণ করা চলছে, তাতে এক-মেরু চুম্বকের অস্তিত্ব এক নতুন আলোকপাত করতে পারে। তাই এক-মেরু চুম্বক বাস্তবে পাওয়া যায় কিনা, যদি না পাওয়া যায় তবে তারই বা কারণ কি—এসম্পর্কে গবেষণা একান্ত প্রয়োজনীয়।

উনিশ শতকে ম্যাক্সওয়েল যে তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্বের (Electromagnetic theory) অবতারণা করেছেন, কি সাধারণ, কি আপেক্ষিকতাবাদনির্ভর (Relativistic) সমীকরণের কোনটিতেই চুম্বকীয় আধানের কথা নেই। উদাহরণস্বরূপ দুটি সমীকরণ ধরা যাক

$$\Delta.E = 4\pi\rho\,;\quad \Delta.B = O$$

এখানে E ও B যথাক্রমে তড়িৎ ও চুম্বক ক্ষেত্র, ρ তড়িৎ আধানের ঘনত্ব। এক-মেরু চুম্বক পাওয়া গেলে Δ B = O এই সমীকরণে O-এর পরিবর্তে চুম্বকীয় আধান বসাতে হবে। ম্যাক্সওয়েলের অন্য সমীকরণগুলি সম্পর্কেও অনুরূপ কথা খাটে। ডিরাকের মতে ইলেকট্রন, প্রোটনের মত উত্তর বা দক্ষিণ এক-মেরু চুম্বক থাকা সমীচীন এবং একক তড়িৎ-আধান ও এক-মেরু চুম্বকের বলের গুণফল হবে $\frac{1}{2}$, আর সেই একককে (Unit) ক্ষুদ্রতম আধান হলো $\frac{1}{\sqrt{137}}$। তাহলে একটি এক-মেরু চুম্বকের নিম্নতম চুম্বকমাত্রা (Strength) হবে $\sqrt{\frac{137}{2}}$. আবার একটি চুম্বক কণাতম (Quantum) একটি তড়িৎ আধান কণাতম (Quantum) থেকে প্রায় ৬৮.৫ গুণ শক্তিশালী। দুটি তড়িৎ-আহিত কণার মধ্যে যে বল, দুটি চুম্বকীয় কণার মধ্যে তাই প্রায় ৬৮.৫ × ৬৮.৫ = ৪৬৯২ গুণ অধিক বল কাজ করবে, অবশ্য তাদের মধ্যেকার দূরত্ব যদি একই থাকে।

সাধারণতঃ কোন কণিকাদের পরস্পর বিক্রিয়ার মাত্রা তাদের ভরের উপর নির্ভর করে। এই কণিকাগুলির ভর যত বেশী, বিক্রিয়ার মাত্রাও তত বেশী। এখন কাল্পনিক এক-মেরু চুম্বকের যে বিপুল চুম্বকমাত্রার কথা বলা হয়েছে, তার ফলে এই কণার ভর প্রোটনের অন্ততঃ তিন গুণ হওয়া উচিত। তাছাড়া যেমন (ধন ও ঋণ), ইলেকট্রন (পজিট্রন), প্রোটন (অ্যান্টিপ্রোটন) প্রভৃতি আহিত মৌলিক কণা যে রকম ভিন্ন ভিন্ন ভরের হয়, সে রকম ভিন্ন ভিন্ন ভরের এক-মেরু চুম্বকও পাওয়া

অসম্ভব নয়। কোন কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণ করে খুঁজে দেখতে হলে, তার জন্ম, মৃত্যু ও বেঁচে থাকবার খুঁটিনাটি দিক সম্পর্কে তলিয়ে দেখতে হয়। প্রথমতঃ এক-মেরু চুম্বকের জন্ম-রহস্যের ঠিকানা খুঁজে দেখা যাক। ফোটন থেকে ইলেকট্রন-পজিট্রনের জুড়ির মত উত্তর ও দক্ষিণ এক-মেরু চুম্বকের জুড়িও ফোটন থেকে জন্মগ্রহণ করতে পারে। ব্রুকহাভেন ও সার্নের বৃহদাকার কণাত্বরণ যন্ত্র, যাতে প্রোটন থেকে অনেক ভারী কণারও জন্ম লাভ হতে পারে বা নভোরশ্মিতে জুড়ি গঠন (Pair formation) প্রক্রিয়ায় উত্তর ও দক্ষিণ এক-মেরু চুম্বক পাওয়া সম্ভব। এক-মেরু চুম্বক কণা যথেষ্ট ভারী হবে, এই অনুমানের ভিত্তিতেই আমরা একথা বলছি।

যদি নভোরশ্মি (Cosmic rays) থেকে এদের জন্ম হয়, তাহলে বায়ুশূন্য মহাকাশে বিচরণশীল এই কণিকা নভোমণ্ডলের (Cosmos) সামান্য ক্ষীণতম চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবেও শত শত বিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তিতে ত্বরণ প্রাপ্ত হবে, কারণ এই কণিকার নিজস্ব চুম্বকমাত্রা যথেষ্ট অধিক। ইলেকট্রন ধাতুর (Metal) মধ্যে যে ধরণের শক্তির মাধ্যমে আটকে থাকে, এই সব বেগবান চুম্বক কণা সেই ধরণের শক্তিতে মহাকাশে বিচরণশীল উল্কাপিণ্ডে আটকা পড়ে যাবে, অবশ্য সে ক্ষেত্রে শক্তির মাত্রাটা হবে ইলেকট্রনগুলির থেকে বহুগুণ বেশী। তাহলে পুরাতন উল্কাপিণ্ডগুলির ভিতর এক-মেরু চুম্বকের সন্ধান করা যেতে পারে। উল্কাপিণ্ডের সংস্পর্শ এড়িয়ে এই কণা যদি আমাদের বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে, তাহলে বস্তুকণার সঙ্গে সংঘাতে ক্রমশঃ মন্দীভূত হবে ও পৃথিবীপৃষ্ঠে যেখানে লৌহ আকরিক (Iron ore) ছড়ানো রয়েছে—সেখানে ওই আকরিকের মধ্যে ঢুকে পড়বে। তাই ওই সব আকরিকও খুঁজে দেখা যেতে পারে।

উল্কাপিণ্ড বা লৌহ আকরিক থেকে চুম্বক কণা কিভাবে পৃথক করা যায়? একটা উপায় হলো, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উল্কাপিণ্ডকে চুম্বকত্বহীন করে ফেলা, অথবা বাইরে থেকে ৬০,০০০ বা ততোধিক গাউস্ (Gauss) চৌম্বক দিয়ে এক-মেরু চুম্বক কণাকে উল্কাপিণ্ড বা লৌহ আকরিক থেকে টেনে নিয়ে আসা। বৃহৎ চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে এই পরীক্ষা অবশ্য করা হয়েছে—কিন্তু তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এক-মেরু চুম্বকের অস্তিত্ব নেই অথবা যদি থাকে, তবে তার চুম্বকমাত্রা বা ভর অনুমান অপেক্ষা অনেক বেশী।

নিউক্লিয়ার এমালসন (Nuclear emulsion) প্লেটে, মেঘকক্ষে (Cloud chamber) বা বুদ্বুদ কক্ষে (Bubble chamber) চুম্বক কণার গতিপথ সন্ধান করা সম্ভব। কারণ এই কণার ভর অত্যন্ত বেশী বলে এর গতিপথের চিহ্ন অন্য মৌলিক কণা থেকে হবে পৃথক।

তবে বস্তুর সঙ্গে এর ক্রিয়া কি হবে, তা ভাল করে জানা নেই। কেউ কেউ বলেন, কয়েকটি অক্সিজেন অণুর সহযোগিতায় এই কণা চুম্বকীয় অণু (Magnetic molecule) তৈরি করতে পারে। পরমাণুর মধ্যে নিউক্লীয় চুম্বকত্বও (Nuclear magnetism) এই সব চুম্বক কণাকে নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি টেনে নিয়ে আসতে পারে, তখন কিন্তু পরমাণুতে আটকে থাকা সেই চুম্বক কণাকে মুক্ত করে নিয়ে আসা খুব শক্ত হতে পারে।

নিত্যতাবাদের ভিত্তিতে চুম্বক কণারও নিত্যতা বজায় থাকা প্রয়োজন। ফলে, একটি উত্তর এক-মেরু চুম্বক একটি দক্ষিণ এক-মেরু

চুম্বকের সঙ্গে মিলনে অন্তর্হিত (Annihilation) হবে ও ফোটনের জন্ম দেবে।

ব্রুকহাভেন ও সার্নের কণাত্বরণ যন্ত্রের সাহায্যে এক-মেরু চুম্বকের সন্ধানও ব্যর্থ হয়েছে। প্রচুর শক্তিশালী সিন্টিলেশন (Scintillation) গণনাযন্ত্র (Counter) নিয়োগ করেও এরকম কণিকার সন্ধান পাওয়া যায় নি। প্রমাণ হয়েছে যে, প্রোটন থেকে অন্ততঃ তিনগুণ ভারী কোন চুম্বক কণার অস্তিত্ব নেই, তবে আরও ভারী হলে অবশ্য এই পরীক্ষায় তা ধরা পড়া সম্ভব ছিল না।

বিজ্ঞানীরা থেমে নেই। যতদিন না প্রমাণ করা যায় যে, তত্ত্বের ভিত্তিতে এক-মেরু চুম্বকের অস্তিত্ব থাকলেও বাস্তব ক্ষেত্রে না পাওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে, ততদিন বিজ্ঞানীরা এর অস্তিত্ব খুঁজে বেড়াবেন, ক্ষ্যাপার পরশ পাথর খোঁজবার মত। হয়তো সাফল্য একদিন আসবেই।

"আমাদের দেশে শিক্ষিতদের মধ্যেও বিজ্ঞান-চর্চা তেমন করিয়া ছড়াইয়া পড়ে নাই; দেশী ভাষায় সাহিত্যের যেমন উন্নতি হইয়াছে, বিজ্ঞানের তেমন হয় নাই * * *।

* * * অন্য দেশের অণুকরণ করিতে গেলে, সে দেশের লোক যে ফল পাইতেছে তাহাও পাইব না, আমরা যে ফল আশা করিতে পারিতাম, তাহা হইতেও বঞ্চিত হইব। যে ব্যক্তি চলিতে শিখিলেই আপাততঃ খুসী হওয়া যায়, তাহাকে একদমে লাফ দিতে শিখাইতে হইবে, এমন পণ করিয়া বসিলে লাফ দেওয়াও হইবে না, মাঝে হইতে চলাই দুর্ঘট হইবে।

* * * বিজ্ঞানের কূটতত্ত্ব ও কঠিন সমস্যা লইয়া নাড়াচাড়া করিলেই যে উদ্ভাবনী শক্তি বাড়ে, তাহা নহে। প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়, ভাল করিয়া দেখিতে শেখাই বিজ্ঞান-সাধকের মুখ্য সম্বল। বিজ্ঞানপাণ্ডিত্যে যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারা যে বিদ্যালয়ে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা দিয়া বড় হইয়াছেন, তাহা নহে।

আমাদের দেশে আমরা যদি যথার্থ বিজ্ঞানবীরদের অভ্যুদয় দেখিতে চাই, তবে শিক্ষার আদর্শ দুরূহ ও পরীক্ষা কঠিন করিলেই সে ফল পাইব না। তাহার জন্য দেশে বিজ্ঞানের সাধারণ ধারণা ব্যপ্ত হওয়া চাই এবং ছাত্রেরা যাহাতে পুঁথিগত বিদ্যার শুষ্ক কাঠিন্যের মধ্যে বদ্ধ না থাকিয়া প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বিজ্ঞানদৃষ্টি চালনার চর্চা করিতে পারে, তাহার উপায় করিতে হইবে।"

জগদীশচন্দ্র বসু

নূতনতর প্লাষ্টিক্স প্রসঙ্গে

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকাল বাজারে ছোটদের খেল্না থেকে সুরু করে আমাদের গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহারোপযোগী কাপ, প্লেট, রেকাবি, মগ, গেলাস, জলের বোতল, টেবিল ক্লথ, কার্পেট ইত্যাদি নানারকম প্লাষ্টিক্সের জিনিষের ছড়াছড়ি দেখা যায়। কাজেই আজ যদি কেউ বলেন, ভোরবেলা জানালা দিয়ে সূর্যের আলো ঘরে প্রবেশ করবার পর অমুক বাবু তাঁর পলি (ইউরিথেন) বিছানা থেকে উঠে পলি (অ্যাক্রোনাইট্রাইল-কো-ভিনাইল অ্যাসিটেট) কার্পেটের উপর পা ফেলে অ্যাক্রিলিক বাথরুমে গিয়ে মুখহাত ধুয়ে পলি (ইথিলিন টেরিথালেট) পোশাক পরলেন, তা হলে কথাটা নিতান্ত আজগুবী শোনাবে না। অবশ্য ২৫-৩০ বছর আগে এধরণের কথা শুনলে কোন বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনীর অংশবিশেষ বলেই মনে হতো। গত ২৫।৩০ বছরে প্লাষ্টিক্স শিল্পে যে বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তা সত্যই অভাবনীয়। আজ নিত্য নূতন প্লাষ্টিক্সের কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি।

আমাদের আজকের এই অতিপরিচিত প্লাষ্টিক্স হচ্ছে রাসায়নিক বিচারে হাইপলিমার (High polymer) নামে অভিহিত এক জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ। সাধারণভাবে বাংলায় এদের আমরা বলতে পারি অতিকায় রাসায়নিক অণু। 'Poly' শব্দের অর্থ বহু এবং 'mer' শব্দের অর্থ অংশ, অর্থাৎ এক জাতীয় রাসায়নিক অণু আপন কলেবরকে বহুগুণিত করে যে অতিকায় অণুর সৃষ্টি করে, তাকে বলা হয় হাইপলিমার। আর যে অণু এভাবে নিজেকে বহুগুণিত করে, তাকে বলা হয় Monomer, বাংলায় বলা যায় আদিম বা একক অণু। বহু সরল একজাতীয় অণু একক যখন নিজেকে বহুগুণিত করে জটিল অতিকায় অণুর সৃষ্টি করে, স্বাভাবিকভাবে তখন অনুমান করা যেতে পারে একক এবং বহুগুণিত অণুর ধর্মের মধ্যে অনেকটা সামঞ্জস্য থাকবে! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, ঔপাদানিক একক অণুর ধর্মের সঙ্গে অতিকায় অণুর ধর্মের বিশেষ কোন মিল নেই। অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ থেকে প্লাষ্টিক্স জাতীয় অতিকায় অণুর পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য হলো এদের স্থিতিস্থাপকতা, দার্ঢ্য, কাঠিন্য ও সহজে যে কোন আকৃতি গ্রহণের গুণে।

যদিও প্লাষ্টিক্স ইত্যাদি অতিকায় অণুর উদ্ভব সাম্প্রতিক কালে, কিন্তু সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষের খাবার, পরবার এবং থাকবার সকল উপকরণ ও মালমশলা সৃষ্টি হয়ে আসছে অতিকায় অণু থেকে। আমাদের দুটি প্রধান খাদ্য শ্বেতসার ও আমিষ, আমাদের পরিধানের প্রধান উপকরণ কার্পাস, রেশম ও পশম, আমাদের দেহকোষের দুটি প্রধান উপাদান প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড—এসবেরই অণু হচ্ছে অতিকায় জাতীয়। এই অতিকায় অণুগঠিত পদার্থসমূহ যেমন প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায়, তেমনি গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়েও সৃষ্টি করা যায়। আবার স্বাভাবিক অতিকায় অণু যেমন অজৈব ও জৈব দুটি রূপে দেখা যায়, তেমনি কৃত্রিম অতিকায় অণু অজৈব, জৈব ও মিশ্র তিনটি রূপে সৃষ্টি করা যায়। স্ফটিক, গ্র্যাফাইট, অভ্র, অ্যাসবেস্টস, সেলুলোজ ইত্যাদি হচ্ছে স্বাভাবিক অতিকায় অণুর

উদাহরণ। আর মিউ-সালফার, প্লাষ্টিক্স, নাইলন, সিলিকন, রেজিন ইত্যাদি হচ্ছে কৃত্রিম অতিকায় অণু।

গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে অতিকায় অণু সৃষ্টির সরলতম একক হচ্ছে ঈথিলিন। এই ঈথিলিন অণুতে দুটি কার্বন পরমাণু আছে এবং প্রত্যেকটি কার্বন পরমাণুর সঙ্গে দুটি করে হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত থাকে—অর্থাৎ ঈথিলিনের রাসায়নিক রূপ হচ্ছে $CH_2 — CH_2$। এই ঈথিলিন একক অণু থেকে প্রবল তাপ ও চাপে এবং সামান্য পরিমাণ অক্সিজেন অনুঘটকের সান্নিধ্যে পলিঈথিলিন বা পলিথিন অতিকায় অণু সৃষ্টি হয়। সম্প্রতি অক্সিজেন ছাড়া অন্য অনুঘটক আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তাদের সাহায্যে সাধারণ তাপ ও চাপেই ঈথিলিন থেকে পলিথিন সৃষ্ট করা সম্ভব হয়েছে। পলিথিন তাপে নরম হয় এবং গরম অবস্থায় একে নানা আকারের জিনিষে পরিণত করা যায়। পলিথিন জলে ভিজে না এবং কোন অ্যাসিড বা ক্ষারের দ্বারা আক্রান্ত হয় না। এটি একটি উত্তম বিদ্যুৎ-অন্তরক।

এখন যদি ঈথিলিন অণুর কিছু সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু অন্য কোন পরমাণু বা উপাণু (Group) এককের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, তাহলে নূতন রকমের অতিকায় অণু সৃষ্ট হবে। যেমন—ঈথিলিন অণুতে CH_2 উপাণু দুটির মধ্যে একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর একটি যদি ক্লোরিন (Cl) পরমাণুর দ্বারা পর পর প্রতিস্থাপিত হয়, তাহলে পলিভিনাইল ক্লোরাইড বা সংক্ষেপে পি ভি. সি. (Polyvinyl chloride) নামে একটি নতুন অতিকায় অণু সৃষ্টি হবে। এই পলিভিনাইল ক্লোরাইড প্লাষ্টিকের পর্দা, গৃহসজ্জার আচ্ছাদন, বৈদ্যুতিক তার মোড়বার অন্তরক এবং মেজেতে পাতবার কার্পেট ইত্যাদি তৈরির জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমাদের দেশে বোম্বের উপকণ্ঠে ন্যাশন্যাল অর্গানিক কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কারখানায় এখন পি. ভি. সি. উৎপন্ন হচ্ছে।

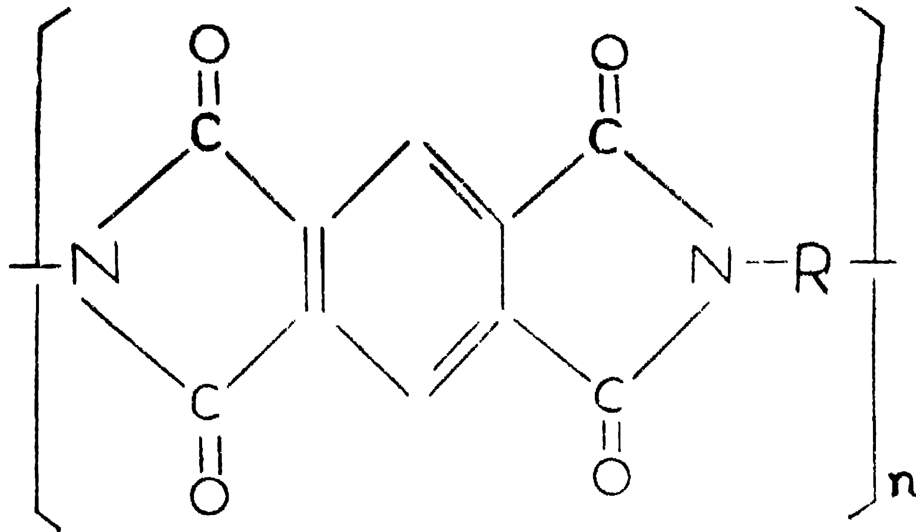
অনুরূপভাবে ক্লোরিন পরমাণুর পরিবর্তে সায়ানাইড (CN) উপাণু দ্বারা হাইড্রোজেন পরমাণু প্রতিস্থাপিত হলে সৃষ্টি হয় অ্যাক্রিলো নাইট্রাইল নামে কৃত্রিম তন্তুর অতিকায় অণু। এই কৃত্রিম তন্তু অরলন, অ্যাক্রিলন ইত্যাদি নানা ব্যবসায়িক নামে বাজারে বিক্রি হয়ে থাকে।

ঈথিলিনের একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর বদলে ফিনাইল ($C_6 H_5$) উপাণু বসালে হয় স্টাইরিন এবং তা বহুগুণিত হলে হয় পলিস্টাইরিন। জলের মত বর্ণহীন এবং কাচের মত স্বচ্ছ বলে এটি কাচের বদলে বহুল ব্যবহৃত হয়। রেডিও যন্ত্রে বিদ্যুৎ-অন্তরক হিসাবে, অভঙ্গুর কাচ নির্মাণে এবং মোটর গাড়ী ও বিমানের আলোর ব্যবস্থায় পলিস্টাইরিনের বিশেষ ব্যবহার দেখা যায়।

কিন্তু গবেষণাগারে উদ্ভাবিত প্রত্যেকটি অতিকায় অণু ব্যবসায়িক দিক থেকে উপযোগী হয় না। এই কারণে পলিঅলিফিন, অ্যাক্রিলিক্স, পলিএস্টার ইত্যাদি যে অতিকায় অণুগুলি ব্যবসায়িক দিক থেকে উপযোগী, তাদের উপরই প্লাষ্টিক্স শিল্পের নজর বেশী। কিন্তু বর্তমানে প্লাষ্টিক্সের উপযোগিতার ক্ষেত্র এত বিস্তৃত ও বিচিত্র হয়েছে যে, কোন অতিকায় অণুর প্রয়োগের সম্ভাব্যতা ভালভাবে যাচাই হয় নি বলে সেটিকে একেবারে অবজ্ঞা করা যায় না। এতদিন পর্যন্ত ভাবা হতো, নূতন উদ্ভাবিত অতিকায় অণুসমূহের অল্পসংখ্যকই ব্যবসায়িক দিক থেকে উপযোগী হয়। কিন্তু এখন প্রয়োজনের ক্ষেত্র এত বিস্তৃত হয়েছে যে, রসায়নবিজ্ঞানী, যন্ত্রবিদ্ ও কারুশিল্পীরা বিশেষ বিশেষ ধরণের প্লাষ্টিক্সের সন্ধান করছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সম্প্রতি উদ্ভাবিত কার্বন তন্তুগঠিত

বস্তুর দার্ঢ্য ও তাপপ্রতিরোধের বিশেষ গুণের জন্তে বিমানযানের যন্ত্রাংশে এখন ব্যবহার করা হচ্ছে। এতদিন পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে প্লাষ্টিক্সের ব্যবহার অসম্ভব বলেই মনে করা হতো। অতি নিম্ন ও অতি উচ্চ তাপমাত্রায় প্লাষ্টিক্স ব্যবহারের উপযোগী নয় বলে একটা ধারণা সাধারণতঃ প্রচলিত আছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, অন্তরক এবং জেট ইঞ্জিনে জ্বালানীর সীল হিসাবে পলিইমাইডস আজ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অধিকাংশ সাধারণ অতিকায় অণু একজাতীয় একক উপাদানের একসারি দীর্ঘ চেন বা শৃঙ্খল যুক্ত হয়ে গঠিত হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, তাপমাত্রার স্থায়িত্ব (অর্থাৎ অধিক শৈত্য বা উত্তাপে বস্তুর ধর্মের তারতম্য না ঘটা) বৃদ্ধি

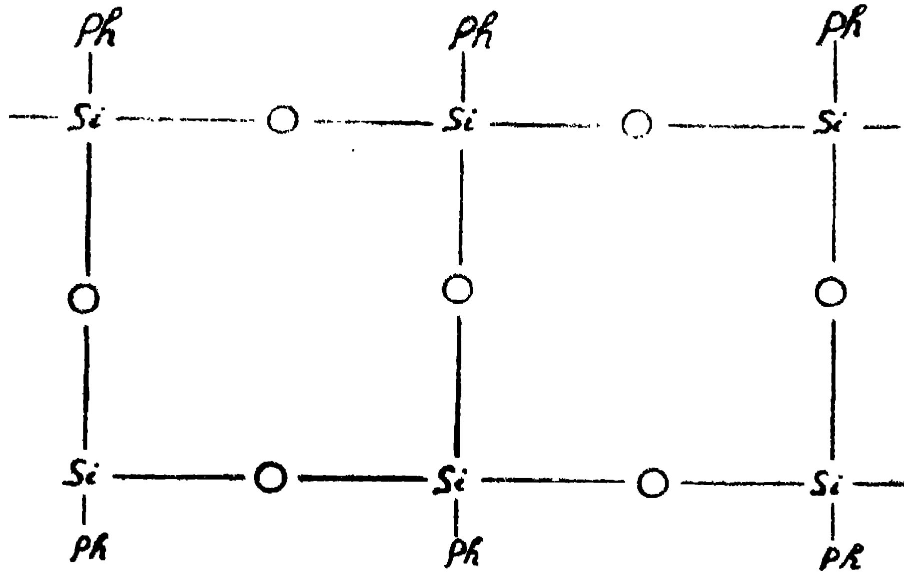


১নং চিত্র
পলিইমাইডস।

এই প্রচলিত ধারণা ভুল। এখন এমন সব নূতনতর প্লাষ্টিক্সের সন্ধান পাওয়া গেছে, যা অতি নিম্ন ও অতি উচ্চ তাপমাত্রায় অদ্ভুত যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক ধর্ম প্রদর্শন করে।

এই ধরণের প্রতিশ্রুতিপূর্ণ নূতন প্লাষ্টিক্সের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পলিইমাইডস্ (Polyimides) (১নং চিত্র)। এদের মধ্যে কোন কোনটি শূন্য ডিগ্রীর নীচে ২৫০° সে. থেকে ৪০০° সে. পর্যন্ত তাপমাত্রায় কার্যক্ষমতা বজায় রাখে। এই বিস্তীর্ণ তাপমাত্রার মধ্যে স্থায়িত্ব, অদ্ভুত প্রতিরোধ ক্ষমতা ও বৈদ্যুতিক ধর্ম বজায় রাখবার গুণ সমন্বিত হয়েছে পলিইমাইডস শ্রেণীর প্লাষ্টিক্স। এই কারণে মহাকাশযানে বিদ্যুৎ-করা যায় সিঁড়ির বিন্যাসে গঠিত অতিকায় অণু (Ladder polymer) সংশ্লেষণ করে। এই ধরণের অতিকায় অণু নির্দিষ্ট ব্যবধানে পারস্পরিক সহ-যোজ্যতা বন্ধনের (Covalent bond) মাধ্যমে দুটি চেন বা শৃঙ্খল জুড়ে গঠিত হয়। এই জাতীয় অতিকায় অণুর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে, পলিভিনাইল সিলসেস্কুইঅকসেন (২নং চিত্র)। বাতাসে ৫২৫° ডিগ্রী সে. পর্যন্ত তাপমাত্রায় এই প্লাষ্টিক্সের ধর্ম অক্ষুণ্ণ থাকে। অদ্ভুত তাপীয় ও বৈদ্যুতিক ধর্মবিশিষ্ট পলিঅ্যারোমেটিক হেটারোসাইকলস্ (Poly aromatic heterocycles) প্লাষ্টিক্স সম্প্রতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এই শ্রেণীর একটি প্লাষ্টিক পলিবেনজিম-

অ্যাজিনোন (Poly benzoxazinone) ২৫০° ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় ১০ বছর পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে। বিশেষ বিশেষ ধর্মবিশিষ্ট অতিকায় অণু নিত্য নূতন সৃষ্টি হওয়ায় তাদের প্রয়োগ-ক্ষেত্র যেমন বেড়ে চলেছে, সেই সঙ্গে উদ্ভাবন করতে পারেন বটে, কিন্তু তার বস্তুগত ধর্ম নির্ণয়ের জন্যে তাঁদের পদার্থবিজ্ঞানী ও ভৌত রসায়নবিজ্ঞানীর সহযোগিতা কামনা করতে হবে। তা না হলে সংশ্লেষিত নূতনতর প্লাষ্টিকের প্রয়োগ-ক্ষেত্র যাচাই করে দেখা সম্ভব



২নং চিত্র
পলিভিনাইল সিলসেস্কুইঅক্শেন।

কিছু সমস্যারও উদ্ভব হচ্ছে। নূতন নূতন প্লাষ্টিক্সের প্রয়োগ-ক্ষেত্র ও তাদের ব্যবসায়িক উপযোগিতা যাচাই করে দেখবার জন্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। সংশ্লেষণ রসায়নবিজ্ঞানীরা নূতনতর প্লাষ্টিক্স হবে না। আজ বিজ্ঞান এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে যে, কোন এক বিশেষ শাখার বিজ্ঞানীর একক চেষ্টায় সামগ্রিক অভীষ্ট ফল লাভ করা সম্ভব নয়, বিভিন্ন শাখার গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হতে পারে।

বাংলায় বিজ্ঞান-কোষ হবে কি ?

শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আজ কারও মনে সন্দেহ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার, অধ্যাপক, বিজ্ঞানী সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারের জন্যে ও বিজ্ঞান-শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষাই সবচেয়ে উপযোগী। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এই বিষয়ে অনেক দূর কাজ এগিয়ে গেছে। হিন্দী, মারাঠি, তেলেগু, গুজরাটি প্রভৃতি ভাষায় বিজ্ঞান-কোষগ্রন্থ লেখা হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় ১৯৩৬ সালে প্রণীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা[1] ছাড়া আর কোন বৈজ্ঞানিক পরিভাষার বই পাওয়া যায় না। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ (বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ নয়) এরও আগে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা[2] নামক একটি বই প্রকাশ করেন ১৯৩৩ সালে। এটি অবশ্য সাধারণলভ্য নয়। বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নতুন করে পরিভাষা তৈরির কাজে আবার হাত দিয়েছেন। বাংলায় বিজ্ঞান যাঁরা পড়েন বা বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ে যাঁরা লেখেন, তাঁদের কয়েকটি বিশেষ সমস্যার আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে প্রায় সত্তর বছর ধরে। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এপর্যন্ত যা লেখা হয়েছে, তা সাধারণ লেখক বা পাঠকের কাছে দুর্লভ। ৩২ বছর আগে অধুনালুপ্ত প্রকৃতি পত্রিকায় অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী মহাশয় একটি পত্র প্রকাশ করেছিলেন 'বাংলা ভাষার গ্রন্থপঞ্জী'[3] নামে। এই পত্রটিতে ১৮০টি বিভিন্ন পত্র ও রচনার উল্লেখ আছে। মূল পত্রটি বা তাতে উল্লিখিত কোন পত্রই সহজলভ্য নয়। এর কোনটিকে আধুনিক বলা চলে না, তবু এগুলি হাতের কাছে থাকলে লেখক ও পাঠক উভয় গোষ্ঠীরই অনেক সুরাহা হতো। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে যে সব পরিভাষা সংক্রান্ত পত্র প্রকাশিত হয়েছিল, তার একটি সঙ্কলন অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ীর কাছে আজও আছে। এগুলি আধুনিক না হলেও এর পুনর্মুদ্রণ প্রয়োজন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান লেখার চেষ্টা যাঁরা করেন, তাঁদের অবগতির জন্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় অভিধান গ্রন্থের কথা জানানো প্রয়োজন মনে করি—শ্রীচারুচন্দ্র গুহ মহাশয়ের 'দি মডার্ণ অ্যাংলো বেঙ্গলী ডিক্‌শনারী'[4]। তিন খণ্ডে প্রায় ৩০০০ পাতায় সম্পূর্ণ এই অভিধান যে কোন বিষয়ে পরিভাষা খোঁজবার জন্যে একটি স্বর্ণখনি বিশেষ। প্রকাশনার কাল ১৯১৬/১৯ থেকেই বোঝা যাবে যে, আধুনিক বিজ্ঞানের কোন কথা অবশ্য এতে নেই। যতদূর জানা আছে, এর কোন সংস্করণ বেরোয় নি এবং অল্প কয়েকজনের কাছে এর সন্ধান মিলবে।

বাংলায় যাঁরা বিজ্ঞান পড়তে চান, তাঁদের পক্ষে সবচেয়ে বড় অসুবিধা এই যে, কোন বাংলা অভিধানে পারিভাষিক শব্দ বর্ণানুক্রমিক ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় নি। দুটি অভিধানের শেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা পরিশিষ্ট হিসাবে দেওয়া আছে। রাজশেখর বসু প্রণীত চলন্তিকায়[5], কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনার মত বিষয় অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাজানো ইংরেজী ও

তার বাংলা প্রতিশব্দ আছে। সংসদ বাংলা অভিধানের[*] পরিশিষ্টে বিজ্ঞানের শব্দগুলি ইংরেজীতে বর্ণানুক্রমিক সাজানো। এটা অনুবাদকের কাজে আসে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানে অনুরাগী পাঠকের এতে কোন সুরাহা হয় না। বিজ্ঞানের রচনার কোন নতুন শব্দ পেলে তার অর্থ জানবার কোন সুযোগ এখানে নেই। বাংলায় ব্যাখ্যামূলক অভিধান বিজ্ঞান ভারতীতে[৭] অনেক ইংরেজী শব্দের ব্যাখ্যা আছে বটে, তবে তাতে মূল বাংলা শব্দের সংখ্যা বা পারিভাষিক শব্দের তালিকা অতি অল্প। নতুন কোন পারিভাষিক শব্দ তৈরি না করে যদি কেউ বর্তমানে চালু পারিভাষিক শব্দগুলির বাংলায় বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজিয়ে দেন, তাহলেও তিনি বাঙালী পাঠকের অকুণ্ঠ সাধুবাদ লাভ করবেন। বাংলায় বিজ্ঞান রচনায় পাঠক যে নেই, তার প্রধান কারণ বিজ্ঞানের জন্যে বাংলায় কোন অভিধান নেই। ইচ্ছা থাকলেও পাঠকদের জ্ঞানপিপাসা মেটাবার কোন উপায় নেই। পাঠকদের প্রয়োজন আরও একটু বেশী। কেবলমাত্র একটি শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ জেনে কোন লাভ নেই—সেই শব্দটির ব্যবহার প্রাঞ্জল বাংলায় বোঝা দরকার; অর্থাৎ প্রয়োজন একটি বিজ্ঞান-কোষের। আজ প্রায় এক-শ' বছর ধরে বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ে লেখা হচ্ছে—অথচ আজও কোন বিজ্ঞান-কোষ রচিত হয় নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ভারতকোষের[৮]। ভারতকোষের যে কয়টি খণ্ড বেরিয়েছে তাতে বিজ্ঞান বিষয়ে রচনা অতি সামান্য। যে রচনাগুলি আছে, তারও ভাষা কোন অভিধানে না থাকায় তার অর্থ উদ্ধার করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। কেবল মাত্র বিশেষজ্ঞেরাই এথেকে অর্থ উদ্ধার করতে পারবেন। অন্যান্য ভারতীয় ভাষায়, যেমন তেলেগু[৯] বা মারাঠি[১০] ভাষায় ছাপা বিজ্ঞানের কোষগ্রন্থ নজরে পড়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় মোটামুটি মোট হাজার দশেক শব্দ আছে। স্কুল বা কলেজে পাঠ্য বিভিন্ন বিষয়গুলির পক্ষে তা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ইংরেজী-হিন্দী বিজ্ঞান-শব্দাবলীতে[১১] আছে প্রায় ৫৫,০০০ শব্দ। মোটামুটি B. Sc. (Pass) পর্যন্ত বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে যে সব কথা ব্যবহার হয় তা এতে পাওয়া যাবে। এটিও ইংরেজীতে বর্ণানুক্রমিক; অর্থাৎ কোন হিন্দী কথার অর্থ খোঁজবার প্রয়োজন হলে মুস্কিল। ইংরেজী হিন্দী অভিধানের কথায় ফাদার বুল্‌কে প্রণীত 'অংরেজী-হিন্দী কোষ'[১২]টিও উল্লেখযোগ্য।

একথা সকলেই স্বীকার করেন যে, অনেক বিদেশী কথার বাংলা প্রতিশব্দ নেই। সে ক্ষেত্রে নতুন অপ্রচলিত বাংলা শব্দ তৈরি না করে বিদেশী শব্দটিকে বাংলায় চালু করা হোক। কথাটা ঠিক, কিন্তু লেখকের সমস্যা—কেমন করে বিদেশী শব্দটিকে আত্মসাৎ করা যায়। কারণ কথাটি বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, সর্বনাম নানাভাবে আসবে। তার কোন্‌টি বাংলায় নেওয়া হবে? উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক interference, অধিকাংশ ভারতীয় ভাষায় বলা হয় ব্যাতিকরণ—কথাটা খট্‌মটে বলে মনে হয় interference-কে বাংলায় ব্যবহার করলে কেমন হয়? কিন্তু সমস্যার কথাটা অনেক ভাবে আসে। যেমন—interference, interfering, to interfere, interferometer—বাংলায় কোন্‌টি নেওয়া হবে? এমন উদাহরণ আরও দেওয়া যায়। যেমন plastic, to plasticise, plasticated, plasticity অথবা to hydrate, hydrated, hydration, anhydrous ইত্যাদি। বিদেশী শব্দ ব্যবহার করতে গেলে সর্ববাদীসম্মত কতকগুলি নিয়ম বেঁধে নেওয়া দরকার। অবশ্য নিয়মকানুনের জন্যে লেখা বন্ধ নেই। তার ফল নানা ক্ষেত্রে

বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। যেমন ধরুন atomic energy—ভারতীয় ভাষায় অণুশক্তি, আণবিক শক্তি, পারমাণবিক শক্তি নানারূপ ব্যবহার হয়ে থাকে। এমন কি অণুশক্তি কেন্দ্র বলে পোষ্ট অফিসও হয়েছে। বিজ্ঞানের দিক থেকে ইংরেজী বা বাংলা কোনটাই ঠিক নয়। হওয়ার কথা nuclear energy বা পরমাণুকেন্দ্রীন শক্তি। এখানেও দেখুন আমরা যদি নিউক্লিয়াস কথাটা ধার করি তবে nuclear বোঝাতে নিউক্লিয়ার বলবো না নিউক্লীয়—অ্যাটমিক না অ্যাটমীয়। এখন থেকেই একটা নিয়মের মধ্যে না গেলে ভবিষ্যতে বিতর্কের আর শেষ থাকবে না। শব্দের বিভিন্ন রূপগুলি পরিভাষা এবং কোষের অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

বাংলায় বিজ্ঞানের ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে গেলে সে সম্বন্ধে গবেষণা প্রয়োজন সে কথা বলাই বাহুল্য। এই গবেষণা কেমন হতে পারে, তার উদাহরণ হিসাবে শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী প্রণীত "প্রাণীবিজ্ঞানের পরিভাষা"[১১] দেখতে হয়। বাংলায় বিজ্ঞানে এরূপ প্রচেষ্টা আর হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এই বইটিও বিস্মৃতির অতল গহ্বরে চলে গেছে। অধ্যাপক ভাদুড়ী নিজে আমাকে এটি না দেখালে জানবার সুযোগ কোনদিনই হতো না। একটি বাংলা প্রতিশব্দ খোঁজবার প্রচেষ্টা তিনি কেমন ভাবে করেছেন, তার উদাহরণ এখানে দেওয়া হলো। মোট ১২৪টি শব্দ সম্বন্ধে গবেষণা এতে আছে। কেবল মাত্র শব্দটির ব্যবহারের উদ্ধৃতি থাকলেই প্রচেষ্টাটি সর্বাঙ্গসুন্দর হতো।

[৭৮। Parasite—[Gk. para, beside ; sitos, food.] An organism living with or within another to its own advantage in food or shelter. p. 227.

"Parasite (Gr. parasitos, one who lives at another's table), an organism which nourishes itself at the expense of another living organism without making any return."*

"Parasite. An animal which lives in or another species of animal (its host), at the expense of the latter."†

"Parasite. (Gr. parasitos, one who eats at another's expense), an animal that lives in, on, or at the expense of another animal,"‡

১৮৫১ (One who dines with others or sponges on his neighbor) পরান্নঃ, পরান্নভোজী, পরান্নভক্ষী, পরান্নপুষ্ট, পরাবরুচি, পরপাকরুচিঃ পরপিণ্ডদঃ, পাত্রেসমিতঃ, পীঠকেলিঃ, পীঠমর্দ্দঃ—(In botany, a plant which attaches itself to others) বৃক্ষরুহা, তরুরুহা, তরুরোহিণী, তরুভুক্, বৃক্ষদনী, পরাশ্রয়া, বন্দা, বন্দাকা, জীবন্তিকা, আকাশবল্লী, খবল্লী, উপদী, Williams, M., Dict. Eng. Sans. p. 571.

১৮৯৩ পরান্নভোজিন, পরান্নপুষ্ট, পরপিণ্ডাদ, পাত্রেসমিতঃ, Apte, V. S., Student's Eng. Sans. Dict., P. 305

১৩০১ পরজীবী, যোঃ রায়, নব্যভারত, ১২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১৬৭

১৩০৭ পরান্নপুষ্ট, সুঃ মহলানবিশ, সাহিত্য, ১১ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৬৪৯

১৩০৭ পরভৃত—স্বাস্থ্য, পৃঃ ১০০

---

* Dendy, A., 'Outlines of Evolutionary Biology', Glossary of Technical Terms, p. xxxi (1918).

† Shull, A. F., 'Principles of Animal Biology', Glossary, p. 394 (1920).

‡ Hegner, R. W., 'An Introduction to Zoology', Glossary, p. 332 (1926).

১৩০৭ পরভুক, জঃ রায়, প্রদীপ, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৫২

১৩০৯ পরদেহবাসী, শঃ মিত্র, নব্যভারত, ২০ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৫৯

১৩১০ পরজীবী, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪২

১৯০৪ কীটাণু, তাঃ নাঃ রায়, ভিষক-দর্পণ, ১৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১২৮

১৩১৩ পরপুষ্ট, শঃ রায়,নব্যভারত, ২৪ (৫৯ সংখ্যা) পৃঃ ২৩৯

১৩১৪ মোসাহেব, জ্ঞাঃ রায়, প্রবাসী, ৭ (১২শ সংখ্যা) পৃঃ ৭৩০

১৮২৯ শক পরভুক্, জঃ রায়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭ (১ম ভাগ) পৃঃ ১০৭

১৯১১ জীবিতাশী, হঃ সেন, ভিষক-দর্পণ, ২১ (১০ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৬১

১৩১৮ পরাঙ্গপুষ্ট, অঘোঃ বসু, বসুধা, ১১ (১১।১২ সংখ্যা) পৃঃ ৩৯৩

১৩১৮ প্যারাছাইট, খঃ সরকার, কৃষি সম্পদ ২ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ৭৬

১৩১৯ পরাস্ততঃপুষ্ট (কীট) শি সেন, সাহিত্য, ২৩ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২০৮

১৩২১ পরভোজী, কেঃ গুপ্ত, অর্চনা, ১১ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ৯৮

১৯১৪ পরাশ্রয়ী, অঃ বসু, বিজ্ঞান, ৩ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ৩২৯

১৯১৫ পরভুক,—বিজ্ঞান, ৪ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৪৯৩

১৯১৭ পরজীবী, পরের গলগ্রহ ব্যক্তি, পরপিণ্ডাদ, পরসম্ভোগজীবী (হিঃ কোঃ) পরভাগ্যোপজীবী, পরান্নভোজী ; পরপুষ্টজীবী, পরাস্তঃপুষ্ট জীব, পরাঙ্গপুষ্ট জীব, পরগাছা, বৃক্ষরুহ, Guha, C. Modern Ang-Beng. Dict. 11 P. 1500

১৯১৮ পরাশ্রয়ী, অশ্বিঃ দত্ত ও ক্ষিঃ ঘোষ, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, পৃঃ ১৫৮

১৩২৮ পরাঙ্গপুষ্টজীব, শঃ রায়, নব্যভারত, ৩৯ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১০৫

১৩৩২ অন্তর্জীবালম্বী কীট, শিঃ চট্টোঃ, মাঃ বসুমতী, ৪ (২য় খঃ) পৃঃ ৫০৩

১৩৩৩ পরপুষ্ট জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৩৪৬

১৩৩৪ পরপুষ্ট, পরভোজী, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৪ (৪র্থ সংখ্যা) ৩৪৬

১৩৩৫ পরপুষ্ট, পরাশ্রয়, পরাচিত, পরিকন্দ, পরভৃত, পরজাত, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৫ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৩৭

১৩৩৫ পরাঙ্গপুষ্ট জীব, নৃঃ বসু, সুবর্ণ বণিক সমাচার, ১২ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৩২১

১৩৩৬ পরাচিত (nourished by another, parasite) রঃ ঠাকুর, সাঃ পঃ পঃ, ৩৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১৯৩

১৩৩৬ পরাণুপুষ্ট জীব, ধীঃ চৌধুরী, বিচিত্রা, ৩ (২য় খঃ) পৃঃ ১৪০

১৩৪০ পরজীবি (যোঃ রায়), পরাশ্রিত (রঃ ঠাকুর), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪২

জার্মান—Parasit.

ফ্রেঞ্চ—Parasite.

ইতালীয়—Parasito.

ল্যাটিন—Parasitus.

Parasite-এর মোটামুটি এইরূপ বাংলা অর্থ করা যাইতে পারে, যে জীব অপর জীবের সহিত বা তাহার শরীরাভ্যন্তরে থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে, তাহা আশ্রয়ের দিক দিয়া হউক বা ভাগ্যের দিক দিয়া হউক। ইহার পরিভাষা প্রায় সকলেই পৃথক পৃথক শব্দ সৃষ্টি করিয়া প্রবন্ধাদিতে ব্যবহার করিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক শব্দের মধ্যে কিছু না কিছু ইংরেজী ব্যাখ্যা নিহিত আছে। সকলগুলি লইলে পরিভাষার কাজ চলিবে না। ইহাদের মধ্যে একটি বা দুইটি শ্রুতিমুখকর শব্দ গ্রহণ করিয়া প্রাণি-

বিজ্ঞানের কাজ চালাইতে হইবে। আমরা যোগেশবাবুর 'পরজীবী' (১৩০১, ১০) শব্দটি শ্রুতিমধুর এবং ছোট বলিয়া গ্রহণ করিতে অভিলাষী। এই শব্দটি রাজশেখরবাবু (১৩৪০) ব্যতীত অপর কেহ গ্রহণ করেন নাই; বরং অনেকেই 'পরাঙ্গপুষ্ট' (১৩০৭, '১৮, '২৮, '৩৫,) 'পরপুষ্ট' (১৩১৩, '৩৩, '৩৫) বা 'পরভোজী' (১৩২১, '৩৪) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইংরেজী অর্থের সকল দিক ইহার কোনটির মধ্যে বজায় নাই। সুতরাং যে শব্দই সঙ্কলন করি না কেন, সেই শব্দের মধ্যে অর্থ আরোপ করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা কেন যে 'যোগেশবাবুর পরজীবী' শব্দটি লইতে চাহি, তাহার কারণ বিন্যাস করা সুকঠিন। উপরি-উক্ত প্রত্যেক শব্দটি শ্রুতিসুখত্ব এবং অর্থ বিচার করা মতসাপেক্ষ এবং সে বিচারের মাপ-কাঠি নির্ধারণ করা আরও কঠিন। 'পরজীবী' আমাদের নিকট ছোট, শ্রুতিমধুর শব্দের দিক দিয়া ভাল লাগিতেছে বলিয়া লইলাম, আর কোনও কারণ নাই।

অপর ক্ষেত্রে যেখানে বাংলা পারিভাষিক শব্দের গোলমাল দেখিয়াছি, সেইখানে আমরা ইংরেজী শব্দ অক্ষরান্তরিত করিয়া লইবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছি। এক্ষেত্রে সরকার মহাশয় (১৩১৮) 'প্যারাসাইট' লেখা সত্ত্বেও আমরা সে সুযোগ গ্রহণ করিলাম না। ইহার কারণ নির্দেশ করাও শক্ত। 'প্যারাসাইট' জোর করিয়া চালাইলে চলিবে না, এমন কথা বলিবার ধৃষ্টতা রাখি না, তবে 'পরজীবী' চলিবার অধিকতর সম্ভাবনা আছে বলিয়া ইংরেজী অক্ষরান্তরিত শব্দ উপস্থিত গ্রহণ করিলাম না। বিদেশীয় সব ভাষাতেই মোটামুটি Parasite ঠিক আছে।

পরজীবী—(Parasite)

অর্থ :—যে জীব অপর জীবের সাহচর্যে বা শরীরাভ্যন্তরে থাকিয়া নিজের স্বার্থের জন্য আহার অথবা আশ্রয় যে দিক দিয়া হউক, জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে।]

বাংলায় লেখা প্রবন্ধগুলি থেকে বিশেষ করে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, জগদানন্দ রায়, মেঘনাদ সাহা, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, নীলরতন ধর, প্রিয়দারঞ্জন রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ বিজ্ঞানীদের লেখা থেকে এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানে গত ২০ বছরে যে সব রচনা বেরিয়েছে তার থেকে বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দের ব্যবহারের উদাহরণ কোষগ্রন্থে সংযোগ করলে লেখক ও পাঠক উভয় পক্ষই উপকৃত হবেন।

শ্রদ্ধেয় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত শব্দ-কোষে[১৪] আধুনিক বিজ্ঞানে প্রচলিত শব্দগুলি নাই বটে, কিন্তু প্রাচীন হিন্দুবিজ্ঞানে ব্যবহৃত শব্দগুলি আছে। যে শব্দগুলি আছে তার সম্বন্ধে যা কিছু জানার সবই পাওয়া যাবে।

উদাহরণস্বরূপ দেখা যাক রাশি :—

রাশি

পুং [√অশ্ +ই (ইণ্) -ক, উ ৪.১৩২; 'রাশি'—সমূহ (সায়ণ—ঋগ্বেদ ৪ ২০.৮); 'রাশি' (পুং, স্ত্রী—ত্রিকাণ্ডশেষ)]১ 'ব্যাপক' পুঞ্জ, কূট সমূহ। তিল, ধন, ধান্য, যশো। তুল শ ১.১০। সপ্ত রঘু ১৫.১৫। পয়োরাশি।—হি ২.১৪। রাশি রাশি শুভ্রহাস্তে চ.কা ১১১; বুকভরা আলিঙ্গন রাশি ২১২। ২ (গণিতে সংখ্যা (number)। "ত্রৈরাশিক, বহুরাশিক। বড় হতে ছোট রাশি যত কম হয় (তাহাই হইবে বাকি) শুভঙ্কর। ৩ (জ্যোতিষে) জ্যোতিশ্চক্রের দ্বাদ-শাংশ—মেষাদি। "যে যে মাসে যে যে রাশি তার সপ্তমে থাকে শশী॥—খনা। [গত (বিণ) —রাশিপ্রাপ্ত, পুঞ্জীভূত। চক্র (ক্লী)—মেষাদি রাশিঘটিত বৃত্ত; জ্যোতিশ্চক্র। "প.ভূ ৫৫। ত্রয় (ক্লী)—ত্রৈরাশিক (Rule of three)।

নাম (-মন) ক্লী—রাশিগত নাম ; জন্মরাশির বর্ণনানুসারে কৃত নাম, রাশনাম। প (পুং)—রাশিদেবতা। প্রবিভাগ (পুং) রাশিসংখ্যানানুসারে সপ্তবিংশতি নক্ষত্র-বিভাগ। ব্যবহার (পুং) শস্য-রাশির পরিমাণজ্ঞানার্থ অঙ্কবিশেষ। ভাগ (পুং) ভগ্নাংশ। ভোগ (পুং)—সূর্যাদিগ্রহের গত্যনুসারে রাশিতে গতিভেদ (ত. বা)। স্থ (বিণ)—মেষাদিস্থিত (গ্রহ)।]

গত এক-শ বছর ধরে বাংলায় বিজ্ঞান লেখার পর আজকে যে পরিস্থিতি তাতে শব্দকোষের সমান মানের বিজ্ঞান-কোষ বাংলায় কতদিনে তৈরি হবে, সে কথা কল্পনা করাও মুস্কিল। অথচ কোন শব্দের ব্যুৎপত্তি, ব্যবহারের ইতিহাস না জানলে সেই শব্দের অধিকাংশই অজানা থেকে যায়।

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাতেই পরিভাষা তৈরির চেষ্টা চলছে। ভবিষ্যতে এক ভারতীয় ভাষাভাষী যাতে অন্যদের সঙ্গে মোটামুটি সংযোগ রাখতে পারেন, তার জন্যে অন্যান্য ভাষায় কে কি করছেন জানা একান্ত প্রয়োজনীয়। এরকম একটি প্রচেষ্টা একক ভাবে করেছেন বিশ্বনাথ দিনকর নরবণে তাঁর "ভারতীয় ব্যবহার কোষে"[১৫]। প্রচেষ্টাটি বিজ্ঞানের জন্যে নয় এবং ঠিক পেশাদারী না হলেও ষোলটি ভাষায় একই শব্দের বিভিন্ন রূপ বা কতকগুলি একই রূপে চলে, তা জানতে অনেক সময়ই ইচ্ছা হয়। যাঁরা জাতীয় সংহতি নিয়ে মাথা ঘামান তাঁরা বিজ্ঞানের জন্যে এমন একটি প্রচেষ্টা নিলে পারেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পাঠকদের জন্যে ষোলটি ভাষায় কয়েকটি শব্দের তালিকা দেওয়া হলো।

বাংলা	জ্যামিতি	শামুক	সর্প, সাপ
ইংরেজী	জিওমেট্রি	স্নেল	স্নেক
হিন্দী	ভূমিতি, রেখাগণিত	ঘোঁঘা	সাঁপ
পাঞ্জাবী	রেখাগণিত	ঘোগ্গা, কোহগ্গা	সপ্প
উর্দু	অক্লীদস, মসাহত	ঘোঁগা	সাঁপ
কাশ্মিরী	জাম্ট্রি	হাংগিন্য	সরুফ্
সিন্ধি	রেখাগণিত, ভূমিতি	ঘোঘিতো	নাংগু
মারাঠি	ভূমিতি	গোগলগায়ে	সাপ, সর্প
গুজরাটি	ভূমিতি	গোকলগায়ে	সাপ
অসমীয়া	জ্যামিতি	শামুক	সাপ
ওড়িয়া	জ্যামিতি	গেণ্ডা	সাপ
তেলেগু	রেখাগণিতম	নত্ত	পামু
তামিল	রেখাগণিতম্	নত্তৈ	পাম্বুঁ
মালয়লম	ক্ষেত্রগণিতম	অলচুঁ, ওলচুঁ	পাম্বুঁ
কানাড়া	রেখাগণিত	বসওনহুলু	হাযু
সংস্কৃত	ভূমিতি	মখর, শম্বুক	সর্প

একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, আধুনিক বিজ্ঞান অতি দ্রুতহারে বিস্তার লাভ করছে। আজ পর্যন্ত যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার হচ্ছে তার কোষ তৈরি করলেই কাজ শেষ হলো না।

প্রতি বছরই নতুন নতুন কথা সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং কোষ তৈরির কাজ চলতেই থাকবে। আরও একটা বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বিজ্ঞান-কোষ তৈরি একটি সখের খেয়াল নয়। একজন বা কয়েকজন জনহিতৈষী তাঁদের অবসর সময়ে দু-চারটি শব্দ নিয়ে মাথা ঘামাবেন এবং সেটা কোষ হয়ে বেরুবে তাহলে আবার ৫০ বছর বসে থাকতে হবে এবং শব্দ-কোষের মত যখন বেরুবে তখন সেটা ৫০ বছরের পুরনো। বাঙ্গালীর ভাষার অভিমান বড় বেশী, কিন্তু অভিধান বা কোষের ক্ষেত্রে তার পরিচয় বড় দুর্বল। তার জন্যে যে অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দরকার তার বড়ই অভাব। সরকার, পরিষদ, বিদ্যালয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চেষ্টা না করে সকলে মিলে এক হয়ে চেষ্টা করলে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে বাংলায় বিজ্ঞান-কোষ হবে। আমি মনে করি, আর কেউ না করলেও বিজ্ঞান পরিষদের এটা মহান দায়িত্ব।

---

১ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬০)

ভূমিকা—শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৮ই মে ১৯৩৬

২ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা : বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও কলিকাতা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯৩৩।

৩ "বাংলা পরিভাষার গ্রন্থপঞ্জী" শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী

প্রকৃতি, ১৪শ বর্ষ (১৩৪৪) গ্রীষ্ম সংখ্যা।

৪ The Modern Anglo Bengali Dictionary ; (A comprehensive lexican of bi-lingual literary, scientific and technological words and terms), Charuchandra Guha, 3 volumes, Bengal Library, Dacca (1916-19).

৫ চলন্তিকা : রাজশেখর বসু, দশম সংস্করণ ১৩৭৩। এম, সি, সরকার এণ্ড্ সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২।

৬ সংসদ বাংলা অভিধান : শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ বিশ্বাস। সাহিত্য সংসদ, ৩২এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। ১৯৬৪।

৭ বিজ্ঞান ভারতী : শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। এম, সি, সরকার এণ্ড্ সন্স, কলিকাতা-১২।

৮ ভারত কোষ : ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা। ১৯৬৫।

৯ ভৌতিক রসায়নম শাস্ত্রমুলু : তেলেগু ভাষা সমিতি, ১-১-২৯৯ নিঝোলি আড্ডা, হায়দ্রাবাদ-২৭। ১৯৬৪।

১০ শাস্ত্রীয় পরিভাষা কোষ : The English Indian Dictionary of Scientific Techonology : যশোবন্ত রামকৃষ্ণ দাতে ও চিন্তামন গণেশ কার্ভে। মহারাষ্ট্র কোষমণ্ডল লিঃ, ৩ বুধাওর গেট, পুণা-২। (১৯৪৮)

১১ বিজ্ঞান শব্দাবলী : Central Hindi Directorate, Ministry of Education. 1964.

১২ আংরেজী-হিন্দী কোষ : কাদার কামিল বুল্কে : ক্যাথলিক প্রেস, রাঁচী, ১৯৬৮।

১৩ প্রাণীবিজ্ঞানের পরিভাষা : শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী : প্রকৃতি কার্যালয়, কলিকাতা। (১৯৩৭ ?)

১৪ বঙ্গীয় শব্দকোষ—দুই খণ্ড—হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় : সাহিত্য একাদেমী (১৯৬৬)।

১৫ ভারতীয় ব্যবহার কোষ (সোলহ ভাষাওঁ কা শব্দকোষ) : সম্পাদক, বিশ্বনাথ দিনকর নরবণে, ত্রিপাঠি সঙ্গম, সারা মঁশন গোখলে রোড (উত্তর) দাদর, বোম্বাই-২৮।

বেতার-তরঙ্গ ও আয়নমণ্ডল সম্বন্ধে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার গবেষণা

সতীশরঞ্জন খাস্তগীর

ভূমিকা

১৯২৩ সনে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হবার কয়েক বছর পর থেকেই বেতার-তরঙ্গ ও আয়নমণ্ডল সম্বন্ধে তিনি তাঁর ছাত্রদের নিয়ে তত্ত্বীয় ও পরীক্ষামূলক গবেষণা আরম্ভ করেন। এই বিষয় নিয়ে যে কয়েকজন তরুণ গবেষক সে সময়ে অধ্যাপক সাহার নির্দেশ অনুসারে কাজ করেন, তাঁদের মধ্যে গোবিন্দ রায় তোশ্‌নিয়াল, রামনিবাস রায়, বি. ডি. পন্থ ও রামরতন বাজপেয়ী ও কল্যাণ বকৃস্‌ মাথুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক সাহার পরিচালনায় এই গবেষণার সিদ্ধান্তগুলি বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই সব গবেষণার বিবরণ সংক্ষেপেও যদি দিতে হয়, তবে ভূমিকা স্বরূপ বেতার-তরঙ্গ ও আয়নমণ্ডল সম্বন্ধে প্রথমেই কিছু আলোচনার প্রয়োজন।

আয়নমণ্ডল ও আকাশ-তরঙ্গ

বেতার-প্রেরক কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সাধারণতঃ এরিয়েলের সব দিকেই ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর গা বেয়ে যে তরঙ্গ যায়, তাকে ভূ-তরঙ্গ (Ground wave) বলা হয়। এই ভূ-তরঙ্গ যখন ভূ-পৃষ্ঠতলে অগ্রসর হতে থাকে, পৃথিবীর মাটি তখন এই তরঙ্গকে ক্রমশঃ শোষণ করে নেয়। শোষণের ফলে বেশী দূর যেতে না যেতেই ভূ-তরঙ্গ তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে ফেলে। এই শক্তি-হ্রাসের হার প্রধানতঃ মাটির তড়িৎ-পরিবাহিতার উপর নির্ভর করে। দীর্ঘ বা মধ্যম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ ভূ-পৃষ্ঠের উপর কয়েক শত মাইল পর্যন্ত যেতে পারে —হ্রস্ব-তরঙ্গের দৌড় তার চেয়েও কম। অথচ দেশ-দেশান্তর থেকে কথা বা গান বেতারে শোনা যায়। বেতারের আদি পর্বেই মার্কোনি আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে প্রায় ২০০০ মাইল পর্যন্ত বেতার-তরঙ্গ পাঠিয়েছিলেন। এ কি করে সম্ভব হতে পারে—তার উত্তর দিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী হেভিসাইড (Heaviside) ও আমেরিকার বিজ্ঞানী কেনেলী (Kennelly)। ১৯০২ সনে এই দু-জন বিজ্ঞানী প্রায় একই সময়ে এই মত প্রচার করেন যে, পৃথিবী থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে একটি তড়িৎ-পরিবাহী স্তর আছে। বেতার-প্রেরক কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উপরের দিকে উঠে এই স্তরটির উপর গিয়ে পড়ে এবং প্রতিফলিত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসে। এই স্তরটির নামকরণ হয়েছিল—কেনেলী-হেভিসাইড স্তর। এই স্তর থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গকে 'আকাশ-তরঙ্গ' বলা হয়। বেতার-প্রেরক কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যখন একদিকে হেলে এই স্তরে আপতিত হয়, তখন এই তরঙ্গ ঐ স্তর থেকে ঠিক বিপরীত দিকে হেলে প্রতিফলিত হয়ে বেতার-প্রেরক কেন্দ্র থেকে দূরে ভূ-পৃষ্ঠে আবার নেমে আসে। আকাশ-তরঙ্গের সাহায্যে দূর-দূরান্তরে বেতার-বার্তা প্রেরিত হয়। বহু বছর আগে পৃথিবীর চৌম্বক বলের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঊর্ধ্বে একটি তড়িৎ-পরিবাহী স্তরের কল্পনা করা হয়েছিল—কেনেলী-হেভিসাইড এই

পুরাতন পরিকল্পনারই নূতন যুক্তি দিলেন। এই তড়িৎ-পরিবাহী স্তর থেকে বেতার-তরঙ্গ কি প্রক্রিয়ায় নেমে আসে ১৯১২ সনে ইংল্যাণ্ডের ইক্‌ল্‌স্ (Eccles) ও পরে ১৯২৪ সনে লারমার (Larmor) এই বিষয়ের আলোচনা করেন। ১৯২৫ সালে সর্বপ্রথম আমেরিকার ব্রাইট (Breit) ও টুভ (Tuve) কেনেলী-হেভিসাইড স্তরের পরীক্ষাগত প্রমাণ দেন। ইংল্যাণ্ডে প্রায় একই সময়ে অ্যাপল্‌টন (Appleton) ও তাঁর সহ-কর্মীরা এই তড়িৎ-পরিবাহী স্তরটির অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। এর এক বছর পরেই অ্যাপল্‌টন উর্ধ্বে আরও একটি অনুরূপ স্তর আবিষ্কার করেন। আজকাল এই দুই স্তরের নীচেরটিকে —অর্থাৎ কেনেলী-হেভিসাইড স্তরটিকে E-স্তর ও উপরেরটিকে F-স্তর বলা হয়। E-স্তরের ঠিক নীচে আরও একটি স্তরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই স্তরটি বেতার-তরঙ্গকে শোষণ করে ও কচিৎ কখনও প্রতিফলিত করে। এরই নাম D-স্তর। সাধারণতঃ সূর্যোদয়ের পর থেকেই এই স্তরটি দেখা দেয়। দিনের বেলায় এবং কখনও কখনও রাত্রে F স্তরটি যে দুই ভাগে বিভক্ত হয়, তার প্রমাণ বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। F-স্তরের এই দুই ভাগকে F_1 ও F_2 নাম দেওয়া হয়। F-স্তরের উপরেও কয়েকটি তড়িৎ-পরিবাহী স্তরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই সব বিদ্যুতের স্তরগুলিকে সমগ্রভাবে আয়নমণ্ডল বলা হয়।

বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে আয়নীভবন (Ionization)

সূর্যের আলো যখন বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে, তখন সেই আলোক-তরঙ্গের শক্তি যদি পর্যাপ্ত হয়, বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন অণুর মধ্যস্থ পরমাণুর ভিতরকার ইলেকট্রন তখন নিষ্কাশিত হয়। সূর্যরশ্মির বিশেষ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গে নিহিত শক্তির ফলেই এই নিষ্কাশন-ক্রিয়া সম্ভব হয়। অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন থেকে নিষ্কাশিত ইলেকট্রন বায়ুর সাধারণ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন অণুগুলিকে ঋণ-বিদ্যুৎসম্পন্ন আয়নে পরিণত করে। পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে এলে ঐ পরমাণুটি ধন-বিদ্যুতের গুণ পায়—এদেরই বলা হয় ধন-বিদ্যুৎসম্পন্ন আয়ন। বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে কিভাবে যে আয়নিত ভিন্ন ভিন্ন স্তরের সৃষ্টি হয়, তার সুসঙ্গত ব্যাখ্যা আজ সম্ভব হয়েছে।

আয়নমণ্ডলে 'সাধারণ' ও 'অ-সাধারণ' বেতার-তরঙ্গ

অ্যাপল্‌টন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছিলেন যে, বেতার-তরঙ্গ যদি উর্ধ্বে প্রেরণ করা হয়—আয়নিত স্তরে তা প্রবেশ করে ভূ-চুম্বকত্বের ফলে দুই অংশে ভাগ হয়ে যায়। এক অংশকে আমরা 'সাধারণ' (Ordinary) ও অন্য অংশটিকে 'অসাধারণ' (Extra-ordinary) তরঙ্গ আখ্যা দিতে পারি। আয়নমণ্ডলের কোনও স্তরে বেতার-তরঙ্গের উপর ভূ-চুম্বকত্বের প্রভাব সম্বন্ধে অ্যাপল্‌টন্ এবং প্রায় একই সময়ে হার্টরি (Hartree) যে তত্ত্বের অবতারণা করেন, তাকে Magneto-ionic theory বলা হয়। এই তত্ত্বানুসারে আয়নমণ্ডলের কোনও স্তরে যখন বেতার-তরঙ্গ প্রবেশ করে—ভূ-চুম্বকত্বের ফলে বেতার-তরঙ্গ শুধু যে দুই অংশে বিভক্ত হয় তা নয়, এই 'সাধারণ' ও 'অ-সাধারণ' তরঙ্গের মধ্যে প্রকৃতিগত বৈষম্যও দেখা যায়। যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বেতার-প্রেরক কেন্দ্রের এরিয়েলের তার থেকে সংক্রমিত হয়, তার বৈদ্যুতিক স্পন্দন মোটামুটি একই দিকে সম্পন্ন হয়। এই প্রকার তরঙ্গকে সরলরৈখিক স্পন্দনধর্মী (Plane-polarized) বলা হয়। কিন্তু ভূ-চুম্বকত্বের প্রভাবে আয়নমণ্ডলে এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যখন 'সাধারণ' ও 'অ-সাধারণ' এই দুই ভাগে বিভক্ত

হয়, তখন এদের প্রত্যেকটিতে বৈদ্যুতিক বল সাধারণতঃ উপবৃত্তের আকারে এবং কখনও কখনও বৃত্তের আকারে ক্রমান্বয়ে দিক পরিবর্তন করে। যে তরঙ্গে বৈদ্যুতিক বল বৃত্তাকারে বা উপবৃত্তাকারে আবর্তিত হয়, তাকে বৃত্তাবর্তন ধর্মী (Circularly polarized) বা উপবৃত্তাবর্তন ধর্মী (Elliptically polarized) বলতে পারি। 'সাধারণ' তরঙ্গে বৈদ্যুতিক বলের আবর্তন যদি ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে সেই দিকে হয়, তবে 'অ-সাধারণ' তরঙ্গে বৈদ্যুতিক বলের আবর্তন তার বিপরীত দিকে দেখা যায়। এই বিষয় নিয়ে অ্যাপলটন, র‍্যাটক্লিফ (Ratcliffe), হোয়াইট (F. G. ও E. L. C. White), ফারমার (Farmer), একার্স্লি (Eckersley), পিডিংটন্‌ (Piddington), মানরো (Munro) প্রভৃতি অনেক বিজ্ঞানী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এই বিষয়ের তত্ত্বীয় সমাধানও সম্ভব হয়েছে।

আয়নমণ্ডল থেকে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন—অ্যাপলটন প্রদত্ত তিনটি নিয়মসূত্র

বেতার-তরঙ্গ ঊর্ধ্বে প্রেরণ করলে যখন আয়নমণ্ডলে তা প্রবেশ করে 'সাধারণ' ও 'অ-সাধারণ' তরঙ্গে বিশ্লিষ্ট হয়, এই দুই পরস্পর-বিপরীত আবর্তনধর্মী তরঙ্গ তখন আয়নিত স্তরের বিভিন্ন উচ্চতা থেকে কি ভাবে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে আবার ফিরে আসে, অ্যাপলটনই সর্বপ্রথম তার নিয়মসূত্র বেঁধে দিয়েছিলেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে, বেতার-প্রেরক কেন্দ্র থেকে যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ-বিক্ষেপ সঞ্চারিত হয় এবং ঊর্ধ্বে আয়নমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করে, গণিতজ্ঞ ফুরিয়ের (Fourier) বিশ্লেষণ-বিধি অনুসারে তা ক্রমবর্ধমান স্পন্দনাঙ্কের অসংখ্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গে পর্যবসিত হয়। আয়নমণ্ডলে এই তরঙ্গশ্রেণীর সমষ্টিগত বিস্তাসের গতিবেগকে সংক্ষেপে সমষ্টিগত বেগ (Group velocity) বলা যেতে পারে। এই বেগ একক-তরঙ্গের ব্যষ্টিগত বেগ (Wave velocity) থেকে যে ভিন্ন, ইংরেজ বিজ্ঞানী র‍্যালে (Rayleigh) তা বহু বছর আগেই দেখিয়েছিলেন। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, আয়নমণ্ডলের যে কোনও স্তরে ইলেকট্রনের ঘনত্ব উপরের দিকে কিছু দূর পর্যন্ত অল্পে-অল্পে বেড়ে গিয়ে সমে এসে পৌঁছয় এবং আরও ঊর্ধ্বে ঘনত্ব আবার ক্রমশঃ কমে আসে। আয়নমণ্ডলের স্তরে প্রবেশ করে বেতার-তরঙ্গ এই ক্রমবর্ধমান ইলেকট্রন সংখ্যার মধ্য দিয়ে ঊর্ধ্বে যখন অগ্রসর হয়—যখন তার ফুরিয়ে-উপাংশগুলির (Fourier components) সমষ্টিগত গতিবেগ ক্রমশঃই কমতে থাকে। ইলেকট্রনের ঘনত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সমষ্টিগত বেগ কমতে কমতে যখন শূন্যে পরিণত হয়, তখনই এই তরঙ্গরাজি পৃথিবীর দিকে আবার নেমে আসে, বিজ্ঞানীরা এইরূপ পরিকল্পনা করে থাকেন। তরঙ্গরাজির সমষ্টিগত গতিবেগ আয়নিত স্তরের যে উচ্চতায় শূন্য হয়, সেই স্থানের প্রতিসরাঙ্কও তখন শূন্য হয়। কাজেই তরঙ্গরাজির সমষ্টিগত বেগ $U=O$ অথবা প্রতিসরাঙ্ক $\mu=O$—এই হলো আয়নমণ্ডল থেকে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলনের সর্ত বা সূত্র। আয়নমণ্ডলের প্রতিসরাঙ্কের যে সাধারণ সূত্র অ্যাপলটন ও হার্ট্রি দিয়েছিলেন, তাতে প্রতিসরাঙ্ক শূন্য ধরে নিয়ে অ্যাপলটন প্রাতফলনের তিনটি নিয়মসূত্র পেয়েছিলেন,

(১) $f_0^2 = f^2 - f.\,fH$

(২) $f_0^2 = f^2$

(৩) $f_0^2 = f^2 + f.\,fH$

এখানে $f_0^2 = \frac{Ne^2}{m}$

N = ইলেকট্রনের ঘনত্ব

e, m = ইলেকট্রনের তড়িৎ পরিমাণ ও ভর

$$fH = \frac{eH}{2\pi mc}$$

H=পৃথিবীর চৌম্বক বল

এবং f=ঊর্ধ্বগামী বিদ্যুৎ-তরঙ্গের স্পন্দনাঙ্ক।

দ্বিতীয় নিয়মসূত্রটি 'সাধারণ' তরঙ্গের ক্ষেত্রে এবং প্রথম ও তৃতীয় নিয়মসূত্র দুটি 'অ-সাধারণ' তরঙ্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অ্যাপলটনের এই তিনটি সূত্র থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হই। প্রথমেই দেখা যায়, আয়নমণ্ডল থেকে প্রতিফলিত হয় 'অ-সাধারণ' তরঙ্গ। আর তার একটু ঊর্ধ্বে প্রতিফলিত হয় 'সাধারণ' তরঙ্গ। যদি কোনও বিশেষ অবস্থায় 'অ-সাধারণ' তরঙ্গের আংশিক প্রতিফলন সম্ভব হয়, তবে 'অ-সাধারণ' তরঙ্গের একাংশ আয়নমণ্ডলের আরও ঊর্ধ্বে উঠে প্রতিফলিত হয়। এখানে ঊর্ধ্বগামী বেতার-তরঙ্গের স্পন্দনাঙ্ক সমান রাখা হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে 'অ-সাধারণ' ও 'সাধারণ' তরঙ্গ যে আয়নিত স্তরের দুই বিভিন্ন উচ্চতা থেকে প্রতিফলিত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসে, অ্যাপলটন ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের বীক্ষণাগারে তার পরীক্ষামূলক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। তৃতীয় সূত্র অনুসারে আয়নিত স্তরের আরও ঊর্ধ্ব স্থান থেকে প্রতিফলনের নিদর্শন কোনও বীক্ষণাগারেই পাওয়া যায় নি—এর কারণ অত ঊর্ধ্বে উঠতে উঠতে বেতার-তরঙ্গ আয়নমণ্ডলে শোষণের ফলে ক্ষীণ বা বিলীন হয়ে যায়। আয়নমণ্ডল থেকে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলনের তিনটি নিয়মসূত্র অন্যভাবেও পরীক্ষা করা যায়। যদি আয়নিত স্তরের কোনও স্থান থেকে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন আলোচনা করি, তবে দেখা যায় যে, সেই একই স্থান থেকে ঊর্ধ্বগামী বেতার-তরঙ্গের বিভিন্ন স্পন্দনাঙ্কে 'সাধারণ' ও 'অ-সাধারণ' তরঙ্গগুলি প্রতিফলিত হবে। এই স্পন্দনাঙ্কগুলিকে f_1, f_2, f_3 দ্বারা যদি সূচিত করা হয়- তবে আমরা পাই—

(১) $f_1^2 = f_0^2 - f_1 \cdot f_H$

(২) $f_2^2 = f_0^2$

(৩) $f_3^2 = f_0^2 + f_3 \cdot f_H$

(সংকেতগুলির সংজ্ঞা পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছে)

আয়নমণ্ডল ও বেতার-তরঙ্গের সংক্রমণ সম্বন্ধে অধ্যাপক সাহার গবেষণা

কলিকাতা সায়েন্স কলেজে ১৯২৫-২৬ সন থেকেই স্বর্গতঃ শিশিরকুমার মিত্র ও তাঁর সহকর্মীরা আয়নমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর থেকে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেছিলেন। তত্ত্বের দিক দিয়ে এই গবেষণায় অধ্যাপক সাহার শুধু যে কৌতূহল ছিল তা নয়, সক্রিয় সহযোগও ছিল। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবার পর অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা বেতার-তরঙ্গ ও আয়নমণ্ডল বিষয়ে তাঁর ছাত্রদের নিয়ে ১৯৩০ সন থেকে যে গবেষণা করেছিলেন, তা দু-ভাগে ভাগ করা যায়—(১) আয়নমণ্ডল থেকে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন ও (২) আয়নমণ্ডলের সৃষ্টিতত্ত্ব। ১৯৩৮ সনে কলিকাতা সায়েন্স কলেজে আসবার পর অধ্যাপক সাহা ও তাঁর ছাত্রগণ আয়নমণ্ডলে বেতার-তরঙ্গের সংক্রমণ ও তার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে তত্ত্বীয় ও পরীক্ষামূলক গবেষণা করেছিলেন, বিশেষজ্ঞদের কাছে তা সমাদৃত হয়েছে।

(১) আয়নমণ্ডল থেকে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন

পূর্বেই বলা হয়েছে, আয়নমণ্ডল থেকে প্রতিফলনের তৃতীয় সূত্রটির পরীক্ষামূলক সমর্থন পাওয়া যায় নি। ১৯৩৪ সনে অধ্যাপক সাহার পরিচালনায় তাঁর ছাত্র তোশ্‌নিয়াল সর্বপ্রথম প্রতিফলনের অ্যাপলটন প্রদত্ত তৃতীয় সূত্রটির সত্যতা প্রমাণ করেন। এলাহাবাদ অঞ্চলের

ভূ-চুম্বক বলের পরিমাণ ধরে নিলে অ্যাপলটনের তৃতীয় সূত্রটি নিম্নলিখিত ভাবে লেখা যায়—

$f_3 \approx f_0 + 0.65$ Mc/s (Megacycles per sec.)

তোশ্‌নিয়ালের পরীক্ষায় এই সূত্রটির সমর্থন পাওয়া যায়। এর অব্যবহিত পরেই অসলো (Oslo) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হারাঙ (Harang) অনুরূপ পরীক্ষা করে একই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। অ্যাপলটন-প্রদত্ত তৃতীয় সূত্রটির সমর্থন পরে অন্যান্য অনেক বীক্ষণাগার থেকেও পাওয়া গিয়েছিল।

এই সময়ে অধ্যাপক সাহার তত্ত্বাবধানে তাঁর দুটি ছাত্র পন্থ ও বাজপেয়ী আয়নমণ্ডল থেকে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন সম্পর্কে নতুন আর এক সূত্রের সন্ধান পান। তাঁদের পরীক্ষায় জানা যায়—

$$f_4 \approx f_0 + 0.14 \text{ Mc/s}$$

এই চতুর্থ সূত্রটির তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা অধ্যাপক সাহা দিয়েছিলেন। আয়নমণ্ডলে ঊর্ধ্বগামী বেতার-তরঙ্গরাজির সংষ্টিগত গতিবেগ কমতে কমতে যেখানে শূন্য হয়, সেখান থেকেই বেতার তরঙ্গের প্রতিফলন—এই প্রস্তাবনা অবলম্বন করে অধ্যাপক সাহা এই বিষয়ের তত্ত্বীয় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। আয়নমণ্ডলে বেতার-তরঙ্গের শোষণ যথেষ্ট পরিমাণেই হয়, এই শোষন-ক্রিয়া প্রতিফলন-সমস্যার সমাধানে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করে। শোষণাঙ্কটিকে বাদ দিয়ে অধ্যাপক সাহা ও তাঁর ছাত্রেরা সমস্যার যে সমাধান করেন—তাকেই প্রতিফলনের চতুর্থ নিয়মসূত্র বলা হয়। এই চতুর্থ নিয়মসূত্রটি এই—

$$f_0^2 = f_4^2 \cdot \frac{f_4^2 - f_H^2}{f_4^2 - f_L^2}$$

এখানে $f_H = \frac{eH}{2\pi mc}$ এবং $f_L = f_H \cos\theta$ আর θ হচ্ছে পৃথিবীর চৌম্বক বল H ও তরঙ্গের গতিপথ এই দুই-এর মধ্যস্থ কোণ। এলাহাবাদের চৌম্বক বলের পরিমাণ ধরে নিলে অধ্যাপক সাহার চতুর্থ সূত্রটির সঙ্গে পন্থ-বাজপেয়ীর পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তের মিল পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, আয়নমণ্ডলে বেতার-তরঙ্গের শোষণাঙ্ককে অগ্রাহ্য না করে অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ বসু অনতিকাল পরেই আয়নমণ্ডল থেকে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলনের একটি সাধারণ সূত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রণালীতে প্রদর্শন করেন। সূত্রটি খুব জটিল এবং সাধারণভাবে তার প্রয়োগও কষ্টসাধ্য। বসুর এই সাধারণ সূত্রে আয়নমণ্ডলে বেতার-তরঙ্গের শোষণাঙ্ক শূন্য ধরে নিলে সূত্রটি সাহা প্রদত্ত চতুর্থ নিয়মসূত্রে পর্যবসিত হয়।*

আয়নমণ্ডলের কোনও স্তর বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন সম্বন্ধে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা আরও একটি তাত্ত্বিক অনুসন্ধান এলাহাবাদে অবস্থান কালেই আরম্ভ করেছিলেন। E-স্তরের কিছু উপরে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১২০ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে একটি স্তরের সন্ধান মাঝে মাঝে অনিয়মিত-ভাবে পাওয়া যায়। এই স্তরটি থেকে বেতার-তরঙ্গ সম্পূর্ণ অনির্দিষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় এবং এই বিক্ষিপ্ত তরঙ্গের বিস্তারও অনির্দিষ্ট ও অনিয়মিতভাবে কমে বাড়ে। এই স্তরটিকে Sporadic E-স্তর বলা হয়। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তুলনায় সাধারণ E-স্তরকে পুরুই ধরা যেতে পারে—F-স্তর আরও বেশী পুরু। এই দুই স্তর থেকে বেতার-তরঙ্গের পূর্ণ প্রতিফলন (Total reflection) হয়। Sporadic

---

* এখানে বলা আবশ্যক, আয়নমণ্ডল থেকে বেতার-তরঙ্গের সাহা-প্রদত্ত চতুর্থ সূত্রটি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ আছে। বিরুদ্ধ মতবাদীদের মধ্যে বাডেন (Budden), হেডিং (Hedding) ও হুইপল্ (Whipple)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

E-স্তরের বিশেষত্ব এই যে, এই স্তর থেকে সাধারণতঃ বেতার-তরঙ্গের পূর্ণ প্রতিফলন হয় না—আংশিক প্রতিফলন ও আংশিক অতিক্রমণ দেখা যায়। এই Sporadic E-স্তরটির সৃষ্টি সম্বন্ধে এখনও গবেষণা চলছে। বিশেষজ্ঞেরা কেউ কেউ বলেন, তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তুলনায় এই স্তরটি অত্যন্ত অগভীর। এই অগভীর বা পাত্‌লা স্তর থেকে বেতার-তরঙ্গ কেন আংশিক ভাবে প্রতিফলিত হতে পারে, আধুনিক কোয়ান্টাম তত্ত্ব অবলম্বন করে ১৯৩১ সনে অধ্যাপক সাহা ও রামনিবাস রায় তার তাত্ত্বিক সমাধানের চেষ্টা করেন। আয়নিত স্তরের যেখানে ইলেকট্রনের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী, তার ঠিক নীচে ও উপরে ইলেকট্রনের সংখ্যা সরল রৈখিক নিয়মে বাড়ে ও কমে—ইলেকট্রনের সমাবেশ এরূপ সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের মত ধরে নিয়ে তাঁরা আংশিক প্রতিফলনের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। আয়নিত স্তরে অনেক সময়েই ইলেকট্রনের সমাবেশ অধিবৃত্তের ন্যায় দেখা যায়—আয়নিত স্তরে অধিবৃত্ত সদৃশ ইলেকট্রনের সমাবেশ ধরে নিয়ে অধ্যাপক সাহার এক ছাত্র (এ. সি. দেব) ১৯৪০ সনে বেতার-তরঙ্গের আংশিক প্রতিফলন ও আংশিক অতিক্রমণের কোয়ান্টামবাদসম্মত ব্যাখ্যা দিতে প্রয়াস পেয়েছিলেন।

(২) আয়নমণ্ডলের সৃষ্টি-রহস্য

উত্তাপের ফলে কোন বায়বীয় পদার্থ বা গ্যাস আয়নে পরিণত হয়। তাপজনিত এই আয়নীভবনের (Thermal ionization) পরিকল্পনা থেকে ১৯২০ সনে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা যে নিয়মসূত্রটি প্রদর্শন করেন—তা আজ বিজ্ঞান-জগতে সুবিদিত। তাপের উৎপত্তিস্থল ও যে মাধ্যমের মধ্য দিয়ে তাপের বিকিরণ হয়—এই দুইয়ের তাপমাত্রা বা উষ্ণতা যখন সমান হয়—এই সাম্যাবস্থায় গ্যাস বা বায়বীয় পদার্থের কত ভগ্নাংশ আয়নিত হয়, সাহার এই নিয়মসূত্র থেকে তা জানা যায়। সূর্যের তাপ যখন পৃথিবীর পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে, সেখানকার তাপমাত্রা সূর্যের বহিরাবরণের তাপমাত্রা থেকে অনেক কম। তাপমাত্রার এই অসমতার জন্যে সাহার তাপজনিত আয়নীভবনের সূত্রটির পরিবর্তন আবশ্যক। ওলন্দাজ বিজ্ঞানী Woltjer ও ইংরেজ বিজ্ঞানী মিলনে (Milne) দু-জনেই স্বাধীনভাবে সাহার সূত্রটির আবশ্যকীয় পরিবর্তন করেন। সূর্য থেকে বিকিরণের ফলে পৃথিবীর পরিমণ্ডল ভিন্ন ভিন্ন স্তরে আয়নিত হয়। এ-থেকেই হয় আয়নমণ্ডলের সৃষ্টি। সাহার পরিবর্তিত নিয়মসূত্রটি প্রয়োগ করে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে বিভিন্ন আয়নিত স্তরের সৃষ্টি সম্পর্কে যাঁরা গবেষণা করেন—তাঁদের মধ্যে হল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী পানেকক (Pannekock), আমেরিকার হাল্‌বার্ট (Hulbert) ইংল্যাণ্ডের উল্‌ফ্‌ ও ডেমিং (Wolfe ও Deming) এবং ভারতবর্ষের মেঘনাদ সাহা ও শিশিরকুমার মিত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বিষয় নিয়ে অধ্যাপক সাহা যেসব আলোচনা প্রকাশ করেছিলেন, তার মধ্যে উচ্চ বায়ুমণ্ডলে সূর্যের অতি-বেগুনী আলোকের ক্রিয়া ('On the Action of ultra-violet sunlight upon the upper atmosphere') নামে নিবন্ধটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৩৮ সনে ন্যাশন্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট অব সায়েন্সের লাহোর অধিবেশনে এই বিষয় নিয়ে তিনি সভাপতির ভাষণ দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক সাহার নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখযোগ্য :—

(ক) পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার উর্ধ্বে সূর্যের বিকিরণের ফলে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন-অণু সম্পূর্ণভাবে অক্সিজেন পরমাণুতে পরিণত হয়। এর উর্ধ্বে অক্সিজেন-অণুর অস্তিত্ব থাকে না।

(খ) সূর্যের অতিবেগুনী আলোর বিশেষ বিশেষ স্পন্দনাঙ্কের তরঙ্গে নিহিত শক্তির ফলেই আয়নমণ্ডলে বিভিন্ন স্তরের সৃষ্টি হয়।

(গ) সূর্যকে ৬,০০০° (কেল্‌ভিন)তাপমাত্রার কৃষ্ণ-বস্তু (Black body) বলে ধরে নিলে তা থেকে যে অবিচ্ছিন্ন বর্ণালীর (Continuous spectrum) তরঙ্গরাজি পাওয়া যায়, তার শক্তি যদি দশ লক্ষ গুণ হয়—তবে এই শক্তিসম্পন্ন অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গের প্রভাবেও আয়নমণ্ডলে বিভিন্ন স্তরের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

সত্য সত্যই সূর্যের বিকিরণে এরূপ শক্তি-সম্পন্ন অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ আছে কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে অধ্যাপক সাহা ১৯৩৬ সনেই ওজোন (Ozone)-স্তরের উর্ধ্বে পৃথিবী থেকে ৫০ কিলোমিটার উপরে উঠে সূর্যালোকের বর্ণালী পরীক্ষার কথা বলেছিলেন। ৩০ কিলোমিটার উর্ধ্বে অবস্থিত যে ওজোনের স্তর আছে—সেই স্তর সূর্যের অতিবেগুনী আলোর অবিচ্ছিন্ন বর্ণালীকে অনেক পরিমাণে শুষে নেয়, সেই জন্যেই হার্ভার্ড কলেজের মানমন্দিরের পত্রিকায় প্রকাশিত সুদীর্ঘ একটি নিবন্ধে ওজোন-স্তরের উপরে উঠে সূর্যের বর্ণালী পরীক্ষার প্রস্তাব করেছিলেন। অবশ্য তখনকার দিনে এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা সম্ভব ছিল না। গত মহাযুদ্ধে যখন জার্মান কর্তৃক V_2-রকেটের প্রবর্তন হয়—তখন আমেরিকার কলোরাডো (Colorado) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিটেনপোল (Pretenpol), রেন্স (Rense) প্রভৃতি কয়েকজন পদার্থবিদ্ ৮০ কিলোমিটার উর্ধ্বে উঠে সৌর-বর্ণালীর ছবি তোলেন। কিন্তু অতিবেগুনী আলোর শক্তিসম্পন্ন অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ-রাজির কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় নি।

অধ্যাপক সাহা তাঁর তাপজনিত আয়নী-ভবনের পরিবর্তিত সূত্রটি বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন অণু (ও ১০০ কিলোমিটার উর্ধ্বে অক্সিজেন পরমাণু) এবং নাইট্রোজেন অণুর উপর প্রয়োগ করে সূর্যের বিকিরণের বিশেষ বিশেষ স্পন্দনাঙ্কের তরঙ্গে নিহিত শক্তির প্রভাবে এই অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন অণু এবং ১০০ কিলোমিটার উর্ধ্বে অক্সিজেন পরমাণু ও নাইট্রোজেন অণু কতখানি আয়নিত হয়, তার হিসেব করে আয়নমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের সৃষ্টি সম্বন্ধে যে আলোচনা আরম্ভ করেছিলেন, তা খুব বেশী ফলপ্রসূ হয় নি। অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র অনেকটা এই প্রণালী অবলম্বন করে D, E, F_1 ও F_2 স্তরের সৃষ্টি-রহস্যের সমাধানে অনেকটা কৃতকার্য হয়েছিলেন। অবশ্য E ও F_1 স্তরের সৃষ্টি সম্পর্কে অধ্যাপক মিত্রের মতামত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য হয়েছে, যদিও তাঁর F_2 স্তরের ব্যাখ্যা সর্ববাদিসম্মত এবং তাঁর D স্তরের ব্যাখ্যা আংশিকভাবে স্বীকৃত।

(৩) আয়নমণ্ডলে বেতার-তরঙ্গের সংক্রমণ এবং 'সাধারণ' ও 'অ-সাধারণ'-তরঙ্গের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গবেষণা

১৯৩৮ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হবার পর অধ্যাপক সাহা ব্রজেন্দ্রকিশোর ব্যানার্জি, ইউ. সি. গুহ প্রভৃতি ছাত্রের সহযোগে আয়নমণ্ডলে বেতার-তরঙ্গের সংক্রমণ এবং 'সাধারণ' ও 'অ-সাধারণ' তরঙ্গের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাত্ত্বিক গবেষণা আরম্ভ করেন। তরঙ্গবাদ অবলম্বন করে অধ্যাপক সাহা ও তাঁর ছাত্রগণ এই গবেষণায় নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং কতকগুলি নিয়মসূত্রের প্রবর্তন করেছিলেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা এই নিয়ম-সূত্রগুলির সত্যতা নির্ধারণের চেষ্টাও তিনি তাঁর ছাত্র রবি রায় ও জে. কে. ডি. বর্মার সহযোগিতায় করেছিলেন। এই জটিল বিষয়ে অধ্যাপক সাহা ও তাঁর সহকর্মীদের তত্ত্বীয় গবেষণায় কিছু ভুল থাকা সত্ত্বেও একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, আয়নমণ্ডলে বেতার-তরঙ্গ সংক্রমণ সম্পর্কে অধ্যাপক সাহা এক সম্পূর্ণ নূতন পথ প্রদর্শন করে গিয়েছেন। ফলে তথ্য ও তত্ত্বের দিক থেকে এই বিষয়ের গবেষণা আজ অনেক দূর অগ্রসর হতে পেরেছে।

জ্যোতির্বিদ্যায় নবযুগ—বহুরূপে বিশ্ব

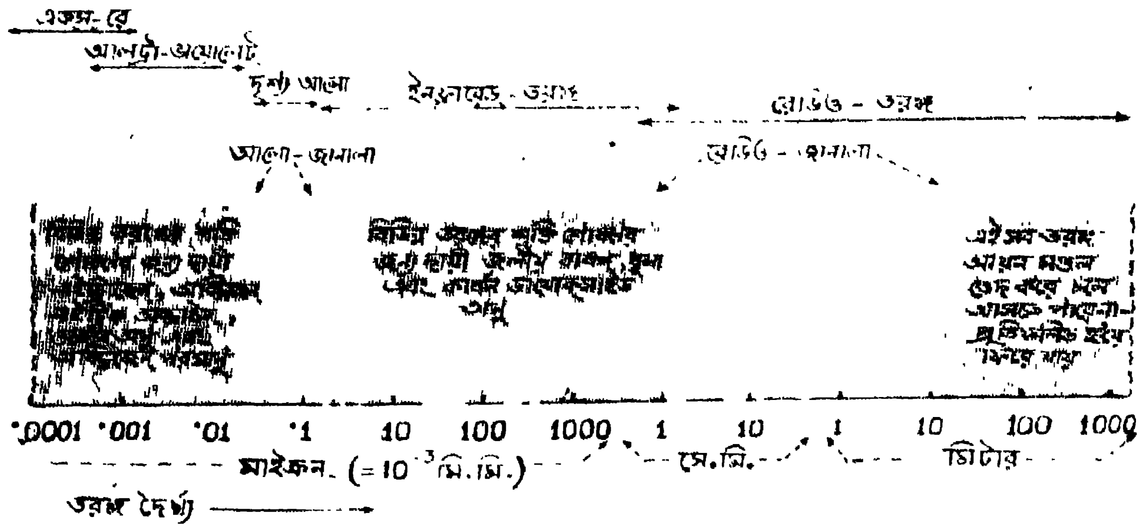
মৃণালকুমার দাশগুপ্ত

প্রায় চল্লিশ বছর আগেও জ্যোতির্বিদ্যার একটা একক সত্তা ছিল। প্রাচীনতম বিজ্ঞান—যার বিষয়বস্তু আলোর মারফৎ বিশ্বরহস্যকে জানা। স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ দিনের বেলায় সূর্যের প্রখর আলো, রাতের আকাশে চাঁদ, অপরাপর গ্রহ এবং অগুণ্তি তারার আলো দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে ভেবেছে বিশ্বরহস্যের কথা। চার-শ' বছর আগে গ্যালিলিও দূরবীন আবিষ্কার করলেন। সেই থেকে অদ্যাবধি নানা ধরণের বিশালকায় সব দূরবীন এবং অন্যান্য নিখুঁত সব যন্ত্রপাতির সাহায্যে জ্যোতির্বিদ্যার গবেষণা চলে আসছে। তথ্য এবং তত্ত্বের সমন্বয়ে বিশ্বরহস্যের অনেক কথাই বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন। ঊর্ধ্বগামী রকেট, কৃত্রিম উপগ্রহ এবং দূরপাল্লার মহাকাশযানের দৌলতে এই যুগে জ্যোতির্বিদ্যা কিন্তু তার সেই একক সত্তা হারিয়ে ফেলেছে। জ্যোতির্বিদ্যা আজ বহুমুখী—বিশ্ব আমাদের কাছে বহুরূপে উদ্ভাসিত। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, জ্যোতির্বিদ্যার এই নবযুগ প্রসঙ্গে সাধারণভাবে আলোচনা করা।

স্বভাবতঃই প্রাচীনতম বিজ্ঞানকে বর্তমানে আলোক-জ্যোতির্বিদ্যাই বলা উচিত। গত চার-শ' বছরের গবেষণায় আমাদের এই পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, তারা, স্থানীয় গ্যালাক্সি এবং বহির্বিশ্বের অগুণ্তি অন্যান্য গ্যালাক্সির কথা অনেক কিছুই জানা গেছে। জানাটা সম্ভব হয়েছে বিভিন্ন জ্যোতিষ্ক থেকে আগত আলোর মারফৎ। বিশ্বের আনাচে-কানাচে কোথায় কি ঘটছে, সেই খবর এনে দিচ্ছে আলো এবং তাই বিশ্বের যে কাঠামোর সঙ্গে আমরা পরিচিত, তাকে বলা যেতে পারে আলোক-বিশ্ব। আলো ছাড়াও বহির্বিশ্ব থেকে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রেডিও-ঢেউ আসছে। এই মূল্যবান তথ্যটি একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার—১৯৩২ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী ইয়ান্‌স্কির অবদান। ইয়ান্‌স্কির সফলতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নব্যবিজ্ঞান—রেডিও জ্যোতির্বিদ্যা। এই নব্যবিজ্ঞানের বিজ্ঞানীরাও বিশ্বকে দেখছেন—তবে তাঁদের দেখাটা সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের—আলোর বদলে এঁরা নানা তথ্য সংগ্রহ করছেন রেডিও-ঢেউয়ের মারফৎ। বড় বড় রেডিও-জ্যোতির্বিদ্যার মানমন্দির গড়ে উঠেছে, মস্ত বড় এবং বিচিত্র ধরণের রেডিও দূরবীন এবং নিখুঁত সব গ্রাহক-যন্ত্রের সাহায্যে মহাকাশের বিভিন্ন দিক থেকে আগত ছোট-বড় নানা দৈর্ঘ্যের রেডিও-ঢেউকে ধরে নিখুঁত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে দিবারাত্র লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। এগুলি বিশ্লেষণ করে রেডিও-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, রেডিও-সূর্য, গ্রহ, তারা এবং গ্যালাক্সির কথা। উপরন্তু এই নব্যবিজ্ঞান এমন কতকগুলি উৎসের (যেমন—কোয়াসার এবং পাল্‌সার) সন্ধান আমাদের দিয়েছে, যাদের সম্বন্ধে আলোক-জ্যোতির্বিদ্যার চার-শ' বছরের গবেষণাতেও কিছুই জানা যায় নি বা ভবিষ্যতে কোন দিন হয়তো জানা যেতও না। রেডিও-ঢেউ মারফৎ জানা বিশ্বের কাঠামোকে বলা যেতে পারে রেডিও-বিশ্ব। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, আলো এবং রেডিওর মধ্যে সম্পর্ক কি?

আলো একপ্রকার শক্তি। একথা সুস্পষ্টভাবে জানা গেছে যে, গামা ও এক্স্‌-রশ্মি, আলট্রা-ভায়োলেট আলো, ইনফ্রারেড বা তাপ, রেডিও ইত্যাদি সবই শক্তি এবং সবাই বিরাট এক পরি-

বারের যেন বিভিন্ন সভ্য। পরিবারটির নাম বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ বা ইলেকট্রোম্যাগ্নেটিক ওয়েভ্স (চিত্র-১)। উৎস থেকে এরা তরঙ্গ বা ঢেউয়ের আকারে প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল গতিবেগে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। (ম্যাক্স্ প্লাঙ্ক প্রবর্তিত কোয়ান্টাম তত্ত্বে আলো-কে শক্তি-কণারূপে কল্পনা করা হয়েছে। এই শক্তিকণা—'ফোটনের' শক্তি-মান তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল।) ঢেউগুলির দৈর্ঘ্য কত বড় বা ছোট, তারই উপর নির্ভর করে এদের প্রকৃতি এবং নিহিত শক্তির মান। দৈর্ঘ্যে সবচেয়ে ছোট কিন্তু সবচেয়ে শক্তিশালী হলো গামা-রশ্মি এবং দৈর্ঘ্যে সবচেয়ে বড় কিন্তু শক্তিমানে ক্ষীণতম হলো রেডিও-ঢেউ—দুয়ের মাঝামাঝি হলো আলোর ঢেউ—দৃশ্য বেগুনী থেকে লাল। আবার আলোর ক্ষেত্রে ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য বেগুনীর সবচেয়ে কম এবং লালের সবচেয়ে বেশী। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে, অতি ক্ষুদে রেডিও-ঢেউ বা মাইক্রোতরঙ্গের আলোকসুলভ প্রকৃতি বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁর বহুবিধ নিখুঁত পরীক্ষার মাধ্যমে প্রায় পঁচাত্তর বছর পূর্বে প্রেসিডেন্সী কলেজের পরীক্ষাগারে প্রমাণ করে গেছেন।



১নং চিত্র

বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের বর্ণালী বা স্পেকট্রাম। গামা-রে ব্যতীত অপরাপর সভ্যদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মোটামুটি বিস্তার দেখানো হয়েছে। 'আলো-জানালা' এবং 'রেডিও-জানালা' দুটি সাদা অংশ হিসেবে রয়েছে। যে সমস্ত তরঙ্গ বিভিন্ন কারণে বায়ুমণ্ডলের আবরণ ভেদ করে পৃথিবীর বুকে চলে আসতে পারে না, সে সব অংশগুলি ছায়াঙ্কিত দেখানো হয়েছে। অবশ্য আলো-জানালা সংলগ্ন কিছু কিছু ইনফ্রারেড তরঙ্গ এবং রেডিও-জানালা সংলগ্ন কিছু কিছু মাইক্রো-তরঙ্গ পুরাপুরি অথবা আংশিকভাবে বায়ুমণ্ডল ভেদ করে চলে আসতে পারে। এই সব ক্ষুদ্র জানালাগুলি এখানে দেখানো হয় নি।

এখন তাহলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আলো এবং রেডিও-ঢেউয়ের মারফৎ বিশ্বরহস্যের যখন অনেক কিছুই জানা গেছে, তখন ঐ পরিবারটির অন্যান্য সভ্যদের মারফৎ কি অজানা আরো অনেক রহস্যের সন্ধান মিলবে না? উপরন্তু শুধুমাত্র বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গই বা কেন? মহাকাশে শক্তিশালী আহিত পদার্থকণিকা-স্রোতের সন্ধানও তো বিজ্ঞানীরা বহু পূর্বেই জানতে

পেরেছেন। তাদের মারফৎও কি বিশ্বরহস্যের নতুন তথ্য জানা যাবে না? এসব প্রশ্ন নিয়ে বিজ্ঞানীদের জল্পনা-কল্পনার ইয়ত্তা নেই। তাঁরা কিন্তু পাকাপাকি সিদ্ধান্তে এসে গেছেন এবং অত্যাশ্চর্য সব গবেষণা বর্তমানে চলছে।

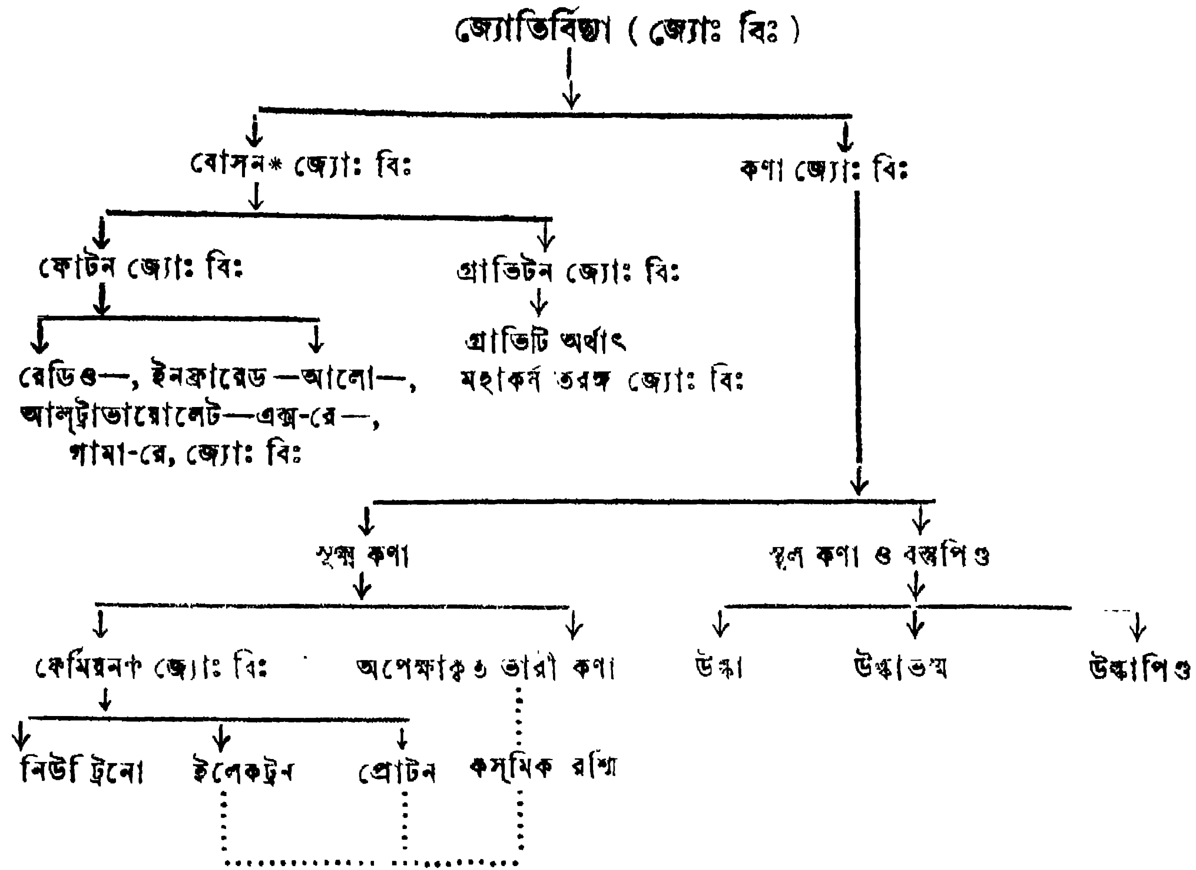
গত বিশ্বযুদ্ধের শেষে জার্মানদের আবিষ্কৃত ভি-টু (V-2) রকেটকে মার্কিন বিজ্ঞানীরা গবেষণার কাজে লাগালেন। সৌরআলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করবার জন্যে একটি স্পেকট্রোগ্রাফ যন্ত্র ভি-টু রকেটের মাথায় চাপিয়ে ঊর্ধ্বাকাশে পাঠানো হলো। বায়ুমণ্ডলে রকেটটি প্রায় এক-শ' মাইল উঁচুতে উঠে গেল এবং যাত্রা শেষে অভিকর্ষ বলের টানে আবার ধরিত্রীর বুকে ফিরে এলো। স্পেকট্রোগ্রাফ যন্ত্রে সৌরবর্ণালীর ছবি দেখে বিজ্ঞানীরা বিস্মিত হলেন। রকেটটি যত উপরে উঠেছে, আলট্রাভায়োলেটের দিকে বর্ণালীর বিস্তারও তেমনি বেড়ে গেছে। আরো একটি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষার কথা আমরা জানি। ১৯৫৭-'৫৮ সালে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থবিদ্যা বছরে (I. G. Y.) মার্কিন বিজ্ঞানীরা রকুন (ROCKOON) পরীক্ষার পরিকল্পনা করেন। উদ্দেশ্য, সৌরবিস্ফোরণের সময় সূর্যদেহ থেকে কি ধরণের এক্স্-রশ্মি নির্গত হয়, সেটা ভাল ভাবে পরীক্ষা করে দেখা এবং এই দেখাটা দেখতে হবে বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্ব থেকে। পরিকল্পিত ব্যবস্থায় বায়ুমণ্ডলে কয়েক মাইল উচ্চতায় বেলুনের সাহায্যে একটি রকেটকে ভাসমান অবস্থায় রাখা হলো। রকেটের অগ্রভাগে সু-সংরক্ষিত রইলো নানাবিধ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি। সৌরবিস্ফোরণের দৃশ্যের ইঙ্গিত পাবার সঙ্গে সঙ্গে রেডিও কন্ট্রোলের সাহায্যে নিমেষের মধ্যে ভাসমান রকেটটি চালু করা হলো। বায়ুমণ্ডলে আরো ঊর্ধ্বে সেটি ছুটে চললো—স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে লিপিবদ্ধ হলো সূর্য থেকে আগত বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা শক্তিমানের এক্স্-রশ্মি। রকেট এবং বেলুনের সমন্বয়ে গঠিত এই ব্যবস্থাকেই সংক্ষেপে 'রকুন' পরিকল্পনা বলা হয়। এসব পরীক্ষার সাফল্যে একথা সুপ্রমাণিত হলো যে, পৃথিবীর বুকে বসে শুধুমাত্র আলো এবং রেডিও-ঢেউ মারফৎ বিশ্ব-রহস্যের সঠিক পরিচয় নির্ধারণ করবার ব্যাপারটা তাহলে খুবই অসম্পূর্ণ। কাজেই বায়ুমণ্ডলের আবরণের ঊর্ধ্ব থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারলেই বিশ্বরহস্যকে পুরাপুরি জানা যাবে।

পৃথিবীর ঊর্ধ্বাকাশে বিভিন্ন উচ্চতায় প্রধানতঃ তিনটি অদৃশ্য আবরণ গবেষণার কাজে অন্তরায়-স্বরূপ। বহির্বিশ্ব থেকে আগত শক্তির দূত, বিভিন্ন বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ এবং বিভিন্ন গতি-সম্পন্ন আহিত মৌলিক কণার স্রোতকে পৃথিবীতে আসতে দিচ্ছে না। আমাদের বরাত ভাল, কারণ তা না হলে এই সব সর্বনাশী শক্তির সংঘাতে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতাম। আবরণ তিনটি হলো—আবহমণ্ডল, আয়নমণ্ডল এবং চুম্বকমণ্ডল। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে দশ-পনেরো মাইল উচ্চতা পর্যন্ত ঘন বায়ুস্তরকে আবহমণ্ডল বলা হয়। এই অঞ্চলে বিভিন্ন গ্যাসের অণু বহিরাগত ইন্‌ফ্রারেড এবং মাইক্রো রেডিও তরঙ্গের শক্তি শুষে নেয় এবং তাই এরা পৃথিবীর বুকে ধরা দেয় না। আরো উঁচুতে অপেক্ষাকৃত হাল্কা বায়ুস্তরে বিভিন্ন অণু এবং পরমাণু আলট্রাভায়োলেট এবং এক্স্-রশ্মির শক্তি শুষে নেয়। এই শক্তির সংঘাতে অণু ভেঙ্গে সৃষ্টি করে পরমাণুর। পরমাণুগুলিও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। শক্তির প্রভাবে পরমাণুর আওতা থেকে ইলেকট্রন বিচ্যুত হয়ে পড়ে। প্রায় পঞ্চাশ থেকে পাঁচ-শ' মাইল উচ্চতায় বিভিন্ন স্তরে মুক্ত ইলেকট্রন এবং অন্যান্য আহিত কণিকার সমাবেশ ঘটে অর্থাৎ আয়নমণ্ডলের সৃষ্টি হয়। দূরপাল্লার বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা এই আয়নমণ্ডলের অস্তিত্বেই সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রেডিও-ঢেউ আয়নমণ্ডলের কোন না কোন স্তর থেকে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীর বুকেই ফিরে

আসে। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যদি পনেরো মিটারের কম হয়, তাহলে আয়নমণ্ডলের কোন স্তরই তাকে প্রতিফলিত করতে পারে না—সেটা আয়নমণ্ডল ভেদ করে মহাশূন্যে চলে যায়। তাহলে এটাও বলা চলে যে, বহিরাগত কোন রেডিও-ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য যদি পনেরো মিটারের বেশী হয় তাহলে সেগুলি আয়নমণ্ডলের আবরণ ভেদ করে পৃথিবীতে আসতে পারে না। সংক্ষেপে তাহলে এই দাঁড়ালো যে, বায়ুমণ্ডল ভেদ করে রামধনুর সাতরঙা আলো এবং আনুমানিক পনেরো মিটার থেকে এক সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের রেডিও-ঢেউ শুধুমাত্র পৃথিবীতে আসতে পারে—অন্যদের প্রবেশ যেন নিষিদ্ধ। সাধারণভাবে তাই বলা হয়, বায়ুমণ্ডলে যেন দুটি মাত্র জানালা খোলা—একটি 'আলো-জানালা', অপরটি 'রেডিও-জানালা' (চিত্র-১)। দুটি মাত্র জানালা খোলা বলেই আলোক এবং রেডিও-জ্যোতির্বিদ্যার মাধ্যমে আমরা বিশ্বরহস্য জানতে পারছি, অন্য কোন জ্যোতির্বিদ্যার কথা শুনি নি।

শক্তির অপর দূত বিভিন্ন গতিসম্পন্ন আহিত মৌলিক কণার বেলায় আবরণের কাজ করে পৃথিবীর চুম্বকমণ্ডল বা ম্যাগ্‌নেটোস্ফীয়ার। পৃথিবী একটি চুম্বক এবং এই চৌম্বক ক্ষেত্র বায়ুমণ্ডলের চতুর্দিকে বহুদূর-প্রসারী। দূরত্বের সঙ্গে চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতা কোথায় কতটা এবং কিই বা তার প্রকৃতি, তাও বিভিন্ন কৃত্রিম উপগ্রহ এবং মহাকাশযানের সাহায্যে নিখুঁত মাপজোক করে জানা গেছে। চৌম্বক ক্ষেত্রে আহিত মৌলিক কণিকা, যেমন—ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতির গতিবিধি বিশেষ কতকগুলি ধারা মেনে চলে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, যে সব কণিকা উচ্চশক্তিসম্পন্ন অর্থাৎ প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে আসে, সেগুলি চুম্বকমণ্ডল ভেদ করে তাদের প্রাথমিক রূপ পরিবর্তন করেও অনায়াসে পৃথিবীর বুকে নেমে আসতে পারে। এদের বলা হয় কস্‌মিক রশ্মি। যেগুলি কম শক্তিসম্পন্ন অর্থাৎ কম গতিবেগের, তারা চুম্বকমণ্ডলের ব্যূহ ভেদ করতে পারে না, বিকর্ষণের প্রভাবে আবার মহাকাশেই ফিরে যায়। কিন্তু যাদের গতিবেগ মাঝামাঝি, তারা চুম্বকমণ্ডলে ঢুকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আট্‌কা পড়ে যায়, সহজে বেরিয়ে যেতে পারে না। আহিত মৌলিক কণাগুলির গতিবিধি সীমাবদ্ধ থাকে চুম্বকমণ্ডলে —এক মেরুপ্রান্ত থেকে অপর মেরুপ্রান্ত পর্যন্ত। বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিজ্ঞানের সূত্রানুসারে এরা চৌম্বক বলরেখার চারদিকে পাক খেতে খেতে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের মধ্যে বহুদূরপ্রসারী চুম্বকমণ্ডলে চলাচল করতে থাকে। এসব তত্ত্ব অনেক আগে থেকেই জানা ছিল, কিন্তু এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ করলেন সর্বপ্রথম মার্কিন বিজ্ঞানী ভ্যান অ্যালেন। কৃত্রিম উপগ্রহ এবং মহাকাশযানে সংরক্ষিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে মাপজোক করে তিনি দেখিয়েছেন যে, পৃথিবীকে ঘিরে বিভিন্ন উচ্চতায় দুটি বিকিরণ বলয় রয়েছে, যাদের সৃষ্টির মূলে হলো চুম্বকমণ্ডলের ফাঁদে আট্‌কাপড়ে-যাওয়া শক্তিশালী আহিত মৌলিক কণা, ইলেকট্রন এবং প্রোটন।

একথা তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, বর্তমান যুগে বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন কক্ষপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণরত কৃত্রিম উপগ্রহ এবং দূরপাল্লার মহাকাশযান বিশ্বরহস্য সমাধানে এক অনবদ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। নানাবিধ স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বকে দেখা সম্ভব হয়েছে নানা 'চোখে'। গড়ে উঠেছে জ্যোতির্বিদ্যার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা (ছকটি দ্রষ্টব্য)। তাই আমরা আজ এক নবযুগের সূচনা দেখতে পাচ্ছি। এই যুগের বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন ধরণের জ্যোতির্বিদ্যার স্বীকৃতি—বিশ্বের বহুরূপ দর্শন। গত কয়েক বছরে OSO (Orbiting Solar Observatory), OAO—(Orbiting Astronomical Observ-



* যে সমস্ত কণা সত্যেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত 'বোস-সংখ্যায়ন' মেনে চলে।

† যে সমস্ত কণা এনরিকো ফের্মি প্রবর্তিত 'ফের্মি-সংখ্যায়ন' মেনে চলে।

ছক—বহুমুখী জ্যোতির্বিদ্যার বর্তমান শাখা-প্রশাখার স্বরূপ।

atory) অর্থাৎ পৃথিবী প্রদক্ষিণরত স্বয়ংক্রিয় মানমন্দির থেকে সূর্য এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য জানা গেছে। আজ আমরা হামেশাই শুনতে পাচ্ছি, এক্স্ রশ্মি, গামা রশ্মি, আলট্রাভায়োলেট—প্রভৃতি জ্যোতির্বিদ্যার কথা। উপরন্তু মানুষের চাঁদ-অভিযানের সাফল্যে আরো সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের আশায় বিজ্ঞানীরা উল্লসিত হয়ে উঠেছেন। পরিকল্পনা চলেছে যে, চাঁদের দেশে গিয়ে উপযুক্ত পরিবেশে প্রধানতঃ চাঁদের উল্টো পিঠে অদূর ভবিষ্যতে বিভিন্ন জ্যোতির্বিদ্যার মানমন্দির নির্মাণ করা হবে। চাঁদের দেশে আবহমণ্ডল, আয়নমণ্ডল এবং চুম্বক-মণ্ডলরূপী আবরণের কোন বালাই নেই। অতএব নিঃসন্দেহে চাঁদের দেশের পরিবেশ ভবিষ্যত গবেষণার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা সুনিশ্চিত। চাঁদের দেশে প্রতিনিয়ত বিনা বাধায় বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের সব সদস্য, সর্বপ্রকার গতিসম্পন্ন আহিত মৌলিক কণা এসে পড়ছে। ভবিষ্যতের খাতে কি আছে জানি না, তবে বর্তমানে জ্যোতির্বিদ্যায় নবযুগের অভ্যুদয়কে মেনে নিতেই হবে এবং 'বহুরূপে বিশ্ব' হয়তো অজানা রহস্যকে আরও রহস্যাবৃত করে তুলবে। কবে কেমন করে বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছিল, বিশ্ব স্থিতিশীল কি সম্প্রসারণশীল অথবা দোদুল্যমান, গ্যালাক্সি এবং তারার জন্মের ইতিবৃত্তই বা কি, বিশ্বব্যাপী শক্তির সত্যিকারের স্বরূপই বা কি—এসব বহুবিধ প্রশ্নের সঠিক জবাব হয়তো একদিন মিলবে। অত্যধিক ব্যয়বাহুল্যের পরিপ্রেক্ষিতে বহু বিতর্কিত চন্দ্র-অভিযানের অন্ততঃ কিছুটা সার্থকতা সেদিনই প্রমাণিত হবে।

উপজাতি প্রসঙ্গে

প্রবোধকুমার ভৌমিক

আমাদের দেশে প্রায় তিন কোটির মত উপজাতি বাস করে। শাসন ব্যবস্থায় এই সকল গোষ্ঠীগুলিকে তফ্‌শিলভুক্ত (Scheduled) বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর ফলে এই সকল গোষ্ঠীগুলি নানা প্রকার সুযোগ-সুবিধা পেয়ে তাদের জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পারবে, নানাবিধ সামাজিক অবহেলা বা অবিচার থেকে পাবে মুক্তি।

কারা এই উপজাতি? কেমন বা তাদের জীবনযাপনের ধারা? কেমন ভাবে এই উপজাতি গোষ্ঠীদের—সমাজের অন্যান্য জাতি বা সম্প্রদায় থেকে আমরা সহজে বুঝতে পারবো এবং কি হবে তাদের সংজ্ঞা? এই নিয়ে নানা আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এখনও এক সিদ্ধান্তে আসা যায় নি। সমাজ-বিজ্ঞানীর মতে, উপজাতি হলো মানুষের ক্ষুদ্র এক গোষ্ঠী—সহজ অনাড়ম্বর এদের জীবনধারণের পদ্ধতি, যে গোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদের এক ভাষায় কথা বলে। আকৃতি ও সংস্কৃতিগত ঐক্য তাদের মধ্যে থাকবে আর হয়তো তারা বসবাস করবে কোন এক নির্দিষ্ট অঞ্চলে। সমাজ পরিচালনায় থাকবে তাদের সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী-চেতনা, যা তাদের নানা সংঘর্ষে অনুপ্রাণিত করতে পারবে। কিন্তু চলমান সমাজ জীবনে এই রকম এক সংজ্ঞা বেশী দিন চলে না। কেন না, বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের জীবনের ধারা গেছে পাল্টে, মানুষের সংজ্ঞা হয়েছে সম্পর্কের হেরফের। মানুষ তার পরিবেশ-পরিসরের সংকীর্ণতা থেকে নানাভাবে মুক্তি পেয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যখন উপজাতি নিয়ে আলোচনা করতে যাই, তখন তার এক নির্ভরযোগ্য, প্রত্যয়শীল সংজ্ঞা খুঁজে পাবার চেষ্টা করি। বিশেষ করে ভারতের উপজাতি গোষ্ঠী সম্পর্কে একথা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

উপজাতি অর্থে আমরা সাধারণভাবে 'আদিবাসী' অর্থাৎ 'আদিম বাসিন্দা' (Autochthone) বলে বুঝে থাকি। কেউ কেউ তাদের 'খণ্ডজাতি' বলে অভিহিত করতে চান। এই 'জাতিসর্বস্ব' ভারতভূমিতে বাস্তবিকই তারা 'খণ্ডজাতি' বা 'উপজাতি'। প্রাক্-আর্য ভারতের এরাই ছিল আদিম বাসিন্দা। সীমাহীন অতীতের সুদূর দিগন্তে এই সব অনগ্রসর মানুষের গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ ভারতের নানা স্থানে বসতি স্থাপন করেছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পরিবেশ, পরিমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্যে তাদের জীবনের গতিপথ কখনও মন্থর, কখনও বা দ্রুত, কখনও হয়েছে স্তিমিত বর্তমানের এই উপজাতি গোষ্ঠীগুলি সেই আদিম মানুষের উত্তরসূরী। তাদের দেখা যাবে পাহাড়-পর্বতের পাদদেশে, নদীর কূলে-উপকূলে, পর্বত-কন্দর কিংবা গিরি-গুহায়, নিবিড় কিংবা অগভীর অরণ্যে সভ্য মানুষের গ্রাম-জীবনের সংস্পর্শে অথবা কোন নগরীর আশেপাশে। বিচিত্র এদের জীবনযাপনের পদ্ধতি, বিচিত্র তাদের সমাজ-জীবনের নীতি। একদিন এদের পূর্বপুরুষ প্রস্তরসভ্যতার সূচনা করেছিল, যার বহু নিদর্শন রয়েছে অমসৃণ কিংবা মসৃণ প্রস্তরআয়ুধের ব্যবহারে। ইতিহাসের উত্থান-পতনের তরঙ্গায়িত প্রবাহে, বহিরাগত গোষ্ঠীর আক্রমণে, নানাবিধ আবিষ্কারে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এসেছে দ্রুত পরিবর্তন; হয়েছে তাদের আদিম সমাজ-জীবনের পরিবর্তন।

ভারত ইউনিয়নের মানচিত্রে আমরা এদের দেখতে পাই মুখ্যতঃ তিনটি প্রধান অঞ্চলে—(১) হিমালয় পর্বতের পাদদেশ থেকে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চল, যেখানে রয়েছে—আকা, ডাফ্‌লা, লুশাই, খাসিয়া, গারো, কাছাড়ি, লেপ্‌চা, রাভা, থারু, করোয়া, চেরি প্রভৃতি।

(২) মধ্যবর্তী অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে বিহার, ওড়িশা, পশ্চিম বাংলার পশ্চিমাঞ্চল, রাজস্থান,



একটি সাঁওতাল পরিবার

মিরি, ভোট, আপাটানি, পদম মিয়োং আর নাগাদের মধ্যে কনিয়াক, রেংমা, সেংগামা, আও, আঙ্গামী, লোঠা, কাবুই, আর রয়েছে কুকি, উত্তর বোম্বাই, দক্ষিণ উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ। এই অঞ্চলে যাদের বাস তাদের মধ্যে প্রধান হলো শবর, ভূমাং, খাড়িয়া, খন্দ, ভূমিজ, ভুইয়া, মুণ্ডা,

সাঁওতাল, ওরাঁও, লোধা, বাথুরি, মহালি, বিরহড়, হো, কোল, ভীল, করকু, গন্দ, মালের, অসুর, বাইগা, আগারিয়া, মাড়িয়া ও মুড়িয়া প্রভৃতি।

(৩) দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে হায়দ্রাবাদ, কেরল, মাদ্রাজ, অন্ধ্রপ্রদেশ। এই অঞ্চলে যারা বসবাস করে, তাদের মধ্যে চেনচু, রেড্ডি, টোডা, বাদাগা, কোটা, পারিয়ান, ইরুপ, কুরুম্বা, কাদর, কানিকর, মালভাদন ও মালকুরুভান হলো প্রধান।

ভারতীয় সংবিধানে এই সকল অনগ্রসর গোষ্ঠী বা উপজাতিগুলির জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ধরে নেওয়া হয়েছে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা থেকে এদের জীবনযাত্রার মান নীচু। নাগরিক, সামাজিক অবিচার ও অবহেলা এদের জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। সেই জন্যে তফ্‌শিলভুক্ত করে এদের প্রশাসনিক অনেক সুযোগ-সুবিধা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারগুলিও যথেষ্ট চেষ্টা করছেন, যাতে বাস্তবিকই এদের দুঃখ-কষ্টের অবসান হয়।



ভূমিজ শিকারী

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তফ্‌শিলভুক্ত করবার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য না থাকায় অনেক অসুবিধা লক্ষ্য করা যায়। এমন দেখা গেছে নৃ-বিজ্ঞানীর বা

সমাজতাত্ত্বিকের বিচারে যারা উপজাতি, তাদের অনেকে প্রশাসনিক তফ্‌শিলভুক্ত বিচারে বাদ পড়েছে। আবার বিভিন্ন রাজ্য সরকার যে সকল যোগ্যতার মাপকাঠিতে এদের চিহ্নিত করেছেন ব্যবস্থার গোষ্ঠীগুলিকে বেছে নিয়েছেন। মধ্যপ্রদেশ সরকার অরণ্য-অধ্যুষিত অঞ্চলের গোষ্ঠীদের যারা আদিম উপায়ে জীবনযাপন করে, তাদের তফ্‌শিল উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।



কাঠের উদূখলে লোধারমণী ধান ভানার চেষ্টায়

তার মধ্যেও তফাৎ অনেক। তফ্‌শিলভুক্ত উপজাতি হিসাবে গণ্য করবার জন্যে আসাম রাজ্য সরকার মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীসম্ভূত আদিম সমাজ- ওড়িশা সরকার প্রাক্‌-দ্রাবিড়, বা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর জাতিদের, তামিলনাড়ু সরকার আদিম জীবন-যাত্রায় যে সকল উপজাতি জীবনযাত্রা নির্বাহ

করছে, তাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার উপজাতি গোষ্ঠী-উদ্ভূত হলেই উপজাতি হিসাবে গণ্য করছেন। আদিম জড়োপাসক গোষ্ঠীদের কোন কোন রাজ্য উপজাতি হিসাবে দেখেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, পশ্চিম বাংলার ভূমিজ তফ্‌শিলভুক্ত উপজাতি নয়, কিন্তু বিহার রাজ্যে ভূমিজ উপজাতি। রাজ্য পুনর্বিন্যাসের ফলে বিহারের যে অংশ পশ্চিম-বাংলায় এসেছে, তাদের ভূমিজরা কিন্তু উপজাতি হিসাবে গণ্য হচ্ছে। এর ফলে কোন কোন রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য বেশী পাচ্ছে আর কোন কোন রাজ্য তা পাচ্ছে না। ভারতের সার্বিক উন্নতি এতে বিঘ্নিত হচ্ছে।

ভাষা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো ধর্মবিশ্বাসের ধারা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে সমাজ-বিজ্ঞানীরা উপজাতির সংজ্ঞা নিরূপণ করবার চেষ্টা করছেন। ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐক্য হলো এর প্রধান বিচার্য বিষয়। উপজাতিগুলির এক-একটির মধ্যে ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত ঐক্য সহজে নজরে পড়ে। যদিও দেখা গেছে কোন উপজাতি তাদের ভাষার স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছে, তবুও তাদের উপজাতি হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। যেমন—২৪ পরগণা জেলার বা সুন্দরবন অঞ্চলের ওরাঁও, যারা দীর্ঘদিন পূর্বে ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চল থেকে এসেছে, অথবা মেদিনীপুর জেলার লোধা উপজাতি। তারা প্রায় বাংলা ও ওড়িয়া ভাষায় কথা বলে। তবুও তাদের ছড়া, লোকগীতি অনুশীলন করলে আমরা তাদের আদিম ভাষার রেশ খুঁজে পাব।



লোধা গুণীন তুক্‌তাক্ করছে

সামাজিক বা ধর্মভিত্তিক আচার-অনুষ্ঠানে একই গোষ্ঠীর লোক সাধারণতঃ অংশ গ্রহণ করে থাকে এবং আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিটি রূপরেখা তাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ঐ গোষ্ঠীর লোকেরা কেবলমাত্র তা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে অথবা তাতে অংশগ্রহণ করতে পারে। এই ঐক্যের জন্যে আমরা সেই গোষ্ঠীকে উপজাতি হিসাবে গণ্য করতে পারি।

গোষ্ঠীচেতনা—গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় হিসাবে তাদের মধ্যে এক স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে। যেই আকর্ষণ তাদের সংঘবদ্ধ করতে সাহায্য করে এবং এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে গোষ্ঠীচেতনা দৃঢ় হয়। যে কোন সংঘর্ষ, বিরোধ বা বিসংবাদে এই গোষ্ঠীচেতনা প্রবল আকার ধারণ করে। বর্ত্তমানের—লোধা-সাঁওতাল সংঘর্ষ, লোধা-ভূমিজ বা সাঁওতাল-বাগাল সংঘর্ষ এই গোষ্ঠীচেতনার বিশেষ উদাহরণ।

সামাজিক গঠনবৈচিত্র্যে আদিমতা উপজাতি বিশ্লেষণের আর এক প্রধান বিচার্য বিষয়। শুধু তাই নয়, জীবনযাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা তাদের প্রকৃতিনির্ভর হতে দেখি। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার দ্রব্যসম্ভার অত্যন্ত দীন ও জটিলতার প্রভাব মুক্ত। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা শিকারজীবী গোষ্ঠী হিসাবে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আন্দামানী, জারাওয়া, ওঙ্গে প্রভৃতিকে বুঝি—ফলমূল আহরণ ও শিকার তাদের জীবনযাত্রার প্রধান অবলম্বন। এমন বিশেষ দ্রব্যসম্ভারও তাদের নেই অথবা পোশাক-পরিচ্ছদ বলতে তেমন কিছুও এদের নেই। এই সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনই তাদের বৈশিষ্ট্য। আবার পশুপালকের উপজীবিকায় আমরা দেখি নীলগিরি পাহাড়ের টোডাদের বা আলমোড়া পাহাড়ের ভোটদের। বন্য প্রথায় চাষ করে যারা দিন কাটায় তাদের মধ্যে জুয়াং, বাইগা, গণ্ড উপজাতি প্রধান। বন বা জঙ্গলে গ্রীষ্মের দিনেআগুন দিয়ে পুড়িয়ে খানিকটা পরিষ্কার করবার পর তাতে কাঠের খন্তা বা গাঁইতি দিয়ে চাষ করাকে বন্যপ্রথায় চাষ বলা যায়। আসাম অঞ্চলে একে 'ঝুম' চাষ বলে, মধ্যপ্রদেশে বলে বেওয়ার বা ডাহিয়া। এছাড়া লাঙ্গল চাষে যে সকল উপজাতি জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের মধ্যে সাঁওতাল, হো, ভূমিজ, মুণ্ডা, ওঁরাও হলো প্রধান। অনেক উপজাতি নানাপ্রকার শিল্প কাজের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে; যেমন—বিরহড়রা দড়ি তৈরি করে, মহিলারা ঝুড়ি বানায়, অসুর বা আগারিয়ারা লোহা গলিয়ে কামারের কাজ করে।

বর্তমানে অনেক উপজাতিদের আমরা বিভিন্ন কলকারখানার শ্রমিক হিসাবে অথবা মাটিকাটা বা রাস্তা তৈরির কাজে দেখতে পাই।

উপজাতি সম্পর্কে আমরা যে সংজ্ঞা দিই না কেন, তার অনেক কিছু নির্ভর করে তার পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। দীর্ঘ দিন সহাবস্থানে অথবা উন্নত জীবনযাত্রার বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে তাদের জীবনযাত্রার ধরণধারণ পরিবর্তিত হয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর হয়েছে পরিবর্তন। পরিবর্তিত হয়েছে—বিশ্বের দিগন্ত ও স্বকীয় জীবনদর্শন।

রসায়ন-বিজ্ঞানে শব্দ সঙ্কলন

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

সম্প্রতি স্থির হয়েছে যে, অদূর ভবিষ্যতেই স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত সর্বস্তরেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা প্রচলিত হবে এবং এজন্যে পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজে হাত দেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ইতিমধ্যে রসায়ন-বিজ্ঞানের নূতন পাঠ্যসূচী (Syllabus) প্রকাশ করেছেন। এই নূতন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী লিখিত পুস্তকসমূহ হয়তো বা শীঘ্রই পর্ষদের অনুমোদনের জন্যে দাখিল করা হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রসায়ন-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্ববাদিসম্মত সুষ্ঠু পরিভাষা এখনও গড়ে ওঠে নি। এজন্যে বিভিন্ন লেখক ইচ্ছামত পরিভাষা ব্যবহার করে চলেছেন এবং তার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা এক বিভ্রান্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছেন।

ইতিপূর্বে পর্ষদ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, পরিভাষার ব্যাপারে 'চলন্তিকা' অনুসরণ করতে হবে। যেসব শব্দ চলন্তিকায় আছে, সেগুলি নিয়ে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এরূপ শব্দের সংখ্যা নিতান্তই কম। একটি স্কুল পাঠ্যপুস্তক রচনার পক্ষে সামান্য তো বটেই, এর উপর নির্ভর করে একটি কলেজ পাঠ্যপুস্তক রচনার কথা কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং এরূপ একটি দুরূহ কাজে প্রবৃত্ত হবার পূর্বে আমাদের সকলেরই সুষ্ঠু পরিভাষা গঠন করবার দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার।

সম্প্রতি পর্ষদের তরফ থেকে আর একটি নূতন ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সেটিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ইতিপূর্বে উচ্চ-মাধ্যমিক শেষ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ইংরেজী প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা অনুবাদও দেওয়া হতো। এতে বিভ্রান্তির খুব বেশী অবকাশ ছিল না। কিন্তু এই বছর যে প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়েছে, তাতে শুধু বাংলা আছে, ইংরেজী নেই। এই নূতন ব্যবস্থা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার প্রধান কারণ, একই ইংরেজী শব্দের জন্যে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটির সঙ্গে অন্যটির মিল নেই। তাছাড়া ঐ শব্দগুলি যে কোথা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, তাও সঠিক জানা নেই। পর্ষদের তরফ থেকে আজ অবধি কোন সুনির্দিষ্ট এবং সুষ্ঠু পারিভাষিক শব্দের তালিকা প্রকাশ করা হয় নি। তাই বিভিন্ন লেখক নিজেদের খেয়ালখুশিমত বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দ চয়ন করে নিয়েছেন। এজন্যে ছাত্র-ছাত্রীরা অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তার কারণ, তারা যে শব্দটির সঙ্গে পরিচিত, সেই শব্দটি হয়তো প্রশ্নপত্রে দেওয়া হলো না, দেওয়া হলো অন্য কোন শব্দ। কাজেই প্রশ্নটি ভাল করে না বুঝলে তারা উত্তর লিখবে কি করে! এজন্যে সুনির্দিষ্ট এবং সুষ্ঠু পরিভাষা রচনার প্রয়োজনীয়তা এখন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৫০ সালে ভারত সরকার কয়েক জন বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ্ এবং বিজ্ঞানীকে নিয়ে একটি পর্ষদ গঠন করেন। অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌গণ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এঁদের প্রধান বিচার্য বিষয় ছিল—"To consider the question of evolving a uniform scientific termino-

logy for the country and preparing a dictionary of such terms for all modern Indian languages."

১৯৫৩ সালে এই পর্ষদ রসায়নের একটি তালিকা প্রকাশ করেন। এর ভূমিকায় লেখা হয়েছিল—(1) The lists now released are tentative and transitional and have not been finally approved by the Board. After public comments and suggestions on these have been received and considered by the Board, the lists will be finalised and the terms recognised for educational purposes by the Government.

(2) Where a scientific term is truly international, as defined by the Board, it has been retained ; but in cases of difference of usage in different countries, words have either been coined from Sanskritic sources or from some other Indian language, or terms in English have been retained for the present.

(3) The terms of the provisional list seek to meet the demands of both accuracy and intelligibility as far as possible. Where there is a conflict between the two, greater emphasis has been placed on accuracy.

(4) The size of the country and the diversity of the languages make it particularly difficult to get an agreed list of all terms. Regional variations have, therefore, been occasionally given side by side with the terms proposed for Hindi.

এর উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এইসব পারিভাষিক শব্দাবলী বাংলা ভাষায় গ্রহণ করবার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ কিংবা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ উদ্যোগী হয়েছিলেন কিনা, তা লেখকের জানা নেই। আর হয়ে থাকলেও এই সম্পর্কে পর্ষদের তরফ থেকে আজ অবধি কোনও নির্দেশ পাওয়া যায় নি।

ইতিপূর্বে যাঁরা বাংলা ভাষায় রসায়নের পুস্তক রচনা করেছেন, তাঁদের অনেকেই হয়তো এই তালিকাটি দেখেন নি। আর দেখে থাকলেও তা নিশ্চয়ই গ্রাহ্য করেন নি। তা না হলে পরিভাষার ব্যাপারে এত বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে কেন ?

বর্তমান প্রবন্ধে এই বছরের প্রশ্নপত্রের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি শব্দ নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হলো। এথেকেই বোঝা যাবে যে, বিষয়টি মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।

উপরিউক্ত দুটি তালিকায়ই আছে, equivalent =তুল্য, তুল্যাঙ্ক ; কিন্তু equivalent weight-এর কোনও পরিভাষা কোথাও নেই। দ্বিতীয় পত্রের ১ম প্রশ্নে equivalent weight বোঝাতে তুল্যাঙ্কভার বলা হয়েছে। আর ২(ii) প্রশ্নে chemical equivalent বোঝাবার জন্যে বলা হয়েছে রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক। বলা বাহুল্য, দুটিই সমার্থকবোধক। একই প্রশ্নপত্রে দু-রকম পরিভাষা ব্যবহার করা বিভ্রান্তিকর নয় কি ?

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, equivalent weight বলতে প্রকৃতপক্ষে ওজনের অনুপাত বোঝায়। এটা একটি সংখ্যা মাত্র, এর কোন একক নেই। যেমন—ম্যাগ্‌নেসিয়ামের equivalent weight হলো ১২ ; এর অর্থ ১২ ভাগ ওজনের

ম্যাগ্‌নেসিয়াম ১ ভাগ ওজনের হাইড্রোজেন বিস্থাপিত করে। এক্ষেত্রে ওজনের যে কোন একক (গ্র্যাম বা পাউণ্ড) অনুযায়ী হিসেব-নিকেশ করা যেতে পারে, তাতে কিছুই যায়-আসে না। এজন্যে এখন সকলেই একে তুল্যাঙ্ক ভার না বলে রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক এবং সেই থেকে সংক্ষেপে তুল্যাঙ্ক বলে থাকেন। সুতরাং equivalent weight বোঝাতে তুল্যাঙ্কভার না বলে শুধু তুল্যাঙ্ক বলাই সমীচীন। তাতে বিভ্রান্তির কোন অবকাশ থাকবে না।

দ্বিতীয় পত্রের ১ম প্রশ্নেই আর একটি শব্দ আছে—পারমাণবিক ওজন। খুবই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, atomic weight-এর সঠিক পরিভাষা কোন তালিকায়ই নেই।

পরমাণু অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তাই তার ওজন ও অত্যন্ত কম ; যেমন—সবচেয়ে হাল্‌কা হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রকৃত ওজন (Absolute weight) হলো $১\cdot৬৬ \times ১০^{-২৪}$ গ্র্যাম, আর সবচেয়ে ভারী ইউ-রেনিয়াম পরমাণুর প্রকৃত ওজন হলো $৩\cdot৯৫ \times ১০^{-২২}$ গ্র্যাম। এজন্যে পরমাণুর প্রকৃত ওজন নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন, তাছাড়া বিভিন্ন রাসায়নিক গণনাতে এসব ওজন ব্যবহার করাও অত্যন্ত অসুবিধাজনক। এজন্যে বিজ্ঞানীরা পরমাণুর ওজন প্রকাশের উদ্দেশ্যে একটি নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এতে একটি হাই-ড্রোজেন পরমাণুর ওজনকে একক (Unit) ধরা হয়, আর এরই সঙ্গে তুলনা করে অন্য পর-মাণুর ওজন প্রকাশ করা হয়। একটি পরমাণু একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে যত গুণ ভারী হয়, তার ওজন তত ধরা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, atomic weight একটি সংখ্যা মাত্র ; এথেকে বোঝা যায়, পরমাণুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে কতগুণ ভারী। যেমন—অক্সিজেনের atomic weight হলো ১৬ ; তার মানে ১৬ গ্র্যাম বা পাউণ্ড নয়। এর অর্থ, অক্সিজেনের একটি পরমাণু হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর চেয়ে ১৬ গুণ ভারী। এমতাবস্থায় atomic weight বোঝাতে পারমাণবিক ওজন বলা বিভ্রান্তিকর নয় কি ? লেখকের মতে, এক্ষেত্রে পারমাণবিক ওজন না বলে পরমাণু-ভার শব্দটি ব্যবহার করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কারণ, এতে বিভ্রান্তির কোন অবকাশ থাকবে না।

প্রথম পত্রের ৯ম প্রশ্নে allotropy বোঝাতে বলা হয়েছে বহুরূপতা। চলন্তিকায় এরূপ কোন শব্দ নেই, কিন্তু ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তালিকায় আছে, allotropy = অপররূপতা। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিবেচনা করলে বলতে হয় যে. এটিই অধিকতর সমীচীন। কারণ, গ্রীক ভাষা অনুযায়ী allos = another, trops = from

প্রথম পত্রের ১ম প্রশ্নে আছে—(ঘ) যখন চুনে জল দেওয়া হয়, তখন কিরূপ পরিবর্তন হয়, বুঝাইয়া দাও। আবার ঐ পত্রেরই ৮ম প্রশ্নে আছে.—নিম্নলিখিত পদার্থগুলির সহিত জলের ক্রিয়া কি রকম, সমীকরণসহ আলোচনা কর : (ঘ) চুন। উভয় ক্ষেত্রেই চুনের সঙ্গে জলের ক্রিয়া কি রকম হয়, তাই জানতে চাওয়া হয়েছে, অর্থাৎ একই প্রশ্ন দু-বার দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু চুন দু-রকম—quicklime এবং slaked lime। এক্ষেত্রে কোন্ প্রকার চুনের সঙ্গে বিক্রিয়া দিতে হবে ? বলা বাহুল্য, জলের সঙ্গে দুই প্রকার চুনের বিক্রিয়া দু-রকম হবে। চলন্তি-কায় আছে, lime = চুন, quicklime = কলিচুন ; কিন্তু slaked lime-এর কোন পরিভাষা নেই। অবশ্য ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তালিকায় আছে slaked lime = শমিত চুন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, অভিধানে slake = তৃপ্ত করা বা উপশম করা। সুতরাং প্রশ্নপত্রে শুধু চুন

বলা মোটেই যুক্তিযুক্ত হয় নি. কলিচুন অথবা শমিত চুন বলা উচিত ছিল। সঙ্গে ইংরেজী শব্দটি থাকলে অবশ্য এরূপ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতো না।

প্রথম পত্রের ২ (ক) প্রশ্নে আছে, কলয়েডীয় দ্রবণ সম্পর্কে কি জান? পার্টিংটন-এর বইয়ে আছে—Suspensions containing ultramicroscopic particles which do not settle out on standing and pass through filter paper, are called colloidal solutions. চলন্তিকায় colloidal solution-এর কোনও পরিভাষা দেওয়া হয় নি। তবে অভিধান অংশে আছে, কলিল= মিশ্রিত। এদিকে ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তালিকায় আছে, colloid=কলিল। সুতরাং colloidal solution বোঝাবার জন্যে কলয়েডিয় দ্রবণ (ইংরেজী-বাংলার খিচুড়ি) বলবার কোনও সার্থকতা নেই। এই উদ্দেশ্যে কলিল দ্রবণ এই পরিভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে অনায়াসে।

ইংরেজীতে দুটি শব্দ আছে—displacement এবং substitution। শব্দ দুটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের বিক্রিয়া বোঝাবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়ে থাকে (সাধারণভাবে অজৈব বিক্রিয়া হলে displacement এবং জৈব বিক্রিয়া হলে substitution বলা হয়)। কাজেই বাংলা ভাষায় সর্বত্র একই শব্দ (প্রতিস্থাপন) ব্যবহার করা সঙ্গত নয় (দ্বিতীয় পত্রের ৪র্থ এবং ৯ম প্রশ্ন দ্রষ্টব্য)। চলন্তিকায় এদের কোনটিরই উল্লেখ নেই, কিন্তু ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তালিকায় আছে, displacement—বিস্থাপন, এবং substitution—প্রতিস্থাপন। সুতরাং বিভিন্ন ধরণের বিক্রিয়া বোঝাবার উদ্দেশ্যে এই শব্দ দুটি ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চলন্তিকায় এমন অনেক শব্দ আছে, যেগুলি ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত শব্দগুলির সঙ্গে মেলে না। চলন্তিকার শব্দগুলি গঠন করা হয়েছিল অনেক কাল আগে, সে তুলনায় সরকারী তালিকার অন্তর্ভুক্ত শব্দগুলি অনেক বেশী আধুনিক। বর্তমান লেখকের মতে, বিকল্প শব্দসমূহের অনেকগুলিই অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত এবং অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ আর সেই হিসাবে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। এজন্যে বিকল্প শব্দগুলি তুলনামূলক ভাবে বিচার-বিবেচনা করে দেখবার সময় এসেছে। নীচে এরূপ কতকগুলি শব্দের একটি তালিকা দেওয়া হলো।

কয়েকটি বিকল্প শব্দের তালিকা

ইংরেজী শব্দ	ব্যাখ্যা	পরিভাষা	
		চলন্তিকা অনুযায়ী	সরকারী তালিকা অনুযায়ী
Absorption	... .	শোষণ	অবশোষণ
Calcination	To heat to a temp-insufficient to melt.	ভস্মীকরণ	নিস্তাপন
Catalyst	It is like a whip to the horse.	অনুঘটক	উৎপ্রেরক

ইংরেজী শব্দ	ব্যাখ্যা	পরিভাষা	
Coagulation	To change from fluid to more or less solid state, clot, curdle, set.	তঞ্চন	স্কন্দন
Deliquescence	To become moist, and then turn liquid, on absorbing moisture from air.	উদগ্রহ	প্রস্বেদন
Double decomposition		পরিবর্ত বিয়োজন	দ্বিগুণ বিয়োজন
Double salt		দ্বিধাতুক লবণ	দ্বিগুণ লবণ
Efflorescence	To lose water of crystn. when left exposed and then to fall to powder.	উদত্যাগ	প্রস্ফুটন*
Flux	It reacts with impurities, when heated, to give easily fusible compds.	বিগালক	দ্রাবক
Precipitate	Substance formed in a reactn. falls out of the soln. in the solid state.	অধঃক্ষেপ	অবক্ষেপ
Saturated	Solution—the concentration of which remains unchanged in contact with the solute.	সংপৃক্ত	সংতৃপ্ত
Smelting	To melt ore and thus extract metal	বিগলন	প্রদ্রাবণ
Suspension		অবলম্বন	আলম্বন

*ফুলের মত ফুটে ওঠে তাই প্রস্ফুটন। একেই ইংরেজী শব্দের সার্থক পরিভাষা বলা যায়।

এরূপ আরও ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কায় আপাততঃ তাথেকে বিরত রইলাম। সুযোগ-সুবিধা ঘটলে ভবিষ্যতে এই বিষয়ে আরও আলোচনা করা যাবে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কারও সঙ্গে এ-নিয়ে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হওয়া লেখকের উদ্দেশ্য নয়। সমস্যার প্রকৃতি কিরূপ, সবার সমক্ষে তুলে ধরাই হলো এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। এখানে লেখকের বক্তব্য এই যে, পরিভাষার ব্যাপারে যে বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, অবিলম্বে তার অবসান হওয়া দরকার।

এজন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সম্মিলিতভাবে উদ্যোগী হওয়া দরকার। এঁরা পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট ভাষা-তত্ত্ববিদ্ এবং বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছেন এরূপ বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করতে পারেন। এই বিষয়ে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ-এর তরফ থেকেও সক্রিয় সহযোগিতার আশা করা যেতে পারে। এই কমিটি বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত পারিভাষিক শব্দগুলি বিচার-বিবেচনা করে দেখবেন। তারপর বাংলা ভাষায় গ্রহণযোগ্য পারিভাষিক শব্দাবলীর এক সুসঙ্গত তালিকা প্রণয়ন করবেন। বলা বাহুল্য, এরূপ একটি তালিকা প্রকাশিত হলে, তা পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতা, প্রশ্নকর্তা এবং পরীক্ষক—সকলের পক্ষেই গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক করতে হবে। একমাত্র তখনই পরিভাষার ব্যাপারে এই রকম স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করা যাবে, নতুবা নয়।

পারিভাষিক শব্দাবলী গ্রহণ করবার ব্যাপারে বর্তমান লেখকের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, যেসব শব্দ চলন্তিকায় আছে, সেগুলি অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং যেগুলি চলন্তিকায় নেই, সেগুলি ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তালিকা থেকে গ্রহণ করতে হবে (এরূপ ক্ষেত্রে অন্য কোন বিকল্প শব্দ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় নয়)। তবে যেসব ক্ষেত্রে একই শব্দের পরিভাষা দু-জায়গায় (চলন্তিকা এবং সরকারী তালিকা) দু-রকম আছে, সে সব ক্ষেত্রে দু-রকম পরিভাষাই পাশাপাশি ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। কালক্রমে অধিক গ্রহণযোগ্য শব্দটি থাকবে, অন্যটি বাতিল হয়ে যাবে। আর যেগুলি উপরিউক্ত কোনও তালিকায়ই পাওয়া যাবে না, তাদের জন্যে নূতন শব্দ গঠন করতে হবে। বলা বাহুল্য, স্নাতক বা স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পুস্তক রচনা করতে হলে এরূপ অনেক শব্দ গঠন করবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে। তখন অবশ্য ইতিমধ্যে প্রচলিত পারিভাষিক শব্দগুলি বিচার-বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। আর নতুন শব্দ গঠন করার সময় ভারত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মাবলী অনুসরণ করাই বাঞ্ছনীয়।

ভারতে পারমাণবিক শক্তি

শঙ্কর চক্রবর্তী

তারাপুরে ভারতের প্রথম পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র এই বছর চালু হয়েছে। পশ্চিম ভারতে বিদ্যুৎশক্তির মোট চাহিদার কিছুটা অংশ এই শক্তিকেন্দ্র থেকে সরবরাহ করা হবে। ভারতে শিল্পের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎশক্তির চাহিদার তুলনায় এই পরিমাণ খুবই সামান্য সন্দেহ নেই। তবে ভারতের পারমাণবিক শক্তির গবেষণায় এই যে একটি নতুন অধ্যায় সূচীত হলো, তা অদূর ভবিষ্যতে আরো বৃহত্তর পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যাপক ও বিস্তৃত আকার পরিগ্রহ করবে, সন্দেহ নেই।

ভারতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের পরিস্থিতি খানিকটা আলোচনা করে নিলে পারমাণবিক শক্তির প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি আমাদের কাছে আরো পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

ভারতে বিদ্যুৎশক্তি

১৯৫০ সালে ভারতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের মোট সামর্থ্যের (Capacity) পরিমাণ ছিল ২৩০০ মেগাওয়াট। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ১৯৫৬ সালের গোড়ায় এই সামর্থ্যের পরিমাণ ১১০০ মেগাওয়াটের মত বেড়ে ৩৪২০ মেগাওয়াটে এসে দাঁড়ালো। দ্বিতীয় পরিকল্পনার (১৯৫৬-৬১) শেষে এই পরিমাণ আরো ২৪০০ মেগাওয়াটের মত বেড়ে দাঁড়ালো ৫৮০০ মেগাওয়াটে এবং তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে এই পরিমাণ বেড়ে ১০১৭০ মেগাওয়াটের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে।

চতুর্থ পরিকল্পনার (১৯৬৬-৭১) শেষে বিদ্যুৎ-শক্তির উৎপাদনের সামর্থ্যের মোট পরিমাণ ২০,০০০ মেগাওয়াটে এসে দাঁড়াবে। পরিকল্পনার পাঁচ বছরে যে পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি ভারতে উৎপন্ন হবার কথা, গত ১০ বছরে সমগ্র দেশে উৎপন্ন মোট বিদ্যুৎশক্তির চেয়েও তা বেশী। এই পাঁচ বছরে বৃদ্ধির মোট পরিমাণটা তৃতীয় পরিকল্পনার তুলনায় দাঁড়াচ্ছে ৯৮৩০ মেগাওয়াট।

এই ৯৮৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎশক্তি তৈরির ব্যবস্থা যেভাবে করা হয়েছিল, তা হলো এই—জলশক্তি থেকে আসবে ৩৫৪০ মেগাওয়াট, বাষ্প-শক্তি যোগাবে ৫৮৬০ মেগাওয়াট এবং পারমাণবিক শক্তি যোগাবে ৫৮০ মেগাওয়াট।

ভারতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা যে কত স্বল্প, তা একটি হিসেব থেকেই আমাদের কাছে ধরা পড়বে। ভারতে এক বছরে বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারের গড়পড়তা হার যেখানে হলো ৫০ কিলোওয়াট-ঘন্টা, সেখানে এই হার নরওয়েতে হলো ৬০০০, সোভিয়েট ইউনিয়নে ৮৬০, ফ্রান্সে ১০০০, বৃটেনে ১২১০ এবং আমেরিকাতে ৪৪০০। বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা যে কতটা পিছনে পড়ে আছি, তা বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারের এই তুলনামূলক বিচার থেকেই বোঝা যাচ্ছে। শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলির তুলনায় আমাদের শিল্পগত পশ্চাদগামিতাও এই একটি সূচকের দ্বারাই স্পষ্টভাবে নির্দেশিত হচ্ছে।

ভারতে বিদ্যুৎশক্তির উৎস

ভারতের বিদ্যুৎশক্তির উৎসরূপে প্রথমেই জল-শক্তির কথা উল্লেখ করতে হয়। জলশক্তির সরবরাহকারী ভারতের নদীগুলিকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যারা সম্পূর্ণরূপে বর্ষণপুষ্ট এবং যারা বর্ষণ ও তুষারপুষ্ট। প্রথম শ্রেণীর

নদীগুলি বর্ষার মাসগুলিতে প্রচুর পরিমাণে জল বহন করে। কিন্তু গ্রীষ্মে ঐ জলপ্রবাহ ক্ষীণ হয়ে আসে। দ্বিতীয় শ্রেণীর নদীগুলি—হিমালয় থেকে যাদের উৎপত্তি, তাদের ক্ষেত্রে তুষারের ক্লান্তিহীন সরবরাহ প্রবাহের অস্বাভাবিক তারতম্যকে খানিকটা সামলে রাখবার চেষ্টা করে।

ভারতে জল-বিদ্যুৎশক্তির কেন্দ্রগুলির কার্য-কারীতা তাই নদী-প্রবাহের এই পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করবার উপর নির্ভরশীল। ভারতে জল-শক্তির মোট সামর্থ্যের পরিমাণ প্রায় ৪০,০০০ মেগাওয়াটের কাছাকাছি। বৃটেন, আমেরিকা ও সোভিয়েট ইউনিয়নে জলশক্তির মোট সামর্থ্যের পরিমাণ হলো, যথাক্রমে ৫০০, ১০,০০০ ও ৬০,০০০ মেগাওয়াট। কাজেই বিদ্যুৎশক্তির এই একটি উৎসের পরিমাণের বিচারে তুলনামূলকভাবে ভারতের অবস্থাটা মোটেই খারাপ নয়।

ভারতে জলশক্তির এই যে সামর্থ্য, বর্তমানে তার মাত্র শতকরা ৬ থেকে আট ভাগ বিদ্যুৎশক্তি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। নদীর বর্ষাকালীন প্রবাহের উপর প্রধানতঃ নির্ভরশীল কেরালা, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, রাজস্থান এবং পূর্ব পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চল-গুলিতে তাই অন্য ঋতুর সময়ে বিদ্যুৎশক্তির ঘাটতি হতে দেখা যায়।

বিদ্যুৎশক্তির আর একটি উৎস হলো কয়লা। ভারতে কয়লার মোট পরিমাণ প্রায় ১,২০,০০০ মিলিয়ন টনের কাছাকাছি বলে অনুমান করা হচ্ছে। ভারতের কয়লাসম্পদের বেশীর ভাগ নিকৃষ্ট শ্রেণীর। উন্নত শ্রেণীর কয়লা প্রধানতঃ বিহার ও পশ্চিম বঙ্গের খনিগুলিতেই সীমাবদ্ধ।

বিদ্যুৎশক্তির আর দুটি উৎস তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের সম্পদ ভারতে খুবই কম এবং এই সঞ্চয়ও প্রধানতঃ ভারতের উত্তর-পূর্ব ও মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলগুলিতেই সীমাবদ্ধ।

পারমাণবিক জ্বালানী

পৃথিবীর কোন দেশেই তেল ও কয়লার সম্পদ অফুরন্ত নয়। আগামী দেড়-শ', দু শ' বছরের মধ্যে এদের পরিমাণ এক নিম্নতম অঙ্কে এসে পৌঁছুতে পারে। তাই বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের যে বিকল্প উপাদানটির প্রতি বিজ্ঞানীরা ক্রমেই বেশী মাত্রায় আকৃষ্ট হচ্ছিলেন, তা হলো পদার্থের পরমাণু। কোন বিভাজনশীল পদার্থের পরমাণু-কেন্দ্রক বিদীর্ণ হলে পরমাণু ভর রূপান্তরিত হয় পরমাণবিক শক্তিতে। এই শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থাকে নিউক্লিয়ার রিয়াক্টর যন্ত্রের মধ্যে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা হয়। এই যন্ত্রটি চালু থাকাকালীন অবস্থায় ওর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে তাপশক্তি তৈরি হতে থাকে। একটি Atomic Power Station বা পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রে এই তাপশক্তি বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকে।

পারমাণবিক জ্বালানীরূপে যে মৌলিক পদার্থটি সর্বাধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, সেটি হলো ইউ-রেনিয়াম। ভারতে পারমাণবিক জ্বালানীর অনু-সন্ধানের কাজ বিশেষভাবে চালাবার জন্যে Indian Atomic Minerals Division নামে একটি সংস্থা কয়েক বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সংস্থাটি জামসেদপুরের কাছে যদুগুড়াতে ইতিমধ্যেই ইউরেনিয়াম আবিষ্কার করেছে এবং খনি থেকে তা তোলবার কাজও চলেছে। এই সংস্থা বিহারে মোনাজাইটের একটি নতুন অবস্থানও খুঁজে পেয়েছে। ভারতে একমাত্র কেরালার উপকূলেই এপর্যন্ত মোনাজাইট পাওয়া যেত এবং পরিমাণে এটি ছিল পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ। বিহারে নব-আবিষ্কৃত মোনাজাইটের পরিমাণ কেরালার চেয়েও বেশী বলে অনুমান করা হচ্ছে।

কেরালার উপকূলের এবং বিহারের মোনাজাইট থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পদার্থটি পাওয়া যাচ্ছে, সেটি হলো থোরিয়াম। পারমাণবিক

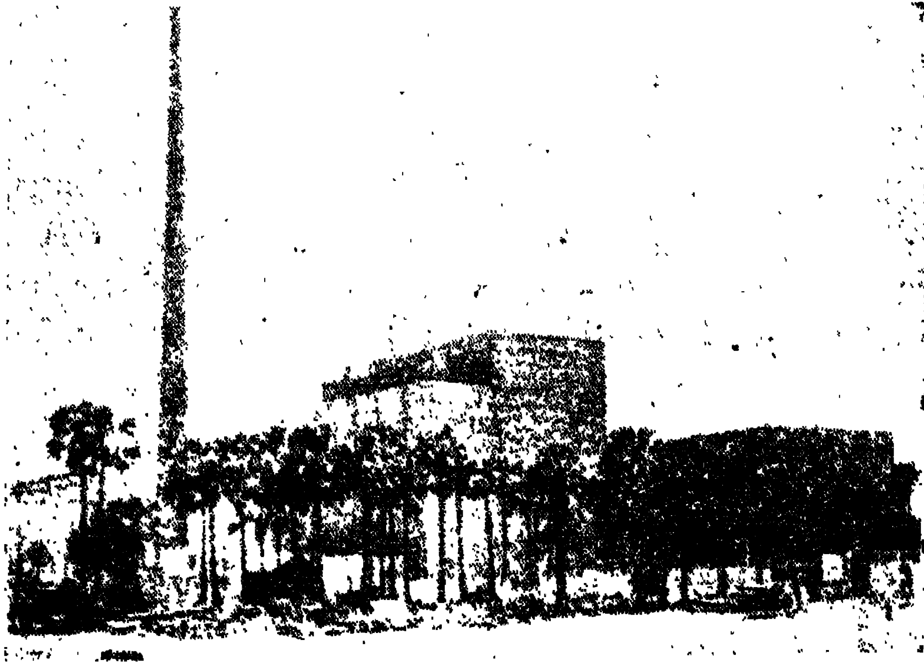
শক্তির জ্বালানীর ব্যাপারে থোরিয়ামের ভূমিকাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আনুমানিক হিসাবে, ভারতে প্রায় ২৫০,০০০ টনের মত থোরিয়াম রয়েছে। সে তুলনায় ভারতে ইউরেনিয়ামের সঞ্চয় এর এক-দশমাংশের মত। কাজেই দূর ভবিষ্যতে ভারতে পারমাণবিক শক্তির পরিকল্পনা থোরিয়ামকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠবে বলে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে আলোচনায় আমরা পরে আসছি।

পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র

ভারতে প্রথম পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রটি তৈরি হয়েছে গুজরাটের তারাপুরে। এই জায়গাটি বোম্বাই শহর থেকে প্রায় ষাট মাইল উত্তরে আরব সাগরের তীরে অবস্থিত। এই কেন্দ্রের দুটি রিয়্যাক্টরের বিদ্যুৎশক্তি তৈরির পুরা সামর্থ্যের পরিমাণ হলো ৩৮০ মেগাওয়াট। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের শিল্প-সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিতে এখান থেকে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা হবে।

ভারতের যে অঞ্চলগুলিতে কয়লা, তেল ও জলশক্তির যথেষ্ট সঞ্চয় নেই, আপাততঃ সে সব এলাকাতেই পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন তুলনামূলকভাবে বেশী। তারাপুর এই জাতীয় একটি এলাকার অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া আরো দুটি এলাকা এই পর্যায়ভুক্ত—একটি হলো রাজস্থান-দিল্লী-পাঞ্জাব এলাকা, আর একটি হলো ভারতের দক্ষিণ ভাগ।

তারাপুরে যে দুটি রিয়্যাক্টর বসানো হয়েছে, সেগুলি Boiling Water Reactor শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এখানে জ্বালানী হিসাবে খানিকটা সমৃদ্ধ (Enriched) ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয়েছে। স্বাভাবিক ইউরেনিয়ামের মধ্যে ওর যে আইসোটোপটি বিভাজনশীল অর্থাৎ যার পরমাণু-কেন্দ্রককে সংঘে ভেঙ্গে ফেলা যায়, সেই ইউ-২৩৫-এর পরিমাণ শতকরা '৭ ভাগের চেয়ে বেশী থাকলে তাকে আমরা সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম বলবো। স্বাভাবিক ইউরেনিয়ামের মধ্যে ওর যে আইসোটোপটি শত-



তারাপুর পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র।

করা ৯৯ তাগের চেয়েও বেশী পরিমাণে থাকে, সেই ইউ-২৩৮ আদৌ বিভাজনশীল নয়।

তারাপুরে যে দুটি রিয়্যাক্টর রয়েছে, তাদের মধ্যে ইউরেনিয়ামরূপী জ্বালানীকে একটি মাত্র দণ্ডের আকারে না রেখে কতকগুলি দণ্ডকে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে অনেক বেশী পরিমাণে তাপ রিয়্যাক্টর থেকে বাইরে বের করে আনা সম্ভব হয়। ইউ-২৩৫-এর পরমাণু-কেন্দ্রকগুলি বিদীর্ণ হলে তাপ-শক্তির সঙ্গে কিছু নিউট্রন ছাড়া পায়। এই নিউট্রনগুলি আবার প্রতিবেশী পরমাণু-কেন্দ্রকদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরায়। একটি ইউ-২৩৫ পরমাণু-কেন্দ্রকের বিভাজন যদি মুক্ত নিউট্রনের সাহায্যে আর একটি পরমাণু-কেন্দ্রকের বিভাজন ঘটাতে সক্ষম হয়, তাহলে আমরা বলবো, রিয়্যাক্টের মধ্যে এক স্বনির্ভরশীল শৃঙ্খল-প্রক্রিয়া (Self-sustaining chain reaction) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং রিয়্যাক্টরটি criticality-র পর্যায়ে পৌঁচেছে। এই ব্যাপারটি যেখানে ঘটছে না, সেখানে রিয়্যাক্টরটি রয়েছে sub-critical পর্যায়ে। আবার একটি পরমাণু-কেন্দ্রকের বিভাজন যদি একের চেয়ে বেশী পরমাণু-কেন্দ্রকের বিভাজন ঘটায়, তাহলে রিয়্যাক্টরটি super-critical পর্যায়ে পৌঁচেছে বলতে হবে। একটি রিয়্যাক্টরের মধ্যে এই দুটি অবস্থাকেই সামলে ওঠবার মত ব্যবস্থা তৈরি রাখতে হয়।

তারাপুরের একটি রিয়্যাক্টর গত ফেব্রুয়ারী মাসে এবং আর একটি গত মে মাসে critical হয়ে দাঁড়ায়। এখান থেকে বিদ্যুৎশক্তির সরবরাহ সুরু হয় গত জুলাই মাস থেকে। এই শক্তিকেন্দ্রে নিউট্রনের বেগ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখবার জন্যে নিয়ন্ত্রাকারী বা moderator হিসেবে সাধারণ জল ব্যবহার করা হচ্ছে। রিয়্যাক্টরের নামকরণও হয়েছে তাই থেকে। রিয়্যাক্টরকে ঠাণ্ডা রাখবার দায়িত্বও রয়েছে জলের উপরেই। নিউট্রনের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে ক্যাডমিয়াম, বোরোন প্রভৃতি বস্তুর দণ্ড রিয়্যাক্টরে জ্বালানীর দণ্ড বা পাতের মধ্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। ওদের ওঠা-নামার মধ্য দিয়ে নিউট্রনের সংখ্যা খুসীমত কমানো-বাড়ানো যায়।

তাপ থেকে বিদ্যুৎ

রিয়্যাক্টরের মধ্যে ইউ-২৩৫ পরমাণু-কেন্দ্রকের বিভাজনের ফলে যে তাপ সৃষ্ট হয়, তার ফলে ভিতরের জল ফুটতে থাকে এবং বাষ্পে-পরিণতি লাভ করে। সেই বাষ্প একটি বাষ্প পৃথকীকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে উচ্চচাপ ও নিম্নচাপ-যুক্ত অবস্থায় একটি টারবাইনের উচ্চচাপ ও নিম্নচাপ প্রান্তে গিয়ে হাজির হয়। টারবাইনটি গতিশীল হয়ে একটি জেনারেটরকে চালু করে। জেনারেটর বিদ্যুৎশক্তিকে তৈরি করে বসে।

তারাপুর শক্তিকেন্দ্রে রিয়্যাক্টর দুটি ১৩,২২,০০০ কিলোওয়াটের মত তাপীয় শক্তি তৈরি করছে, কিন্তু সেই তাপশক্তি থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি তৈরি হচ্ছে ৩৮০,০০০ কিলোওয়াটের মত; কাজেই উপযুক্ততার (Efficiency) পরিমাপ দাঁড়াচ্ছে শতকরা ২৮'৭ ভাগ।

প্রতিটি রিয়্যাক্টরে ৪০ টনের মত ইউরেনিয়ামরূপী জ্বালানী মজুত করা রয়েছে। দু'বছরের মধ্যে আর কোন জ্বালানীর প্রয়োজন হবে না। পরবর্তী কালে প্রতি বছরে ২২ টনের মত জ্বালানী লাগবে এবং এথেকে যে শক্তি পাওয়া যাবে, তার পরিমাণ দাঁড়াবে প্রতি বছর দশ লক্ষ টন কয়লা জ্বালিয়ে পাওয়া শক্তির সমান।

রাজস্থানে কোটার কাছে রাণাপ্রতাপ সাগরে ভারতের দ্বিতীয় পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রটি স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে। তৃতীয় পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রটি স্থাপিত হচ্ছে মাদ্রাজের মহাবলিপুরমের কাছে কলপাকম জায়গাটিতে। দুটি কেন্দ্রেই দু-শ' মেগাওয়াট বিদ্যুৎশক্তি তৈরির সামর্থ্যসম্পন্ন

দুটি করে রিয়্যাক্টর স্থাপন করা হবে। এই দুটি রিয়্যাক্টরে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হবে স্বাভাবিক ইউরেনিয়াম, তারাপুরের মত সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম নয়। রিয়্যাক্টরের মধ্যে মডারেটর হিসেবে সাধারণ জলের জায়গায় ব্যবহার করা হবে ভারী জল।

রাণাপ্রতাপ সাগর এবং কলপাকম—এই দুটি পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র তৈরির কাজ ১৯৭০-৭১ সাল নাগাদ শেষ হবে।

ব্রিডার রিয়্যাক্টর: জ্বালানী তৈরির কারখানা

ভারতবর্ষকে যদি পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র নির্মাণে স্বাবলম্বী হতে হয়, তাহলে এমন একটি জ্বালানী নির্বাচনের দিকে অগ্রসর হতে হবে, যাতে বিদেশের দ্বারস্থ না হতে হয়। ভারতে ইউরেনিয়ামের সঞ্চয় খুবই কম, কিন্তু থোরিয়াম রয়েছে অপর্যাপ্ত। ইউ-২৩৫-এর মত থোরিয়ামের পরমাণুগুলি বিভাজনশীল নয়। কিন্তু থোরিয়ামকে একটি বিশেষ ব্যবস্থায় ইউরেনিয়ামেরই একটি আইসোটোপ ইউ-২৩৩-এ রূপান্তরিত করা যায়, যার পরমাণুগুলি আবার বিভাজনশীল।

পদার্থের ভোল পাল্টাবার এই খেলা একটি দ্রুতগতি ব্রিডার রিয়্যাক্টরের মধ্যে চমৎকার-ভাবে চলতে পারে। ব্রিডার শব্দটির অর্থ—যে জন্ম দান করে। রিয়্যাক্টরের ঐ নামকরণের কারণ হলো, চালু থাকবার জন্যে ও যে পরিমাণ জ্বালানী খরচা করছে, তার চেয়ে বেশী পরিমাণ জ্বালানীকে ও জন্ম দিচ্ছে বা তৈরি করে তুলছে। পরমাণু বিভাজনের ফলে ছাড়া পাওয়া নিউট্রনগুলির মন্দগতি করবার জন্যে এই জাতীয় রিয়্যাক্টরে কোন মডারেটর ব্যবহার করা হয় না বলে এর নামকরণ করা হয়েছে দ্রুতগতি ব্রিডার রিয়্যাক্টর!

এই জাতীয় একটি রিয়্যাক্টরের মধ্যে মনে করা যাক, জ্বালানী হিসেবে সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামকে ব্যবহার করা হলো, যার শতকরা ৯৯ ভাগেরও বেশী হলো অ-বিভাজনশীল ইউ-২৩৮, আর ⋅১ ভাগের মত হলো বিভাজনশীল ইউ-২৩৫। ইউ-২৩৫-এর পরমাণুগুলির বিভাজনের ফলে যে নিউট্রনগুলি ছাড়া পাচ্ছে, অ-বিভাজনশীল ইউ-২৩৮-এর পরমাণু-গুলি ওদের শুষে নিয়ে প্লুটোনিয়ামে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। প্লুটোনিয়ামের পরমাণু আবার বিভাজনশীল। একই রিয়্যাক্টরের মধ্যে যদি থোরিয়ামকে রেখে দেওয়া যায়, তাহলে থোরি-য়ামের পরমাণু আবার নিউট্রন শুষে নিয়ে ইউরেনিয়ামের আর একটি আইসোটোপ ইউ-২৩৩-তে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। ইউ-২৩৩-এর পরমাণুরাও বিভাজনশীল।

বিশেষজ্ঞদের হিসাবে বর্তমানের পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রগুলিতে যে ধরণের রিয়্যাক্টরের ব্যবস্থা চালু রয়েছে তাই যদি চলতে থাকে, তাহলে আগামী ৫০ বছর বাদে পৃথিবীর স্বাভাবিক ইউ-রেনিয়ামের বার্ষিক চাহিদা ২০ থেকে ৪০ মিলিয়ন টনের অঙ্কে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু যদি দ্রুতগতি ব্রিডার রিয়্যাক্টরকে সে জায়গায় কাজে লাগানো যায়, তাহলে গোটা পৃথিবীর বিদ্যুৎশক্তির একই পরিমাণ চাহিদা মেটাবার জন্যে ২০ মিলিয়ন টনের বেশী স্বাভাবিক ইউরে-নিয়ামের আদৌ কোন প্রয়োজন হবে না।

দ্রুতগতি ব্রিডার রিয়্যাক্টরের ব্যবহার এখনো পরীক্ষামূলক পর্যায়েই রয়ে গেছে। থোরিয়ামকে কেন্দ্র করে রিয়্যাক্টরের ব্যবস্থা ভারতের ভবিষ্যৎ পারমাণবিক শক্তি পরিকল্পনায় এক অতি গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে, সন্দেহ নেই।

ক্যানাল রশ্মির বিশ্লেষণ ও ভরচ্ছত্র

হীরেন্দ্রকুমার পাল

পরমাণুকে উদ্দীপিত করলে যে আলো বিকিরিত হয়, তার বর্ণচ্ছত্র (Spectrum) বিশ্লেষণ করে ঐ পরমাণুর ভিতরকার অনেক রহস্য জানা যায়। পক্ষান্তরে পরমাণুকে আয়নিত করে যথাযোগ্য ব্যবস্থায় তার একটা ভরচ্ছত্র (Mass-spetrum) পাওয়া যেতে পারে, যা বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা পরমাণুর ভর বা বস্তুমাত্রা সম্পর্কে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এর ফলে পরমাণুর গঠন সম্পর্কিত আমাদের প্রাক্তন ধ্যান-ধারণাগুলিকে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হয়েছে। অতীত যুগে মনে করা হতো, মৌলিক পদার্থের প্রতিটি পরমাণু শুধু রাসায়নিক গুণাগুণের দিক দিয়েই নয়, ভরের দিক দিয়েও সর্বতোভাবে অভিন্ন। কিন্তু ক্যানাল রশ্মি (Canal rays) বিশ্লেষণের দৌলতে আজ আমরা জানতে পেরেছি যে, রাসায়নিক ধর্মের অভিন্নতা সত্ত্বেও পরমাণুর ভর বিভিন্ন হতে বাধা নেই। কাজেই পর্যায়সারণীর (Periodic table) রূপকার মেণ্ডেলিফ (Mendeleeff) যে একদা বলেছিলেন, বস্তুর রাসায়নিক ধর্ম তার পারমাণবিক ওজনের উপর নির্ভরশীল (যদিও পর্যায়ক্রমিক ভাবেই), সে কথাটা আজ আর নির্ভেজাল সত্য বলে গ্রহণীয় নয়।

ড্যালটনের (Dalton) 'পরমাণু' বর্তমানে 'অবিভাজ্য' নয় মোটেই। ভাঙলে পরে তা থেকে বেরোয় এক প্রকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণিকা। এরা ঋণতড়িদ্বাহী এবং প্রত্যেকের আছে একই পরিমাণ তড়িৎ-সম্পদ। এরা প্রত্যেক পরমাণুর অপরিহার্য অংশও বটে। পরমাণু থেকে এরা বেরিয়ে এলে অবশিষ্ট পরমাণু হবে ধন-তড়িৎযুক্ত এবং সে ধনতড়িতের পরিমাণ হবে বিযুক্ত ঋণতড়িতের সমান, যেহেতু সমগ্রভাবে পরমাণু নিস্তড়িৎ। ঐ ঋণতড়িৎ কণা কিন্তু সম্পূর্ণ অবিভাজ্য—ইলেকট্রন নামে এর পরিচিতি।

ঐতিহাসিক দিক দিয়ে ইলেকট্রন আবিষ্কারের মূলে রয়েছে গ্যাসের ভিতরে তড়িৎ-ক্ষরণের পরীক্ষা। আলোচ্য ক্যানাল রশ্মির আবিষ্কারও তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

সাধারণতঃ স্বাভাবিক চাপের অধীন প্রায় সব গ্যাসই তড়িৎ-প্রবাহের উত্তম প্রতিরোধক। কিন্তু এই প্রতিরোধ-ক্ষমতা ভেঙে পড়ে, যখন গ্যাসের চাপ অতিমাত্রায় কমিয়ে এবং আরোপিত বৈদ্যুতিক চাপ অতিমাত্রায় বাড়িয়ে দেওয়া যায়। তখন দেখা যাবে, গ্যাসের ভিতর দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহের চলাচল অনেকটাই সহজ হয়ে এসেছে। এর সমর্থনে নিম্নোক্ত পরীক্ষাটি অনায়াসে নিষ্পন্ন করা যেতে পারে।

একটি আবদ্ধ কাচ-নলের ভিতরে পরীক্ষণীয় গ্যাস নিয়ে তার দুই প্রান্তে দুটি তড়িৎ-মেরু (Electrode)—অ্যানোড (Anode) এবং ক্যাথোড (Cothode) স্থাপন করা হলো আর নলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো নিষ্কাশন পাম্প ও চাপমান যন্ত্র। পরে মেরুদ্বয়ের মধ্যে উচ্চ ভোল্টের বৈদ্যুতিক বিভব-পার্থক্য (Potential difference) প্রয়োগ করলে প্রথমতঃ গ্যাসের ভিতরে তড়িৎ-প্রবাহের কোনই নিদর্শন পাওয়া যাবে না। কিন্তু অবিরাম পাম্প চালিয়ে গ্যাসের চাপ ক্রমশঃ কমাতে কমাতে এমন এক স্তরে এনে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব, যখন নলের ভিতরে সত্য সত্যই, ক্ষীণ হলেও একটা তড়িৎ-প্রবাহের অস্তিত্ব যন্ত্রে

ধরা পড়বে এবং গ্যাসটিও সঙ্গে সঙ্গে খণ্ড খণ্ড দীপ্তিতে বিভক্ত হয়ে, হয়ে উঠবে ভাস্বর। সে এক অপূর্ব নয়ন-বিমোহন দৃশ্য। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখা যাবে, ক্যাথোডের অব্যবহিত সামনে রয়েছে একটি দীপ্তি, যাকে বলে 'ক্যাথোড-জ্যোতি' (Cathode glow) এবং তার পুরোভাগেই এক ফালি অন্ধকার, যার নাম 'ক্রুক্‌স্-এর অন্ধকার অঞ্চল' (Crookes' dark space)।

গ্যাসের চাপ আরো কমতে থাকলে নলের ভিতরকার নানা পরিবর্তনই ক্রমশঃ দৃষ্টিগোচর হবে। পরিশেষে চাপের চরম সীমায় এসে ঐ অন্ধকার ফালিটি সম্প্রসারিত হয়ে সম্পূর্ণ নলটিকে ছেয়ে ফেলবে আর অ্যানোড সংলগ্ন দীপ্তিটি হবে অদৃশ্য। দেখতে দেখতে নলের প্রাচীর-গাত্রও রঙীন প্রতিপ্রভায় (Fluorescence) ঝলমল করে উঠবে। তড়িৎ-প্রবাহ কিন্তু তখনো অব্যাহতই চলছে। আরো দেখা যাবে, যেন অপার্থিব কোন কিছুর একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা ক্যাথোড থেকে অ্যানোডের দিকে সোজাসুজি ছুটে চলেছে। গোল্ডষ্টাইন (Goldstein) এই ধারার নাম রেখেছেন 'ক্যাথোড রশ্মি' (Cathode rays)।

এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগবে, গ্যাসের ভিতরে এই যে ধারা, তার প্রকৃত স্বরূপটা কি এবং সে কোন্ অদৃশ্য প্রক্রিয়া, যা নলের তড়িৎ-প্রবাহের জন্যে দায়ী? স্যার উইলিয়াম ক্রুক্‌স্-এর মতে, ক্যাথোড-রশ্মি পদার্থের অজানা চতুর্থ এক বিশেষ অবস্থার প্রকাশ। পক্ষান্তরে জার্মান বিজ্ঞানীদের বৃহৎ এক গোষ্ঠী মনে করতেন যে, রশ্মিটি অতিবেগুনী জাতীয় ঈথার-তরঙ্গ। শেষ পর্যন্ত সকল বাদানুবাদের অবসান ঘটিয়ে স্যার জে. জে. টমসন সংশয়াতীতভাবে প্রমাণ করেন যে, ক্যাথোড-রশ্মি ক্ষুদ্রতম ঋণ তড়িৎ-কণার প্রবাহ ছাড়া আর কিছু নয়। এর উপর বৈদ্যুতিক এবং চৌম্বক বলের ক্রিয়া নিরীক্ষণ করে তিনি ঐ তড়িৎ-কণাগুলির প্রচণ্ড গতিবেগ এবং তাদের তড়িৎ-আধানের সঙ্গে ভরের অনুপাত (e/m) নির্ণয় করেন। বলা বাহুল্য, পদার্থ-বিজ্ঞানের আসরে এই অনুপাতটির গুরুত্ব অপরিসীম।

ক্যানাল রশ্মি প্রসঙ্গে নলের ভিতর ঋণ তড়িৎ-কণার আবির্ভাবের চিত্রটি অনুধাবনের প্রয়োজন আছে যদিও সে চিত্র যে খুব স্পষ্ট, তা নয়। আমরা জানি, গ্যাসের অণুগুলি কখনও কোথাও স্থির হয়ে বসে থাকে না—মহাব্যস্ততায় বিশৃঙ্খলভাবে এবং প্রচণ্ড বেগে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করে। ফলে অনিবার্যভাবেই তাদের মধ্যে পুনঃ পুনঃ ঠোকাঠুকি হয় এবং তাতেই হয়তো কিছু অণু ভেঙ্গে গিয়ে গোড়ার দিকে তাদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসে ঐ ঋণ তড়িৎ-কণা। ঋণতড়িৎ হারিয়ে অণুগুলি তখন হয় ধনাধানগ্রস্ত। এই ঋণ তড়িৎ-কণা এবং ধনাহিত অণুকে বলে আয়ন (Ion) আর অণুর এই বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়াকে আয়নীকরণ অথবা আয়নীভবন (Ionization) বলা হয়। গ্যাসের অভ্যন্তরে ঋণায়ন ও ধনায়নের মধ্যে আকর্ষণ কিংবা সংঘর্ষ হেতু তাদের পুনর্মিলন (Recombination) হয়ে মূল অণুর পুনরুদ্ধারও সম্ভব। আবার নিস্তড়িৎ অণুর সঙ্গেও ঋণায়ন (Negative ion) সংযুক্ত হয়ে অল্প বৃহৎ ঋণায়ন তৈরি করতে পারে। স্বল্প চাপের অধীনে স্বাভাবিক অবস্থায়ও গ্যাসের ভিতরে দু-চারটি আয়ন থাকতে পারে এখানে-সেখানে। কিন্তু অ্যানোড-ক্যাথোডের মধ্যে তড়িৎ-ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে ঐ মুক্ত আয়নগুলি পুনর্মিলন যথাসম্ভব এড়িয়ে বিপুল বেগে বিপরীত দিকে ধাবিত হবে—ঋণায়ন যাবে অ্যানোডের দিকে এবং ধনায়ন যাবে ক্যাথোডের দিকে। পথে যেতে যেতে ঠোকাঠুকির ফলে তারা আরো বিস্তর অণুকে আয়নিত করবে এবং নবজাত আয়নগুলিও পূর্বগামীদের মতই ছুটতে থাকবে। এভাবে পর পর অজস্র

আয়নের সৃষ্টি হবে এবং সেগুলিই অ্যানোড-ক্যাথোডের মধ্যে তড়িৎ পরিবহনের কাজটি সম্পাদন করবে। ঋণায়ন যে শুধু গ্যাসীয় অণু-পরমাণু থেকেই নির্গত হবে, এমন কোন কথা নেই, ক্যাথোড-পদার্থ থেকেও আসতে পারে ধনায়নের সংঘাতে। সে যাই হোক, এখানে মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই যে, ধনায়নগুলি গিয়ে ভীড় করবে ক্যাথোডের গায়ে। তড়িৎ সঞ্চালনের সময় গ্যাসের মধ্যে ইতস্ততঃ যে দীপ্তি ফুটে উঠেছিল, তার জন্যে দায়ী গ্যাসের উল্লিখিত আয়নীভবন।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, ঋণায়নের 'আধান/ভর' (e/m) অনুপাত একটি সার্বভৌম ধ্রুবাঙ্ক; অর্থাৎ তা আরোপিত তড়িৎ-ক্ষেত্রের প্রাবল্য, ক্যাথোড-পদার্থ কিংবা নলের মধ্যস্থিত গ্যাসের রাসায়নিক প্রকৃতি অথবা গ্যাসের চাপ, তাপমাত্রা প্রভৃতি কোন কিছুর উপরই নির্ভরশীল নয়। অতএব এই সিদ্ধান্তে অবশ্যই আসতে হয় যে, পরমাণু মাত্রেই সে অনন্ত ঋণায়নের আদিম আবাসস্থল। বলা বাহুল্য, এই ঋণায়নগুলি হলো আমাদের পূর্ব-বর্ণিত ইলেকট্রন।

বিজ্ঞানী উইলসনই (C. T. R. Wilson) সর্বপ্রথম তাঁর 'মেঘপ্রকোষ্ঠের পরীক্ষায়' (Cloud chamber experiment) সাহায্যে ইলেকট্রনের তড়িৎ-আধান (e) পরিমাপ করেন। পরে অধ্যাপক মিলিকানও (Millikan) বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রের প্রভাবাধীন ইলেকট্রন-আহিত তৈল-বিন্দুর পতন (Oil-drop experiment) নিরীক্ষণ করে এবং আরো নির্ভুলভাবে ঐ আধান নির্ধারণ করে অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হন। এস্থলে উল্লেখ্য যে, এই আধান বিশ্বের ক্ষুদ্রতম তড়িন্মাত্রা এবং অন্যান্য তুলনীয় যে সব আধান নিয়ে বিজ্ঞানীদের কারবার, তা এর পূর্ণ গুণিতক বলেই জানা গেছে।

উইলসন এবং মিলিকানের পরীক্ষার গুরুত্ব অসাধারণ। কারণ, এতকাল পরমাণুর শুধু আপেক্ষিক ওজনটাই (হাইড্রোজেন পরমাণুর তুলনায়) আমাদের জানা ছিল। এবার তার অন্য-নিরপেক্ষ আসল ওজনটাও হাতের মুঠোয় এসে গেল। এঁদের এবং স্যার জে. জে. টমসনের পরীক্ষালব্ধ ফল একত্র করলে ইলেকট্রনের ভর দাঁড়ায় ৯×১০^{-২৮} গ্র্যাম। তবে এই ভর যে বস্তুগত কিছু নয়, তা মনে করবার কারণ আছে। বিজ্ঞানীরা ইতিপূর্বে হাইড্রোজেন-সমন্বিত দ্রবের তাড়িতক বিশ্লেষণ থেকে ঐ আয়নের তড়িৎ-সত্তার এবং ভর-এর অনুপাত স্থির করেছিলেন। এর সঙ্গে ইলেকট্রন-সংশ্লিষ্ট অনুপাত তুলনা করে দেখতে পাই, হাইড্রোজেন-আয়ন ইলেকট্রনের ১৮৪০ গুণ ভারী। এস্থলে অবশ্য সঙ্গত কারণেই ধরে নিচ্ছি যে, হাইড্রোজেন-আয়ন এবং ইলেকট্রনের তড়িৎ-সত্তার বিপরীত চিহ্নাত্মক হলেও পরিমাণের দিক দিয়ে তারা পরস্পরের সমান। তাহলে হাইড্রোজেন-আয়নের নিজস্ব, নিরপেক্ষ ভর দাঁড়ায় $১৮৪০ \times ৯ \times ১০^{-২৮} = ১৬৫ \times ১০^{-২৬}$ গ্র্যাম। হাইড্রোজেন পরমাণুরও হবে তাই। কেন না, ঐ পরমাণু থেকে ইলেকট্রনটা নিষ্ক্রান্ত হলেই তা আয়নীভূত হয়, আর ইলেকট্রনের ভর হাইড্রোজেন-আয়নের তুলনায় নগণ্য। অতএব মেণ্ডেলেফ-এর পর্যায়সারণীর অন্তর্গত প্রতিটি পরমাণুর নিরপেক্ষ প্রকৃত ভর জানবার পথে এখন আর কোন বাধা রইলো না।

রসায়নশাস্ত্রের পারমাণবিক ওজনগুলি মোটামুটি পূর্ণ অর্থাৎ ভগ্নাংশ বর্জিত আস্ত সংখ্যার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এজন্যেই মনীষী প্রাউট (Prout) একদা অনুমান করেছিলেন যে, প্রত্যেক মৌলিক পরমাণু হাইড্রোজেন এককের সমষ্টি। আর আজকার চিন্তাধারাও দেখতে পাই মূলতঃ এই দিকেই ধাবিত। লক্ষণীয় যে, অক্সিজেনের পারমাণবিক ওজনকে ১৬ ধরলে অন্যান্য পারমাণবিক ওজনের পূর্ণ সংখ্যায় নির্দেশ্যতা আরো নিখুঁৎ হয়।

কিন্তু তাতে হাইড্রোজেনের নিজেরটা হয়ে পড়ে ১'০০৮, যা হলো একটা ভগ্নাংশযুক্ত সংখ্যা!

বিশেষ সঙ্কটের সৃষ্টি হলো ক্লোরিনকে নিয়ে। কেন না, তার ওজন পাওয়া গেল ৩৫'৪, যা কোন পূর্ণ সংখ্যা নয়। বহুকাল এ সমস্যা রসায়ন-বিজ্ঞানীর সামনে এক বিরাট জিজ্ঞাসা বোধক চিহ্নের মত দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু পরম স্বস্তির বিষয়, বিজ্ঞানের দুর্বার অগ্রযাত্রায় আজ তার সুমীমাংসা হয়েছে; এখন সে ইতিহাসের এক বিস্মৃতপ্রায় কাহিনী ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রাক্-ইলেকট্রন যুগে আপেক্ষিক পারমাণবিক ওজনগুলি রাসায়নিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ বিশুদ্ধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই নির্ণীত হয়ে আসছিল। কিন্তু ক্যানাল রশ্মির আবিষ্কার আমাদের হাতে এমন একটি পদ্ধতি তুলে দিয়েছে, যাতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কোন সংশ্রব নেই। পদ্ধতিটি একান্তভাবেই পদার্থবিদ্যার আওতা-ভুক্ত। এর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক্ষমতা আমাদের জন্যে এনে দিয়েছে পারমাণবিক ওজন সংক্রান্ত নতুন জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গী।

ক্যানাল রশ্মির উল্লেখ করলাম, কিন্তু সে রশ্মিটি কি এবং কিভাবে উৎপন্ন হয়, তা বলা হয় নি এখনও। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, স্বল্প চাপ গ্যাসের ভিতর দিয়ে কিভাবে তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চালিত হয় আর কিভাবেই বা গ্যাসের ধনায়ন-গুলি ক্যাথোডের উপর সঞ্চিত হয়ে সেখানে জ্যোতি উৎসারিত করে। এখন এই ক্যাথোডের গায়ে এক বা একাধিক ছিদ্র থাকলে ঐ ছিদ্রপথে উপযুক্ত তড়িৎ-বলক্ষেত্রের সাহায্যে ধনায়নগুলিকে ইলেকট্রন-স্রোতের বিপরীত দিকে অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যায়, ক্যাথোডের পিছনে। সেখানকার গ্যাসের চাপ অবশ্য আরো কিছু কম থাকা দরকার। ধনায়ন-ধারা গিয়ে সেখানে এক অনুপ্রভার (Phosphorescence) সৃষ্টি করবে। ইলেকট্রন-ধারার জন্যেও অনুপ্রভা উৎপন্ন হয়। তবে একই গ্যাসের জন্যে তাদের রং হয় দু-রকম; যেমন—হিলিয়ামের বেলায় তারা হয় যথাক্রমে লোহিতাভ এবং ফিকে নীল। ক্যাথোডের পিছনে প্রবাহিত এই ধনায়ন-ধারাকেই বলে ক্যানাল বা ধনাহিত রশ্মি (Positive rays)।

ক্যানাল রশ্মিতে ধনায়নেরও 'আধান/ভর' অনুপাত সুকৌশলে স্থির করেছেন স্যার জে. জে. টমসন। পদ্ধতিটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে: প্রথমতঃ সরু এক গুচ্ছ ক্যানাল রশ্মিকে ক্যামেরার প্লেটে এনে ফেলা হয়। রশ্মি যেখানে এসে পড়বে, সেখানে একটি বিন্দুর ছাপ উঠবে, যেমন উঠতো আলোক রশ্মি পড়লে। কিন্তু যদি ঐ ক্যানাল রশ্মির উপর দুটি সমান্তরাল বলক্ষেত্র—একটি বৈদ্যুতিক আর অন্যটি চৌম্বক,—উপর্যুপরি স্থাপন করা যায়, যেন তারা রশ্মি-পথের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে থাকে, তাহলে ক্যামেরার পটে ফুটে উঠবে এক বক্ররেখা, যা তাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার করলে হবে একটা পরাবৃত্তাংশ। আর পূর্বোক্ত বিন্দুই হবে সে পরাবৃত্তের (Parabola) 'একান্ত' বিন্দু। বলক্ষেত্র দুটির জন্যে রশ্মির পৃথক পৃথক সমকৌণিক বিচ্যুতি ঘটবে। এর সমষ্টিগত ফল দাঁড়াবে এই যে, ধনায়নগুলি মূল বিন্দুতে না পড়ে তাদের গতিবেগের তারতম্যানুযায়ী পড়বে এসে ঐ বক্র-রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে। উক্ত পরাবৃত্তটা হলো তাহলে পাতবিন্দুর সঞ্চারপথ (Locus)। একে মেপে-জুকে ধনায়নের 'আধান/ভর অনুপাত স্থির করা যায়। যেহেতু বিভিন্ন গ্যাসের জন্যে এই অনুপাত বিভিন্ন, সেহেতু সংশ্লিষ্ট ধনায়নের সঞ্চারপথও হবে বিভিন্ন। আবার একই গ্যাসের জন্যেও অনুপাতটি বিভিন্ন হতে পারে এই কারণে যে, পরমাণু থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন নিষ্কাশিত হয়ে আয়নাধানের বৈষম্য

ঘটাতে পারে। সে যাই হোক, আলোকচিত্রের যথাযথ পর্যবেক্ষণ এবং বিচার-বিবেচনার দ্বারা প্রকৃত ব্যাপার অনুধাবনে বিশেষ কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। সুতরাং একই প্লেটে একই পরিমণ্ডলে যদি হাইড্রোজেন এবং অন্য কোন মৌলিক গ্যাসের জন্যে পৃথক ছবি তোলা হয়, তাহলে তাদের তুলনামূলক পরিমাপ থেকে সহজেই সে গ্যাসায়নের আপেক্ষিক ভর অর্থাৎ তথাকথিত 'পারমাণবিক ওজন' নিরূপিত হতে পারে। ঐ একই পদ্ধতিতে যৌগিক আয়নেরও আপেক্ষিক ওজন জানা যায়।

এই প্রসঙ্গে আর একটা সম্ভাবনার কথাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। একই মৌলিক (বা যৌগিক) বস্তুর বিভিন্ন ধনায়নের জন্যে আধান-মাত্রা সমান হয়েও যদি তাদের ভর অসমান হয়, তাহলেও ফটোর প্লেটে বিভিন্ন পরাবৃত্ত-রেখা অঙ্কিত হবে। এই অসম ভরের কল্পনা অবশ্য প্রাচীন চিন্তাধারার সঙ্গে খাপ খায় না; তবু কল্পনাটা গ্রহণযোগ্য কিনা, তা উপস্থিত প্রত্যক্ষ পরীক্ষার নিরিখেই সাব্যস্ত করতে হবে। স্যার জে. জে. টমসন নিয়ন (Neon) গ্যাসের (২০·২) জন্যে যে ছবি তুলেছেন, তাতে সত্য সত্যই দুটি রেখা এসে গেছে। এদের একটা তো খুবই স্পষ্ট, যদিও অপরটি তত নয়। প্রথম রেখা থেকে পারমাণবিক ওজন পাওয়া গেল ২০; কিন্তু দ্বিতীয়টি ২২-এর ইঙ্গিত বহন করলো। তবে আয়নসমূহের সংখ্যা-ভূয়িষ্ঠতার তারতম্যই রেখা-প্রাখর্যের পার্থক্যের হেতু কিনা, সঠিক বলা যায় না। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নিয়ন-২২-কে নিয়ন-২০ থেকে কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেই আলাদা করা যায় না, যেহেতু রাসায়নিক গুণাগুণের দিক থেকে তারা সমপর্যায়ভুক্ত। অতএব দেখা যাচ্ছে, রসায়নবিদ্‌রা নিয়নের যে পারমাণবিক ওজন ২০·২ বের করছেন, তা একটা গড়পড়তা হিসাবে মাত্র; নিয়ন পরমাণুগোষ্ঠীর ব্যষ্টিগত ওজন নয়। এ উক্তি অন্যান্য পরমাণুর বেলায়ও খাটে। টমসন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো, এর সাহায্যে পরমাণুগোষ্ঠীর ব্যষ্টিগত ওজনটাই পাওয়া যেতে পারে।

একই মৌলিক পদার্থের নানা পরমাণু যাদের কেন্দ্রীয় ধনাধান-মাত্রা সমান, কিন্তু ভরের দিক দিয়ে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। তাদের বলা হয় আইসোটোপ (Isotope) বা সমধর্মী পরমাণু। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরমাণুর রাসায়নিক প্রকৃতিকে তার ভর-সাপেক্ষ না বলে, তার ধনাধানের মাত্রাসাপেক্ষ বলাই যুক্তিসঙ্গত। অধিকন্তু, যেহেতু মোজ্‌লের (Moseley) রন্ট্‌গেন রশ্মিসংক্রান্ত বিখ্যাত গবেষণার আলোকে এই কেন্দ্রীয় ধনাধান সংখ্যার সঙ্গে তথাকথিত 'পারমাণবিক নম্বর'-এর কোন প্রভেদ নেই, সে জন্যে ঐ রাসায়নিক প্রকৃতি পারমাণবিক নম্বর নিয়ন্ত্রিতও বটে।

টমসন-পদ্ধতিটি যে কত সূক্ষ্মচেতন, তার প্রমাণ মিলেছিল হিলিয়াম গ্যাসের নিরীক্ষায়। বায়ুমণ্ডলে এই গ্যাসের পরিমাণ নিতান্তই তুচ্ছ। তবু ক্ষুদ্র এক ঘনসেন্টিমিটার পরিমিত সাধারণ বায়ুতে যেটুকু হিলিয়াম আছে, তারও অস্তিত্ব ছবিতে সংশয়াতীতরূপে ধরা পড়েছে। এত সব সত্ত্বেও বলা দরকার যে, এই পদ্ধতির প্রয়োগ কয়েকটি মাত্র মৌলিক পদার্থের বেলাতেই পরিসীমিত। ধাতুগুলি প্রত্যক্ষভাবে সে দলে ভিড়ে না। কিন্তু একটিমাত্র ব্যতিক্রম আছে, সে হলো পারদ। তবে যদি ধাতব অক্সাইড-আচ্ছাদিত তার দিয়ে তৈরি হয় কোন অ্যানোড এবং তাকে তড়িৎ-প্রবাহের সাহায্যে প্রজ্জ্বলন্ত করা হয়, তাহলে সে অ্যানোড-নিঃসৃত ধাতব ধনায়নের উপরেও এবম্বিধ পরীক্ষা চালানো সম্ভব।

কোন কোন ছবিতে বিপরীত পরাবৃত্তও দেখা দেয়। কারণটা সহজেই অনুমেয়। ধনায়নগুলি তাদের গতিপথে যথেষ্ট সংখ্যায় ইলেকট্রন কুড়িয়ে নিয়ে ঋণাহিত হয়ে পড়েছে বলে তাদের বৈদ্যুতিক এবং চৌম্বক বিচ্যুতি উভয়েই উল্টো দিকে সংঘটিত

হয়েছে। পক্ষান্তরে কুড়ানো ইলেকট্রনের দ্বারা যদি ধনাধানটি কেবলমাত্র নস্যাৎই হয়, তাহলে ঐ আয়নগুলি পুনরায় নিস্তড়িৎ পরমাণুতে পরিণত হবে। এমতাবস্থায় তারা বলক্ষেত্রদ্বয়ের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করলেও কিছুমাত্র বিচ্যুত না হয়ে মূল বিন্দুতেই এসে তাদের মুদ্রণ আঁকবে। অধিকাংশ আয়নের হয়তো এই-ই ভাগ্যলিপি। কেন না, মূল বিন্দুতে বেশ উজ্জ্বল রকমের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। আর চৌম্বক ক্ষেত্রকে বিপরীতমুখী করে স্থাপন করলে তজ্জনিত যে উল্টো বিচ্যুতি হবে, তাতে পরাবৃত্তের অপর অর্ধাংশও দেখা দিবে ফটোর প্লেটে। কার্যক্ষেত্রেও বরাবর বিভাসনের (Exposure) অর্ধপথে চৌম্বক ক্ষেত্রকে বিপরীত-মুখী করে দেওয়া হয়, মাপজোকের গড় থেকে ফলাফল যথাসম্ভব নির্ভুল করবার তাগিদে।

অধ্যাপক অ্যাস্টনের (Aston) হাতে পড়ে ক্যানাল রশ্মি বিশ্লেষণের আরো উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। টমসন-পদ্ধতিতে দুটি গলদ ছিল। প্রথমতঃ ছবি পরিস্ফুটনের জন্যে দীর্ঘস্থায়ী বিভাসন প্রয়োজন হতো এবং দ্বিতীয়তঃ আইসোটোপ সংশ্লিষ্ট রেখাগুলির বিয়োজনও (Dispersion) পর্যাপ্ত ছিল না। অ্যাস্টনের উদ্ভাবিত যন্ত্রে কিন্তু এই ত্রুটিগুলি কৌশলে বিদূরিত করা হয়েছে। যন্ত্রটির পিছনে যে মূলনীতি সক্রিয়, তা হলো এই যে, যদি ভিন্ন ভিন্ন বেগে ধাবিত অথচ সমান ভরবিশিষ্ট আয়নগুলিকে একই বিন্দুতে অভি-সারিত করা যায়, তাহলে অতি সরু রশ্মি-গুচ্ছ দিয়েও অত্যল্প কালের মধ্যেই ছবিতে উৎকৃষ্ট প্রাখর্য পাওয়া যাবে এবং তৎসঙ্গে অধি-কতর বিয়োজনও।

এই ধারণার ভিত্তিতে অ্যাষ্টন বৈদ্যুতিক এবং চৌম্বক ক্ষেত্র দুটিকে টমসন যন্ত্রের মত উপর্যুপরি এবং সমান্তরালভাবে না রেখে রশ্মিপথে প্রথমে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র এবং তার কিছু দূরে চৌম্বক ক্ষেত্র সংস্থাপিত করলেন। এরূপ ব্যবস্থাপনায় সমান 'আধান/ভর' অথচ বিভিন্ন গতিবেগসম্পন্ন আয়নসমূহের বৈদ্যুতিক বিচ্যুতিকে নাকচ করা হলো বিপরীতমুখী চৌম্বক বিচ্যুতি দিয়ে, যাতে রশ্মিগুলি চৌম্বক ক্ষেত্র থেকে নিষ্ক্রান্ত হয় সমান্তরাল পথ ধরে। অবশ্য বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র-জনিত বিয়োজনের জন্যে নিষ্ক্রান্ত রশ্মিমালার খানিকটা প্রস্থচ্ছেদ বা বিস্তার থাকা সম্ভব। কিন্তু তাও দূর করা অসাধ্য নয় চৌম্বক বিচ্যুতি আরো কিছু বাড়িয়ে দিয়ে। ফটোপ্লেটের এমন একটা স্থাপনভঙ্গীও আছে, যাতে একই ভরের যাবতীয় আয়ন এসে পতিত হয় যে বিন্দুতে, সে বিন্দু অবস্থিত থাকে প্রায় সরল একটি রেখায়। এভাবে ভরের তারতম্য অনুযায়ী আইসোটোপ-আয়নগুলি প্লেটের উপর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্ব স্ব ছাপ অঙ্কিত করে যাবে এবং তাদের অবস্থান থেকে সংশ্লিষ্ট ভরমাত্রা জানতে পারবো। লক্ষণীয় যে, অক্সিজেনকে ১৬ ধরে হিসেব করলে এরা সর্বদা ভগ্নাংশবর্জিত পূর্ণরাশির দ্বারাই সূচিত হয়। ফটোপ্লেটে পর পর মুদ্রিত চিহ্নগুলি এক ঝলকে আলোক-বর্ণালীর কথাই মনে করিয়ে দেয়। পার্থক্য হলো এই যে, বর্ণালী বা বর্ণচ্ছত্রে রেখাবিন্যাস হয় সংশ্লিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যা-নুযায়ী আর বর্তমান স্থলে চিহ্নগুলি বিন্যস্ত হয় আইসোটোপের ভরমাত্রানুযায়ী। এই দৃষ্টি-কোণ থেকে উল্লিখিত চিহ্নবিন্যাসকে ভরচ্ছত্র এবং যে যন্ত্রে ঐ ভরচ্ছত্র উৎপন্ন হয় তাকে ভরচ্ছত্রবীক্ষণ যন্ত্র (Mass spectroscope) বলা যায়।

পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নশাস্ত্র এই ভরচ্ছত্রের কাছে কত যে ঋণী, তা বলে শেষ করা যায় না। কারণ এর সাহায্যে শুধু যে আইসোটোপের অস্তিত্বই ধরা পড়ে, তা নয়। ভরমাত্রার নিরিখে তাদের কেন্দ্রীনের (Nucleus) গঠন-চিত্রও অনেকটাই অনাবৃত হয়ে পড়ে। ক্লোরিনের ভরচ্ছত্র পরীক্ষা করে ৩৫ ও ৩৭ ওজনের দুটি

আইসোটোপ পাওয়া গেছে। এতে করে পূর্ব-বর্ণিত ক্লোরিন-সম্পর্কিত সমস্যার একটা সুষ্ঠু মীমাংসা হয়ে গেল। কেন না, পারমাণবিক ওজনের ভগ্নাংশ যে আইসোটোপ মিশ্রণের জন্যেই উদ্ভূত, সেটা প্রাঞ্জল হলো। অন্যান্য যে সব পরমাণুর বেলায়ও পূর্ণসংখ্যা-নীতির ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়, তারাও যে একাধিক আইসোটোপের মিশ্রণ, তা পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হয়েছে। ক্রিপটনের (Krypton) কমসে কম ছয়টি আইসোটোপ—তাদের ওজন ছড়িয়ে আছে ৭৮ থেকে ৮৬ পর্যন্ত। নিয়নের (Neon) বিষয় আগেই বলা হয়েছে। আশ্চর্যের কথা, পর্যায়সারণীতে যে হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনকে একক ধরা হয়, তার আরো দুটি আইসোটোপ আছে বলে জানা গেছে—২ ও ৩ ওজনের। তাদের নাম যথাক্রমে ডিপ্লজেন (Diplogen) অথবা ডয়টেরন (Deuteron) এবং ট্রাইটিয়াম (Tritium)। এদের ভারী হাইড্রোজেনও বলে। স্বাভাবিক সাধারণ আইসোটোপের কথা বাদ দিলেও কতিপয় তেজস্ক্রিয় পরমাণু, যেমন—রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি থেকে তেজ নিঃসরণকালে স্বতঃই আইসোটোপ সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রীন-রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবার ফলে আজকাল কৃত্রিম আইসোটোপও তৈরি হচ্ছে বিস্তর এবং এদের পৃথক করবার জন্যেও নানা কলাকৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে।

কেন্দ্রীনের গঠন সম্বন্ধে প্রচলিত সর্বাধুনিক মতবাদ অনুসারে পরমাণু-জগতের অভ্যন্তরে যে সব মৌলিক কণার বাস, তন্মধ্যে প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রনই প্রধান। প্রোটন ধনাহিত, ইলেকট্রন ঋণাহিত এবং নিউট্রন অনাহিত। কিন্তু প্রোটন ও ইলেকট্রনের তড়িৎ-মাত্রা হুবহু সমান, আর প্রোটন ও নিউট্রনের ভরমাত্রাও (প্রায়) তাই। উভয়ে আবার হাইড্রোজেন পরমাণুর সমান ভারী। এদের মধ্যে প্রোটন ও নিউট্রন থাকে কেন্দ্রীনের ভিতরে এবং ইলেকট্রনগুলি তাকে কেন্দ্র করে বাইরে অবিরাম ঘোরে। অতএব ভরচ্ছত্র-লব্ধ জ্ঞানের আলোকে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীনে প্রোটন-নিউট্রনের মিলিত সংখ্যা হিসাব করা যায়। যেহেতু কোন পরমাণুর বিভিন্ন আইসোটোপের কেন্দ্রীনগুলি সমান আধান বহন করে, সে-হেতু তাদের প্রোটন সংখ্যাও হবে সমান, পার্থক্য থাকবে শুধু তাদের নিউট্রন-সংখ্যায়।

এই পরিকল্পনায় পরমাণু নিহিত প্রোটন, নিউট্রনের মিলিত ভর থেকে নিকটতম পূর্ণ-সংখ্যার যেটুকু কমতি লক্ষ্য করা যায়, অতি সূক্ষ্ম নিরীক্ষায় তারও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মিলেছে আপেক্ষিকতা বাদের ভিত্তিতে। ঐ তত্ত্বের শিক্ষা এই যে—শক্তি ও ভর হচ্ছে আদতে একই সত্তা, শুধু বাহ্যিক রূপেরই পার্থক্য। সুতরাং এরা পরস্পরের মধ্যে রূপান্তর-সাধ্য। কেন্দ্রীনের অভ্যন্তরে প্রোটন ও নিউট্রন জমাট বাঁধতে গিয়ে যে প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন হয়, তা প্রলব্ধ হয় ঐ ভর-হ্রাসের (Mass defect) বিনিময়েই।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে স্বর-বিজ্ঞান

মন্মথ হালদার

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে ৭টি শুদ্ধ স্বর ও ৫টি বিকৃত স্বর প্রয়োগের রীতি আছে। এই ১২টি স্বর লইয়া একটি সপ্তক গঠিত হয়। হিন্দু সঙ্গীতে মানুষের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করা হইয়াছে; যেহেতু একটি নির্দিষ্ট কম্পনের সুরকে কেন্দ্র করিয়া ঊর্ধ্ব ও নিম্নদিকে কণ্ঠস্বরকে পরিচালিত করিলে তিনটি সপ্তকের মধ্যেই কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিকতা বজায় থাকে। মানুষের কণ্ঠের উপযোগী ও আয়াসসাধ্য বলিয়াই "সপ্তস্বর, তিনগ্রাম, একুশ মূর্চ্ছনা"র বাহিরে শাস্ত্রকারেরা যান নাই। কারণ, তাহাতে নিঃসন্দেহে কৃত্রিমতার সৃষ্টি হইবার আশঙ্কা ছিল। ৭টি সুরের বিভিন্ন সংমিশ্রণে মোট তান সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০৪০। তিনটি সপ্তককে সাঙ্গীতিক ভাষায় বলা হয় 'মন্দ্র', 'মধ্য' ও 'তার' (উদারা, মুদারা ও তারা)। প্রতিটি সপ্তক আবার ২২টি শ্রুতিতে বিভক্ত। এই শ্রুতিগুলির সংস্থাপনায় প্রাচীন সঙ্গীত-বিদ্‌গণের অপূর্ব প্রতিভা ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। "রত্নাকর-চতুর্দণ্ডী-পারি-জাতে"র বহু পূর্বের আমলে আজকালের মত স্বরের কম্পন পরিমাপ করিবার জন্য কোন "টিউ-নিং ফর্ক" আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু কি করিয়া যে প্রাচীন পণ্ডিতগণ এই শ্রুতিগুলিকে আবিষ্কার, আয়ত্ত ও সংযোজনা করিয়াছিলেন, তাহা বিস্ময়কর। বস্তুতঃ ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের স্বরোৎপত্তি ও বিবর্তন এক বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কয়েকটি প্রাচীন পুস্তকে বলা হইয়াছে যে, ৭টি প্রাণীর ডাক হইতে ৭টি স্বরের উৎপত্তি; যথা :—

ময়ূরের	ডাক হইতে	—ষড়জ্
বৃষভের (মতান্তরে ভেকের)	"	—ঋষভ্
ছাগের	"	—গান্ধার
ক্রৌঞ্চের (মতান্তরে বকের)	"	—মধ্যম্
কোকিলের	"	—পঞ্চম্
তুরঙ্গমের	"	—ধৈবত
মাতঙ্গের	"	—নিষাদ

উক্ত প্রাণীদের ডাকে বাতাসে যে কম্পন-সংখ্যার সৃষ্টি করে, তাহার সহিত ষড়জ্ ঋষভ গান্ধার ইত্যাদি সুরগুলির কম্পন-সংখ্যার কিছু সামঞ্জস্য আছে কিনা, তাহা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচারসাপেক্ষ।

আদিম মানুষের কথিত ভাষার ক্রমবিকাশের ন্যায় সঙ্গীতের সাতটি স্বরের ধীরে ধীরে বিবর্তন ঘটিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সামবেদীয় যুগে বৈদিক সূত্রগুলি কয়েকটি স্বরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য তখনও পর্যন্ত ৭টি সুরের আবিষ্কার ঘটিয়াছিল কিনা, এই বিষয়ে বহু বিতর্ক আছে। আমার পূজ্যপাদ সঙ্গীতগুরু ৺ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় (গৌরীপুর) আমাকে তিন সুরের 'মালশ্রী' রাগ দিয়াছিলেন—সমস্ত রাগটি সা, গা ও পা এই তিনটি সুরের দ্বারা রচিত (সাধারণ প্রথা অনুযায়ী ৫ সুরের কমে কোন রাগ হয় না)। সামবেদীয় সূত্রগুলি হয়তো এই ধরণের কয়েকটি মাত্র স্বরের মধ্যে উঠা-নামা করিত। আধুনিক কালেও আদিবাসীদের মধ্যে এক প্রকারের বৃহৎ আকারের বাঁশী দেখিতে পাওয়া যায় (এই বাঁশীকে যষ্ঠির মতও ব্যবহার করা হয়), যাহার মাত্র দুইটি কি তিনটি ছিদ্র থাকে এবং তদনুরূপ আওয়াজ নির্গত হয়।

একটি স্বর হইতে উচ্চতর অথবা নিম্নতর অপর একটি স্বরে গেলে কম্পন-সংখ্যার পার্থক্য ঘটে। দুই পর পর স্বরের ঠিক মধ্যবর্তী 'কম্পন-অনুভূতি' হইতেই ৪টি 'কোমল' ও ১টি 'কড়ি' স্বরের উৎপত্তি। আবার পর পর দুইটি স্বরের মধ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপবিভাগ আছে। প্রাচীন সঙ্গীত-বেত্তাগণ বুঝিয়াছিলেন যে, দুই পর পর স্বরের মধ্যবর্তী 'অনু'-স্বরগুলি এমনই দূরত্বে রাখিতে হইবে যেন, প্রত্যেক বিভাগগুলির স্বতন্ত্র আওয়াজ কানে ধরা পড়ে। শ্রুতিকারদের গুণপনা এইখানেই। ৭টি স্বরের অভ্যন্তরে যেখানে বহু সংখ্যক শ্রুতি হইতে পারিত, সেখানে তাঁহারা ২২টির বেশী শ্রুতির অবতারণা করেন নাই। অবশ্য গ্রীক সঙ্গীতবেত্তাগণ ২৪টি শ্রুতির কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় শাস্ত্রে প্রথম ও পঞ্চম সুর (সা ও পা) অবিকৃত থাকিবার জন্য শ্রুতিসংখ্যা ২২টি দাঁড়ায়।

প্রাচীন ও আধুনিক শ্রুতি স্থাপনার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। আধুনিক শ্রুতি পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল :—

সা হইতে রে = ৪ শ্রুতি (তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দা ও ছন্দোবতী

রে „ গা = ৩ „ (দয়াবতী, রঞ্জনী ও রতিকা)

গা „ মা = ২ „ (রুদ্রা ও ক্রোধা)

মা „ পা = ৪ „ (বীজরেখা, প্রসারিণী, পার্বতী ও মার্জনী)

পা „ ধা = ৪ „ (যতী, রক্তা, সন্দিপনী ও আলাপনী)

ধা „ নি = ৩ „ (মদন্তী, রোহণী ও রম্যা)

নি „ সা = ২ „ (উগ্রা ও ক্ষোভিনী)

উপরিউক্ত স্থাপনা হইতে দেখা যাইবে যে, রে হইতে গা এবং ধা হইতে নি স্বরের অন্তর বা দূরত্ব কিঞ্চিৎ কম (১ শ্রুতি কম) এবং গা হইতে মা এবং নি হইতে সা এই দুই ক্ষেত্রে দূরত্ব অর্ধেক (২ শ্রুতি কম)। একটি তারের যন্ত্রের পর্দাগুলির দূরত্ব পরিমাপ করিলে ইহা সহজেই প্রমাণিত হইবে। পুরাকালে শ্রুতি নির্ণয়ের প্রধান সহায়ক ছিল 'চল' ও 'অচল' বীণা। এই বীণা যন্ত্রের সাহায্যেই শ্রুতিগুলির সঠিক অবস্থান ও রূপ নিরূপণ করা হইত। বর্তমান কালে উত্তর-ভারতে শ্রুতিগুলির নিয়মমাফিক রেওয়াজ—কণ্ঠে বা যন্ত্রে একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলা চলে। দক্ষিণ-ভারতে শ্রুতি-চর্চা কিছুটা বজায় আছে।

ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাচীন পণ্ডিতগণ কণ্ঠ ছাড়া বাদ্যগুলিকেও চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেন ; যথাঃ— 'তত', 'বিতত', 'ঘন' ও 'সুষির' এবং যন্ত্রগুলির শব্দানুরণন সম্বন্ধে যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াছিলেন। 'তত' অর্থে যে যন্ত্রগুলি চর্মাচ্ছাদিত, যেমন মৃদঙ্গ, দামামা। 'বিতত' অর্থে যেগুলি বিনা চর্মে বাদিত হয়, যেমন—বীণা, সেতার। 'ঘন' অর্থে যেগুলি ধাতু-নির্মিত, যেমন—করতালি, খঞ্জনী এবং 'সুষির' অর্থে যে যন্ত্রগুলি বায়ুর (ফুঁয়ের) সাহায্যে বাদিত হয়, যেমন—মুরলী, সানাই। বিশেষ করিয়া আওয়াজের মিষ্টত্ব বিচার করিয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণ মৃদঙ্গ, বীণা, কিঙ্কিণী ও মুরলীকে যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছিলেন।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ হইল তাহার রাগরাগিণীর রত্নভাণ্ডার। কোন্ স্বরগুলি কি ভাবে বিন্যাস করিলে কি কি রসের সৃষ্টি হইবে এবং কোন্ কোন্ প্রহর ও ঋতুভেদে কি কি পরিবেশ রচনা করিবে এই সম্বন্ধে প্রাচীন পণ্ডিতগণের সম্যক জ্ঞান বিস্ময়কর। শিবমত, ভরতমত, হনুমন্তমত ও তিও মতে সর্বসাকুল্যে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী ও তাহাদের সন্তান-সন্ততি-সখা লইয়া বিরাট রাগ পরিবারের কল্পনা করা হইয়াছে। রাগ-রাগিণীর ধ্যান ও মূর্তি সাধকের মানসচক্ষে জীবন্ত করিয়া তুলিবার যথাসাধ্য প্রয়াসের ত্রুটি ছিল না। নাদ বা

শব্দই যে আদি ও সমস্ত সৃষ্টি-রহস্যের মূল, এই পরম সত্য তাঁহাদের নিকট সুবিদিত ছিল। আবার অনেক সঙ্গীত-সাধক যন্ত্রের বোলের সাহায্যে নিজেদের প্রাণের কথা বলিয়া গিয়াছেন। নায়ক ধুঁদি যেন মৃদঙ্গের কণ্ঠে আক্ষেপ করিয়াছেন—"কৎ দেৎ ধেটেঘেনে, ঘে নান কতা কতা, আধুঁদিক ত্রাণে নানে কতা দে ধেরেকেটে কৎ থুন থুন, আক্রানে কৎ দেৎ ধা।" উক্ত বোলে রূপান্তরিত 'পড়ান'টির অর্থ হইল—"কত কত দেশ-দেশান্তর পরিভ্রমণ করিয়া আসিলাম কিন্তু ধুঁদির ত্রাণের স্থান কোথাও পাইলাম না, দূরে চেষ্টা করা বৃথা, ঘরে বসিয়া চিন্তা কর তাহা হইলে কতক পাইবে।" কেহ কেহ আবার মৃদঙ্গ যন্ত্রে গঙ্গাস্তব, গনেশবন্দনা গুণীপ্রণামও জানাইয়া গিয়াছেন; বীর, অদ্ভুত, রৌদ্র, শান্ত, শৃঙ্গার, হাস্য করুণ, বীভৎস ও ভয়ানক—নববিধ রসের অবতারণা করিয়াছেন; মৃদঙ্গের বোলের সাহায্যে পক্ষ্যাটিকা, অঞ্জলিকা, গজময়ূরা, গজক্রীড়া, গজ-বিহারী, গজকর্কট, ইন্দ্রাহুতি, গীতঙ্গী, মীনক্রিয়া, তরণীবিহার, ন্যাসতালিকা, পুষ্পদলনী, গরুড়-সেতু, মেঘমালা, পিঙ্গল প্রাকৃতিক, সুরভি উল্লাস প্রভৃতি বহু প্রকারের ছন্দ ও লয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন; ব্যাকরণের কর্মধারয়, বহুব্রীহি ও দ্বন্দ্ব সমাসের সমস্যমান পদগুলির জটিলতা মৃদঙ্গের বোলে সমাধান করিয়াছেন।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে সুর, ও লয়কে যতটা প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, ততটা প্রাধান্য ভাষাকে দেওয়া হয় নাই। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত যোগ সাধনার এক সহজিয়া পথ। রাজযোগে যে অনাহত নাদের মহিমা কীর্তন করা হইয়াছে, উহার সন্ধান সঙ্গীতের এক বিশেষ স্তরে সাধকগণ পাইয়া থাকেন। দেখা যায় যাঁহারা সঙ্গীত মার্গের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন শেষ অবধি তাঁহাদের অধিকাংশই ভক্ত ও সাধকে পরিণত হইয়া গিয়াছিলেন। বৈজু বাওরা, হরিদাস স্বামী, মীরাবাঈ, সুরদাস প্রভৃতি উচ্চমার্গের সাধক ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সময়ে বৈষ্ণবদের মধ্যে বহু সঙ্গীতশাস্ত্রবেত্তা ও গায়ক ছিলেন—কোন্ রাগ কি তালে গেয়, তাহারও নির্দেশ তাঁহারা দিয়া গিয়াছেন। সঙ্গীত পারিজাত প্রণেতা পণ্ডিত অহোবলের উক্তি দিয়া আমাদের প্রবন্ধটি শেষ করিলাম—

"বীণাবাদন তত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতিজাতি বিশারদঃ।
তালজ্ঞশ্চা প্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিয়চ্ছতি॥"

(১৮নং শ্লোক)

প্লাজ্‌মা

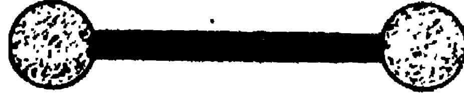
শ্রীশ্যামসুন্দর দে

পৃথিবীতে পদার্থ সাধারণতঃ কঠিন, তরল ও বায়বীয়—এই তিন অবস্থায় থাকে। এই তিনটি অবস্থা ছাড়া পদার্থ আরও একটা বিশেষ অবস্থায় থাকে, যা কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই বিশেষ অবস্থাকে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বা প্লাজ্‌মা বলা হয়।

বর্তমানে পদার্থবিদ্যায় প্লাজ্‌মা একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। প্লাজ্‌মা সংক্রান্ত আলোচনা ও গবেষণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুপুঞ্জের শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগই প্লাজ্‌মা অবস্থায় আছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। সুতরাং প্লাজ্‌মা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির রাজ্যের অনেক অজানা নিয়মের সঙ্গে আমরা পরিচিত হবো।

প্লাজ্‌মার উৎপত্তি

কি ভাবে প্লাজ্‌মা অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা উদাহরণের সাহায্যে বোঝবার চেষ্টা করা যাক। বায়ুকে মোটামুটিভাবে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের সাধারণ মিশ্রণ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এদের প্রত্যেকটা অণুই দুটি পরমাণু দিয়ে তৈরি। দুটি বলকে একটা রবারের দণ্ডের সাহায্যে দৃঢ়ভাবে আটকে রাখলে তাদের যে চেহারা হয়, পরমাণুর দ্বারা সংগঠিত অণুর ক্ষেত্রেও ঠিক একই চেহারা কল্পনা করে নেওয়া যেতে পারে (১ নং চিত্র)।



১নং চিত্র

আমরা জানি যে, শূন্য ডিগ্রী কেলভিন তাপমাত্রায় অণুগুলির কোন গতিবিধি থাকে না। পদার্থের মধ্যে অণুগুলির গতিবিধির জন্য তাপীয় শক্তির প্রয়োজন; এই শক্তি শূন্য ডিগ্রী কেলভিন তাপমাত্রায় অবলুপ্ত হয়ে যায়, কাজেই এই তাপমাত্রায় অণু-পরমাণুগুলির কোন গতিবিধি থাকে না। তাপমাত্রা বাড়লে তাদের নানা রকম গতির উদ্ভব হয় এবং তাপমাত্রার সঙ্গে সঙ্গে গতির পরিমাণও বাড়তে থাকে। তাপমাত্রা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলে অণুগুলির গতি বৃদ্ধির ফলে সেগুলির মধ্যে সংঘর্ষের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে ও অবশেষে পরমাণুগুলির মধ্যে রবার দণ্ডের মত বন্ধনটি ছিন্ন হয়ে যায়। এই আণবিক বন্ধন ছিন্ন হওয়াকে বলে বিয়োজন (Dissociation)। অক্সিজেনের ক্ষেত্রে এই বিয়োজন তাপমাত্রা প্রায় ৩০০০° কেলভিন ও নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে প্রায় ৪৫০০° কেলভিন।

আমরা জানি যে, পৃথিবীতে প্রত্যেকটা পদার্থের গঠনের মূলে রয়েছে পরমাণু। পরমাণুর

মাঝে আছে কেন্দ্রীন—যা সাধারণভাবে প্রোটন ও নিউট্রন দিয়ে তৈরি। কেন্দ্রীনের চারদিকে বিভিন্ন কক্ষপথে প্রোটনের সমান সংখ্যক ইলেকট্রন ঘুরে বেড়ায়। এই দুয়ের তড়িৎ সমান কিন্তু বিপরীতধর্মী; এরা সংখ্যায় সমান বলে সাধারণ অবস্থায় পরমাণুগুলি বৈদ্যুতিক আধান-নিরপেক্ষ হয়। ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন নির্দিষ্ট সংখ্যায় কেন্দ্রীন থেকে বিভিন্ন দূরত্বে বিশিষ্ট কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায়। কেন্দ্রীন থেকে যতই দূরে যাওয়া যায়, ততই ইলেকট্রন ও কেন্দ্রীনের মধ্যে বন্ধন শক্তি কমতে থাকে। একেবারে বাইরের কক্ষপথে ইলেকট্রনগুলি স্বভাবতঃই আলগাভাবে বাঁধা থাকে—এদের বলা হয় যোজ্যতা ইলেকট্রন। পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম, বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্ম এই বহিঃস্তরের ইলেকট্রনের কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে।

পদার্থকে ক্রমশঃ বিয়োজন তাপমাত্রা অপেক্ষা উচ্চতর তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হলে বাইরের ইলেকট্রনগুলি উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং কক্ষচ্যুত হয়ে বেরিয়ে আসতে সুরু করে। সাধারণ-ভাবে পরমাণুর বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ হলেও এথেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন বিচ্যুত হলে পরমাণুটা ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট হয়ে পড়ে। এই রকম ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট পরমাণুকে বলা হয় ধনাত্মক আয়ন। কোন গ্যাসের পরমাণুগুলির কক্ষ থেকে যতই বেশী ইলেকট্রন বিচ্যুত হতে থাকবে, ততই তার মধ্যে মুক্ত ইলেকট্রন ও ধনাত্মক আয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ও অপর পক্ষে নিরপেক্ষ পরমাণুর সংখ্যা কমতে থাকবে। পদার্থের এই যে বিশেষ অবস্থা—যেখানে মুক্ত ইলেকট্রন, ধনাত্মক আয়ন ও নিরপেক্ষ কণিকা এক-সঙ্গে আছে—সেই সমাবেশকে বলা হয় প্লাজ্‌মা।

বায়ুর ক্ষেত্রে সাধারণ তাপে প্রায় ১০,০০০ ডিগ্রী কেলভিন তাপমাত্রায় এই ব্যাপারটা ঘটে। চাপের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেও আয়নীভবনের মাত্রার পরিবর্তন হয়। দেখা গেছে যে, চাপ নির্দিষ্ট রেখে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে যেমন আয়নীভবনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, তেমনই তাপমাত্রা নির্দিষ্ট রেখে চাপ যথেষ্ট কমালেও এই মাত্রা বাড়ে। আয়নীভবনের ক্ষেত্রে চাপের এই প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

গ্যাসের তাপমাত্রা ২০,০০০ ডিগ্রীর বেশী হলে সমস্ত গ্যাসীয় পরমাণুই আয়নিত হয়ে যায়। গ্যাসের এই অবস্থাকে বলা হয় সম্পূর্ণ আয়নিত (Fully ionized) প্লাজ্‌মা। যে প্লাজ্‌মা সমাবেশে কিছু সংখ্যক নিরপেক্ষ কণিকা থেকে যায়, তাকে বলা হয় আংশিক আয়নিত (Partially ionized) প্লাজ্‌মা। যখন প্লাজ্‌মার মধ্যে ইলেকট্রন ও ধনাত্মক আয়নের সংখ্যা সমান, তখন প্লাজ্‌মা তড়িৎ-নিরপেক্ষ অবস্থায় থাকে। কিন্তু প্লাজ্‌মার কোন অংশে এই দুয়ের সংখ্যা অসমান হলে বৃহত্তর সংখ্যার আধান অনুযায়ী সেখানে স্থানীয় আধানের (Space charge) ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।

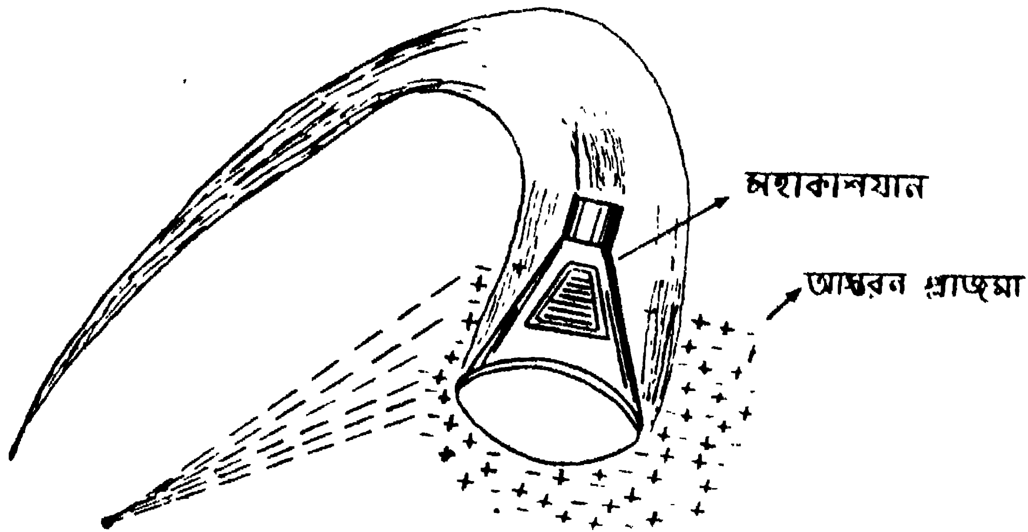
মহাকাশযান যখন মহাকাশ থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে, তখন বায়ুমণ্ডলস্থিত কণিকার সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে প্রচণ্ড তাপমাত্রার উদ্ভব হয়, যার জন্যে মহাকাশযানের গতিপথের চারদিকে প্লাজ্‌মার সৃষ্টি হয় (২নং চিত্র)। এইভাবে সৃষ্ট প্লাজ্‌মায় দু-জাতীয় কণিকার সংখ্যার মধ্যে প্রচুর ব্যবধান থাকে। কারণ বিজ্ঞানীরা নিরপেক্ষ প্লাজ্‌মাকে শুধু প্লাজ্‌মা ও এই জাতীয় প্লাজ্‌মাকে আস্তরণ প্লাজ্‌মা (Plasma sheath) বলে অভিহিত করেন। কৃত্রিমভাবে যে সব প্লাজ্‌মা তৈরি করা হয়, তাদের মধ্যে স্বভাবতঃই পূর্বের গ্যাসীয় অবস্থায় ফিরে আসবার প্রবণতা থাকে। উপযুক্ত পরিস্থিতিতে ইলেকট্রনগুলি ধনাত্মক আধানের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিরপেক্ষ গ্যাসীয় পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই পুনর্যোজন (Recombination) প্রক্রিয়ায় সময় প্রচুর

পরিমাণ শক্তি বিকিরিত হয়। মহাকাশযান বায়ুমণ্ডলে ঘর্ষণের ফলে যে আস্তরণ প্লাজ্‌মা তৈরি করে, তার তাপমাত্রা ও এই প্লাজ্‌মা কণিকাগুলির পুনর্যোজনের ফলে যে প্রচণ্ড তাপ বিকিরিত হয়, এই দুয়ের প্রভাবের কথা চিন্তা করে মহাকাশযান তৈরির ধাতু নির্বাচন করা হয়।

পরীক্ষাগারে বিভিন্ন ধরণের প্লাজ্‌মা তৈরির যন্ত্র গঠন করা সম্ভব হয়েছে। তবে এদের মধ্যে বিশেষ কোন একটা যন্ত্র প্লাজ্‌মা প্রয়োগের সব কিছু চাহিদা মেটাতে পারে না। সাধারণতঃ 'ডিস্‌চার্জ' ও 'বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় শক্' নল—এই দুই পদ্ধতিতে প্লাজ্‌মা তৈরি করা হয়। শক্ নলে সৃষ্ট প্লাজ্‌মা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আর্ক ডিস্‌চার্জ নলে স্থায়ী প্লাজ্‌মা-প্রবাহ পাওয়া যায়। এই দুই পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরণের প্লাজ্‌মা তৈরির যন্ত্র গঠন করা হয়ে থাকে—যাদের মধ্যেকার ইলেকট্রনের তাপমাত্রা ও ঘনত্ব আলাদা। শক্ নলে উৎপন্ন প্লাজ্‌মার তাপমাত্রা খুবই বেশী হয়ে থাকে, যার জন্যে এতে কণিকাগুলির বেগও অত্যন্ত বেশী।

প্লাজ্‌মার ধর্ম

এবার প্লাজ্‌মার কতগুলি বিশেষ ধর্ম নিয়ে আলোচনা করা যাক। ফুটবল খেলায় খেলোয়াড়দের মধ্যবর্তী গড়দূরত্ব যেমন প্রতি মুহূর্তেই পাণ্টায় এবং তারা যেমন কোন নির্দিষ্ট জায়গায় আট্‌কা থাকে না—প্লাজ্‌মার ভিতর কণিকাগুলির ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার ঘটে। প্লাজ্‌মার ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী গড়দূরত্বকে বলা হয় 'গড় ব্যবধান দূরত্ব' (Mean distance of separation)। প্লাজ্‌মার ভিতর কণিকার সংখ্যা যত কম, এই দূরত্বও তত বেশী। ঠিক একই কারণে প্লাজ্‌মার ঘনত্ব বাড়লে অর্থাৎ কণিকার সংখ্যা বাড়লে এই দূরত্ব হ্রাস পায়। দেখা গেছে যে, প্রতি ঘনসেন্টিমিটার নিরপেক্ষ প্লাজ্‌মায় যদি ইলেকট্রনের সংখ্যা হয় $১০^{১২}$, তবে এই 'গড় ব্যবধান দূরত্ব' প্রায় ১.২৫×১০^{-৪} সেন্টিমিটার। আপাতদৃষ্টিতে এই দূরত্ব খুব ছোট হলেও প্লাজ্‌মা কণিকাগুলির ব্যাসের তুলনায় খুব বড়, কেন না, আমরা জানি একটা পরমাণুর ব্যাসার্ধ প্রায় $১০^{-৮}$ সে. মি.; অর্থাৎ এই দূরত্ব একটা কণিকার ব্যাসের



২নং চিত্র

প্রায় ১০,০০০ গুণ বেশী। কাজেই ধারণা করা যেতে পারে যে, যদিও কণিকাগুলি ক্রমাগতই ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাহলেও তারা যে সব সময়েই পরস্পরকে আঘাত করবে এমন কথা বলা যায় না। এখন চিন্তা করবার বিষয় হচ্ছে এই যে, একটা সংঘর্ষের আগে তারা কতখানি দূরত্ব অতিক্রম করে। দুটি সংঘর্ষের মধ্যে একটা কণিকা যে দূরত্ব অতিক্রম করে, তাকে বলা হয় ঐ কণিকার 'গড় মুক্ত পথ' (Mean free path) এবং এর বৃদ্ধি বা হ্রাস 'গড় ব্যবধান দূরত্বে'র মতই প্লাজ্মা কণিকার ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল। এই যে সংঘর্ষের কথা বলা হলো, এটা ঘটে যখন একটা কণিকা অপর একটা কণিকার নির্দিষ্ট সেই গণ্ডীর মধ্যে এসে পড়ে, যাকে বলা হয় সংঘর্ষের প্রস্থচ্ছেদ (Collision cross-section)। ইলেকট্রনের ঘনত্বও এই 'সংঘর্ষ প্রস্থচ্ছেদ'-এর ব্যস্তানুপাতিক। এদের মধ্যে সম্পর্কটা নিম্নলিখিত সূত্রের দ্বারা প্রকাশ করা হয়—

$$L_c = \frac{1}{n_e A}$$

এখানে L_c হচ্ছে 'গড় মুক্ত পথ', n_e ইলেকট্রনের ঘনত্ব ও A হচ্ছে 'সংঘর্ষ প্রস্থচ্ছেদ'। $A = 10^{-16}$ বর্গ সে. মি. ধরা হলে ও $ne = 10^{12}$ হলে $Lc = 10^4$ সে. মি. হয়।

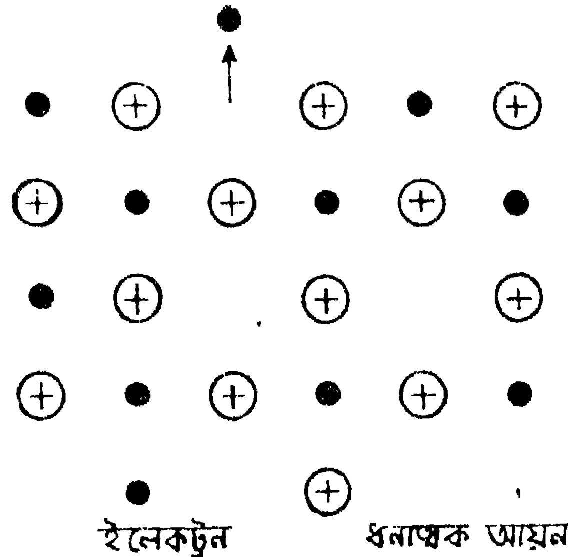
পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ঐ নির্দিষ্ট ঘনত্ববিশিষ্ট প্লাজ্মায় 'গড় ব্যবধান দূরত্ব' প্রায় $৭\cdot৯৫ \times ১০^{-৪}$ সে. মি.। কাজেই 'গড় মুক্ত পথ', 'গড় ব্যবধান দূরত্ব'-এর তুলনায় অনেক গুণ বেশী। যদিও কণিকাগুলি পরস্পর মোটামুটি $৭\cdot৯৫ \times ১০^{-৪}$ সে. মি. দূরত্ব বজায় রেখে ঘুরে বেড়ায়। তবুও দুটি কণিকার মধ্যে সংঘর্ষ হতে গেলে এদের প্রায় ১০০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। সাধারণ অবস্থায় তাই সংঘর্ষের মাধ্যমে পরমাণুর আয়নিত হবার সম্ভবনা খুবই কম। এই কারণে যে কোন ভাবে প্লাজ্মা অবস্থা সৃষ্টি করা সহজসাধ্য নয়।

আগে আমরা প্লাজ্মা কণিকাগুলির গতি-বিধির সঙ্গে খেলোয়াড়দের গতিবিধির তুলনা করেছিলাম। খেলোয়াড়েরা যেমন তাদের গতি-বিধির মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে ফুটবলের আদান-প্রদান করে, তেমনি প্লাজ্মা কণিকাগুলি তাদের গতিবিধির মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তির আদান-প্রদান করে। প্লাজ্মার মুক্ত তড়িৎ-আধানযুক্ত কণিকাগুলির গতিবিধির ফলেই এই আদান-প্রদান সম্ভব। আংশিক আয়নিত প্লাজ্মার ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিরপেক্ষ কণিকার সংখ্যা হ্রাস পায়, অপরপক্ষে আয়নিত কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়; এর ফলে অধিকতর বৈদ্যুতিক শক্তির আদান-প্রদান সম্ভব হয় বলে প্লাজ্মার বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা বেড়ে যায়।

প্লাজ্মার মধ্যে প্রতিটি ইলেকট্রন বা ধনাত্মক আয়নের চারপাশে নিজস্ব বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র থাকে। চার পাশে অবস্থিত বিপরীতধর্মী বিদ্যুৎ-কণিকার জন্যে অল্প দূরেই ঐ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের প্রভাব কার্যতঃ বাতিল হয়ে যায়। যে দূরত্ব পর্যন্ত এই প্রভাব কার্যকরী থাকে, তাকে বলা হয় 'ডিবাই দৈর্ঘ্য' (Debye length)। এটা বিজ্ঞানী উইলহেল্‌ম্‌ ডিবাই কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছিল।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ল্যাংমুর গ্যাস ডিস্‌চার্জ নল নিয়ে গবেষণার সময় নলের মধ্যস্থিত কণিকাগুলির মধ্যে একটা স্পন্দন লক্ষ্য করেন। জীববিদ্যার রক্তরস—যাকে প্লাজ্মা বলা হয়, তার ভিতর রক্তকণিকাগুলির বিক্ষিপ্ত গতির সঙ্গে ল্যাংমুর গ্যাস ডিসচার্জ নলের কণিকাগুলির স্পন্দনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন এবং এথেকেই তিনি গ্যাস ডিস্‌চার্জ নলের কণিকাগুলির সমষ্টিকে প্রথম 'প্লাজ্মা' নামে অভিহিত করেন। ল্যাংমুর

কণিকাগুলির যে স্পন্দন লক্ষ্য করেছিলেন, সেটা আর কিছুই নয়, একজাতীয় তরঙ্গ-প্রবাহ মাত্র। প্লাজ্‌মার ভিতর কিভাবে স্পন্দনের সৃষ্টি হয়, এবার তা বোঝাবার চেষ্টা করা যাক। একটা নির্দিষ্ট আয়তনের তড়িৎ-নিরপেক্ষ সম্পূর্ণ আয়নিত প্লাজ্‌মার কথা চিন্তা করা যাক। এই প্লাজ্‌মার মধ্যে ইলেকট্রন ও ধনাত্মক আয়নের সংখ্যা সমান এবং ধরা যাক এরা প্লাজ্‌মার ভিতর সাম্য অবস্থায় আছে। এই অবস্থায় যদি কোন কারণে এক বা একাধিক ইলেকট্রন স্থানচ্যুত হয় (৩নং চিত্র), তবে প্লাজ্‌মায় ধনাত্মক আয়নের সংখ্যা ইলেকট্রনের তুলনায় বেড়ে যায় ও এদের আকর্ষণী 'প্লাজ্‌মা কম্পনাঙ্ক'। এই কম্পনাঙ্ক ইলেকট্রনের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে। পরীক্ষাগারে আর্ক ডিস্‌চার্জ নলে যে প্লাজ্‌মা পাওয়া যায়, তার এই কম্পনাঙ্ক সেকেণ্ডে ১০¹² পর্যন্ত সাধারণতঃ হয়ে থাকে। মহাকাশযান পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢোকবার সময় এর চার পাশে যে আস্তর প্লাজ্‌মার সৃষ্টি হয়, তার কম্পনাঙ্ক সেকেণ্ডে প্রায় ১০⁸ পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্লাজ্‌মার মধ্য দিয়ে কোন বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ পাঠালে এটা প্লাজ্‌মাকে ভেদ করতে পারে, যদি এর কম্পনাঙ্ক প্লাজ্‌মার কম্পনাঙ্কের চেয়ে বেশী হয়। কিন্তু প্লাজ্‌মার কম্পনাঙ্কের চেয়ে এর কম্পনাঙ্ক কম হলে এই তরঙ্গ প্লাজ্‌মা ভেদ করতে পারে না,



৩নং চিত্র

শক্তি বিচ্যুত ইলেকট্রনগুলিকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে। ফলে ইলেকট্রনগুলি যখন ফিরে আসে, তখন এরা আর আগের সাম্য অবস্থা বজায় রাখতে পারে না, যার জন্যে বিপরীত দিকে আকৃষ্ট হয়। এই প্রক্রিয়া বরাবর চলতে থাকলে দেখা যায় যে, ইলেকট্রনগুলি সাম্য অবস্থার চারদিকে পর্যাবৃত্তভাবে আন্দোলিত হতে থাকে। এই আন্দোলনের কম্পনাঙ্ককে বলা হয় প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। মহাকাশযান যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তখন এর চারপাশে প্লাজ্‌মার সৃষ্টি হয়—একথা আমরা আগেই বলেছি। কাজেই মহাকাশযান থেকে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের মাধ্যমে পৃথিবীতে কোন খবর পাঠাবার দরকার পড়লে এই তরঙ্গের কম্পনাঙ্ক অবশ্যই প্লাজ্‌মার কম্পনাঙ্কের চেয়ে বেশী হওয়া দরকার। কিন্তু কম্পনাঙ্ক বৃদ্ধির জন্যে যান্ত্রিক সূক্ষ্মতার প্রয়োজনও

বেশী। প্লাজ্‌মা চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয়। প্লাজ্‌মার মধ্যে ইলেকট্রনগুলি যখন চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন এদের স্পন্দনও হয় আলাদা ধরণের। চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুপস্থিতিতে প্লাজ্‌মার মধ্যে যে স্পন্দন হচ্ছে, তার কম্পনাঙ্ককে বলা হয় 'প্লাজ্‌মা কম্পনাঙ্ক' ও চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে যে নতুন ধরণের স্পন্দন দেখা যায় তাকে বলা হয় 'সাইক্লোট্রন কম্পনাঙ্ক'। প্লাজ্‌মার কম্পনাঙ্ক, বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের কম্পনাঙ্কের চেয়ে বেশী হলেও প্লাজ্‌মাকে চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা প্রভাবিত করলে এই কম্পনাঙ্কবিশিষ্ট তরঙ্গ প্লাজ্‌মা ভেদ করে যেতে পারে। বেতার-সঙ্কেত আদান-প্রদানের ব্যাপারে মহাকাশযানের চতুর্দিকে আস্তরণ প্লাজ্‌মার জন্যে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়, উপরিউক্ত নীতি অবলম্বন করে সেই অসুবিধা হয়তো দূর করা যেতে পারে। উপরে বর্ণিত দু-রকম কম্পনাঙ্ক ছাড়াও প্লাজ্‌মার মধ্যে বিভিন্ন কণিকাগুলির উপস্থিতি ও পারস্পরিক সংঘর্ষের জন্যেও অন্য কয়েকটি কম্পনাঙ্ক পাওয়া যায়।

কোন নির্দিষ্ট গতিবেগে প্রবাহিত প্লাজ্‌মার চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করা হলে একটা বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের উদ্ভব হয়, যা তড়িতের সৃষ্টি করে। এই তড়িৎ চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয় ও যান্ত্রিক বলের উদ্ভব করে, যেটা প্লাজ্‌মার গতিবেগের পরিবর্তন ঘটাতে চেষ্টা করে। প্লাজ্‌মার গতিবেগ থেকে উৎপন্ন উদস্থিতীয় (Hydro-dynamic) শক্তি ও বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তির বিক্রিয়ার এক ধরণের তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। একে বলা হয় 'আলফ্‌ভেন তরঙ্গ' বা ম্যাগ্‌নেটো-হাইড্রোডাইনামিক তরঙ্গ। এই তরঙ্গের প্রবাহের দিক চৌম্বক ক্ষেত্রের সমান্তরাল। মহাজাগতিক গবেষণার ক্ষেত্রে এই 'আলফ্‌ভেন তরঙ্গের'—প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ।

প্লাজ্‌মার মধ্যেকার ধনাত্মক আয়ন, ইলেকট্রন ও নিরপেক্ষ কণিকাগুলির তাপমাত্রা এক নয়। তাপমাত্রার পার্থক্য অনেকাংশে চাপের উপর নির্ভর করে। চাপ বৃদ্ধির সঙ্গে তাপমাত্রার এই পার্থক্য হ্রাস পায়। ইলেকট্রন আয়নের তুলনায় খুবই হাল্কা। তাই ইলেকট্রনের গতিবেগ আয়নের চেয়ে অনেক বেশী এবং বিদ্যুৎ-প্রবাহের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনের ভূমিকা এত বেশী যে, অনেক সময় ধনাত্মক আয়নের প্রভাবকে উপেক্ষা করা হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, প্লাজ্‌মার উপর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব যথেষ্ট। চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে প্লাজ্‌মার মধ্য দিয়ে বেতার-তরঙ্গ পাঠালে তা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এদের বলা হয়—সাধারণ তরঙ্গ ও অসাধারণ তরঙ্গ। এই দুই প্রকার তরঙ্গের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলাদা।

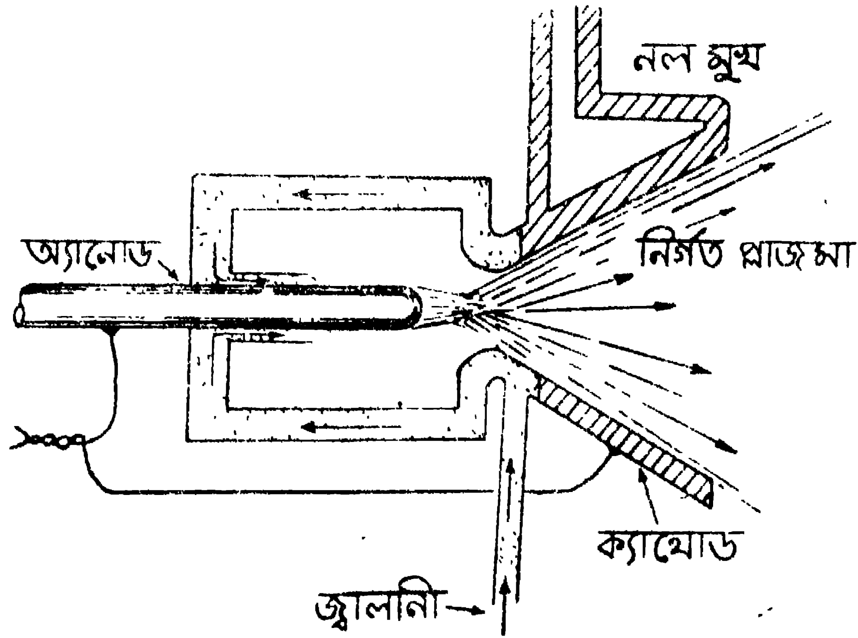
প্লাজ্‌মার মধ্যেকার কণিকাগুলির ঘনত্ব, গতিবিধি, কণিকাগুলির তাপমাত্রা ও সংঘর্ষ সংখ্যা, তড়িৎ ক্ষেত্র প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য জানবার জন্যে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করেন। এদের মধ্যে এক-একটি পদ্ধতি এক-একটি বৈশিষ্ট্য নিরূপণে সাহায্য করে; অর্থাৎ কোন বিশেষ প্রণালীর সাহায্যে প্লাজ্‌মার সমস্ত বৈশিষ্ট্য নির্ভুলভাবে নিরূপণ করা যায় না। এই উদ্দেশ্যে নানা রকমের বৈদ্যুতিক, চুম্বকীয় ও স্পেকট্রোস্কোপিক প্রক্রিয়া আছে। প্লাজ্‌মার মধ্য দিয়ে অতি ক্ষুদ্র বেতার-তরঙ্গ (Micro wave), ক্ষুদ্র শব্দ-তরঙ্গ (Ultrasonic wave) প্রভৃতি পাঠিয়ে এদের উপর প্লাজ্‌মার প্রভাব লক্ষ্য করে প্লাজ্‌মার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা যায়।

প্লাজ্‌মার ব্যবহার

পৃথিবীর উপরিভাগে ৭০ থেকে ৩০০ কিলো-মিটারব্যাপী বিস্তৃত যে আয়নমণ্ডল, সেটি প্লাজ্‌মার দ্বারা সংগঠিত। এই প্লাজ্‌মার মাধ্যমে দেশ-বিদেশে দূরপাল্লার বেতার-সঙ্কেত প্রেরণ করা হয়।

মহাকাশযান থেকে পৃথিবীতে বেতার-সঙ্কেত পাঠাবার সুবিধার জন্যে প্লাজ্মার মধ্যে চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রয়োগের কথা আগেই বলেছি। মহাকাশযান পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবার পথে যদি কোনক্রমে এর গতিবেগ কমিয়ে দেওয়া যায়, তবে ঘর্ষণের ফলে উদ্ভূত তাপের পরিমাণ কম হবে ও আগের তুলনায় মহাকাশযানে তাপের প্রভাবও যাবে কমে। বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুযায়ী মহাকাশযানের বেগ উপযুক্ত পরিবর্তন করা যেতে পারে। এই তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে মহাকাশযানের দিক পরিবর্তন ও গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মহাকাশযানের চৌম্বক ক্ষেত্র ও নৌকার হালের ভূমিকা একই। এই চৌম্বক ক্ষেত্রকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন ম্যাগ্‌নেটিক রাডার (Magnetic rudder)।

প্লাজ্মাকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানে মহাকাশযানের ইঞ্জিন তৈরির কথা চিন্তা করা হচ্ছে।



৪নং চিত্র

চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রয়োগে কমানো যেতে পারে। এই ক্রিয়াকে বিজ্ঞানীরা বলেন চুম্বকীয় ব্রেক (Magnetic brake)। প্লাজ্মার মধ্যে চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক পরিবর্তন করলে তাদের মধ্যে ভিন্ন ধরণের বিক্রিয়া হয়। অতএব মহাকাশযানের মধ্যে চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক পরিবর্তন করে প্লাজ্মার উপর চুম্বকীয় প্রভাবেরও দিক নিউটনের গতিসূত্রের তৃতীয় নিয়ম অনুযায়ী (প্রতিক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে) মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করা হয়। সাধারণতঃ মহাকাশযানে জ্বালানীর রাসায়নিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে উচ্চমাত্রায় গতিশক্তি পাওয়া যায়। একটা ইঞ্জিনকে মহাকাশে চালনা করবার জন্যে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হচ্ছে

প্রচণ্ড ঘাতের (Thrust)। এই প্রচণ্ড ঘাত সৃষ্টি সম্ভব হয় যদি মহাকাশযান থেকে নির্গত ভরের পরিমাণ প্রচুর হয় বা যদি এর গতিবেগ হয় খুব বেশী। মহাকাশযানে রক্ষিত জ্বালানীর ভর বেশী হলে মহাকাশযান ভারী হয়ে পড়ে এবং মহাকাশে চালনার ক্ষেত্রে তা অসুবিধার সৃষ্টি করে; অর্থাৎ এক্ষেত্রে ঘাতের পরিমাণ বেশী লাগবে। বিজ্ঞানীরা প্লাজ্‌মাকে কাজে লাগিয়ে দু-রকম ইঞ্জিন তৈরির কথা চিন্তা করেছেন— বিদ্যুৎ-তাপীয় (Electro-thermal engine) ও বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ইঞ্জিন (Electro-magnetic engine)। ৪ নং চিত্রে একটা বিদ্যুৎ-তাপীয়-ইঞ্জিন দেখানো হয়েছে। অ্যানোড ও ক্যাথোডের মাঝে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে জ্বালানীকে প্লাজ্‌মায় পরিণত করে একটি নলমুখ (Nozzle) দিয়ে নির্গত করা হয়। প্লাজ্‌মাকে নলের মধ্য দিয়ে চালনা করলে এর গতি ত্বরান্বিত হয় ও প্লাজ্‌মার তাপশক্তি গতিশক্তিতে পরিণত হয়। এই নির্গত প্লাজ্‌মা ও সাধারণ রকেট থেকে নির্গত জ্বালানী গ্যাসের ক্রিয়া একই— অর্থাৎ রকেটকে নিজেদের নির্গমন দিকের বিপরীত দিকে ঠেলে দেওয়া। বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ইঞ্জিনে বিদ্যুৎ-তাপীয় ইঞ্জিনের মতই প্লাজ্‌মা তৈরি করা হয়, তবে এক্ষেত্রে প্লাজ্‌মার মধ্যে একটা চৌম্বক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে মহাকাশযানের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রয়োগে অতিরিক্ত ঘাতও পাওয়া যেতে পারে। এই দু-রকমের ইঞ্জিনে প্লাজ্‌মা তৈরির জ্বালানীর পরিমাণ লাগে খুবই কম। জ্বালানীর পরিমাণ কম লাগবার জন্যে অধিকতর সময় মহাকাশযানটি চালু থাকতে পারে এবং এই সুবিধার জন্যেই মহাকাশে দূর-দূরান্তে পাঠাবার জন্যে প্লাজ্‌মা রকেট ব্যবহার করা চলতে পারে।

প্লাজ্‌মা সংক্রান্ত 'ম্যাগ্‌নেটো ফ্লুয়িড মেকানিক্সের' তত্ত্বকে আজ নানা প্রকার কাজে লাগানো হচ্ছে। পারমাণবিক চুল্লী, তরল ধাতু-প্রবাহ প্রভৃতির ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ যথেষ্ট। রক্ত এবং প্রস্রাব তড়িৎ-পরিবাহী। ধমনীর মধ্যে যদি দুটি ছোট ইলেকট্রোড প্রবিষ্ট করানো যায়, তবে ম্যাগ্‌নেটো ফ্লুয়িড মেকানিক্সের তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে রক্তের গতি মাপা যায়। এই তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে মূত্রাশয় ও হৃদ্‌যন্ত্রের ব্যবচ্ছেদের সময় যথাক্রমে প্রস্রাব ও রক্তের চলাচল ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বায়ুমণ্ডলে আয়নিত কণিকার সংখ্যা ও চৌম্বক ক্ষেত্রের পার্থক্য গাছপালার বৃদ্ধিকে প্রভাবান্বিত করে। বিজ্ঞানীরা তাই প্লাজ্‌মা ও চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে গাছপালার হ্রাস-বৃদ্ধি সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানবার আশা করেন।

আমরা জানি যে, সংযোজন (Fussion) পদ্ধতিতে কতকগুলি কেন্দ্রীন একত্রিত হয়ে একটা নতুন কেন্দ্রীন তৈরি হয়। এই নবগঠিত কেন্দ্রীনের ওজন আগের কেন্দ্রীনগুলির সমবেত ওজন অপেক্ষা কম হয়। এই প্রণালীতে কম ওজনটুকু $E=mc^2$ সূত্র অনুযায়ী প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন শক্তিকে নিয়ন্ত্রিতভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা

করছেন। পরমাণু-কেন্দ্রীনের মিলনের জন্যে উচ্চ তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। পরীক্ষাগারে তা প্লাজ্‌মার সাহায্যে পাওয়া সম্ভব। সংযোজন প্রণালীতে হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ডয়টেরিয়াম ও ট্রিটিয়ামকে কাজে লাগানো হয়। উচ্চ তাপমাত্রাবিশিষ্ট প্লাজ্‌মাকে ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ রাখা হয় প্লাজ্‌মাস্থিত কণিকাগুলির চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'নিষ্পেষণ প্রক্রিয়া' (Pinch effect)। বাইরে থেকেও চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করে ক্ষুদ্র পরিসরে প্লাজ্‌মাকে আবদ্ধ করা যায়। নিয়ন্ত্রিত সংযোজন চুল্লীর পরিকল্পনা এখনও পর্যন্ত সার্থক হয় নি। সভ্যজগতে শক্তির চাহিদা দিনের পর দিন বেড়েই চলছে, ফলে ভবিষ্যতে শক্তির ক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষ হবার সম্ভাবনা। সংযোজন পদ্ধতির সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হলে এই সমস্যার সমাধান অবধারিত; কেন না প্রকৃতিতে সংযোজন চুল্লীর জন্যে ব্যবহৃত জ্বালানীর প্রাচুর্য যথেষ্ট।

এক নতুন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে প্লাজ্‌মাকে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা যে যন্ত্রের কথা বলেন, তার নাম MHD জেনারেটর (Magneto-hydrodynamic genarator)। বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্যে যে সব পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়, তাদের কার্যকারিতার হার শতকরা ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশ মাত্র। প্লাজ্‌মার সাহায্যে নতুন পদ্ধতিতে এই কার্যকারিতার হার অনেক বৃদ্ধি পায়। কোন চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে বিদ্যুৎ-পরিবাহী তারের কুণ্ডলীকে গতিশীল করলে ঐ কুণ্ডলীতে বিদ্যুৎ চাপের সৃষ্টি হয়। DC জেনারেটরে এই বিদ্যুৎ চাপ থেকে সমপ্রবাহ বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। DC জেনারেটরের মূলনীতিকে ভিত্তি করে MHD জেনারেটর পদ্ধতিতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হয়। এই যন্ত্রে বিদ্যুৎ-পরিবাহী তারের কুণ্ডলীর বদলে প্লাজ্‌মাকে কাজে লাগানো হয়। কারণ তারের কুণ্ডলীর মত প্লাজ্‌মাও তাপ ও বিদ্যুতের পরিবাহী। অপেক্ষাকৃত নিম্ন তাপমাত্রায় আয়নীভবনের হার বৃদ্ধি করবার জন্যে এই সব যন্ত্রে ব্যবহৃত প্লাজ্‌মার সঙ্গে শতকরা একভাগ সিজিয়াম বা পটাশিয়াম মেশানো হয়, যার ফলে প্লাজ্‌মার পরিবাহিতা বেড়ে যায়। এই সিজিয়াম বা পটাশিয়ামমিশ্রিত প্লাজ্‌মাকে বেশ বড় একটা নলের মধ্য দিয়ে পাঠানো হয় ও ঐ নলের বাইরে প্লাজ্‌মার গতির দিকের সঙ্গে ৯০° কোণ করে একটা চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়। নলের মধ্যে দুদিকে দুটি ইলেকট্রোড রাখা থাকে। চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-পরিবাহী প্লাজ্‌মার গতির ফলে ইলেকট্রোড দুটির মধ্যে বিদ্যুৎ-চাপের সৃষ্টি হয়, যা থেকে আমরা বিদ্যুৎশক্তি পেতে পারি।

সংযোজন চুল্লীর সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হলে সংযোজনের শক্তি—যা তাপ হিসাবে প্লাজ্‌মার মধ্যে প্রকাশ পাবে, MHD জেনারেটরের সাহায্যে তাকে সরাসরি বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা যাবে। এই ব্যবহারের কথা চিন্তা করেই বিজ্ঞানীরা MHD জেনারেটরের উপর প্রথমে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

প্লাজ্‌মা সম্বন্ধে অনেক কিছুই এখনো আমাদের অজানা। তাত্ত্বিক দিক দিয়ে প্লাজ্‌মা সম্বন্ধে আমরা যতটা জেনেছি, প্রয়োগবিদ্যায় আমাদের

জ্ঞান ততটা গভীর নয়। প্রাজ্‌মা সংক্রান্ত গবেষণায় প্রত্যেক দেশেই বিজ্ঞানীরা যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শুধু মাত্র সংযোজন চুল্লীর সার্থক প্রণয়নের জন্যেই বহু বিজ্ঞানী গত কয়েক বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। আশা করা যাচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে প্রাজ্‌মা সংক্রান্ত এই জাতীয় অনেক সমস্যারই সমাধান সম্ভব হবে।

"যখনই আমাদের দিবার শক্তি জন্মিয়াছে তখনই আমরা মহৎরূপে দান করিয়াছি—ক্ষুদ্রে কখনই আমাদের তৃপ্তি নাই। সর্ব্বজীবনের স্পর্শে আমাদের জীবন প্রাণময়। যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, তাহাই আমাদের আরাধ্য। শিল্পী কারুকার্য্যে এই মন্দির মণ্ডিত করিয়াছেন এবং চিত্রকর আমাদের হৃদয়ের অব্যক্ত আকাঙ্খা চিত্রপটে বিকশিত করিয়াছেন।

আমি যে উদ্ভিদ-জীবনের কথা বলিয়াছি তাহা আমাদের জীবনেরই প্রতিধ্বনি। সে জীবন আহত হইয়া মুমূর্ষপ্রায় হয় এবং ক্ষণিক মূর্চ্ছা হইতে পুনরায় জাগিয়া উঠে। এই আঘাতের দুইটি দিক আছে; আমরা সেই দুইএর সংযোগস্থলে বর্ত্তমান। একদিকে জীবনের, অপরদিকে মৃত্যুর পথ প্রসারিত। জীবের স্পন্দন আঘাত ক্রিয়া, যে আঘাত হইতে আমরা পুনরায় উঠিতে পারি। প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা আঘাত দ্বারা মুমূর্ষু হইতেছি এবং পুনরায় সঞ্জীবিত হইতেছি। আঘাতের বলেই জীবনের শক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে। তিল তিল করিয়া মরিতেছি বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া রহিয়াছি।

একদিন আসিবে যখন আঘাতের মাত্রা ভীষণ হইবে; তখন যাহা হেলিয়া পড়িবে তাহা আর উঠিবে না; অন্য কেহও তাহাকে তুলিয়া ধরিতে পারিবে না। ব্যর্থ তখন স্বজনের ক্রন্দন, ব্যর্থ তখন সতীর জীবনব্যাপী ব্রত ও সাধনা। কিন্তু যে মৃত্যুর স্পর্শে সমুদয় উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্য শান্ত হয় তাহার রাজত্ব কোন্ কোন্ দেশ লইয়া? কে ইহার রহস্য উদ্ঘাটন করিবে? অজ্ঞান-তিমিরে আমরা একেবারে আচ্ছন্ন। চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইলেই এই ক্ষুদ্র বিশ্বের পশ্চাতে অচিন্তনীয় নূতন বিশ্বের অনন্ত ব্যাপ্তিতে আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি।"

জগদীশচন্দ্র বসু

কিশোর বিজ্ঞানীর

দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অক্টোবর-নভেম্বর—১৯৬৯

২২শ বর্ষ ঃ ১০ম-১১শ সংখ্যা



ষ্টিভেনসনের 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' গল্পের কাঠের পা লাগানো বোম্বেটের নাম ছিল ক্যাপ্টেন ফ্লিন্ট। আর হ্যানোভারের (পঃ জার্মেনী) এই পেঙ্গুইনের নামও ক্যাপ্টেন ফ্লিন্ট, অসুখের ফলে এর ঠ্যাং কেটে বাদ দিয়ে কাঠের পা জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

পদার্থ ও বিপরীত পদার্থ

আমাদের পুরাণের একটা মজার গল্প তোমাদের বলি। এক সময় এক অসুর বহুদিন মহাদেবের কঠিন তপস্যা করলে মহাদেব খুশি হয়ে তাকে বর দিতে আসেন। অসুর বললে, আমাকে এমন এক বর দিন যাতে আমি আমার হাত দিয়ে যা স্পর্শ করবো, তাই যেন তৎক্ষণাৎ ভস্ম হয়ে যায়। মহাদেব সাদাসিধে দেবতা, ভক্ত বর চেয়েছে, বললেন, তথাস্তু। আর বলেই প্রায় চমকে উঠলেন। কারণ তাঁর বর ঠিক ফলে কি না, তাঁকে স্পর্শ করে তাই পরীক্ষা করবার জন্যে সেই ভক্ত ভস্মাসুর তৎক্ষণে তাঁর দিকে দৌড়ে আসছে। যঃ পলায়তি, সঃ জীবতি—মহাদেব আর কি করেন, দৌড়তে লাগলেন। ভক্তও ছাড়বার পাত্র নয়, সেও তাড়া করেছে। মহাদেব পালাতে পালাতে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করলেন। ব্রহ্মা সাহায্য করবেন কি, নিজেই পালাতে পারলে বাঁচেন। তখন মহাদেব বিষ্ণুর কাছে গেলেন। এখন বিষ্ণু হচ্ছেন পালনকর্তা, তাবৎ বিশ্বের যত ধুরন্ধরকে তাঁকে আয়ত্তে রাখতে হয়, তাঁর মাথায় নানারকম বুদ্ধি খেলে। তিনি মহাদেবকে গা ঢাকা দিতে বলে নিজে এক বুড়ী সেজে রইলেন। ভস্মাসুর এসে যখন বুড়ীকে জিজ্ঞেস করলো, মহাদেব কোন্ দিকে গেছে, তখন বুড়ী জানতে চাইলো, মহাদেবকে তার কি দরকার। ভস্মাসুর বললো, মহাদেবকে স্পর্শ করে তাঁর বর ফলে কি না, তাই সে পরীক্ষা করতে চায়। সেই শুনে বুড়ী বললো, তা বাপু, তোমার নিজের মাথাতেই হাত দিয়ে দেখ না। ঝোঁকে পড়ে অসুর যেই মাথায় হাত দিয়েছে, অমনি সে নিজেই ভস্ম হয়ে গেল।

আচ্ছা, এই ধরনের গল্প কি সত্য হতে পারে? পারে যদি ধরে নেওয়া যায়, ভস্মাসুরের হাত বিপরীত পদার্থ (Anti-matter) দিয়ে গঠিত হয়ে গেছলো। কারণ সাধারণ পদার্থের সঙ্গে বিপরীত পদার্থের যোগাযোগ হলে উভয়েই ভস্মীভূত হয়ে একেবারে বিলীন হয়ে যায়, তার বদলে পাওয়া যায় কেবল খানিকটা শক্তি। এই আশ্চর্য বিপরীত পদার্থ যে কি, তা বুঝতে হলে প্রথমে সাধারণ পদার্থের অন্তর্রহস্য কিছুটা জানা দরকার। তোমরা বোধহয় জান যে, বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু দিয়ে পদার্থ গঠিত। এই পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে, দশ কোটি পরমাণুকে পাশাপাশি সাজালে তার মাপ হবে মাত্র এক ইঞ্চির মত। আবার ঐ ক্ষুদ্র পরমাণুর গঠন কেমন? না, তার কেন্দ্রে রয়েছে একটি নিউক্লিয়াস, তার চারপাশে ঘুরছে এক বা একাধিক ইলেকট্রন। নিউক্লিয়াস ইলেকট্রনের চেয়ে ওজনে অনেক ভারী, তবে আকারে সে তুলনায় বিশেষ পার্থক্য নেই। পরমাণুর ভিতরের বেশীর ভাগটাই শূন্য; মধ্যের নিউক্লিয়াসটি পরমাণুর তুলনায় এত ক্ষুদ্র যে, সমগ্র পরমাণুটি

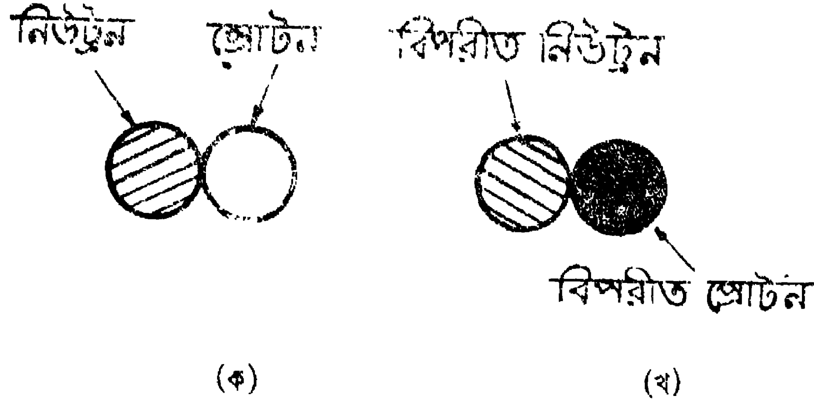
যদি একটি সাগরের সমান হয়, নিউক্লিয়াস তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা একটি জাহাজ মাত্র। নিউক্লিয়াসের মধ্যে আবার দুই ধরণের মৌলিক কণার সন্ধান পাওয়া গেছে, যাদের নাম হলো প্রোটন ও নিউট্রন।

এই যে তিন রকমের মৌলিক কণা—নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন ও নিউট্রন এবং নিউক্লিয়াসের বাইরে ইলেকট্রন, এদের বৈদ্যুতিক প্রকৃতি বিভিন্ন। ব্যাপারটা একটু খুলে বলছি। কোন পদার্থ বিদ্যুৎসম্পন্ন হলে সেই বিদ্যুৎ দু'ধরণের হতে পারে—পজিটিভ বা নেগেটিভ। প্রোটন হচ্ছে পজিটিভ বিদ্যুৎসম্পন্ন, ইলেকট্রন নেগেটিভ বিদ্যুৎসম্পন্ন; আর নিউট্রনের কোন বিদ্যুৎই নেই অর্থাৎ আমরা বলতে পারি নিউট্রন বৈদ্যুতিকভাবে নিরপেক্ষ।

প্রায় ৩৮ বছর আগে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ডিরাক ইলেকট্রন সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যখন ইলেকট্রন রয়েছে তখন বিপরীত ইলেকট্রন বলেও একটি কণা অবশ্য আছে। এই কণার ভর ইলেকট্রনের ভরের সমান, কিন্তু এর বৈদ্যুতিক প্রকৃতি ইলেকট্রনের বিপরীত। ইলেকট্রন যেখানে নেগেটিভ বিদ্যুৎসম্পন্ন, এই কণা সেখানে পজিটিভ বিদ্যুৎসম্পন্ন। এজন্যে এর নাম দেওয়া হলো পজিট্রন। কয়েক বছর পরে অ্যাণ্ডারসন গবেষণাগারে পজিট্রনের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। এই পজিট্রন আমাদের জগতে ক্ষণস্থায়ী, কারণ এখানে বহু ইলেকট্রন থাকায় কোন পজিট্রন সৃষ্ট হওয়ার সামান্য সময়ের মধ্যেই তা কোন না কোন ইলেকট্রনের সংস্পর্শে আসে এবং তখন কণা ও বিপরীত কণার মিলনে উভয়েই ভস্মীভূত হয়ে একেবারে বিলীন হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে এই প্রক্রিয়ায় পদার্থ সম্পূর্ণরূপে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এটাও বলে রাখি যে, যথোপযুক্ত শক্তির রূপান্তরে আবার ইলেকট্রন ও পজিট্রন জোড়ের উৎপত্তিও সম্ভব অর্থাৎ কেবলমাত্র শক্তি থেকেই একটি ইলেকট্রন ও একটি পজিট্রন একসঙ্গে তৈরি হতে পারে। পদার্থ যে শক্তিতে বা শক্তি যে পদার্থে রূপান্তরিত হতে পারে, তা মহামতি আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব থেকে আগেই জানতে পারা গেছলো।

ইলেকট্রনের মত প্রোটনেরও কি কোন বিপরীত কণা আছে? ১৯৫৫ সালে সেগ্রে ও চেম্বারলেন নামে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন অধ্যাপক একটি বিশেষ শক্তিশালী যন্ত্র ব্যবহার করে বিপরীত প্রোটন উৎপাদন করতে সমর্থ হন। অতঃপর দেখা গেল যে, নিউট্রনেরও বিপরীত কণা আছে; নিউট্রন ও বিপরীত নিউট্রন একত্র হলে পরস্পরের বিলুপ্তি ঘটায়। কেবল ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের নয়, মেসন, নিউট্রিনো প্রভৃতি অন্যান্য যে সব মৌলিক কণা আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদেরও বিপরীত কণা রয়েছে।

কিছু কাল আগে বিপরীত ডয়টেরন গবেষণাগারে আবিষ্কৃত হয়েছে। ডয়টেরন হচ্ছে ডয়টেরিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস। ডয়টেরিয়াম হাইড্রোজেনের একটি আইসোটোপ: হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে যেখানে একটি মাত্র বৈদ্যুতিক কণা—একটি প্রোটন—আছে, ডয়টেরিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসেও সেখানে একটিই প্রোটন রয়েছে, তবে তার সঙ্গে রয়েছে একটি নিউট্রন, সেজন্যে ডয়টেরিয়ামের পারমাণবিক



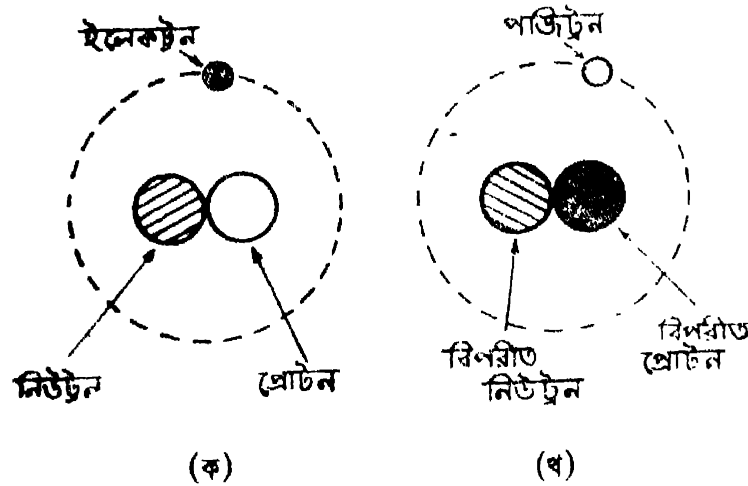
১নং চিত্র

ক—ডয়টেরন, খ—বিপরীত ডয়টেরন

ভর হচ্ছে হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভরের থেকে বেশী। ডয়টেরনে যেখানে আছে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন, বিপরীত ডয়টেরনে সেখানে রয়েছে একটি বিপরীত প্রোটন ও একটি বিপরীত নিউট্রন (১নং চিত্র)।

বিপরীত ডয়টেরনের আবিষ্কার থেকে বোঝা গেল যে, প্রোটন ও নিউট্রন একত্র হয়ে যেমন নানান পরমাণুর নিউক্লিয়াস গঠন করতে পারে, বিপরীত প্রোটন ও বিপরীত নিউট্রনও একত্র হয়ে সেই রকম নানান বিপরীত পরমাণুর বিপরীত নিউক্লিয়াস গঠন করতে পারে। তাহলে প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন নিয়ে যেমন পরমাণু গঠিত হয়, বিপরীত প্রোটন, বিপরীত নিউট্রন ও পজিট্রন নিয়ে তেমনি বিপরীত পরমাণু তৈরি হওয়া সম্ভব (২নং চিত্র দেখ)। আবার বহু পরমাণুর সংযোগে যেমন পদার্থের সৃষ্টি হয়, বহু বিপরীত পদার্থের সমন্বয়ে তেমনি বিপরীত পদার্থের উৎপত্তি হতে পারে। আমাদের সাধারণ পদার্থের জগতে এই বিপরীত পদার্থ অবশ্য ক্ষণস্থায়ী হবে কারণ তা কোন সাধারণ পদার্থের সংযোগে এলে উভয়ে ভস্মীভূত হয়ে যাবে। তবে এই পদার্থ যদি সাধারণ পদার্থের থেকে দূরে থাকে, তাহলে সাধারণ পদার্থের মতই তা স্থায়ী হতে পারে। সুতরাং বহু বিপরীত পদার্থের সংযোগে বিপরীত জগতের সৃষ্টি হওয়াও কিছু অসম্ভব নয়। এই ধরণের জগতের অস্তিত্ব আছে কি না, তা জানবার জন্যে বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান চালাচ্ছেন।

এখানে অসুবিধা হচ্ছে এই যে, দূরের কোন জগৎ থেকে যে আলো বা অন্যান্য বিকিরণ আমাদের কাছে এলে আমরা সেই জগতের সন্ধান পাই, সাধারণ ও বিপরীত জগতের ক্ষেত্রে তা মনে হয় একই রকম হবে। তবে কোথাও যদি কোন বিপরীত জগৎ কোন সাধারণ জগতের সংস্পর্শে এসে থাকে, তাহলে উভয়ে ভস্মীভূত হওয়ার ফলে যে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হবে, সেটা লক্ষ্য করে বিপরীত জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুমান করা যেতে পারে।



২নং চিত্র

ক—ডয়টেরিয়াম পরমাণু, খ—বিপরীত ডয়টেরিয়াম পরমাণু (?)

বিস্ফোরণের কথায় মনুষ্য-সৃষ্ট বিস্ফোরক বোমার কথা স্বভাবতঃই মনে আসে। অ্যাটম বোমা বা পারমাণবিক বোমার কথা তোমরা নিশ্চয় শুনেছ। এই অ্যাটম বোমার থেকে বহু গুণ শক্তিশালী হলো হাইড্রোজেন বোমা। আবার পদার্থ ও বিপরীত পদার্থ দিয়ে যদি মানুষ বোমা তৈরি করতে পারে, তবে সেই এক একটি বোমার ধ্বংসের ক্ষমতা হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংসের ক্ষমতা থেকে প্রায় হাজার গুণ বেশী হবে। তবে আশার কথা, এই ধরণের বোমা তৈরির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত বলেই মনে হয়। নইলে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে মানুষ অচিরেই ভস্মাসুরের মত নিজেই হয়তো নিজের সমূল বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াতো।

জয়ন্ত বসু

জীবন্ত ঘড়ি

ঘড়ি বলতেই আমাদের মনে প্রথমে হাত-ঘড়ি অথবা বিদ্যুৎ বা যন্ত্রচালিত দেয়াল ঘড়ির কথা মনে পড়ে। আমাদের দেহের মধ্যেও যে একটি ঘড়ি অবিরাম আমাদের দৈনন্দিন কার্যবিধি নিয়ন্ত্রণ করছে, তা আমরা অনেকেই জানি না। অথচ এর উপস্থিতি একটু লক্ষ্য করলেই অনুভব করা যেতে পারে। আমাদের প্রত্যেকেরই রাতে ঘুম পায় এবং অনেকের ভোর বেলায় অ্যালার্ম ঘড়ি ছাড়াও রোজ ঠিক একই সময়ে ঘুম ভেঙে যায়। তাছাড়াও আমাদের দেহের তাপমাত্রা, রক্তের চাপ, রক্তে লোহিত কণিকা এবং শর্করার পরিমাণ ইত্যাদির পরিবর্তনেও একটি দৈনিক ছন্দ দেখা যায়। এই সব ঘটনাগুলিই আমাদের দেহের অন্তর্গত একটি জীবন্ত ঘড়ি (Biological clock) পরিচালনা করে, যার আবর্তন সময় হলো ২৪ ঘণ্টা। এটি কোনও জায়গার স্থানীয় সময় অনুসারেই চলে বলে আমাদের দেশ থেকে বিমানযোগে আমেরিকায় গেলে সেখানে প্রথমে বেশ কিছুদিন দিনে ঘুম পায় আবার রাতে ঘুমই আসে না। তবে কয়েক দিনের মধ্যে এই ঘড়িটি সেখানকার স্থানীয় সময় অনুসারে ঠিকভাবে চলতে সুরু করে এবং আর কোনও অসুবিধা হয় না। আবার দেখা গেছে যে, যদি কোনও শিশু রাতে জন্মায় তবে সে প্রথম প্রথম দিনের বেলায় ঘুমায় আর রাতে জেগে থাকে। এর কারন হলো এই যে, জন্মের সময় থেকেই এই ঘড়িটি নিয়মিত ২৪ ঘটার আবর্তন সুরু করে। পরে অবশ্য এটি আপনা থেকেই দিন ও রাতের ব্যাপ্তিকাল অনুযায়ী পুনর্বিন্যস্ত হয়। তাছাড়া আরও কয়েকটি ঘটনা, যেমন—আমাদের মনের বিভিন্ন অবস্থা, বাত ইত্যাদি কয়েকটি রোগের পুনাবির্ভাব এবং বিভিন্ন দিনে আমাদের কাজ করবার ক্ষমতারও একটি ছান্দিক পরিবর্তন দেখা যায়। অবশ্য এই ছন্দগুলির ব্যাপ্তিকাল ভিন্ন ভিন্ন।

এইরূপ জীবন্ত ঘড়ি যে কেবল মানুষেরই বিশেষত্ব, তা নয়। বহু পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ—এমন কি, উদ্ভিদের মধ্যেও এর অস্তিত্ব দেখা যায়। এখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, এই অদৃশ্য ঘড়িটি চালিত হচ্ছে কি করে এবং এর সঙ্গে পৃথিবীর দৈনিক ঘূর্ণন বা দিন-রাত্রি পরিবর্তনের কোনও যোগাযোগ আছে কি?

উদ্ভিদ-জগতে এমন বহু গাছপালা আছে, যেগুলির পাতা রাতে বন্ধ হয়ে যায় বা নুইয়ে পড়ে। এই রকমই একটি উদ্ভিদ হলো সীম-লতা। সদ্য অঙ্কুরিত সীম গাছের পাতা প্রায় প্রতি ২৪ ঘণ্টা অন্তর উঠা-নামা করে। পাতাগুলি রাতে নুইয়ে পড়ে আবার দিনের বেলার খাড়া হয়ে ওঠে। ২৪ ঘণ্টার চেয়ে একটু কম-

বেশী স্থিতিকালের এইরূপ ছন্দকে সারকাডিয়ান ছন্দ (Circadian rythm) বলা হয়।

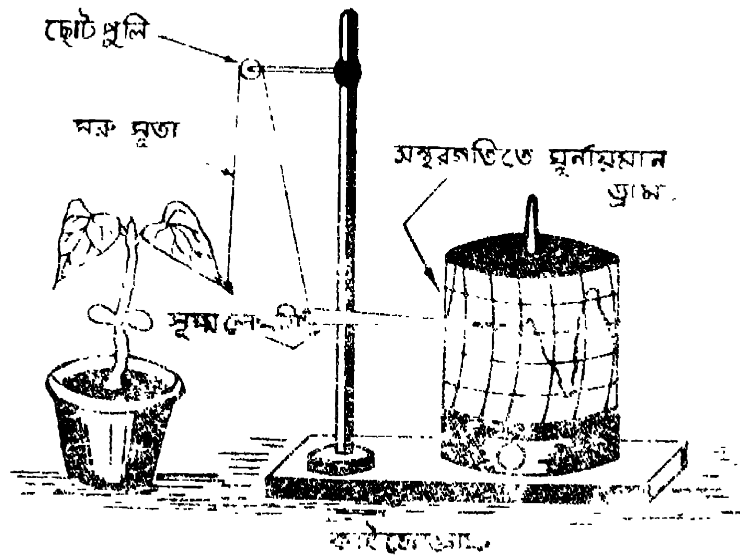
সীমের পাতার এই ছন্দ দিনের আলো বা তাপমাত্রার তারতম্যের উপর নির্ভর করে কিনা, তা জানবার জন্যে খুব সুন্দর একটি পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষাটিতে একটি সীমের চারাকে একটি বদ্ধ কক্ষে রাখা হয় এবং সেটিকে কয়েক দিন ধরে সমানভাবে আলোকিত অথবা অন্ধকার করে রাখা হয়। কক্ষটির তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার পরিমাণও সমানভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। কক্ষের মধ্যে পাতার গতিবিধি লিপিবদ্ধ করবার জন্যে কাইমোগ্রাফ (Kimograph) নামক যন্ত্রের ব্যবহার করা হয়। এখন যদি পাতার বিচলন আলো বা তাপমানের পরিবর্তনশীলতার উপর নির্ভর করে, তবে উপরিউক্ত অবস্থায় সীম গাছের পাতার একভাবে খাড়া বা নুইয়ে থাকা উচিত। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, বদ্ধ কক্ষের মধ্যেও পাতার দৈনিক ওঠা-নামা অবিচলিত থাকতে দেখা যায় (১নং চিত্র)। উদ্ভিদ-জগতে এই প্রকার ছন্দের আরও বহু উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। নয়নতারা, কৃষ্ণকলি ফুলগুলি রাতে মুড়ে বন্ধ হয়ে যায় আবার সকাল বেলায় পুনরায় খুলে যায়। আবার রজনীগন্ধা, লিলি, মাধবীলতা প্রভৃতি ফুলগুলি ঠিক সন্ধ্যার সময় সুগন্ধ বিতরণ করতে সুরু করে। দিনের বেলায় কিন্তু এই ফুলগুলির কোন গন্ধই থাকে না।

এবারে জীব-জগতের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ফিড্‌লার নামক বড় দাড়াযুক্ত একজাতীয় কাঁকড়া সচরাচর সমুদ্রতটবর্তী স্থানে বাস করে। দিনের বেলায় শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে এরা দেহের রং পরিবর্তন করে বালির উপর অবাধে চলাফেরা করে এবং সন্ধ্যার পর পুনরায় এরা নিজের গাঢ় ধূসর রঙে পরিবর্তিত হয়। এই প্রাণীটিকেও পরীক্ষা-কক্ষের অপরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যে প্রতি দিন দু-বার নিজের দেহের রং বদ্‌লাতে দেখা যায়।

আর একটি পরীক্ষায় এক প্রকার সামুদ্রিক ঝিনুককে সমুদ্রোপকূল থেকে প্রায় হাজার মাইল দূরে এক গবেষণাগারের একটি কৃত্রিম জলাশয়ে রাখা হয়। এই ঝিনুকের একটা বিশেষত্ব হলো—এরা প্রতিদিন সমুদ্রে জোয়ার আসবার সময় খুলে যায় আবার ভাটার সময় পুনরায় বন্ধ হয়ে যায় এবং এই ছন্দটি কেবলমাত্র জোয়ার-ভাটার সময়ের উপরই নির্ভর করে। পরীক্ষা কেন্দ্রের ঝিনুকগুলি প্রথমে কয়েক দিন হাজার মাইল দূরবর্তী তাদের বাসস্থানের জোয়ার-ভাটার সময়ানুযায়ী খুলতে ও বন্ধ হতে থাকে। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তারা গবেষণা-স্থলের স্থানীয় জোয়ার-ভাটার সময় অনুসারে তাদের ছন্দ পরিবর্তিত করে নেয়। এখানে ছন্দটি স্পষ্টতঃই কেবলমাত্র আকাশে চাঁদের অবস্থানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

একটি বন্যপ্রাণী—উড়ন্ত কাঠবিড়াল সাধারণতঃ দিনের বেলায় ঘুমায় এবং

সূর্যাস্তের পরেই বাসা থেকে বেরিয়ে আসে, তার পর সারারাত দৌড়াদৌড়ি করে খাবার জোগাড় করে আর বাচ্চাদের খাওয়ায়। এই জন্তুটিকে যখন একটি বিশেষ ধরণের পরীক্ষা-কক্ষে রাখা হলো, তখন দেখা গেল, প্রতিদিন সে প্রায় এক ঘণ্টা আগে এগিয়ে যাচ্ছে—অর্থাৎ ২৩ ঘণ্টা অন্তরই তার দৈনিক গতিবিধি সুরু করছে। এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, পরীক্ষা-কক্ষের স্থায়ী পরিবেশ উড়ন্ত কাঠবিড়ালের দৈনিক কার্যপ্রণালীকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। কয়েক দিন পরে কাঠবিড়ালটিকে যখন মুক্ত করে দেওয়া হলো, তখন আবার দেখা গেল যে, সে অবিলম্বে তার পুরনো ২৪ ঘণ্টার আবর্তন সুরু করছে।



১নং চিত্র। সীমপাতার বিচলনের পরীক্ষা

কীট-পতঙ্গের মধ্যে আরশোলা রাত্রিকালেই সবচেয়ে বেশী সক্রিয়তা দেখায়। এখানেও দেখা গেছে যে, আলোর তারতম্যের উপর এর গতিবিধি নির্ভর করে। কয়েকটি আরশোলাকে যদি বিজলীবাতিযুক্ত একটি বাক্সে রাখা হয় এবং সেই আলোর সাহায্যে যদি কৃত্রিমভাবে দিন ও রাত্রি সৃষ্টি করা হয়, তবে সেগুলি সেই কৃত্রিম পরিবেশ অনুযায়ীই দৈনিক ক্রিয়াকলাপ পুনর্বিন্যস্ত করে। আবার সাধারণ ফল-মাছির (Drosophila) ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, পুত্তলী (Pupa) থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ মাছি কেবলমাত্র ভোর বেলায় বেরোয় এবং এই বৈশিষ্ট্যটি ১৫-পুরুষ ধরে সমানভাবে আলোকিত কক্ষে উত্তোলন করবার পরেও এই পতঙ্গের মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই জীবন্ত ঘড়িটির চলন দিন-রাত্রি বা আলোর তারতম্যের উপর নির্ভর করে, আবার কোনও প্রাণীর মধ্যে এইরূপ ছন্দ বংশানুক্রমে বিদ্যমান থাকে। বর্তমান যুগের মহাকাশচারীদের যাত্রার সময় মহাকাশযানগুলির ভিতরে দিন বা রাত বলে কিছু থাকে না, অবশ্য পৃথিবীর

সঙ্গে বেতার সংযোগের দ্বারা তাঁরা পৃথিবীতে দিন ও রাত সম্বন্ধে জানতে পারেন। আবার সমুদ্রের গভীর তলায় যখন পারমাণবিক শক্তি-চালিত ডুবোজাহাজগুলি মাসের পর মাস বিচরণ করে, তখন জাহাজের নাবিকদলের অবস্থাও একই রকম। সেখানেও দিন বা রাত নেই। এইরূপ ক্ষেত্রে যদি বহির্জগতের সঙ্গে বেতার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, তখন মহাকাশচারী বা নাবিকেরা ঠিকমত সময় আন্দাজ করতে পারে কি? অনেকেই হয়তো বলবে—কেন ঘড়ি রয়েছে তো? হ্যাঁ, ঘড়িতে সময় দেখে আমরা দিন ও রাত সম্বন্ধে নিশ্চয়ই জানতে পারি, তবে কোনও কারণবশতঃ যদি ঘড়িটি ঠিক সময় না দেয়, তখন তার ফল কি হতে পারে?

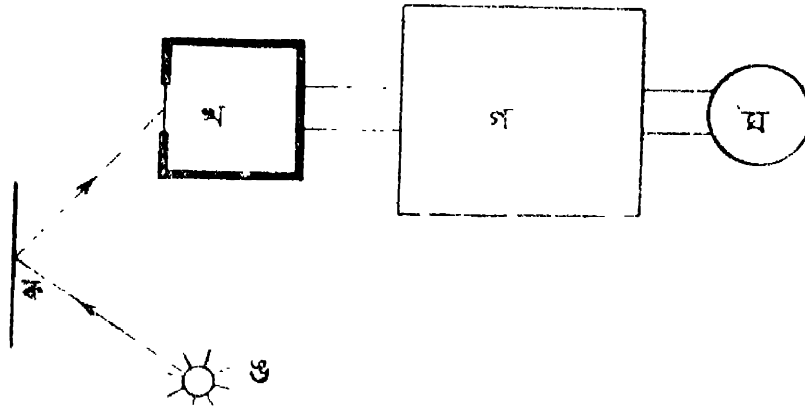
আমেরিকার এক গবেষণাগারে কয়েকটি পৃথক কক্ষে কয়েক জন স্বেচ্ছাকর্মীর উপর এই পরীক্ষা চালানো হয়। প্রত্যেকটি কক্ষের সঙ্গে বাইরের সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় এবং কেবল মাত্র স্বেচ্ছাকর্মীর হৃৎস্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাসের মাত্রা; রক্তের চাপ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করবার জন্যে বৈদ্যুতিক সংযোগ রাখা হয়। এছাড়া প্রত্যেকটি কক্ষকে সমানভাবে আলোকিত রাখা হয় এবং সেগুলির আভ্যন্তরীণ আবহাওয়া স্থায়ীভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এই অবস্থায় কক্ষের ভিতর থেকে বাইরে দিন বা রাত সম্বন্ধে কিছুই জানা সম্ভব নয়। এর পর কর্মীদের প্রত্যেককে একটি করে ঘড়ি দেওয়া হয়, যেগুলিকে আগেই তাঁদের অজ্ঞাতে সাধারণ ঘড়ি থেকে মন্থর বা দ্রুততর করে দেওয়া হয়েছে এবং যে জন্যে সেগুলি দিনে ২৪ ঘণ্টার পরিবর্তে ২২ থেকে ২৬ ঘণ্টা পর্যন্ত সময় দেখায়। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, যাঁদেরই ঘড়ি দ্রুত বা মন্থর করে দেওয়া হয়েছিল তাঁরা সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন এবং তাঁদের নির্দিষ্ট কার্যসাধনে যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটেছে, অথচ যাঁদের ঘড়ি সাধারণভাবে চলছিল, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে যে, ঘড়িতে যে কোনও সময়ই দেখানো হোক না কেন, আমাদের আভ্যন্তরীণ জীবন্ত ঘড়িটি ঠিক ২৪ ঘণ্টার হিসেবেই চলে এবং কৃত্রিম সময়ের সঙ্গে মিল না হলেই শারীরিক ও মানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি করে।

এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা এখনও চলছে এবং ভবিষ্যতে কৃষি ও চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতি সাধনের জন্যে জীবন্ত ঘড়ি সম্বন্ধে অধ্যয়ন হয়তো খুবই লাভজনক হতে পারে। এখনই কয়েকটি পরীক্ষাগারে রাতে বিজলী বাতি ব্যবহার করে মুরগীর ডিমের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে এবং দেখা গেছে যে, কৃত্রিমভাবে দিন ও রাত্রির ব্যাপ্তিকাল নিয়ন্ত্রণের দ্বারা ফল ও সব্জির উৎপাদনও যথেষ্ট বৃদ্ধি করা সম্ভব। তাছাড়া চিকিৎসাশাস্ত্রে রোগীর রক্তের চাপ ও শর্করা পরিমাণে দৈনিক হ্রাস-বৃদ্ধি সম্বন্ধে জ্ঞান হয়তো ওষুধ প্রভৃতির ফলপ্রদ প্রয়োগে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

বিমান বসু

মজার যন্ত্র

বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে আজকাল নানা ধরণের মজার যন্ত্র আমাদের চোখে পড়ে। এই সমস্ত প্রদর্শনীতে সাধারণ বিজ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে দর্শকদের নতুন নতুন জিনিষ দেখানো হয়। পদার্থবিদ্যার ইলেক্ট্রনিক্স শাখায় বিভিন্ন বর্তনীর সাহায্যে অনেক চমকপ্রদ জিনিষই দেখানো সম্ভব। বিশেষতঃ ট্র্যানজিষ্টরের বহুল ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে এসবের প্রাচুর্য বেড়েই চলেছে। প্রদর্শনীতে আজকাল ট্র্যানজিষ্টরের সাহায্যে বিভিন্ন ধরণের খেলা, চোরধরা, প্রতিবেদন-শক্তি পরীক্ষা,



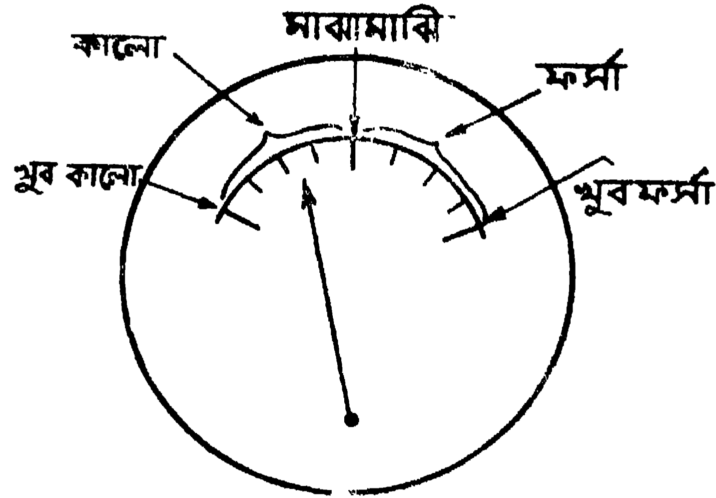
১নং চিত্র
চিত্রে খ, গ ও ঘ যথাক্রমে ফটো-ট্র্যানজিষ্টর, পরিবর্ধক ও মিটার,
ক—চিহ্নিত স্থানে প্রতিফলক হিসাবে সাধারণতঃ মানুষের হাত
রাখা হয়। ঙ—আলোক উৎস।

কালো-ফর্সার মান বিচার করা ইত্যাদি যন্ত্রের মডেল দেখা যায়। এর ফলে বিজ্ঞানের প্রতি মানুষের যেমন কৌতূহল বাড়ে, অন্য দিকে নিত্যব্যবহার্য ট্র্যানজিষ্টর সমন্বিত বহু সরঞ্জামের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়। ঐ রকম একটা যন্ত্র সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হবে।

কালো বা ফর্সার মান বিচার

যখন আমরা কাউকে কালো বা কাউকে ফর্সা বলি, তখন সেটা হয় তুলনা-মূলক বিচার। এখানে আমাদের চোখই ঐ কালো বা ফর্সার মান নিরূপণ করে। চোখের বদলে কোন যন্ত্রের সাহায্যে যদি ঐ মান নিরূপণ করা যায় তবে সেটা যে আকর্ষণীয় হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এক ধরণের ট্র্যানজিষ্টরের সাহায্যে সে রকম যন্ত্র তৈরি করা যেতে পারে। এই বিশেষ ধরণের ট্র্যানজিষ্টরকে বলা হয় ফটো-ট্র্যানজিষ্টর। এর ধর্ম হলো—এর উপর আলো এসে পড়লে ঐ আলো

তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে ট্র্যানজিষ্টরের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করে। তড়িৎ-প্রবাহের মান নির্ভর করে আপতিত আলোর তীব্রতার উপর। আমরা জানি, কালো বস্তুর আলো-প্রতিফলন ক্ষমতা সাদা বস্তুর তুলনায় অপেক্ষাকৃত



২নং চিত্র
চিত্রে মিটারের কাঁটার অবস্থান-স্থল থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মানুষটির রং একটু কালো।

কম, অর্থাৎ সাদা বস্তুর আলো-প্রতিফলন ক্ষমতা বেশী। উপরের বর্ণনা অনুযায়ী যদি ফটো-ট্র্যানজিষ্টরের উপর আলো-কে সোজাসুজি পড়তে না দিয়ে প্রতিফলনের পর পড়তে দেওয়া হয়, তাহলে প্রতিফলিত রশ্মির তীব্রতার মাত্রার উপর ফটো-ট্র্যানজিষ্টরে উৎপন্ন তড়িৎ-প্রবাহের মাত্রা কম-বেশী হবে। কালো প্রতিফলকের তুলনায় সাদা প্রতিফলকের ক্ষেত্রে ফটো-ট্র্যানজিষ্টর উৎপন্ন তড়িৎ-প্রবাহের মান হবে বেশী। সাদা ও কালো প্রতিফলকের মত সাদা ও কালো মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে প্রতিফলিত আলো ফটো-ট্র্যানজিষ্টরে অনুরূপ ঘটনা ঘটায়। এই তড়িৎ-প্রবাহের পরিমাণ খুবই কম হওয়ায় একে পরিবর্ধকের সাহায্যে পরিবর্ধিত করা হয় ও পরে মিটারের দ্বারা তা মাপা হয় (১নং চিত্র দেখ)। এই পরিবর্ধিত তড়িতের মাত্রা পরিবর্ধকে আগত তড়িতের মাত্রার উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ এটা নির্ভর করে ফটো-ট্র্যানজিষ্টরের উপর আপতিত আলোর তীব্রতার মাত্রার উপর। কাজে কাজেই খুব ফর্সা লোকের বেলায় তড়িৎ-প্রবাহের মাত্রা হবে যথেষ্ট বেশী এবং বেশ কালো লোকের বেলায় হবে খুবই কম। মোটামুটিভাবে এই দুই মানকে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ধরে তাদের মধ্যবর্তী মানের দ্বারা বিভিন্ন লোককে ফর্সা বা কালোর পরিমাপগত দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করা যেতে পারে (২নং চিত্র দেখ)।

মহুয়া বিশ্বাস

ধাঁধা

নীচে ৫টি প্রশ্ন দেওয়া হলো। প্রত্যেকটি প্রশ্নের মধ্যে ৪টি করে ছোট প্রশ্ন আছে। প্রতিটি প্রশ্নের জন্যে নম্বর হচ্ছে ২০, অর্থাৎ প্রত্যেক ছোট প্রশ্নের জন্যে নম্বর হলো ৫; সবশুদ্ধ নম্বর ১০০। উত্তর দেবার জন্যে সময় আছে ১০ মিনিট। এই সময়ে ১০০-এর মধ্যে ৮০ বা ৮০ এর বেশী পেলে খুব ভাল, ৬০ থেকে ৮০-এর মধ্যে পেলে শুধু ভাল, ৪০ থেকে ৬০-এর মধ্যে পেলে মন্দের ভাল, আর ৪০-এর নীচে পেলে কিছু না—বলাই ভাল।

১নং প্রশ্ন : লিখিত সংখ্যাগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শূন্যস্থান পূর্ণ কর—

(ক) ১, ৪, —, ১০

(খ) —, ৪৪, ৪৫৪, ৪৯৯৪

(গ) ৬৫৬১, —, ৯, ৩

(ঘ) ২, ৮, ৫১২
১, ১, —

২নং প্রশ্ন : কোন্‌টি সবচেয়ে বড় বল—

(ক) ৭/৮, ৫৭/৬৪, ২২৩/২৫৬

(খ) ক = ১ + ৪ + ৭ + ২ + ৫ + ৮ + ৯,
খ = ২ + ৫ + ৮ + ১ + ৪ + ৭ + ৮,
গ = ৩ + ৬ + ৯ + ০ + ৩ + ৬ + ৭

(গ) ১৫ × ১৫, ১৪ × ১৬, ১৩ × ১৭

(ঘ) ৮ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তের ক্ষেত্রফল
৭ ইঞ্চি বাহুবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল
১০ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৫ ইঞ্চি প্রস্থবিশিষ্ট আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল।

৩নং প্রশ্ন : লিখিত অক্ষরগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শূন্যস্থান পূর্ণ কর—

(ক) প, ফ, ভ, —, প

(খ) ক, ঙ, ঝ, ড, —

(গ) অ, ঊ, —, ও, ই, ঐ

(ঘ) ক, —, টি, তী, পু

৪নং প্রশ্ন : পাশাপাশি দুটি শব্দের শূন্যস্থানে এমন একই অক্ষর বসাও যাতে ঐ দুটি শব্দ সমশ্রেণীভুক্ত বা পরস্পর-সম্পর্কিত দুটি পদার্থ বা বস্তুকে বোঝায়—

(ক) নিয়—, জেন—

(খ) লে—র, মে—র

(গ) নিউ—ক্লাস, নিউ—ক্লোলাস

(ঘ) সো—স, স্পো—ক্সিয়াম

৫নং প্রশ্ন : লিখিত শব্দগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শূন্যস্থান পূর্ণ কর—

(ক) বুধ, শুক্র, —, মঙ্গল

(খ) সমতল, উত্তল, —

(গ) হাইড্রোজেন, —, ট্রিটিয়াম

(ঘ) লাল, কমলা, হলুদে, সবুজ—, নীল, বেগুনী

জয়ন্ত বসু

(উত্তরের জন্যে ৬৮৬নং পৃষ্ঠা দেখ)

আলকাত্‌রা

আলকাত্‌রার সঙ্গে তোমরা নিশ্চয়ই পরিচিত। এক সময় আলকাতরাকে এর বিদ্‌ঘুটে গন্ধের জন্যে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ফেলে দেওয়া হতো। এখন এই আলকাত্‌রা থেকেই নানারকম রং, ওষুধ, গন্ধদ্রব্য, বিস্ফোরক প্রভৃতি তৈরি হচ্ছে। শুনলে অবাক হবে যে, এই আলকাত্‌রা সম্পর্কে আরও অনেক গবেষণা চলছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। আলকাত্‌রার আবিষ্কারক হলেন ডাবলিউ. এইচ. পার্‌কিন। আলকাত্‌রার বহুবিধ গুণের অস্তিত্বের বিষয় তিনিই প্রমাণ করেন। আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্‌ঘুটে গন্ধে-ভরা আলকাত্‌রা সম্পর্কে লোকের ধারণা যায় একেবারে বদ্‌লে। তারা ভাবতেই পারে নি যে, এই কালো রঙের আলকাত্‌রার মধ্যে আত্মগোপন করে থাকতে পারে এত সব গন্ধ, রং আর ওষুধপত্র।

পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশগুলিতে আলকাত্‌রাকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা চলছে। বিরাট বিরাট শিল্প গড়ে উঠছে আলকাত্‌রাকে কাজে লাগাবার জন্যে। এই ব্যাপারে বৃটেনের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৃটেনে প্রতি বছর প্রায় চার কোটি টন কাঁচা কয়লা পুড়িয়ে কোক কয়লা ও গ্যাস তৈরি করা হয়। আর এই সঙ্গে উৎপন্ন হয় ১৮০০ টন আলকাত্‌রা। এই আলকাত্‌রা থেকে নানারকম অ্যারোমেটিক যৌগ তৈরি করেন বৃটেনের আলকাত্‌রা-উৎপাদক কারখানার কর্মীরা। এই আলকাত্‌রার জন্যে প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণ কয়লা।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী পৃথিবীর সমস্ত কয়লার মধ্যে আমেরিকায় আছে ৫২%, ক্যানাডায় ১৬.৫%, চীনে ১৩.৫%, জার্মেনীতে ৫.৭%, বৃটেনে ২.৬% আর অষ্ট্রেলিয়ায় ২.২%; ভারতবর্ষেও কয়লার পরিমাণ নেহাৎ কম নয়। সুতরাং এই কয়লা থেকে আলকাত্‌রা তৈরি করা যেতে পারে। আমাদের দেশে কলকাতা ও জামশেদপুরে কয়লা থেকে আলকাত্‌রা তৈরির জন্যে চেষ্টা সুরু হয়েছে কয়েক বছর আগে থেকেই। তবে এই ব্যাপারে ভারত এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে নি। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে উৎপন্ন আলকাত্‌রার পরিমাণ অনেক কম। ১৯৫২ সালের একটা সমীক্ষায় দেখা গেছে, বৃটেনে যখন ২৫০ লক্ষ টন আলকাত্‌রা উৎপন্ন হয়, তখন ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয় ৩৬.২ লক্ষ টন মাত্র। এখন এই পরিমাণ অবশ্য কিছুটা বেড়েছে আমাদের দেশে। আরও লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, বৃটেনে উৎপন্ন আলকাত্‌রার অর্ধেকটা লাগানো হয় রাস্তা পাকা করবার কাজে। আর ভারতবর্ষে সমস্তটাই লাগে রাস্তা তৈরি করতে।

কয়লার অন্তর্ধূম পাতনের (Destructive distillation) সময় উপজাত (Bye-product) হিসাবে বেরিয়ে আসে আলকাত্‌রা। এই তথ্যের আবিষ্কারক হলেন ইয়র্কশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর জন ক্লেট্যান ও রবার্ট বয়েল। ১৬৬০ সালে তাঁরা যৌথভাবে এই তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। তখন থেকেই আলকাত্‌রা নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে জল্পনা-কল্পনা সুরু হয়ে যায়—চলতে থাকে নানারকম গবেষণা।

কয়লার অন্তর্ধূম পাতনের সময় যে আলকাত্‌রা পাওয়া যায়, মাঝে মাঝে তার আপেক্ষিক গুরুত্বের পরিবর্তন হতে পারে। তবে এই আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.০৮ থেকে ১.২০-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কার্বনের পরিমাণেও তারতম্য দেখা যায় আলকাত্‌রার মধ্যে। কয়লার অন্তর্ধূম পাতনের সময় দেখা গেছে, কার্বন কণিকা ছাড়া আরও প্রায় ৩০০ রকম পদার্থ আলকাত্‌রার সঙ্গে মিশে থাকে। লাইট অয়েল, হেভি অয়েল, অ্যান্থ্রাসিন, পিচ্‌ প্রভৃতির জনক হলো এই আলকাত্‌রা। আলকাতরার রং কালো কেন জান? কার্বন-পরমাণু বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আলকাত্‌রার সঙ্গে মিশে থাকে বলেই এর রং কালো। এছাড়া স্বল্প পরিমাণ জলও থাকে এই আলকাত্‌রার মধ্যে।

আজ আলকাতরার ব্যবহার বহুমুখী। আলকাত্‌রার অদ্ভুত রকম জলনিরোধক ক্ষমতা আছে। আলকাত্‌রার জলনিরোধক ক্ষমতার বিষয় আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৭২৮ সালে। অগ্নিনির্বাপক ও রবারের দ্রাবক ন্যাপ্‌থার আবিষ্কার হয় ১৭২৯ সালের কাছাকাছি। এর আবিষ্কারক হলেন গ্ল্যাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চার্লস

ম্যাকিন্‌টোস। এখানেই শেষ নয়। এরপর ১৮৪০ সালে আলকাত্‌রা থেকে ক্রিয়োজোট নিষ্কাশন করে জ্বালানী তেল হিসাবে একে ব্যবহার করা হতে থাকে। নিষ্কাশনের পর পাত্রে পড়ে-থাকা পিচ রাস্তা তৈরির কাজে লাগানো হয়। আজকাল এই আলকাত্‌রা থেকে নানারকম সুগন্ধি দ্রব্য ও ওষুধপত্র তৈরি হচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা আজও নানারকম চেষ্টা চালাচ্ছেন আলকাত্‌রাকে নিয়ে। তাঁদের চেষ্টা সার্থক হলে আরও নতুন রহস্যের দরজা খুলে যাবে।

হিল্লোল রায়

ধাঁধার উত্তর

১। (ক) ৭; (খ) ৪; (গ) ৮১; (ঘ) ১

২। (ক) $\frac{৫৭}{৬৪}$; (খ) ক; (গ) ১৫ × ১৫; (ঘ) বৃত্তের আয়তন

৩। (ক) ফ; (খ) থ; (গ) আ; (ঘ) চা

৪। (ক) ন; (খ) সা; (গ) ক্লি; (ঘ) রা

৫। (ক) পৃথিবী; (খ) অবতল; (গ) ডয়টেরিয়াম; (ঘ) আসমানি

এফ. আর. এস.

সেটা ছিল গোড়ামির যুগ। খৃষ্টান জগতের গুরু পোপই ছিলেন সমস্ত খৃষ্টান-জগতের হর্তাকর্তা। পোপের আদেশের বিরুদ্ধে কিছু করতে বড় বড় রাজারাও সাহসী হতেন না। পোপের আদেশ অমান্য করবার শাস্তিও ছিল ভয়ানক। তোমরা একথা নিশ্চয়ই জান যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, অর্থাৎ সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ (Heleo-centric theory) প্রচারের জন্যে গ্যালিলিওকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল।

এমনি ধর্মান্ধতার যুগে বিপ্লবের পর ইংল্যাণ্ডের রাজা হয়েছিলেন অলিভার ক্রমওয়েল। পোপ এবং রাজার বিধান ছাড়া নতুন কোন মতবাদের প্রচার তিনিও সমর্থন করতেন না।

এই সময়ে বাধ্য হয়ে ইংল্যাণ্ডের কিছু কিছু শিক্ষিত লোক গোপন সভায় মিলিত হয়ে বিজ্ঞান সম্বন্ধে চর্চা এবং অনুশীলন করতে লাগলেন। এই জ্ঞানর্চার কেন্দ্রটির নাম ছিল The in visible college। বরেণ্য বৈজ্ঞানিক আইজাক নিউটন ছিলেন এই কলেজের প্রথম দিকের সভ্য।

ক্রমওয়েল মারা যাবার পর পরবর্তী রাজাদের অবশ্য মত বদ্‌লে ছিল এবং তাঁরা বিজ্ঞান-চর্চায় উৎসাহ দিতে লাগলেন। ফলে অদৃশ্য কলেজের সদস্যেরা সভ্যজগতের সামনে বের হয়ে আসতে পারলেন। রাজা এবং বিদ্বজ্জনের স্বীকৃতি পেল এই কলেজ এবং পরিবর্তিত হলো জগতের অন্যতম পুরনো বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান—দি রয়েল সোসাইটি অফ ইংল্যাণ্ড-এ।

লণ্ডনের এই রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হওয়া বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদের কাছে অন্যতম উচ্চ সম্মান বলে বিবেচিত হয়। বিজ্ঞানের যে কোনও শাখায় বিশিষ্ট অবদানের স্বীকৃতি তাঁরা পান এই সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়ে।

রয়েল সোসাইটির সুরুতে ইংল্যাণ্ড, তথা বৃটিশ যুক্তরাজ্যের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদেরই কেবল এই সম্মান দেওয়া হতো। এখন অবশ্য বিশ্বের যে কোন বৈজ্ঞানিকই এই সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হতে পারেন।

তবে ফেলো নির্বাচিত হওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। যোগ্যতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে তবেই ফেলো নির্বাচিত করা হয়। তাই এর এত কদর, এত সম্মান। বিজ্ঞান-সাধকের জীবনের অন্যতম কাম্য এর ফেলো নির্বাচিত হওয়া।

বর্তমানে সোসাইটির ফেলোর সংখ্যা সাধারণতঃ ৫৬৮ জনের বেশী হয় না। বছরে ২৫ জনের বেশী নতুন ফেলো নেবার নিয়ম নেই। আবার এক বছরে চারজনের বেশী বিদেশী ফেলো নির্বাচিত করা হয় না।

আজ পর্যন্ত ভারতের যে ক'জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞান-সাধক এই রয়েল সোসাইটির ফেলো (এফ. আর. এস) নির্বাচিত হবার গৌরব অর্জন করেছেন, তাঁরা হলেন—

(১) ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম এই সম্মান অর্জন করেছিলেন ১৮৪১ সালে বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার জাহাঙ্গীর কারসেৎজী। (২) শ্রীনিবাস রামানুজম (১৯১৮), (৩) আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (১৯২০), (৪) আচার্য সি. ভি. রামন (১৯২৪), (৫) মেঘনাদ সাহা (১৯২৭), (৬) বীরবল সাহানী (১৯৩৬), (৭) শ্রী কে. এস. কৃষ্ণান (১৯৪০), (৮) হোমি ভাবা (১৯৪১), (৯) শান্তিস্বরূপ ভাটনগর (১৯৪৩), (১০) এস. চন্দ্রশেখর (১৯৪৫), (১১) প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ (১৯৪৫), (১২) ডি. এন. ওয়াদিয়া (১৯৫৭), (১৩) আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৯৫৮), (১৪) শিশিরকুমার মিত্র (১৯৫৮), (১৫) টি. আর. শেষাদ্রি (১৯৬০), (১৬) পঞ্চানন মহেশ্বরী (১৯৬৫), (১৭) অধ্যাপক সি. আর. রাও (১৯৬৭)।

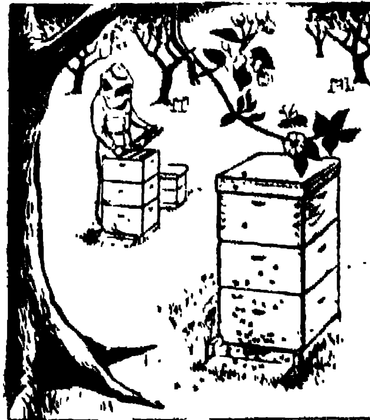
[(১৮) বিশিষ্ট ইংরেজ বৈজ্ঞানিক জে. বি. এস. হলডেন রয়েল সোসাইটির একজন ফেলো ছিলেন। তিনি শেষজীবনে ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন।]

চুণীলাল রায়

জেনে রাখ



ফসল বৃদ্ধির জন্যে পতঙ্গের দ্বারা পরাগ সংযোগের প্রয়োজন এবং তার অধিকাংশই সম্পন্ন হয় মৌমাছির সাহায্যে।



কৃষিক্ষেত্রের কাছাকাছি যদি মৌচাক রাখা যায় তাহলে ফসল উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কারণ মৌমাছির দ্বারা পরাগ সংযোগ হয়।



কোন মৌমাছি যখন ফুলের মধুর সন্ধান পায়—সেই খবর অন্যান্য মৌমাছিদের সে বিশেষ ধরণের নৃত্য করে জানায়।

জানবার কথা

চলচ্চিত্রের কাহিনী

(কথায় ও চিত্রে)

১ (ক)—যে চলচ্চিত্র তোমরা সবাই এখন দেখ—তার সূত্রপাত হয় ১৮৯৬ সালে নিউইয়র্ক সহরে। সেখানকার এক রঙ্গালয়ে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রেক্ষাগৃহ-ভর্তি দর্শক—সবাই এই চলচ্চিত্রে বিচিত্র দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। অবশ্য তখন ছবি খুব স্পষ্ট ছিল না এবং ছবিগুলি কাঁপতো। ছবিতে দেখানো হয়েছিল—মুষ্টিযুদ্ধ এবং নাচ।



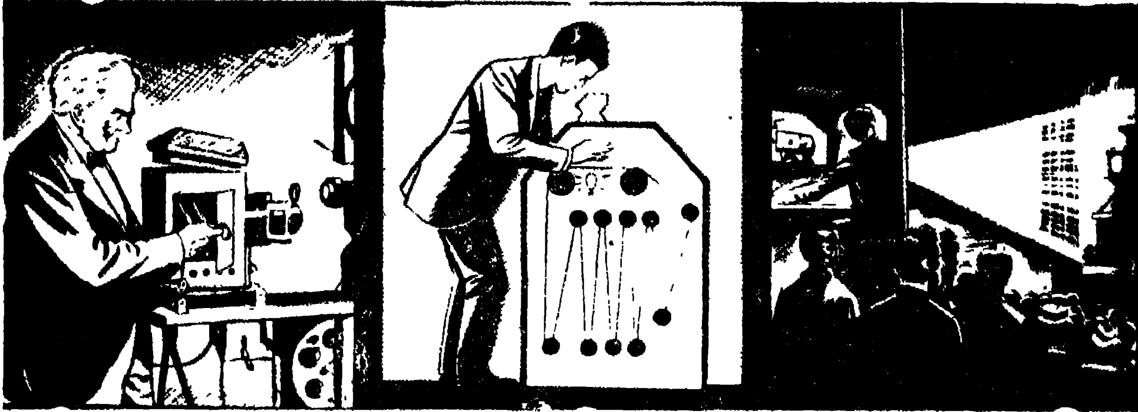
১ (ক) ১ (খ) ১ (গ)

১ (খ)—দৃষ্টিবিভ্রমের ফলে চলচ্চিত্রের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। আমরা চোখে যে সব গতিশীল দৃশ্য দেখি, তা ঠিকভাবে মনে রাখা যায় না। এক সেকেণ্ডের কম সময় দৃশ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব চোখে ধরে রাখা সম্ভব। খুব দ্রুতগতিতে পর পর কয়েকটি ছবি দেখলে একটি ছবির সঙ্গে অন্য ছবির পার্থক্য অর্থাৎ ছবিগুলি যে বিচ্ছিন্ন, তা বোঝা যায় না—মনে অবিচ্ছিন্ন সচল ছবি দেখছি। এই কৌশলের সাহায্যে চলচ্চিত্র দেখানো সম্ভব হয়ে থাকে। পর্দায় প্রতি সেকেণ্ডে প্রোজেক্টরের সাহায্যে ২৪টি স্থির ছবি দেখানো হয়। লেন্সের মধ্য দিয়ে একটা ছবির পর আর একটা ছবি দেখাবার মধ্যবর্তী সামান্য সময়টুকুতে শাটারের সাহায্যে লেন্সের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়, যাতে দর্শক বুঝতে না পারে—পৃথক পৃথক ছবি দেখানো হচ্ছে। এই ভাবে পর পর দ্রুতগতিতে ছবিগুলি দেখানো হতে থাকায় দর্শকের কাছে তা একটা সচল ছবি বলেই প্রতীয়মান হয়।

১ (গ)—১৮৭২ সালে প্রথম চলচ্চিত্রের ফটোগ্রাফ তোলা সম্ভব হয়। ক্যালিফোর্নিয়ার

ষ্ট্যাণ্ডফোর্ড বিশ্ববিত্থালয়ের প্রতিষ্ঠাতা লেল্যাণ্ড পেশাদার ফটোগ্রাফার মাইব্রীজকে একটা ধাবমান অশ্বের ছবি তোলবার জন্তে অনুরোধ করেন। মাইব্রীজ একটি বিশেষ উপায়ে এই কাজটি সমাধা করেন। তিনি ২৪টি ক্যামেরা এক সারিতে সাজিয়ে প্রতিটি ক্যামেরার শাটারের সঙ্গে একটি করে সুতা জুড়ে দেন। ঘোড়াটি প্রত্যেকটি ক্যামেরার লেন্সের সামনে আসামাত্র সুতাটি ছিঁড়ে গিয়ে শাটারটি খুলে সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে যায় এবং প্রতিটি ক্যামেরার প্লেটে ঘোড়ার অবস্থানানুযায়ী ছবির ছাপ পড়ে যায়। এইভাবে পর পর ২৪টি ছবির সাহায্যে তিনি ধাবমান অশ্বের ছবি ফুটিয়ে তোলেন।

২ (ক)—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অনেকেই চলচ্চিত্র উদ্ভাবনের চেষ্টা করতে থাকেন। বৈদ্যুতিক বাতি, ফনোগ্রাফ প্রভৃতি হাজার জিনিষের উদ্ভাবক টমাস আলভা এডিসনও এই ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি দুটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন—(১) চলচ্চিত্র গ্রহণের জন্যে কিনেটোগ্রাফ এবং (২) চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্যে কিনেটোস্কোপ। নিউইয়র্কের অন্তর্গত রোচেষ্টারের জর্জ ইস্টম্যান তখন এক নতুন ধরণের সেলুলয়েড ফিল্ম তৈরি করেছিলেন। এই ফিল্মই এডিসন তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করেন।



২ (ক) ২ (খ) ২ (গ)

২ (খ)—এডিসনের কিনেটোস্কোপ যন্ত্রে একটা কাঠিমে ফিল্মগুলি গুটানো থাকতো। যন্ত্রটির আকৃতি ছিল একটা বাক্সের মত। চলচ্চিত্র দেখবার জন্যে দর্শককে বাক্সের মধ্যে একটা বিশেষ ছিদ্রের মধ্যে দর্শনী ফেলতে হতো। দর্শনী ফেললেই বাক্সের মধ্যে আলো জ্বলে উঠতো। বাক্সের সঙ্গে সংলগ্ন একটা হাতল ঘোরালেই একটার পর একটা ছবি লেন্সের সামনে আসতো। বাক্সের উপরের একটা ছিদ্রের মধ্য দিয়ে দর্শককে দেখতে হতো এবং তার সম্মুখে একটা সচল ছবি উপস্থিত হতো। অবশ্য এই সচল ছবির স্থায়িত্ব ছিল প্রায় এক মিনিট। তখন নাচ ও মূকাভিনয় প্রভৃতি চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত হতো।

২ (গ)—কিনেটোস্কোপ অচিরেই বহু স্থানে চালু হয়ে গেল। সচল ছবি দেখবার জন্যে দর্শকের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়তে থাকে। অনেকেই এই ব্যাপারে মাথা ঘামাতে

থাকেন—কেমন করে এর আরও উন্নতি সাধন করা যায়। টমাস আরমাট পর্দায় চলচ্চিত্র দেখাবার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এডিসনকে তিনি অনুরোধ করেন, তাঁর তৈরি ছবি পর্দায় দেখাবার জন্যে। কিন্তু এডিসনের আশঙ্কা হয় যে, হয়তো এর ফলে তার ছবির দর্শকের সংখ্যা কমে যাবে।

৩ (ক) আরমাটের উদ্ভাবিত প্রোজেক্টর—ভিটাস্কোপের সাহায্যে প্রথম থিয়েটারের ধরণে মূকাভিনয় চলচ্চিত্রে দেখানো হয়। এইভাবে চলচ্চিত্র-শিল্পের পত্তন হয়। এই সব মূকাভিনয়ের প্রতি দর্শকদের আকর্ষণও বাড়তে থাকে। পর্দায় ছবিগুলি যখন বৃহদাকারে দেখা যেত, দর্শকরা তখন খুব উত্তেজিত হয়ে উঠতো।



৩ (ক)		৩ (খ)		৩ (গ)

৩ (খ) ১৯০০ সাল নাগাদ কাহিনীশূন্য খাপছাড়া চলচ্চিত্র আর দর্শকদের ভাল লাগছিল না। তারা আরো নতুন ধরণের কিছু দেখতে চাইতে লাগলো। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে চেষ্টা শুরু হয়ে গেল। ১৯০৩ সালে এডিসন কোম্পানীর এক ক্যামেরাম্যান এডউইন পোর্টার 'দি গ্রেট ট্রেন রবারি'র একটি চলচ্চিত্র প্রস্তুত করেন। এটিই প্রথম সত্যকার কাহিনী সম্বলিত চলচ্চিত্র।

৩ (গ) 'দি গ্রেট ট্রেন রবারি' ছবিতে প্রথম যে কৌশলে ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তোলা হয়, তা আজও প্রচলিত। ক্যামেরার কাছ থেকে এবং দূর থেকে ছবি তোলা হয়েছিল। এই চলচ্চিত্রটি অচিরেই খুব খ্যাতি লাভ করে।

৪ (ক) চলচ্চিত্র দর্শকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। পোর্টারের ছবি তোলবার নতুন কৌশল চলচ্চিত্রের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করে। প্রযোজকেরা ভাল গল্পের জন্যে উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। অনেক প্রেক্ষাগৃহ স্থাপিত হয়। দর্শকেরা চলচ্চিত্র দর্শনে তখন আধঘণ্টা সময় কাটাতে পারতেন।

৪ (খ) নিউইয়র্ক সহর এবং নিউ জার্সির কাছাকাছি স্থানে সে আমলের

অধিকাংশ চলচ্চিত্র নির্মিত হতে থাকে। ১৯০৭ সালে 'দি কাউন্ট অব মন্টিক্রিষ্টো' নামক চলচ্চিত্রের বহির্দৃশ্য ক্যালিফোর্নিয়ায় গ্রহণ করা হয়। ক্যালিফোর্নিয়ায় বৃষ্টিপাত খুব কম হয় এবং রোদও বেশ পাওয়া যায়। এই সুবিধার জন্যে চলচ্চিত্র প্রস্তুতকারক কোম্পানীগুলি ক্যালিফোর্নিয়ার হলিউডে ব্যবসায় পত্তন করেন। ১৯১০ ও ১৯২০ সালের মধ্যে হলিউড পৃথিবীর চলচ্চিত্র শিল্পের রাজধানীরূপে পরিগণিত হয়।



৪ (ক) ৪ (খ) ৪ (গ)

৪ (গ) ১৯১৫ সালে ডি. ডাব্লিউ. গ্রিফিথ পরিচালিত 'দি বার্থ অব এ নেশন' ছবিটি চলচ্চিত্রে আধুনিকতার সূত্রপাত করে। চলচ্চিত্রের এই কাহিনীতে অভিনয়, ঘটনাপ্রবাহ প্রভৃতির অনেক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এই কাহিনীতে যুদ্ধের দৃশ্য দেখাবার জন্যে গ্রিফিথ প্যানোরেমিক ফটোগ্রাফীর ব্যবহার করেন।

৫ (ক) সেকালের চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে একালের ব্যয়বহুল চলচ্চিত্র নির্মাণের সাদৃশ্য খুব কম দেখা যায়। সেকালে অভিনয় বিরতির সময় অভিনেতারা অভিনয়ের দৃশ্যাদি



৫ (ক) ৫ (খ) ৫ (গ)

তৈরি করতেন। পরিচালকেরা গল্প তৈরি করতেন। প্রতিটি দৃশ্যের (ছবির) নীচে অল্প কথায় কাহিনীর পরিচিতি লেখা থাকতো।

৫ (খ) অনেকেই মনে করতেন, নির্বাক যুগের ছবির কাহিনী ও অভিনয়ের গৌরব পরবর্তী কালেও ম্লান হয় নি।

৫ (গ) নির্বাক ছবি 'দি বার্থ অব এ নেশন' এবং ১৯২৭ সালে উদ্ভাবিত সবাক চলচ্চিত্রের মধ্যবর্তী কালের চলচ্চিত্র প্রস্তুতিতে সামান্য শিল্পগত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। সত্যকারের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র হচ্ছে 'দি জাজ সিঙ্গার'। সবাক চলচ্চিত্র একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার এবং এর ফলে চলচ্চিত্রের আরও দ্রুত উন্নতি সাধিত হতে থাকে।

৬ (ক) রঙীন চলচ্চিত্র দর্শকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। চলচ্চিত্র প্রধানতঃ অবসর বিনোদনের জন্যে হলেও কোনও কোনও দেশে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে নানা প্রকার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।



৬ (ক)　　　　৬ (খ)　　　　৬ (গ)

৬ (খ) চলচ্চিত্রের প্রাথমিক অবস্থায় যে যুদ্ধ ইত্যাদির দৃশ্য দেখানো হতো, তা অতি সাধারণ হলেও আজও চলচ্চিত্র অনুরাগীদের আনন্দ দান করে থাকে।

৬ (গ) পৃথিবীর সব দেশে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। এক দেশের তৈরি ছবি অন্য দেশেও প্রদর্শিত হচ্ছে। চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্যে হলিউড বিশ্বখ্যাতি অর্জন করলেও —প্রকৃতপক্ষে জাপানই এখন অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশী চলচ্চিত্র তৈরি করছে। এডিসন তাঁর উদ্ভাবিত যে চলচ্চিত্রকে খেলনা হিসাবে মনে করেছিলেন, আজ তা পৃথিবীর অগণিত দর্শকের কাছে একটা উচ্চ পর্যায়ের শিল্প হিসাবে পরিগণিত।

ম. জ.

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। রাস্তাঘাটে সচরাচর যে মাটি দেখা যায়, তার উপাদান কি? মাটি রাসায়নিক যৌগ বা সাধারণ মিশ্র পদার্থ? মাটি থেকে অ্যালুমিনিয়াম বের করবার কোন পদ্ধতি আছে কি?

অশোককুমার দাস
পুরুলিয়া
শ্যামলী বসাক
কলিকাতা-৬

প্রশ্ন ২। নাইলন, টেরিলিন প্রভৃতির কাপড় যত তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়, সুতার তৈরি কাপড় তত তাড়াতাড়ি কেন শুকায় না? উলের পক্ষে সময়টা আরও কেন বেশী লাগে?

সুজাতা মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-২৯

প্রশ্ন ৩। সাবান কি ও কিভাবে সাবানের দ্বারা ময়লা পরিষ্কার হয়?

বিজনকুমার রায়চৌধুরী
কলিকাতা-৫৮

উঃ ১। মাটি হচ্ছে সাধারণ মিশ্র পদার্থ। রাস্তাঘাটে সচরাচর যে মাটি দেখতে পাওয়া যায়, তার মধ্যে বালি, লোহা, ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি ফস্‌ফেট বা সালফেট অবস্থায় মিশ্রিত রয়েছে। এই সমস্ত ধাতব পদার্থ ছাড়াও মাটির মধ্যে রয়েছে কিছু জৈব পদার্থ। এই সমস্ত জৈব পদার্থ মাটিতে স্থায়ীভাবে জল ধরে রাখবার কাজে ও গাছকে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের কাজে প্রধান ভূমিকা নেয়।

সাধারণতঃ বক্সাইট থেকে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করা হয়। কিন্তু বক্সাইট ছাড়া মাটি থেকেও অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করা যেতে পারে। অ্যাসিড পদ্ধতিতে কি ভাবে মাটি থেকে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করা হয়, সেটা এখানে আলোচনা করছি।

এই পদ্ধতিতে প্রথমে মাটি পুড়িয়ে সেই পোড়া মাটিকে সালফিউরিক ও সালফিউরাস অ্যাসিডের মিশ্রণে ধুয়ে নেওয়া হয়, যার ফলে অ্যালুমিনিয়াম বেসিক অ্যালুমিনিয়াম সালফেট হিসাবে অধঃক্ষিপ্ত হয়। এই অধঃক্ষেপকে অতঃপর কষ্টিক সোডা দ্রবণে দ্রবীভূত করা হয়, যার ফলে সোডিয়াম অ্যালুমিনেট তৈরি হয় এবং একটা দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এই দ্রবণে নির্দিষ্ট পরিমাণ সালফিউরিক অ্যাসিড

যোগ করলে অ্যালুমিনা ও সোডিয়াম সালফেট পাওয়া যায়। এই অ্যালুমিনা বা অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডকে ক্রায়োলাইট নামক পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে উত্তপ্ত ও গলিত অবস্থায় তড়িৎ-প্রবাহের দ্বারা বিশ্লিষ্ট করলে অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায়।

উঃ ২। সূতী কাপড় জল শোষণ করে নেয়। কিন্তু নাইলন, টেরিলিন জাতীয় কাপড় জল শোষণ করে না—কাজেই এক টুক্‌রা সূতী কাপড় সমান আর এক টুক্‌রা নাইলন জাতীয় কাপড়ের তুলনায় বেশী জল শোষণ করে। তাই সূতী কাপড়ের বেলায় ঐ জল বাষ্পীভূত হতে যে সময় লাগে—নাইলনের বেলায় অপেক্ষাকৃত কম সময় লাগবে। এই কারণে নাইলন ইত্যাদির তৈরি কাপড় খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। উলের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ব্যাপার। উলের তন্তুগুলি সূতার চেয়েও বেশী পরিমাণ জল ধরে রাখতে পারে, তাই উলের বেলায় সময়টাও লাগে অনেক বেশী।

উঃ ৩। সাবান হলো চর্বি ও ক্ষারের রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে প্রস্তুত এক প্রকার মিশ্র পদার্থ। সোডিয়াম, পটাসিয়াম ইত্যাদি পদার্থের সঙ্গে চর্বির অ্যাসিড বা ফ্যাটি অ্যাসিডের ক্রিয়ায় যে সব ধাতব লবণ তৈরি হয়, তাদের বলা হয় সাবান। ক্ষারজাতীয় পদার্থ জিনিষ পরিষ্কার করে। কি রকম কাজে ব্যবহৃত হবে—তার উপর ভিত্তি করে চর্বি ও ক্ষার নিরূপণ করা হয়। শুধুমাত্র ক্ষারের সাহায্যেও পরিষ্কার করবার কাজ চলে, কিন্তু ক্ষার মুক্ত অবস্থায় ত্বকের ক্ষতি সাধন করে বলে ক্ষারে বিভিন্ন প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ, যেমন—উদ্ভিজ্জ তেল অথবা জান্তব চর্বি ব্যবহার করা হয়। সাবানের সঙ্গে কার্বলিক অ্যাসিড, স্যালিসিলিক অ্যাসিড, কর্পূর, গন্ধক ইত্যাদি মিশিয়ে একে ত্বকের পক্ষে উপকারী করে তোলা হয়। কোমল সাবান তৈরি করবার সময় সোডার জায়গায় পটাশকে কাজে লাগানো হয়। স্বচ্ছ সাবান তৈরি করবার জন্যে গ্লিসারিনের ব্যবহার করতে হয়।

ঘামের সঙ্গে আমাদের শরীরের লোমকূপ দিয়ে কিছু তৈলাক্ত পদার্থ বের হয়। এই তৈলাক্ত পদার্থ ও সাবানের ভিতরের তেল মিশ্রিত হয়ে সাবানজলের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। আবার ধূলাবালির কণা সাবানজলের সঙ্গে আটকে পড়ে, যার জন্যে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলবার পর এই সব ময়লা সাবানজলের সঙ্গে বেরিয়ে আসে ও পোষাক বা শরীরকে পরিষ্কার করে তোলে।

শ্যামসুন্দর দে

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
স্বস্তিক
৫০।১, হিন্দুস্থান পার্ক
কলিকাত-২৯

২। বলাইচাঁদ কুণ্ডু
বসুবিজ্ঞান মন্দির
৯৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

৩। রমেশ দাশ
গভর্ণমেন্ট কলেজ অব এড়ুকেশন
পোঃ+জেলা বর্ধমান

৪। রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
৩৫, পণ্ডিতিয়া রোড
কলিকাতা-২৯

৫। শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়
সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স
বিজ্ঞান কলেজ
কলিকাতা-৯

৬। জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী
১০।১।১, গৌরীবাড়ী লেন
কলিকাতা-৪

৭। সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
"শুভ-শ্রী"
৬০, পূর্বপল্লী
শান্তিনিকেতন
পশ্চিম বাঙলা

৮। মৃণালকুমার দাশগুপ্ত
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স
বিজ্ঞান কলেজ
কলিকাতা-৯

৯। সূর্যেন্দুবিকাশ কর
সাহা ইনষ্টিটিইট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স।
বিজ্ঞান কলেজ
কলিকাতা-৯

১০। শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ
৭৭।১, ইন্দ্রবিশ্বাস রোড
(ফ্লাট নং-২)
কলিকাতা-৩৭

১১। প্রবোধকুমার ভৌমিক
১২৭, লেক টাউন, পাতিপুকুর
কলিকাতা-৫৫

১২। হীরেন্দ্রকুমার পাল
এ-৯১, এইচ. বি. টাউন
পোঃ সোদপুর
২৪ পরগণা

১৩। শঙ্কর চক্রবর্তী
৬৪ বি, প্রতাপাদিত্য রোড
কলিকাতা-২৬

১৪। জয়ন্ত বসু
সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স
বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-৯

১৫। বিমান বসু
7. U. F College Road
New Delhi-1

১৬। হিল্লোল রায়
অবধায়ক/ডাঃ বি. নিয়োগী
পোঃ হিজলপুকুরিয়া, ২৪ পরগণা

১৭। চুণীলাল রায়
অবধায়ক/শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়
পি-৩৩৯, গাঙ্গুলী বাগান, নাকতলা।
কলিকাতা-৪৭

১৮। মহুয়া বিশ্বাস
১৫।বি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

১৯। শ্রীশ্যামসুন্দর দে
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স
বিজ্ঞান কলেজ
কলিকাতা-৯

২০। মন্মথ হালদার
২২।১।১, সুধীর চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাবিংশ বর্ষ | ডিসেম্বর, ১৯৬৯ | দ্বাদশ সংখ্যা

এল-এস-ডিঃ জৈব রসায়ন ও মনোবিজ্ঞানে একটি বিতর্কিত নাম

জগৎজীবন ঘোষ ও অমলকুমার মৈত্র

এল-এস-ডি—ইদানীং কালের মধ্যে এত সম্মোহন শক্তির অধিকারী কোন নাম মনে পড়ে না। পেনিসিলিনের অত্যাশ্চর্য সঞ্জীবনী শক্তি চল্লিশের দশকে বিস্ময় জাগিয়েছিল, আর এই ষাটের দশকে এল-এস-ডি। আর্তের সেবায় না হলেও সমস্যা-জর্জরিত মানুষের কাছে এল-এস-ডি সব-পেয়েছির দেশের চাবিকাঠি।

এল-এস-ডি—লাইসারজিক অ্যাসিড ডাই-ইথাইলামিড। সুইজারল্যাণ্ডে হফ্‌ম্যানের (Hoffman) গবেষণাগারে এর জন্ম ১৯৩৮ সালে। এর আশ্চর্য অমূলপ্রত্যক্ষ (Hallucination) ঘটাবার ক্ষমতার প্রথম আবিষ্কারও হয় হফ্‌ম্যানের গবেষণাগারেই ১৯৪৩ সালে। গবেষণারত অবস্থাতেই একদিন হফ্‌ম্যান মানসিকতার দ্রুত ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বলি হন। তাঁর সহ-কর্মীরা অবাক হয়ে দেখেন হফ্‌ম্যান কেমন যেন অস্বাভাবিক আচরণ সুরু করেছেন। বহু বিচিত্র অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সেদিন হফ্‌ম্যানকে আচ্ছন্ন করেছিল। বন্ধুরা তাঁকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন কিছু পরে। সেখানেও অনুভূতির প্রকটতার ছেদ নেই। তাঁর স্ত্রী দুঃশ্চিত, বিস্মিত, হতবাক হয়ে পড়েন এই বৈজ্ঞানিকের আচরণে। একটা হাত তাঁর কাছে মনে হচ্ছে কয়েক মাইল লম্বা অপর হাত স্বাভাবিক। তিনি

যেন অনেক অনেক দূর থেকে কথা বলছেন। অস্বাভাবিক ভাবে হাসছেন। শব্দগুলি দৃশ্য হয়ে ফুটে উঠছে—আরও কত কি। হফ্‌ম্যান শুয়ে পড়লেন বিছানায়। কিন্তু কারণ কি—সবারই অজানা; এমনকি বৈজ্ঞানিক হফ্‌ম্যানেরও। পরদিন হফ্‌ম্যান খুবই চিন্তিত। গবেষণাগারে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা চালালেন এই আশ্চর্য ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে। তাঁর মনে হলো এই যে, এল-এস-ডি নিয়ে তিনি গবেষণা চালাচ্ছেন, তারই কি কিছু কণিকা তাঁর মুখে কোন রকমে গেছে! তিনি কয়েক মাইক্রোগ্রাম (10^{-6}gm) তাঁর জিভে রাখলেন। আশ্চর্য! আবার সেই অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাঝে তিনি তলিয়ে গেলেন। এল-এস-ডি-র আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয়ে বৈজ্ঞানিক জগৎ মুগ্ধ হলো।

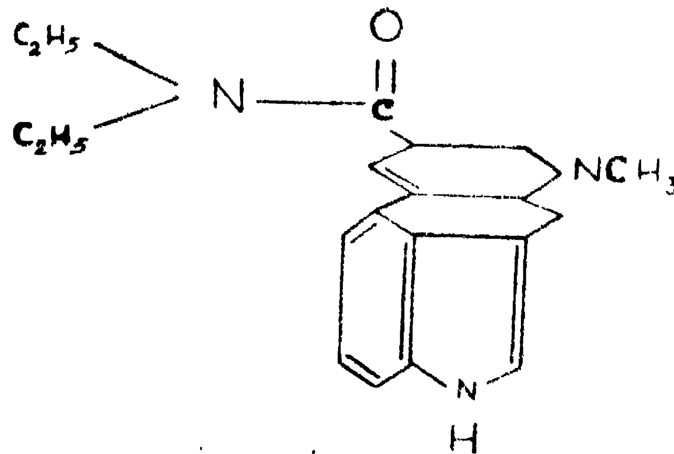
আমাদের মনে এল-এস-ডি-ই যে প্রথম তুরীয় ভাবের সঞ্চার করে, তা নয়। ভারতীয় গাছ-গাছড়ার মধ্যেও এই গুণগুলির পরিচয় বহু যুগ ধরে। মানসিক পরিবর্তন ঘটাতে গাঁজা, ভাঙ ইত্যাদির পারঙ্গমতা সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই আমাদের মধ্যে। এদের বহুল ব্যবহার আমরা সবাই জানি। সব দেশেই এই রকম গাছ-গাছড়ার সন্ধান মেলে। আমেরিকায়ও প্রাক্-কলম্বীয় (Pre-columbian) সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে এই জাতীয় গাছ-গাছড়ার ব্যবহার ছিল। অ্যাজটেক (Aztecs) ও মেক্সিকান ইণ্ডিয়ানরা (Mexican Indians) অতীন্দ্রিয় অনুভূতি লাভে ব্যবহার করতো পিয়ট্‌ল্ ক্যাক্টাস (Peyotl cactus) ও সাইলোসাইব ছত্রাক (Psilocybe mushroom) এবং মর্নিং গ্লোরী জাতীয় এক ধরণের লতাগুল্ম। জৈব রসায়নবিদ্‌রা এই তথাকথিত অ্যাজটেকত্রয়ী (Aztec triad) থেকেই নিষ্কাশন (Isolation) করেন মেসক্যালিন (Mescaline), সাইলোসাইবিন (Psilocybin) এবং লাইসারজিক অ্যাসিড অ্যামাইড। এল-এস-ডি কিন্তু সোজাসুজি প্রাকৃতিক উৎস থেকে পাওয়া যায় না। লাইসারজিক অ্যাসিড থেকে এক বিশেষ সংশ্লেষণ এই এল-এস-ডি। আর লাইসারজিক অ্যাসিড আমরা পাই রাই (Rye) জাতীয় উদ্ভিদের মাথায় আরগট নামক এক ধরণের পরভোজী ছত্রাক থেকে।

এল-এস-ডি বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন তরল পদার্থ, অতিমাত্রায় শক্তিশালী। এক আইড্রপার ভর্তি এল-এস-ডি ৫০০০ মাত্রা ওষুধ ধরে। কারণ ওষুধের ফল পেতে হলে এক আউন্সের তিন-শ' হাজার ভাগের এক ভাগই যথেষ্ট। একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের উপযুক্ত একমাত্রা এল-এস-ডি-র দাম ৫ ডলার। এল-এস-ডি-র রাসায়নিক গঠন ১নং চিত্রের মত।

এল-এস-ডি প্রয়োগে প্রথম ৪½ ঘণ্টা পরিষ্কার আত্মপর্যবেক্ষণ ঘটে, দেহগত সংবেদন, অনুভূতি ও প্রতীতির দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। এর পর চার পাঁচ ঘণ্টা পরিবর্তনানুভূতি কমে গেলেও বেড়ে ওঠে আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্কিজোফ্রেনিয়া-তুল্য মনের ভাব। পরবর্তী ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টা কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বলতা ও মানসিক অবসাদ দেখা যায়।

উগ্র অবস্থার স্বাভাবিক স্থিতিকাল ৮ থেকে ১২ ঘণ্টা। চরম ফল লাভ করতে হলে মানুষের ক্ষেত্রে দিনে ৪।৫ মাত্রার প্রয়োজন। প্রায় চার দিন এক নাগাড়ে এল-এস-ডি প্রয়োগে সহ্যসীমা অতিক্রান্ত হয়। বেশী মাত্রায় ওষুধ প্রয়োগে সহ্যশক্তির চক্রক্রম পরিবর্তন ঘটে। দিন আটেক পরে সহ্যশক্তি চলে যায় আবার পরবর্তী সময়ে ফিরে আসতে দেখা যায়। ওষুধের মাত্রা ২০০ থেকে ১০০০ মাইক্রোগ্রামের মধ্যে ক্রমবর্ধমান হলে ইচ্ছাশক্তি এবং খুঁটিয়ে চিন্তা করবার ও বিভিন্ন উদ্দীপক থেকে প্রয়োজনীয়কে বেছে নেবার ক্ষমতা ক্রমবর্ধমানভাবে হ্রাস পায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ওষুধের মাত্রা ৫০ মাইক্রোগ্রাম থেকে ১৫০০ মাইক্রোগ্রাম পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব হলেও এল-এস-ডি-র কার্যকারিতা নির্ভরশীল মাত্রাটি স্থির করা হয়েছে ব্যক্তিবিশেষের উপর কতটা কার্যকরী, তার উপর দৃষ্টি রেখে। শুধু তাই নয়, নির্দিষ্ট মাত্রার প্রয়োগ সব সময়ই অসুবিধার সৃষ্টি করে। কারণ মাত্রা নির্দিষ্ট থাকা সত্ত্বেও, প্রাথমিক সংবেদন যতই একরকম হোক না কেন, পরবর্তীকালীন অভিজ্ঞতা



১নং চিত্র

ভিন্নতর ও বহুমুখীন হতে পারে। অবশ্য একথা সত্য যে, এল-এস-ডি-জাত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি রোগীর মনে মোটামুটি এক ধরণের সাড়া জাগাতে সক্ষম।

এল-এস-ডি-র কার্যক্ষমতার গোপন রহস্য আজও অনুদ্‌ঘাটিত। তবুও যেটুকু জানা গেছে তাতে মনে হয়, এর মূল প্রভাব মস্তিষ্কের সেই ভাগগুলিতে, যেখানে বহির্বিশ্বের উদ্দীপক-উদ্ভূত সংবেদন অনুভূতিগুলি জমা হয় ও পুনর্বিন্যাস ঘটে। সেদিক থেকে মস্তিষ্কের পুরোভাগ, মধ্যভাগ, হাইপোথ্যালেমাস ও হাইপোক্যাম্পাস এই সব অংশভুক্ত। সংবেদনগুলিকে একত্রিত করে প্রবাহিত করতে প্রধান ভূমিকা নেয় সেরোটোনিন (Serotonin)। এল-এস-ডি প্রয়োগে সেরোটোনিন তৈরি ও সংরক্ষণ প্রভৃত বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে সেরোটোনিন তৈরিতে বাধা দেয় এই রকম অন্য অনেক রাসায়নিক সংশ্লেষ আছে, যার প্রয়োগে এল-এস-ডি-জাত অভিজ্ঞতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

এল-এস-ডি-র অন্যান্য সম্ভাবনার মধ্যে সবচেয়ে বিতর্কমূলক তার মানসিক রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতা, মনোরোগ চিকিৎসায় এল-এস-ডি-র প্রয়োগের কার্যকারিতা সম্বন্ধে প্রথম বিস্তারিত আলোচনা প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে। বিভিন্ন গবেষণালব্ধ জ্ঞান একত্রিত করলে দেখা যায়, এল-এস ডি-র মানসিক রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতা নীচের তিন ধরণের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল :

(১) অবচেতন-উদ্ধার (Abreactive)—অবচেতনে তলিয়ে থাকা স্মৃতি, অনুভূতি, ইচ্ছা ও উপলব্ধির চেতন মনে ফিরিয়ে আনা।

(২) অতীন্দ্রিয় ভাবের সঞ্চার (Transcendental)—বোধাতীত জগতে সঞ্চরণ। বিশেষ ভাবে, এই ভাবধারায় অলৌকিক শক্তির কাছে আত্মনিবেদনের মাধ্যমে অনেকেই মদ্যপানাসক্তি থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব বলে মনে করেন।

(৩) মনোবিকাশ (Psychedelic)—স্বাভাবিক মানসিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে রোগীকে এক বিশেষ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী করে তোলে, যা আগে তার পক্ষে কখনই সম্ভবপর ছিল না।

লেরী (Leary) ও অ্যালপার্ট (Alpert) এল-এস-ডি-র অত্যাশ্চর্য মনোবিকাশের গুণে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। তাঁদের মতে, (অবশ্যই যথেষ্ট পরীক্ষা-নির্ভর) স্কিজোফ্রেনিয়াজাত বিচ্ছিন্নতা, অমূলপ্রত্যক্ষ এবং বাস্তব জ্ঞানবর্জিত অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সম্ভব এল-এস-ডি-র ব্যবহারে। এছাড়াও সাসকাচিউয়ান (Saskachewan) ও লণ্ডনে (London, Canada) অনেক মনোবিজ্ঞানী বিস্তৃত গবেষণা করেছেন মদ্যপানাসক্তি নিবৃত্তি করবার উপায় নিয়ে। এল-এস-ডি প্রয়োগে খুবই আশাপ্রদ ফল পাওয়া গেছে। অবশ্যই সাসকাচিউয়ান গোষ্ঠীর দাবীর মধ্যে যথেষ্ট অতিশয়োক্তি আছে, গবেষণাও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় হয় নি। লণ্ডন গোষ্ঠী অবশ্যই প্রাথমিকভাবে নিয়ন্ত্রিত গবেষণার বিশেষ ব্যবস্থা করেই কাজ সুরু করেছেন। তাঁদের বিস্তারিত গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত যথেষ্ট আশাপ্রদ হলেও এল-এস-ডি-র সর্বজয়ী ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় মেলে নি। শুধু তাই নয়, এল-এস-ডি ব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিবর্তন আনে বলে খুব বেশী প্রমাণ বিজ্ঞানীদের হাতে নেই। সাময়িক পরিবর্তন নিশ্চয়ই আনে, কিন্তু তার বিস্তার ও স্থায়িত্ব এখনও পরীক্ষা ও প্রমাণের অপেক্ষা রাখে।

তবুও এল-এস-ডি আবিষ্কার জৈব রসায়ন ও মনোবিজ্ঞানে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এল-এস-ডি প্রয়োগ স্কিজোফ্রেনিয়ার তুল্য বাতুলতা আনে—এই আবিষ্কারই বৈজ্ঞানিক মহলে এল-এস-ডি-র স্থান করে দিয়েছে। এই প্রথম বৈজ্ঞানিকেরা রসায়নের মাধ্যমে বাতুলতাজনিত মনের অবস্থা সৃষ্টি করতে পারেন। সেই জন্যে এল-এস-ডি-কে মনের অবস্থা অনুকরণকারী ওষুধ (Psychotomimetic drug) বলে। এখন বৈজ্ঞানিকেরা একটু আশার আলো দেখতে পেয়েছেন মানসিক রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে।

আমাদের দেশে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীই কঠোর সাধনা দ্বারা অতীন্দ্রিয় অনুভূতিলোকে নিজেদের উত্তরণ ঘটান। অনেক ক্ষেত্রেই সমস্ত জীবন ধরে সাধনার ফল হিসেবে আমরা এই ধরণের অভূতপূর্ব পরিবর্তনের সাক্ষাৎ পাই কোন কোন সাধকের জীবনে। কিন্তু সাধনার ও কৃচ্ছ্রসাধনের বিন্দুমাত্র ত্রুটি হলে সিদ্ধিলাভ মরীচিকার মত দ্রুত অপসৃত হতে বাধ্য। কারণ সাধনার পথ দুর্গম—"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ যে দ্রুততার উপর নির্ভর করেছে, যে ধৈর্য হীনতা তাকে পেয়ে বসেছে তাতে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি লাভের আকুতিও সহজ পন্থার গ্রহণযোগ্য সমাধানের পথ খোঁজে, যেখানে সময় ও সাধ্য ন্যূনতম পরিমাণ ব্যয়িত এবং ফল নিশ্চিত। আর কি আশ্চর্য! রসায়নের কল্যাণে ধর্মমূলক অতীন্দ্রিয় ভাবলোক কি সহজলভ্য! ডি-এম-টি নামে এক রাসায়নিক সংশ্লেষ আপনাকে এক নিশ্চিত ৩০ মিনিট মনোবিকাশের অভিজ্ঞতায় বুঁদ হয়ে থাকতে সাহায্য করে। তবুও অসুবিধা, যতক্ষণ পর্যন্ত ওষুধ দেহে আছে মাত্র ততক্ষণই এর প্রভাব থাকে। কিন্তু এল-এস-ডি-র প্রভাব যেমন গভীর তেমনি তার বিস্তারও কম নয়। শুধু তাই নয়, এর প্রভাবকালের স্থায়িত্বও অনেক বেশী। বহিরাগত রাসায়নিক পদার্থ দেহের বাইরে চলে গেলেও এর প্রভাব বহুক্ষণ স্থায়ী হয়। অনেক সময় অনুভূতির প্রকটতা ও বৈচিত্র্য মনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনে—মদ্যপ মদ খাওয়া ভুলে যায় পরবর্তী জীবনে; নবজীবন দর্শনে বহু লোক তার অতীতের ক্ষতিকারজনক অভ্যাস ত্যাগ করে।

তবুও বলতে হয় এল-এস-ডি-র সাফল্য নির্ভরশীল ব্যক্তিবিশেষের উপর। যদি খোলা মন নিয়ে আশু পরিবর্তনকে গ্রহণ করা যায়, যদি বেরিয়ে আসা মনের ভাব ও হঠাৎ-পাওয়া অন্তর্দৃষ্টি ব্যক্তিবিশেষের সমস্যা সমাধান করতে পারে, জীবনকে নতুন খাতে বইয়ে দিতে পারে, তবে সোনা ফলে। প্রসঙ্গতঃ যদিও এল-এস-ডি-র প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী। তবুও গ্রহণকারীর সময়-হীনতাজনিত মানসিক বোধ প্রভাবের স্থিতি-কালকে বোধ হয় কিছুটা অবাস্তর করে তোলে। আর একটা কথা, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দৈনন্দিন সমস্যাপীড়িত লোকেরা, যারা কম অধ্যবসায়ী এবং ততোধিক কম জীবনকে গ্রহণ করবার ক্ষমতা রাখে, তারাই পলায়নী মনোবৃত্তি নিয়ে এল-এস-ডি-র শরণাপন্ন হয়। ফলে এল-এস-ডি-র অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে যেটুকু প্রস্তুতির দরকার, তা না থাকায় হিতে বিপরীত ফলও অস্বাভাবিক নয়।

ধর্মমূলক অভিজ্ঞতার প্রচুর দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে রয়েছে এখানে-ওখানে। সব দেশে সব কালেই কিছু কিছু ঐ ধরণের অভিজ্ঞ লোকের সন্ধান পাওয়া যায়। সাধনালব্ধ ঐ ধরণের অনুভূতি দেহের রাসায়নিক একটা বিশেষ পরিবর্তিত স্থিতাবস্থা বা আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক অস্থৈর্যও এনে দিতে পারে। অনেক দেশেই ধর্মসম্বন্ধীয় আচার-অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ভেষজ অথবা উত্তেজক ব্যবহারের নজীর আছে। আমেরিকায় তো নেটিভ ইণ্ডিয়ান চার্চ (যা আড়াই লক্ষ আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের জন্যে) আইনসঙ্গত ভাবেই পেয়ট (Peyote) ব্যবহার করেন। আমাদের দেশেও শক্তিসাধকেরা তন্ত্র-সাধনায় কারণ হিসেবে মদ্যপান করেন। সেদিক থেকে রসায়ন-বাহিত ধর্মমূলক অভিজ্ঞতা লাভও সম্ভব। দেহে রাসায়নিক স্থিতাবস্থার বিশেষ পরিবর্তন এনে, বহুক্ষণ ধ্যানমগ্ন থেকে, বিশেষরূপে দেহের পৌনঃপুনিক সঞ্চালনে অথবা অনেকক্ষণ অনিদ্রিত অবস্থায় থাকায় ধর্মমূলক অনুভূতি লাভ ঘটতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, মনের কোন্ অবস্থাকে এই ধরণের ধর্মমূলক অভিজ্ঞতা বলা যায়, উইলিয়াম জেমস্ (Wlliam James) মনের যে আদান-প্রদানকে "The religious experience" বলে অভিহিত করেন ? এই অবস্থায় মন আর বিন্দুমাত্র আত্মকেন্দ্রিক থাকে না; সময় ও দূরত্ব বোধ চলে যায়। অবশ্যই এই ধরণের অবস্থা বাতুলতাজনিত মনের অবস্থায় উদ্ভূত নয়, অন্তর্দৃষ্টিজাত! এ যেন অহম (Ego) বিবর্জিত হয়ে অশেষ আনন্দলোকে আশীর্বাদপূত যাত্রা। কিন্তু তবুও মনে রাখা দরকার, এল-এস-ডি-সঞ্চালিত সস্তা ধর্মমূলক অভিজ্ঞতা চরমা-কাঙ্ক্ষিত বলে সাধারণের মনে একটা ভ্রান্ত প্রতীতি আনে, যদিও আমরা জানি এল-এস-ডি-বাহিত ধর্মমূলক অভিজ্ঞতা ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভরশীল নয়; পরন্তু লোকে এল-এস-ডি-নির্ভর হয়ে পড়ে, যা কখনই সাধনালব্ধ অনুভূতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এই কথাও সত্য যে, ধর্মমূলক অভিজ্ঞতা শুধু তখনই অর্থবহ, যখন কঠোর শ্রম ও আত্মোন্নতির সাধনার ফলে তা নৈমিত্তিক ব্যবহারিক জীবনে বিকশিত হয়। রসায়নবাহিত অতীন্দ্রিয় অনুভূতির জন্যে যেমন মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই—নেই তেমনি দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধনের দরকার। এই সহজলভ্যতাই এল-এস-ডি-র ব্যবহার সীমিত করতে বাধ্য।

আমেরিকায় শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি-ঔপন্যাসিক মহলে এল-এস-ডি একটি সুপরিচিত নাম। টিমথি লেরীর (Temothy Leary) ভাষা অনুযায়ী আমেরিকার অর্ধেকের বেশী শিল্পীরাই কোন না কোন চেতন-উত্তেজক (Consciousness-alerting) ভেষজ বা রাসায়নিক সংশ্লেষ ব্যবহার করেন। এল-এস-ডি-র মনোবিকাশ (Psychedelic) ক্ষমতা নিশ্চয়ই সৃজনমূলক প্রতীতির (Creative percep-

tion) বিকাশ ঘটায়। সেই সঙ্গে এল-এস-ডি অপরের মানসিকতা ও তার চেতন-মনকে আরও সহজ অনুভবে সাহায্য করে। কিন্তু উইলিয়াম ও মারসেলা ম্যাক্‌গ্লথিন (William & Marsella Mc. Glothin) এবং সিডনি কোহেন (Sidney Cohen) এল-এস-ডি-র সৃজনমূলক সমস্যা সমাধানের ক্ষমতার (Creative problem solving) উপর প্রথম বৈজ্ঞানিকভাবে নিয়ন্ত্রিত গবেষণা চালান। দু-সপ্তাহ ধরে এল-এস-ডি প্রয়োগের আগে ও পরে বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষার প্রয়োগে তাঁরা দেখেন যে, এল-এস-ডি প্রয়োগে যদিও সৃজনীশক্তি প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বেড়েছে, তবুও যাদের প্লেসেবো (Placebo) প্রয়োগ করা হয়েছিল তাদের তুলনায় এই বৃদ্ধি পরিসংখ্যানভিত্তিক তাৎপর্যপূর্ণ নয়। তাছাড়া শুধুমাত্র সৃজনমূলক চিন্তাই লোককে সৃজনশীল করে তোলে না। এল-এস-ডি সৃজনমূলক চিন্তা ও ভাবের বন্যা বইয়ে দিতে পারে। কিন্তু যে ভাবের ঘোর মানুষকে ভর করে, যে শারীরিক জাড্য তাকে পেয়ে বসে এবং যে ভাব প্রকাশের অসামর্থ প্রায়ই ঘটে, তা নিশ্চয়ই সৃজনমূলক সৃষ্টির অনুকূল নয়। আর তাই ভাবের বন্যাকে বিধৃত করা হয়ে ওঠে না। কারণ কার্যকরী চিন্তা সৃষ্টিশীল, যুক্তিনির্ভর ও প্রকাশ মাধ্যম ভিত্তিক। আর ভাষার বাহনেই ভাব ও চিন্তা নব নব সৃষ্টিতে বিকশিত। বাঁধনহারা জল যেমন সৃষ্টিশীল নদী নয়, তেমনি বন্ধাহীন চিন্তাও সৃজনশীল নয়।

আজ এল-এস-ডি-র ব্যবহার আর গবেষণাগারে সীমাবদ্ধ নয়। জীবজন্তু ও মানুষের উপর নিয়ন্ত্রিত গবেষণার বাইরে চোরাবাজারের দৌলতে সমস্ত আমেরিকা ও ইওরোপে এর ব্যবহার বিপুলভাবে বেড়েছে। লরেন্স শিলারের (Lawrence Schiller) হিসেবে শুধুমাত্র আমেরিকাতেই ১৯৬৫ সালে ৪০ লক্ষ লোক এল-এস-ডি ব্যবহার করেছে। এদের মধ্যে শতকরা দশভাগ লোক বছরে একবার এবং ১২½% লোক মাসে অন্ততঃ একবার এল-এস-ডি-র স্বাদ নিয়েছে। আরও তাৎপর্যপূর্ণ যে, এল-এস-ডি ব্যবহাকারীদের মধ্যে শতকরা ৭০ জনই উচ্চবিদ্যালয়ের বা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী। আর তাই এল-এস ডি সমস্যা সমস্ত পৃথিবীর না হলেও সমস্ত আমেরিকাবাসীর। এই সব দেখে স্বতঃই মনে হয় এল-এস-ডি সব-পেয়েছির দেশের চাবিকাঠি। কিন্তু যখন আমরা বাস্তবের সম্মুখীন হই, যখন দেখি লস্ এঞ্জেলস এবং ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরো-সাইকিয়াট্রি ইনস্টিটিউটের এক-ষষ্ঠাংশ ছাত্রই এল-এস-ডি ব্যবহারোত্তর অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে আসে, তখন আর এল-এস-ডি-র সম্ভাব্য নেতিবাচক অভিজ্ঞতার পরিণাম সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। গবেষণায় দেখা গেছে; এল-এস-ডি-র ডি-এন-এ-র প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। গর্ভিণী ইঁদুরকে খাইয়ে দেখা গেছে অনেক সময় গর্ভপাত হয়েছে। তাছাড়া এল-এস-ডি ব্যবহাকারীর রক্তের লোহিত কণিকায় ফিলাডেলফিয়া ক্রোমোজমের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই ক্রোমোজম লিউকেমিয়া রোগাক্রান্তদের রক্তে পাওয়া যায়। অনেক গবেষক মনে করেন যে, এল-এস-ডি-র ব্যবহার ক্রোমোজমে পরিবর্তন এনে বংশগতিকে প্রভাবিত করে। আবার এল-এস-ডি ব্যবহারে মৃত সন্তানের প্রসব ঘটে বা সন্তানের বৃদ্ধি অস্বাভাবিকভাবে স্তিমিত হয়। অবশ্যই ইঁদুর বা মনুষ্যেতর জীবের উপর এই সব গবেষণালব্ধ উপসংহার মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। গত ২০ বছরের চিকিৎসাগত বা সাধারণভাবে এল-এস-ডি-র ব্যবহারে আজ পর্যন্ত মানুষের ক্ষেত্রে সাংঘাতিক দৈহিক ক্ষতির কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

বিজ্ঞানে ও সাধারণ ব্যবহারে এল-এস-ডি-র প্রকৃত স্থান নিরূপণে নিশ্চয়ই আরও ব্যাপক, বিস্তারিত নিয়ন্ত্রিত গবেষণার প্রয়োজন; কিন্তু তার থেকে বোধ হয় আজ বেশী প্রয়োজন এল-এস-ডি-কে দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে আকর্ষণীয়-করে-তোলার বিজ্ঞাপন রোধের। এল-এস-ডি সঞ্জীবনী সুধা হোক, তা বলে যাচাই করে নিতে ক্ষতি কি?

আঙুলের ছাপ ও বাংলা দেশ

বিদ্যুৎকুমার নাগ

আঙুলের ছাপ—বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে বলা হয় অঙ্গুলাঙ্ক, ইংরেজীতে ফিঙ্গার প্রিন্ট। কথাটি শুনলেই আমাদের মনে জেগে ওঠে রহস্য-রোমাঞ্চের অতলান্ত শিহরণ। মার্ক টোয়েনের কাহিনী থেকে সুরু করে আধুনিক কেনেডি হত্যার বিবরণে এর সবিস্তার আলোচনার কথা আমাদের মনে পড়ে। কত কঠিন সব অপরাধের রহস্যভেদ করেছেন গোয়েন্দা নায়কেরা এর সাহায্যে—পড়ে আবালবৃদ্ধবনিতা রোমাঞ্চিত হন। এছাড়া প্রতিদিন বহু সরকারী কর্মী, পুলিশ-কর্মী, গোয়েন্দা, দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকার আদালতের আইনব্যবসায়ী ও বিচারক-গণ আঙুলের ছাপ সংক্রান্ত ব্যাপারে জড়িত থাকেন। জনসাধারণও এই সম্পর্কে নানা আলোচনা পড়েন বা শোনেন। কিন্তু এর সম্বন্ধে বিশদ কিছু জানেন না।

কিন্তু আর কিছু নাই জানুন, অঙ্গুলাঙ্ক-বিজ্ঞানের গবেষণা ও এর প্রথম সফল প্রয়োগের ব্যাপারে বাংলা দেশের যে একটা গৌরবজনক ভূমিকা আছে, তা প্রতিটি বঙ্গবাসীর জানা বাঞ্ছনীয়। প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে টিপসই-এর ব্যবহার চলে আসছে। রাজারাজড়ার হুকুমনামায় পাঞ্জার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। তবে তাথেকে সনাক্তকরণের কোন ব্যবস্থা ছিল না—অনেকটা প্রথা হিসেবেই চলে আসছিল। এর সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন হুগলী জেলার কালেক্টর স্যার উইলিয়াম হার্শেল। একটি চুক্তিপত্রের উপর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজ্যধর কোনাই নামে জনৈক কন্ট্রাক্টরের হাতের ছাপ নেন। এর পর তিনি নানাভাবে আঙুলের ছাপের ব্যবহার করতে থাকেন—বিশেষতঃ দলিলপত্রাদি রেজেষ্ট্রি করবার সময়। তিনি গভর্ণমেন্টকে সুপারিশ করলেন যে, প্রতিটি কয়েদীর আঙুলের ছাপ রাখা হোক সনাক্ত-করণের জন্যে, কিন্তু তখন এই বিষয়ে কোন মনোযোগ দেওয়া হয় নি। তিনি নদীয়ার মহারাজা প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করে গবেষণা সুরু করেন এবং বিলাতের 'নেচার' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা ও গবেষণার কথা প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম হার্শেলের ও হুগলীর স্পেশাল সাব-রেজিষ্ট্রার রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগৃহীত তথ্য থেকে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটন প্রমাণ করেন যে, অঙ্গুলাঙ্কের সাহায্যে কোন ব্যক্তিকে অভ্রান্তভাবে সনাক্ত করা যায়। তবে তিনি অঙ্গুলাঙ্কের যে শ্রেণী বিভাগ করলেন, তা খুব সুবিধাজনক হলো না।

তাই অঙ্গুলাঙ্ক সনাক্তকরণের অন্যান্য পন্থার লেজুড় হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকলো।

শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশে শ্রেণীবিভাগের এই বাধাও অপসারিত হলো। এই বিজ্ঞানকে দৈনন্দিন কাজের উপযুক্ত করে তুললেন স্যার এডওয়ার্ড রিচার্ড হেনরী। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ থেকে তিনি বাংলা দেশের পুলিশ বিভাগের ইন্সপেক্টার জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁকে সাহায্য করেন দু-জন বাঙ্গালী পুলিশ অফিসার —খানবাহাদুর আজিজুল হক ও রায়বাহাদুর হেমচন্দ্র বসু। প্রকৃতপক্ষে আজিজুল হকই অঙ্গুলাঙ্কের গাণিতিক বর্গীকরণ সূত্র (ক্লাসিফিকেশন ফরমুলা) আবিষ্কার করেন, যদিও পরে তা 'হেনরী পন্থা' নামে সারা বিশ্বে প্রচলিত হয়। যখন এই পন্থায় হাজার হাজার অঙ্গুলাঙ্ক-পত্রের সংগ্রহ থেকে নির্দিষ্ট একটিকে খুঁজে বের করা সহজসাধ্য হলো, তখন এই সনাক্তকরণের কথা ভারত সরকারকে জানানো হয়। এর উপযোগিতা বিচার করবার জন্যে সার্ভেয়ার জেনারেল মিঃ সি. ষ্ট্রাহান এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ আলেক্স পেড্‌লারকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে কমিটি কেবলমাত্র অঙ্গুলাঙ্কের পন্থায় সনাক্তকরণের সুপারিশ করলেন। তদনুসারে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংসে স্থাপিত হয় বিশ্বের প্রথম অঙ্গুলাঙ্ক-কার্যালয়।

অল্পদিনের মধ্যেই মাদ্রাজ ও বোম্বেতেও অঙ্গুলাঙ্ক-কার্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়। ইতিমধ্যে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জলপাইগুড়ি জেলার একটি চা বাগানের ম্যানেজারের হত্যাকাণ্ডের সমাধান করেন কলকাতার কার্যালয়। তখন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডেও এই ব্যবস্থা ছিল না। আর আমেরিকার এফ. বি. আই. তখনও জন্মগ্রহণ করে নি, স্বভাবতই সফল নায়ক মিঃ হেনরীকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে অঙ্গুলাঙ্ক কার্যালয় স্থাপিত হয়। কিন্তু বাংলা দেশে যে এই পন্থাটি সাফল্য লাভ করেছিল তা কোথাও উল্লেখিত হলো না। এই ভাবে প্রচারকার্পণ্যে বাংলাদেশের একটি গৌরবজনক অধ্যায় লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে গেল।

প্রথমে শুধু আঙ্গুলের অন্ত্য পর্বের ছাপ নিয়েই গবেষণা করা হয়েছিল এবং সেগুলিই শুধু ব্যবহার করা হতো বা আজও হচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে এর সঙ্গে আঙ্গুলের অন্যান্য পর্বের, করতলের বা পদতলের ছাপও সমান ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে; অর্থাৎ মানবদেহের যেখানেই কূটরেখা (রিজেস) আছে, সেগুলি সবই ব্যবহার করা হচ্ছে। এই অঙ্গুলাঙ্ক এখন বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করছেন এবং সে ব্যবহারগুলি নিম্নোক্তভাবে লিপিবদ্ধ করা যায় :—

(ক) তুলনামূলক নৃতত্ত্ব—বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর তুলনামূলক আলোচনায়,

(খ) তুলনামূলক অঙ্গসংস্থানবিদ্যায় (অ্যানাটমি)—বিবর্তনবাদের গবেষণার জন্যে,

(গ) প্রজননবিদ্যা (জেনেটিক্স)—বংশপরম্পরা, বিশেষতঃ পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব নির্ধারণে বা বিশেষ রোগ-নির্ণয় ইত্যাদিতে,

(ঘ) সনাক্তকরণ—অপরাধী, ফেরারী আসামী অথবা মৃতদেহ ইত্যাদি সনাক্ত করা হয়, দলিল পত্রাদিতে টিপসই হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং অকুস্থলে প্রাপ্ত আঙ্গুলের ছাপের সাহায্যে অপরাধী নির্ণয় করা হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, অঙ্গুলাঙ্কের ব্যবহার শুধু অপরাধ-বিজ্ঞানেই সীমায়িত নেই। তবে অনেকেই হয়তো বলবেন যে, সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে তো দেখা যাচ্ছে যে, শুধু পুলিশ-কর্মীরাই এটা ব্যবহার করছেন। কিন্তু সত্যই কি তাই? পৃথিবীর

সব দেশেই এবং আমাদের দেশেও দলিল-পত্রাদি, পাশপোর্ট, পেন্সনের কাগজপত্রে, মজুরীর হিসাবপত্রে ও সরকারী চাকুরীর রেকর্ড প্রভৃতিতে আঙ্গুলের ছাপের ব্যবহার হচ্ছে না কি? সুতরাং পুলিশের প্রয়োজনে এবং উদ্যোগে বিজ্ঞানের আবিষ্কার হয়েছে বলেই কি আমরা একে অপরাধ-জগতে বন্দী করে রাখবো? এর উপযোগিতার কথা বিবেচনা করলে আরও ব্যাপকতর প্রয়োগে আমাদের কুণ্ঠা থাকবে না। পাগল, স্মৃতি-বিলুপ্ত ব্যক্তি, নিরুদ্দিষ্ট আত্মীয়স্বজন, দুর্ঘটনার আহত বা মৃত, অপহৃত ছেলেমেয়েদের সনাক্ত করতে এই সামান্য অঙ্গুলাঙ্কই অসামান্য সাহায্য করতে পারে। হাসপাতালে নবজাত শিশুগুলিকে যাতে সঠিকভাবে সনাক্ত করা যেতে পারে তার জন্যে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে শিশুর পায়ের ছাপ রাখবার ব্যবস্থা আছে। জন্মের পর বদল হয়ে যাওয়া, চুরি হয়ে যাওয়া আজকে আর অবিশ্বাস্য ঘটনা নয়। আমাদের দেশেও আজ এই ব্যবস্থা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া ব্যাঙ্কের চেক, ইন্সিওরেন্স পলিসি, সীজন টিকিট, রেশন কার্ড, ভোটদাতাদের পরিচয়জ্ঞাপন, বিভিন্ন সদস্যপত্র, নানা প্রতিষ্ঠানের পরিচয়পত্র, রসিদ, মাইনের কাগজপত্র ইত্যাদিতে হাজারো রকমভাবে অঙ্গুলাঙ্ক ব্যবহৃত হতে পারে।

আজকের জটিল সমাজ ব্যবস্থায় এবং যান্ত্রিক যুগে বিমান, রেল, মোটর, জাহাজ বা নৌকা প্রভৃতির দুর্ঘটনা প্রতিদিনই ঘটছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই মৃতদেহ সনাক্ত করা যায় না। এই সব ক্ষেত্রে নিজের বা প্রিয়জনের পরিচয়টি বীমা করে রাখা যায় সামান্য আঙ্গুলের ছাপটি দিয়ে রাখলে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি নাগরিকের অঙ্গুলাঙ্ক সংরক্ষণ ব্যবস্থা (ইউনিভার্সাল ফিঙ্গার প্রিণ্টিং) আজ সারা বিশ্বে একটি আন্দোলন সৃষ্টি করেছে। অন্ততঃ একটি দেশে—দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেণ্টিনায় কিছুদিনের জন্যে এই আন্দোলন সফলতা লাভ করেছিল। বর্তমানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দু-একটি রাজ্যে এই ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক। তবে নানা ধরণের প্রচার মারফৎ অঙ্গুলাঙ্কের ঐচ্ছিক সংগ্রহ বৃদ্ধিই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। এই বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। সেখানে অপরাধীদের অঙ্গুলাঙ্ক-পত্র সংগ্রহ প্রায় ৩০ মিলিয়ন আর সাধারণ নাগরিকের অঙ্গুলাঙ্ক-পত্রের সংখ্যা প্রায় ১৪২ মিলিয়ন এবং এগুলি সবই স্বেচ্ছাপ্রদত্ত। এর থেকে সাধারণ নাগরিকেরা যে উপকার পান তার এক একটি কাহিনী গোয়েন্দা গল্পকে হার মানায়!

এই ধরণের তথ্যাদি বা বিশেষভাবে অঙ্গুলাঙ্ক সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ বাংলা দেশের লোকের কম নয়। অথচ যে দেশে অঙ্গুলাঙ্ক জন্মলাভ করেছে বলা যায়, সেখানেই প্রচারের অভাবে অধিকাংশ লোক এই সম্বন্ধে কিছু জানেন না। প্রদীপের তলাতেই অন্ধকার সবচেয়ে ঘনীভূত হয়েছে বলা যায়। আর এই অজ্ঞানতা থেকেই কিছুটা নিস্পৃহতা এবং কিছুটা অনিচ্ছা জন্মলাভ করেছে এবং অঙ্গুলাঙ্ক-বিজ্ঞানের জনকল্যাণমূলক ব্যবহার থেকে আমাদের বিরত রেখেছে।

ব্যাক্‌টিরিয়োফাজ

শ্রীকমলেন্দুবিকাশ দাস

আমরা জানি অধিকাংশ রোগ ব্যাক্‌টিরিয়া ও ভাইরাসের দ্বারা সংক্রামিত হয়। সুতরাং এদিক দিয়ে দেখলে এক পথের পথিক হিসাবে ব্যাক্‌টিরিয়া ও ভাইরাস পরস্পরের বন্ধু; কিন্তু এদের মধ্যেও বিশ্বাসঘাতকতা রয়েছে। কিছু ভাইরাস আছে, যারা কতকগুলি ব্যাক্‌টিরিয়াকে আক্রমণ করে মৃত্যুর মুখে টেনে নিয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে নিজেদের বংশবৃদ্ধি করে প্রভাব বিস্তার করে। এই ধরণের ভাইরাসকে বলে ব্যাক্‌টিরিয়োফাজ (Bacteriophage—Bacteria—ব্যাক্‌টিরিয়া, Phage—খাদক)।

১৯১৫ সালে বৃটিশ বিজ্ঞানী Twort এবং ১৯১৭ সালে ক্যানাডার বিজ্ঞানী d'Herelle উভয়েই স্বাধীনভাবে লক্ষ্য করেন যে, কোন কোন ব্যাক্‌টিরিয়া ভাইরাসের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। Towrt একটি স্ট্যাফাইলোকক্কাসের কাল্‌চারের মধ্যে এই ক্রিয়া লক্ষ্য করেন। d'Herelle ব্যাসিলারী আমাশয়ে দেখেন যে, একটি ক্ষুদ্র জীবাণু আমাশয়ের ব্যাক্‌টিরিয়া ধ্বংস করছে। তিনি আরও উপলব্ধি করেন যে, এই ক্ষুদ্র জীবাণুগুলি ব্যাক্‌টিরিয়ার উপর নির্ভরশীল পরজীবী এবং ব্যাক্‌টিরিয়া-কোষের বিনিময়ে এরা বংশবৃদ্ধি করে। এই ক্ষুদ্র জীবাণুগুলির নাম দেওয়া হয় ব্যাক্‌টিরিয়োফাজ (Bacteriophage) অথবা কেবলমাত্র ফাজ (Phage)। এই ক্ষুদ্র জীবাণুগুলি ভাইরাস বলে প্রমাণিত হওয়ায় এদের ব্যাক্‌টিরিয়-ভাইরাস (Bacterial virus) বলা হয়।

এরা এক অদ্ভুত ধরণের ভাইরাস। ভাইরাস মূলতঃ চার ধরণের যথা—

(১) মানুষ ও প্রাণীদেহের ভাইরাস

(২) ব্যাক্‌টিরিয়োফাজ

(৩) পোকামাকড়ের ভাইরাস

(৪) উদ্ভিদের ভাইরাস

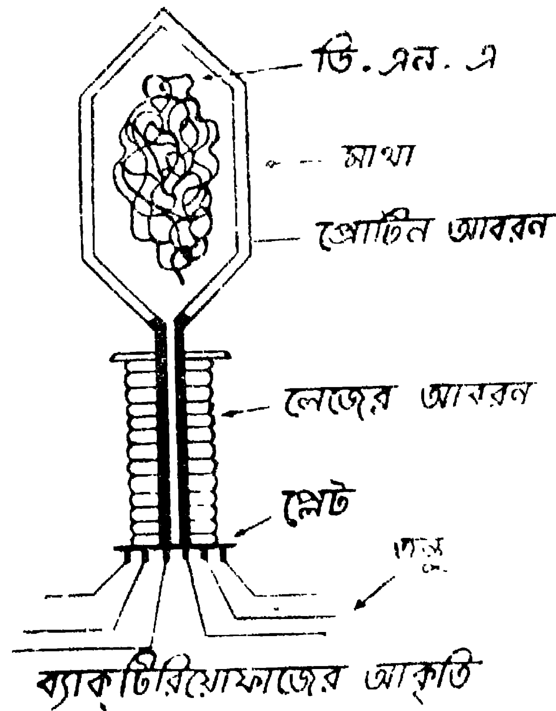
বিজ্ঞানীদের কাছে ব্যাক্‌টিরিয়োফাজের বিশেষ আকর্ষণ আছে, কারণ এদের সংক্রমণের পদ্ধতি ও বংশবৃদ্ধি সম্বন্ধে যথেষ্ট জানা গেছে। এই ক্ষেত্রে প্রাণীদেহের ভাইরাসের সম্বন্ধে আমরা তুলনামূলকভাবে কমই জানি। তাই ফাজকে মডেল ভাইরাসরূপে দেখা হয় এবং অন্যান্য ভাইরাস সম্বন্ধে গবেষণায় ফাজের মূল্য কম নয়।

ফাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও আকৃতি—ফাজ যদি কোন ব্যাক্‌টিরিয়ার কাল্‌চারে থাকে, তবে যেখানে ব্যাক্‌টিরিয়ার বংশবৃদ্ধি হয়েছে সেই অংশটুকু পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই বংশবৃদ্ধিহীন অংশটুকুকে প্লাক (Plaque) বলা হয়।

ফাজের আকৃতি শুক্র অথবা ব্যাঙাচির মতও বলা চলে। মোটের উপর ফাজগুলির আকৃতি ব্যাঙাচির মত, বহু তলবিশিষ্ট মাথা ও সিলিণ্ডারের ন্যায় লেজ সমন্বিত। অবশ্য লেজের ঘনত্বে যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মাথার ব্যাস গড়ে ১০০ × ৫০ mμ। লেজের দৈর্ঘ্য খুব কমও হতে পারে আবার বেশীও হতে পারে। ফাজের মধ্যে ই. কোলাই নামক (Escherichia coil) ব্যাক্‌টিরিয়ার ফাজকে আদর্শ হিসাবে ধরা হয়। এই ফাজকে 'T-even' ফাজ বলা হয়।

ফাজের মাথাটিতে একটি প্রোটিন আবরণ দেওয়া থাকে। এর অভ্যন্তরে ডি. এন. এ. অথবা ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে। লেজের চতুর্দিকে ও সঙ্কোচনশীল আবরণ

থাকে। মাথার অভ্যন্তরের সঙ্গে লেজের ফাঁপা নালীর যোগাযোগ থাকে। লেজের শেষ প্রান্তে ছয়টি সূক্ষ্ম তন্তু থাকে। এই তন্তুগুলি লেজের শেষ প্রান্তে স্বাভাবিক ভাবে গুটানো অবস্থায় থাকে (১নং চিত্র)। যখনই কোন উপযুক্ত ব্যাকটিরিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ হয় তখন এই তন্তুগুলি ব্যাকটিরিয়ার কোষের বাইর্ভাগের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে।



১নং চিত্র

বংশ বৃদ্ধি ও সংক্রমণের ধারা—পূর্বেই বলা হয়েছে ভাইরাসের বংশোৎপাদন পদ্ধতি প্রভৃতির গবেষণার সুবিধার জন্যে ব্যাকটিরিয়োফাজকে অনুসরণ করা হয়। ফাজ ও ব্যাকটিরিয়ার দেহের মধ্যে যে সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায়, তা অন্যান্য প্রাণী দেহের ভাইরাসের সংক্রমণের ধারার সম্বন্ধে প্রযোজ্য হয়। এছাড়া ফাজ-ব্যাকটিরিয়া সিস্টেম (Phage-Bacteria system) জীবদেহে নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিন-বিশ্লেষণের পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক মৌলিক তথ্য সরবরাহ করে।

সংক্রমণ সাধারণতঃ দুই রকমের হয়; যথা—লাইটিক সংক্রমণ (Lytic infection)—যদি কোন ব্যাকটিরিয়া ফাজের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহলে এই সংক্রমণকে লাইটিক সংক্রমণ বলে এবং ফাজটিকে ভিরুলেন্ট (Virulent) বলা হয়।

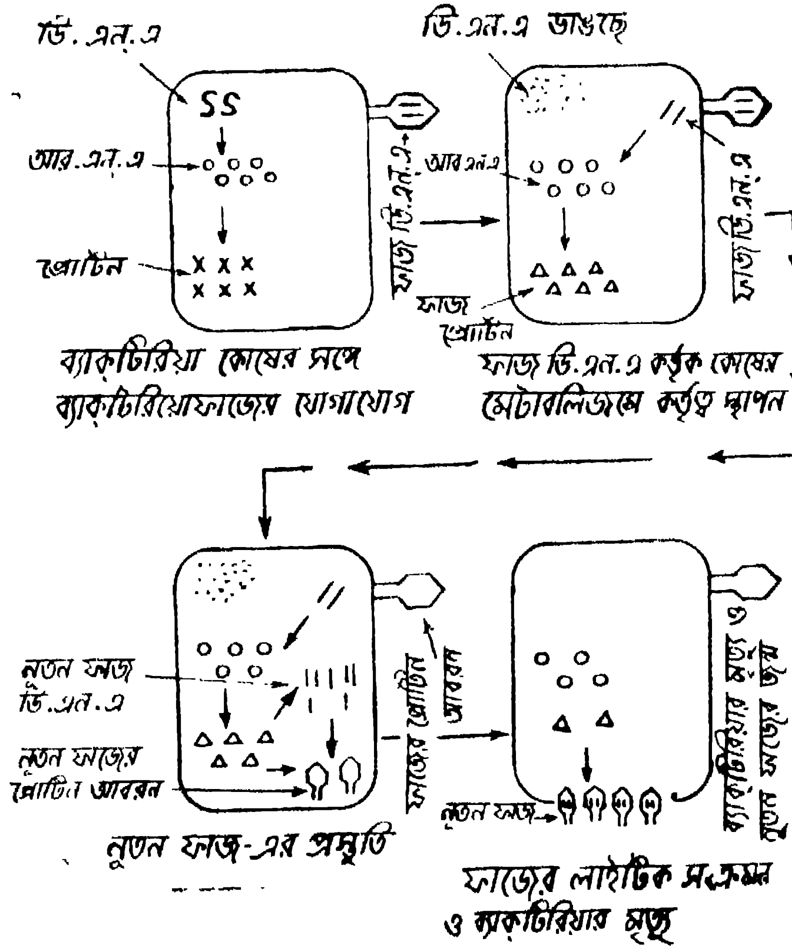
লাইসোজেনিক সংক্রমণ (Lysogenic infection)—যদি কোন ব্যাকটিরিয়া কোন ফাজের দ্বারা আক্রান্ত হয় কিন্তু ব্যাকটিরিয়ার দৃশ্যতঃ কোন ক্ষতি হয় না এবং ওই ব্যাকটিরিয়া বংশানুক্রমে কোষের অভ্যন্তরে ফাজের চরিত্র বহন করে চলে। এই সংক্রমণকে লাইসোজেনিক

সংক্রমণ বলে। এই ধরণের ফাজকে টেম্পারেট ফাজ বলা হয়।

লাইটিক সংক্রমণের পদ্ধতি—লাইটিক সংক্রমণের পদ্ধতিকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা যায় (২নং চিত্র)।

নির্দিষ্ট। কয়েকটি ফ্যাক্টর এই প্রক্রিয়াতে লাগে, যেমন—এল-ট্রিপ্টোফ্যান (L-Tryptophan), অ্যামিনো অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম আয়ন ইত্যাদি।

৩য় স্তর—অ্যাডজর্প্‌সন হবার পর ফাজের লেজ থেকে লাইসোজাইমের ন্যায় এন্‌জাইম



২নং চিত্র

(১) ফাজ অ্যাড্‌জর্প্‌সন এবং রেপ্লিকেসন (Phage adsorption and replication)—

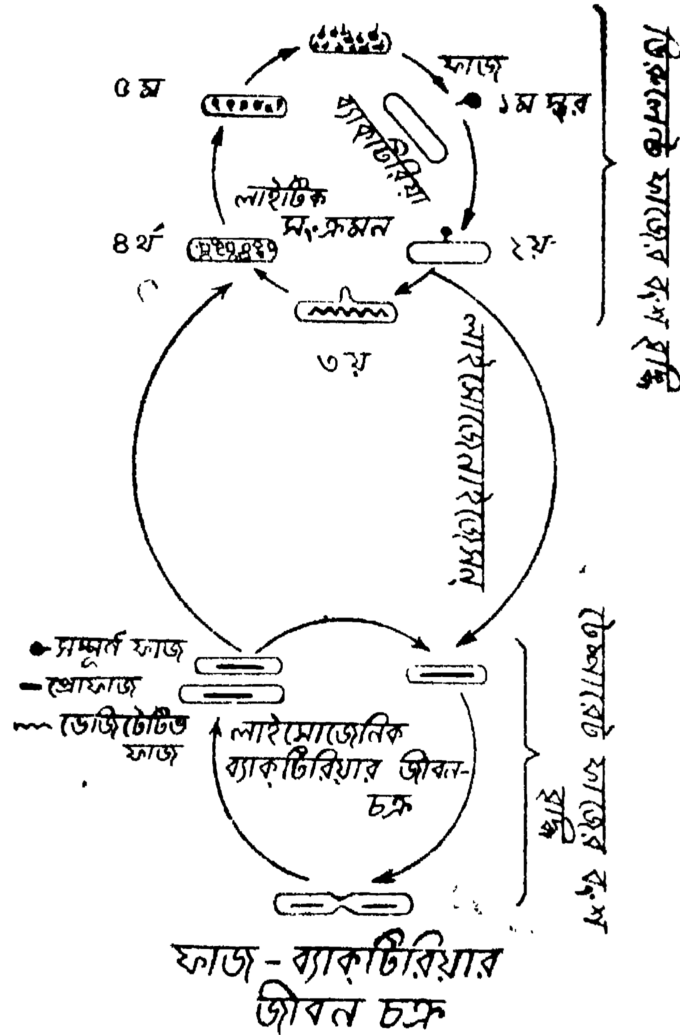
প্রথম স্তর—ব্যাক্‌টিরিয়ার সঙ্গে ফাজের যোগাযোগ।

২য় স্তর—ফাজের লেজের প্রত্যন্ত অংশের সঙ্গে ব্যাক্‌টিরিয়ার বহির্ভাগের আবরণের মধ্য দিয়ে ফাজের অ্যাডজর্প্‌সন হয়। এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত

বের হয়। এই এন্‌জাইম ব্যাক্‌টিরিয়া-কোষের আবরণের খানিকটা অংশ দ্রবীভূত করে। তারপর ফাজের লেজের যে আবরণ আছে, সেটি সঙ্কুচিত হয় এবং ফাজের মাথার মধ্যেকার ডি. এন. এ. লেজের মধ্যেকার কেন্দ্রীয় নালী দিয়ে বের হয়। এই ডি. এন. এ. ব্যাক্‌টিরিয়ার বহিরাবরণ ও সাইটোপ্লাজমিক আবরণ

ভেদ করে ব্যাক্টিরিয়ার সাইটোপ্লাজমের মধ্যে গিয়ে পড়ে।

ফেজের সঙ্কোচনশীল আবরণে যে প্রোটিন থাকে তা সম্ভবতঃ নিউক্লিওসাইড-ট্রাইফস্‌ফেট অণু ও ক্যালসিয়াম আয়নের সঙ্গে অবস্থান করে। যখন আবরণ সঙ্কুচিত হয় তখন কোন বলা হয় একলিপস্ পিরিয়ড (Eclipse period)। এই সময় আক্রান্ত ব্যাক্টিরিয়ার কোষাভ্যন্তরে কোন ফাজ দেখতে পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন বিশ্লেষণ বন্ধ থাকে, কিন্তু ফাজের জন্যে নির্দিষ্ট প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড বিশ্লেষিত হতে থাকে।



৩নং চিত্র

এক এনজাইমের সাহায্যে নিউক্লিওসাইড-ট্রাইফস্‌ফেটের হাইড্রোলিসিস হয় এবং অজৈব ফস্‌ফেট ও ক্যালসিয়াম আয়ন মোচন করে।

(২) ফাজের বৃদ্ধি—৪র্থ স্তর—ব্যাক্টিরিয়ার সঙ্গে যুক্ত হবার পর একটা নির্দিষ্ট সময় আছে তাকে ব্যাক্টিরিয়ার এনজাইম নিজের অপেক্ষা ফাজের প্রোটোপ্লাজম তৈরি করতে থাকে। ডিঅক্সি-রাইবোনিউক্লিয়েজ নামে একটি এনজাইম ব্যাক্-টিরিয়ার ডি. এন. এ-কে ভাঙতে থাকে এবং ফাজের জন্যে নির্দিষ্ট ডি. এন. এ. বিশ্লেষণ

করে। কতকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিড, বিশেষতঃ গ্লাইসিন অথবা ৪-কার্বন কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এবং Fe^{++}, Fe^{+++}, Mg^{++}, Mn^{++} প্রভৃতি আয়ন ফাজ উৎপাদনে সাহায্য করে।

৫ম স্তর—ফাজের বিভিন্ন অংশ একত্রিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ ফাজে পরিণত হয়ে ব্যাক্‌টিরিয়ার কোষে জমা হয়।

(৩) ব্যাকটিরিয়া-ধ্বংস (Bacterial lysis)—যখন অনেকগুলি ফাজ ব্যাক্‌টিরিয়ার মধ্যে জমা হয়, তখন কোন এক মুহূর্তে ব্যাক্‌টিরিয়া ধ্বংস হয়ে ফাজগুলি মুক্ত হয়। এই ফাজগুলি আবার অন্য কোন ব্যাক্‌টিরিয়াকে আক্রমণ করে। এই ক্রিয়াতে লাইসোজাইম নামক এন্‌জাইমের যথেষ্ট সাহায্য থাকে বলে মনে করা হয়।

ফাজ উৎপাদনের প্রত্যেকটি চক্র সম্পূর্ণ হতে ২০ থেকে ৬০ মিনিট সময় লাগে।

লাইসোজেনিক সংক্রমণের পদ্ধতি (৩নং চিত্র)—লাইসোজেনিক সংক্রমণের প্রাথমিক স্তরগুলি অর্থাৎ অ্যাড্‌জর্প্‌সন, ডি. এন. এ-র ব্যাক্‌টিরিয়া-কোষে অনুপ্রবেশ ইত্যাদির স্তর লাইটিক সংক্রমণের স্তরের ন্যায়। পরবর্তী স্তরে ব্যাক্‌টিরিয়াগুলি ফাজের অনুপ্রবেশ ও বৃদ্ধির জন্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। এর পরিবর্তে ব্যাক্‌টিরিয়া বা ব্যাক্‌টিরিয়াগুলি দৃশ্যতঃ বিভাজিত হয়। এই ব্যাক্‌টিরিয়াগুলিতে যদিও এখন কোন ফাজ দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু এদের বংশধর ব্যাক্‌টিরিয়াগুলির প্রত্যেকে ফাজ উৎপাদন করবার ক্ষমতা রাখে। এই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ব্যাক্‌টিরিয়ার জেনেটিক গঠন (Genetic constitution) এমন ভাবে বজায় রাখে, যাতে পরবর্তী বংশধরেরা ফাজ উৎপন্ন করতে পারে। এই জেনেটিক উপাদান (Genetic component) বা বংশধারার উপাদানটিকে প্রোফাজ (Prophage) বলে এবং এই সংক্রমণের পদ্ধতিকে বলে লাইসোজেনাইজেসন।

ব্যাক্‌টিরিয়োফাজের প্রয়োজনীয়তা—(১) ফাজগুলি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট (Specific) বলে জীবাণু-বিজ্ঞানীরা ব্যাক্‌টিরিয়ার শ্রেণীবিভাগ বিষয়ে উপকৃত হয়েছেন।

(২) যেহেতু ফাজ ব্যাক্‌টিরিয়া ধ্বংস করে সেহেতু এটা মনে করা স্বাভাবিক যে, ব্যাক্‌টিরিয়াজাত কোন রোগে সেই ব্যাক্‌টিরিয়ার ধ্বংসের জন্যে ফাজের সাহায্যে চিকিৎসা করলে নিশ্চয় সুফল হবে। কিন্তু যতটা আশা করা হয়েছিল ঠিক সেরূপ ফল পাওয়া যায় নি।

(৩) বর্তমানে বংশগতির বিষয়ে গবেষণার কাজে ফাজের স্থান প্রশ্নাতীত।

সুদূরের পিয়াসী রকেট

রমাতোষ সরকার

প্রধানত যুদ্ধাস্ত্র ও হাউই রূপে সুদীর্ঘকাল এক প্রকার হীন জীবন যাপন করে, বিজ্ঞানের ইতিহাসে রকেট যেন পুনর্জীবন লাভ করে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বা তারই সমসাময়িক কালে। যাঁদের পৌরোহিত্যে রকেটের এই দ্বিজত্ব লাভ, তাঁরা হলেন মুখ্যত: রুশ, ফরাসী, মার্কিন ও জার্মান দেশের কয়েকজন বিজ্ঞান-সাধক। এঁরা অল্প কয়েক বছরের ব্যবধানে, পরস্পরের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত ভাবে স্ব স্ব ক্ষেত্রে একক সাধনায় ব্রতী হন। পূর্ববর্তী কনগ্রীভ (Congreve) যুগের যুদ্ধোদ্যমের পরিবর্তে, এঁদের লক্ষ্য ও গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করে সমকালীন মানুষের মহাকাশ সম্বন্ধে অধিকতর আগ্রহ, বায়ুগতিবিদ্যা (Aerodynamics) ও তাপগতিবিদ্যা (Thermodynamics) প্রসঙ্গে গভীরতর জ্ঞান এবং কিছু কিছু অভিনব গুণসম্পন্ন রাসায়নিক পদার্থের আবিষ্কার।

দূর আকাশের হাতছানি মানুষ সুদীর্ঘকাল ধরে তার অন্তরের মধ্যে অনুভব করছে। মহাকাশে ভ্রমণ করার, তাকে জয় করার, তার রহস্য উন্মোচন করার, তার মধ্য দিয়ে বিশাল দূরত্বকে অতিক্রম করে অন্য কোন জ্যোতিষ্কে পদার্পণ করার স্বপ্ন মানুষ দেখে আসছে যুগ যুগ ধরে, হাজার হাজার বছর ধরে। তখন মানুষের সাধ ছিল, সাধ্য ছিল না। তাই মানুষ তখন কল্পনার ব্যবহার করেছে—বল্‌গাহীন ব্যবহার। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে রচিত পদ্মপুরাণে আছে গরুড় পাখীর পিঠে চড়ে চাঁদে যাওয়ার কথা। এমন অনেক কাল্পনিক অভিযানের অনেক সুন্দর সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় অনেক রূপকথায় ও গল্পে—দ্বিতীয় শতকের গ্রীক লেখক লুকিয়ান (Lukian)-এর উপাখ্যান থেকে সুরু করে আধুনিক কালের ফরাসী লেখক জুল ভোর্ন (Jules Verne) বা ইংরেজ লেখক এইচ, জি, ওয়েলসের উপন্যাস পর্যন্ত। কিন্তু এর ফলে যা হয়েছে তা সাহিত্যের একটি শাখার সৃষ্টি ও পুষ্টি, বিজ্ঞানের নয়। আর, মানুষের মহাকাশ-সন্ধানী মনের তো তৃপ্তি হয় নি।

প্রশ্নটিকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দিক থেকে প্রথম উপস্থাপিত ও বিচার-বিবেচনা করা হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে। যুগ প্রবর্তনকারী এ-চিন্তাধারার প্রথম সূত্রপাতের কৃতিত্ব একপক্ষে হয়তো জার্মেনীর হেরম্যান গানস্‌ভিণ্ড্‌ট্ (Herman Ganswindt)-এর প্রাপ্য। কারণ, রুশ বিজ্ঞানী কনষ্টানটিন জিওলকভস্কি (Konstantin Tsiolkovskii), যাঁকে সাধারণত আধুনিক রকেটবিদ্যা বা নভশ্চারণবিদ্যা (Cosmonautics)-এর জনক বলে অভিহিত করা হয়, তাঁর প্রাসঙ্গিক বনিয়াদী (Classical) প্রবন্ধগুলি রচনা করার (অর্থাৎ ১৮৯৫-র) কয়েক বছর পূর্বেই (সম্ভবত ১৮৯১ সালে) গানস্‌ভিণ্ড্‌ট্ কয়েকটি বক্তৃতায় তাঁর মহাকাশযানের পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেন। কিন্তু গানস্‌ভিণ্ড্‌টের পরিকল্পনা ছিল অত্যন্ত স্থূল ও কষ্টকল্পিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গানস্‌ভিণ্ডটের মস্তিষ্ক-প্রসূত মঙ্গল-যান রকেট নয়, বরং বন্দুকের সঙ্গে তুলনীয়; বারংবার কার্তুজরূপী ডিনামাইট ব্যবহারই ছিল এটির প্রত্যাশিত চালিকাশক্তি! স্পষ্টতঃই, তত্ত্বের দিক থেকে না হলেও ব্যবহারিক দিক থেকে তাতে অনেক অসম্ভাব্যতা ছিল। অপর পক্ষে

মহাকাশযান হিসাবে জিওলকভস্কির বিশদ, পুঙ্খানুপুঙ্খ রকেট-পরিকল্পনা, তাঁর তত্ত্ব ও বাস্তবানুগ কৌশল অনেকাংশে আজ পর্যন্ত অপরিবর্তিতরূপে ব্যবহৃত। প্রসঙ্গতঃ তাঁর দু'-একটি কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রকেটের চালিকাশক্তি যে সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ, তার চলার পথে বাতাসের যে প্রতিরোধ-সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোন ভূমিকা নেই আর সর্বোপরি মহাকাশ যে রকেটেরই অধিগম্য—এই সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলি জিওলকভস্কিই প্রথম সুনিশ্চিত ভাবে হৃদয়ঙ্গম করেন। এঁর আর একটি মূল্যবান কীর্তি রকেটের মধ্যে স্বেচ্ছাচারী বারুদের পরিবর্তে বশংবদ দুটি তরল পদার্থকে দাহ্য ও দাহক হিসাবে ব্যবহারের পরিকল্পনা; বলাই বাহুল্য, প্রথমে পাম্পের সাহায্যে দুটি পৃথক কক্ষে রক্ষিত তরল দুটিকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রাধীনে, ধীরে ধীরে দহনকক্ষে সংমিশ্রিত ও পরে অগ্নি-সংযুক্ত করাই এই কৌশলের মূল উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য। দুঃখের বিষয়, জার-শাসিত অনগ্রসর রুশ দেশে, প্রায় আজন্ম বধির, আত্মপ্রচার-বিমুখ, দরিদ্র স্কুল-শিক্ষক জিওলকভস্কির অগ্রগামী গবেষণার সম্যক অর্থবোধেরও যোগ্যতা বিশেষ কারোর ছিল না। বিদেশেও সে-যুগে বা পরবর্তীকালে বহুদিন পর্যন্ত এঁর নাম বা কীর্তি অপরিজ্ঞাত ছিল; কারণ, এঁর প্রবন্ধাবলীর ভাষা ছিল রুশ ভাষা, যে-ভাষার বিজ্ঞান-চর্চার খোঁজ-খবর সে-যুগে বহির্বিশ্ব বিশেষ রাখতো না। জীবনের শেষভাগে, কর্মজীবনের অবসানে, আজীবন-অবহেলিত, নম্র, নাজুক, জ্ঞান-তপস্বী মানুষটি অবশ্য তাঁর প্রাপ্য সম্মানের কিছুটা পেয়েছিলেন; মৃত্যুর তিন বছর পূর্বে, ১৯৩২ সালে এঁর পঞ্চসপ্ততি জন্মজয়ন্তী সোভিয়েট দেশে সাড়ম্বরে প্রতিপালিত হয়।

পথিকৃৎদের মধ্যে অপরজন আরও ভাগ্য-বিড়ম্বিত। ইনি ফরাসী বিজ্ঞানী রবেয়ার এনোঁ-পেল্‌তেরি (Robert Esnault-Pelterie)। ইনি শুধু এঁর জীবনকালেই নয়, অদ্যাবধি রকেট-চর্চার ক্ষেত্রে এঁর প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত—যদিও বিমান নির্মাণ ও পরিকল্পনার ব্যাপারে এঁর অগ্রণী চিন্তা ও নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির কথা বিজ্ঞানী মহলে অবিদিত নয়। ১৯১২-১৩ সালে ইনি প্যারিসে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় এবং লিখিত একটি প্রবন্ধে রকেটযোগে চাঁদ ও গ্রহান্তরে যাওয়ার একটি অপূর্ব পরিকল্পনা পেশ করেন; পরিকল্পনাটি, খুঁটিনাটি দু-চারটি প্রশ্ন বাদ দিলে, এক কথায়—অনবদ্য। প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধটি নাতি-দীর্ঘ, কিন্তু সেখানে মহাকাশ-অভিযানের প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সংক্ষেপে অথচ সুন্দরভাবে বিচার-বিবেচনা করা হয়েছে, যথা—রকেটের গতিপথ ও গতিবেগ নিয়ন্ত্রণের সমস্যা, ধীরে ধীরে অবতরণের সমস্যা ইত্যাদি। এমন কি তাপাধিক্য বা ওজনহীনতার জন্যে অভিযাত্রীর সম্ভাব্য শারীর-তাত্ত্বিক সমস্যাগুলিও প্রবন্ধকারের দৃষ্টি এড়ায় নি। প্রবন্ধটি রকেট-চর্চার ইতিহাসে একটি অমূল্য দলিল, অনেক ইতিহাস-প্রণেতার অজ্ঞতার বা দৃষ্টিহীনতার লজ্জাকর প্রমাণ!

জিওলকভস্কি এবং পেলতেরির বলিষ্ঠ বিজ্ঞান-ভিত্তিক কল্পনাশক্তি, অদ্ভুত অগ্রণী দূরদৃষ্টি এবং অসাধারণ কুশলী প্রয়োগবুদ্ধি আধুনিক রকেট-বিজ্ঞানীদেরও বিস্ময়ের কারণ। কিন্তু এঁদের অবদান প্রায় সর্বাংশে তত্ত্বের দিকে। জিওলকভস্কি-কৃত অনেক মহাকাশযানের নক্সা, অভিযান-সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশ প্রভৃতি সরাসরি অপরি-বর্তিতভাবে বাস্তবে রূপায়ণযোগ্য বা পরবর্তীকালে প্রকৃতই বাস্তবে রূপায়িত; কিন্তু জিওলকভস্কি স্বয়ং প্রধানতঃ পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা, নক্সার পর নক্সা রচনা করে গেছেন, অর্থ ও সমর্থনের অভাবে সেগুলিকে বাস্তবে রূপদান করার বিশেষ প্রয়াস করেন নি। ব্যবহারিক দিক থেকে যিনি রকেটকে নবজীবন দান করেন, নব উদ্দেশ্যে, নব প্রয়োজনে যিনি রকেট ব্যবহারের সূত্রপাত করেন তিনি হচ্ছেন একজন মার্কিন বিজ্ঞানী, নাম—

রবার্ট হাচিংস গডার্ড (Robert Hutchings Godderd)।

গডার্ড ছিলেন ম্যাসাচুসেট্‌স্‌-এর ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। রকেট সম্পর্কে ফলিত গবেষণার বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার আগ্রহ এঁর ১৯১৪ সাল থেকে, কিন্তু তখন প্রথম মহাযুদ্ধজনিত নানা বাধা-অসুবিধায় বিশেষ অগ্রসর হতে পারেন নি। যুদ্ধশেষে সুযোগ্য সহকারী হিকম্যান (Hickman)-এর সহায়তায় পূর্ণোদ্যমে কাজ সুরু করেন। এই সময়ে, ১৯১৯ সালে, ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেক উচ্চতায় উপনীত হওয়ার উপায় সম্পর্কে ইনি একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন; পুস্তিকায় তিনি রকেট সম্পর্কেই সোৎসাহ আলোচনা করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে মতপ্রকাশ করেন যে, রকেটের পক্ষে চন্দ্রাবতরণও অসম্ভব নয়। গডার্ড অবশ্য চাঁদে মানুষ পাঠাবার কথা উত্থাপন করেন নি, প্রসঙ্গতঃ বলেছিলেন যথেষ্ট শক্তিশালী কোন বিস্ফোরক পাঠানোর কথা, যার প্রচণ্ড বিস্ফোরণ দূরবীন যোগে পৃথিবী থেকে হয়তো দেখা সম্ভব হবে। গডার্ড-বর্ণিত এই গৌণ সম্ভাবনাটি তখন জনমানসে বেশ কিছুটা রেখাপাত করে—পত্র-পত্রিকায় এ-নিয়ে সোৎসাহ সকৌতুক আলোচনা হয়। গডার্ড কিন্তু এ-প্রতিক্রিয়ায় মোটেই খুশী হন নি। প্রসঙ্গচ্যুত ভাবে, প্রচুর সম্ভাবনাপূর্ণ মূল বৈজ্ঞানিক গবেষণার ধারাকে উপেক্ষা করে, শুধু চন্দ্রাভিযানকে গ্রহণ করাটা তাঁর মনোবেদনারই কারণ হয়েছিল। অতঃপর প্রায় দুই দশক ধরে তিনি এ বিষয়ে যে মূল্যবান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন তা যথাসম্ভব লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখবারই চেষ্টা করেন। এমন কি জনসাধারণের অবাঞ্ছিত কৌতূহল ও প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে তিনি ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে, তাঁর গবেষণাক্ষেত্রকে আমেরিকার জনবিরল দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে স্থানান্তরিত করেন। সৌভাগ্যের বিষয়, স্মিথসোনিয়ান ইনষ্টিটিউটের অর্থানুকূল্য তাঁর পিছনে ছিল, আর ছিল স্বীয় অদম্য উৎসাহ ও অবিচল আত্মবিশ্বাস। রকেটের ইতিহাসে কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক সাফল্য প্রথম গডার্ড অর্জন করেন। ১৯২৬ সালে তিনি ইতিহাসে প্রথম তরল-উদ্দীপক (Liquid propellant) রকেট উৎক্ষেপণ করেন। প্রথম দিকে এ-রকেটের গতিবেগ বা ভূপৃষ্ঠ থেকে সর্বাধিক দূরত্ব অবশ্য অল্পই ছিল—যথাক্রমে ঘণ্টায় ৬০ মাইল ও ২০০ ফুট মাত্র; কিন্তু পরীক্ষার মাধ্যমে ক্রমেই তিনি উত্তরোত্তর অধিকতর সাফল্য লাভ করতে থাকেন। ১৯৩৫ সালে তিনি ঘণ্টায় প্রায় ৭৫০ মাইল বেগে (অর্থাৎ শব্দের চেয়ে দ্রুতবেগে) এবং পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭৫০০ ফুট উচ্চতায় রকেট পাঠাতে সক্ষম হন। গডার্ডের এই সব কৃতিত্বের কথা অবশ্য তখন মুষ্টিমেয় কয়েক জন অনুরাগী বন্ধু বা সহকারীর বাইরে কারোরই মনযোগ পায় নি।

পূর্বসূরীদের মধ্যে আর একজনের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ইনি রুমানিয়া-জাত জার্মান পদার্থ-বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ হেরমান ওবের্থ (Hermann Oberth)। ১৯২৩ সালে আন্তর্গ্রহ মহাকাশে রকেট চলাচল সম্পর্কে ইনি জার্মান ভাষায় একটি গবেষণা-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পরবর্তীকালে, সীমাহীন মহাকাশের বিস্তৃততর পটভূমিকায়, পরিবর্তিত নামে গ্রন্থটির একটি পরিবর্ধিত সংস্করণও প্রকাশিত হয়। মহাকাশ-চর্চার ক্ষেত্রে এ-গ্রন্থটির মূল্য অনেক, গুরুত্ব ততোধিক। গ্রন্থটিতে তিনি গণিত ও পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে বিস্তারিতভাবে মহাকাশ অভিযানের যাবতীয় সমস্যা সম্পর্কে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিচার-বিশ্লেষণ করেন এবং বিশেষ মূল্যবান সমাধান নির্দেশ করেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মহাকাশের দূরতর অংশে পাড়ি দেওয়ার সোপান হিসাবে মহাকাশ-ষ্টেশন

ব্যবহারের কৌশল (যা পরবর্তী কালে সফল চন্দ্রাবতরণ প্রচেষ্টার অন্তর্ভূত হয়েছে) ওবের্থই প্রথম এই গ্রন্থে নির্দেশ করেন। ওবের্থের গ্রন্থটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। এই গ্রন্থই প্রথম সাধারণ ভাবে বিজ্ঞানী মহলে মহাকাশ-চর্চা সম্পর্কে একান্ত অবিশ্বাসের মনোভাব দূর করে এবং বিষয়টিকে তার প্রাপ্য মর্যাদায়, সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করে। সমসাময়িককালে মহাকাশ-সন্ধিৎসু বিজ্ঞানীদের কাছে গ্রন্থটি ছিল যেন পথ-নির্দেশক গ্রন্থ। ওবের্থের বক্তব্যের কিছু কিছু অতি মূল্যবান অংশ অবশ্য ছিল প্রায় দুই দশক আগে জিওলকভস্কি-উচ্চারিত বক্তব্যের প্রতিধ্বনি, কিন্তু সে-যুগে ওবের্থের মত অনেকের কাছেই জিওলকভস্কির নাম পর্যন্ত অশ্রুত ছিল।

নব্যরকেট-চর্চায় প্রাচীনদের মধ্যে ওবের্থই ছিলেন সবচেয়ে সৌভাগ্যবান। প্রায় সুরু থেকেই মহাকাশ সন্ধানে রকেট ব্যবহার সম্পর্কে এঁর চমকপ্রদ অভিনব বক্তব্য দেশবিদেশের বিদ্বৎ-সমাজের কম-বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ইনি কিছু কিছু সম্মান, সমর্থন ও পুরস্কার লাভ করতে থাকেন। এঁরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নেতৃত্বে বা প্রেরণায় কয়েকটি দেশে যৌথ ভাবে রকেট-চর্চা সুরু হয় বা মহাকাশ ভ্রমণ সংস্থা গড়ে ওঠে। সাধনালব্ধ পুণ্যফলে শুধু ইনি নিজেই নন্দিত হন নি, এমন কি এঁর ভাগ্যহত পূর্ব-সাধকদেরও কতক পরিমাণে শাপমোচন হয়। রুশ দেশে জিওলকভস্কির ধূলিধূসরিত প্রবন্ধাবলীর পুনর্মুদ্রণ হয়, ফ্রান্সে পেলতেরি তাঁর পুরনো, প্রিয় পরিকল্পনা প্রচারের উদ্দেশ্য নতুন প্রবন্ধ ও নতুন বক্তৃতা পরিবেশনের সুযোগ পান। ওবের্থের সৌভাগ্যের আর একটি বড় নিদর্শন আছে। বিজ্ঞান বা সভ্যতার ইতিহাসে যা মহাকাশ যুগ নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য, সে-যুগ ভূমিষ্ঠ হয় (জিওলকভস্কির জন্মের ঠিক শতবর্ষ পরে) ১৯৫৭ সালে স্পুটনিক-১-এর বীপ-বীপরূপী শঙ্খধ্বনির মধ্য দিয়ে: এ-যুগের অভিষেক ১৯৬৯ সালে অ্যাপোলো-১১-এর যান-বারোহীসহ চন্দ্রাবতরণে। প্রাচীনদের মধ্যে ওবের্থই একমাত্র এ-সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছেন। কত বিনিদ্র রজনীর স্বপ্ন, উষ্ণ মস্তিষ্কের গবেষণা, উপহসিত পরিকল্পনা, অবহেলিত হিসাবনিকাশ মনোরাজ্য থেকে বাস্তব জগতে উপনীত হয়েছে—জিওলকভস্কি-পেলতেরি-গডার্ড তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ-বঞ্চিত হয়েছেন। কিন্তু ওবের্থ—অবসরপ্রাপ্ত, গতোদ্যম, হৃতশক্তি, অতিবৃদ্ধ ওবের্থ—সাশ্রুনয়নে তাঁর যৌবনের নিশিদিনের স্বপ্নকে সত্যে পরিণত হতে দেখেছেন।

আধুনিক রকেটের ইতিবৃত্তে যাকে Backyard rocketry বা গৃহ-প্রাঙ্গণে রকেট-চর্চার পর্ব বলা যেতে পারে, যে-পর্বে মুষ্টিমেয় সহায়-সম্বলহীন কয়েকজন বিজ্ঞানী এককভাবে, লোক-চক্ষুর অগোচরে রকেট-চর্চা করে গেছেন, তার অবসান হয় ওবের্থের সমসাময়িক কালে, অনেক পরিমাণে ওবের্থেরই প্রভাবে। অতঃপর সুরু হয় প্রকাশ্যে, যৌথভাবে রকেট-চর্চা। এ-উদ্দেশ্যে গঠিত সংস্থাগুলির মধ্যে আনুমানিক ১৯২৪ সালে স্থাপিত রুশ সংস্থাটি প্রাচীনতম আর ১৯২৭ সালে জার্মেনীতে প্রতিষ্ঠিত Verein für Raumschiffahrt বা সংক্ষেপে VfR নামে পরিচিত সংস্থাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব সর্বাধিক। ওবের্থ স্বয়ং VfR-এর সঙ্গে গোড়ার দিকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। খ্যাতনামা অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন—ভের্নহের ফন ব্রাউন (Wernher Von Braun) ও ভিলি লেই (Willy Ley)। অনুরূপ অপরাপর সংস্থাগুলির জন্ম হয় আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে। বিশ ও ত্রিশের দশকে এই সংস্থাগুলি পাশ্চাত্য দেশগুলিতে রকেট-চর্চাকে অনেকাংশে জনপ্রিয় ও মর্যাদাযুক্ত করে, এদের তৎপরতায় কিছু কিছু তত্ত্বগত বা পরীক্ষা-নিরীক্ষাগত উৎকর্ষও সাধিত হয়। কিন্তু,

দুঃখের বিষয়, এই সময়ের শেষ দিকে পশ্চিমের আকাশে ধীরে ধীরে যুদ্ধের করাল মেঘ ঘনীভূত হতে থাকে আর তার ফলে ক্রমে ক্রমে একটি ছাড়া অপর সব সংস্থার কর্মধারায় দারুণ ভাটা পড়ে। ব্যতিক্রম সংস্থাটি VfR; এটিরও পূর্বধারাটি অর্থাৎ মহাকাশ-সন্ধানী বৈজ্ঞানিক ধারাটি নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে কিন্তু নাৎসী রাজনৈতিক আদেশে ও আদর্শে পেনেম্যুণ্ডে (Penemünde) নামক স্থানে নূতন, সর্বনাশা একটি ধারার জন্ম হয়। ওবের্থ. সেই প্রমুখ উচ্চমনা, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিজ্ঞানীরা অবশ্য নানাপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করে—এমন কি, দেশত্যাগ বা কারাবরণ করেও—নাৎসী অপকর্ম থেকে নিজেদের দূরে রাখেন, কিন্তু হিটলার-গোষ্ঠীর সহায়তা করেন ফন ব্রাউন। জার্মেনীতে A-4 এবং বহিঃবিশ্বে V-2 নামে কুখ্যাত ভয়াবহ ক্ষেপণাস্ত্র এই অধোগামী রকেট-চর্চারই ফল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে, ১৯৪৪-৪৫ সালে, V-2 মিত্রপক্ষের—বিশেষ করে, ইংরেজদের—নিদারুণ বিভীষিকার কারণ হয়েছিল। ৪৬ ফুট উচ্চ, ১৪ টন ওজনবিশিষ্ট এই রকেটাস্ত্রগুলি ৫ মিনিটে ২০০ মাইল দূরত্বে ১ টন বিস্ফোরক প্রেরণে সক্ষম ছিল। অনেক সমর-বিশেষজ্ঞের মতে নাৎসী বিজ্ঞানীরা এই ভীষণ মারণাস্ত্র নির্মাণকার্য আরো কিছুদিন আগে সমাধা করতে পারলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তথা তৎপরবর্তী মানব-প্রগতির ইতিহাস বহুলাংশে ভিন্নরূপ হতো।

ধ্বংসোপকরণ নির্মিত হলেও V-2 রকেটই কিন্তু আধুনিক মহাকাশজয়ী রকেটের প্রত্যক্ষ ও অতিনিকট পূর্বপুরুষ। এগুলি ছিল ঊর্ধ্বমুখে প্রায় ১০০ মাইল গমনক্ষম—অর্থাৎ, মহাকাশভেদী নয় কিন্তু প্রায় মহাকাশস্পর্শী। প্রকৃত প্রস্তাবে, যুদ্ধোত্তর মহাকাশমুখী রকেট-চর্চা অনেকাংশে এগুলিকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে; অন্ততঃ পক্ষে অন্ততম সফল দেশ আমেরিকার ক্ষেত্রে এ-কথা সর্বজনস্বীকৃত। যুদ্ধের শেষে মার্কিন সৈন্যবাহিনী অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জার্মান রকেট-ঘাটি অধিকার করে এবং কতকগুলি অব্যবহৃত কিন্তু পূর্ণনির্মিত রকেট ও সর্বপ্রধান রকেট-নির্মাতা ফন ব্রাউনকে স্বদেশে রপ্তানী করে। অতঃপর এগুলিকে অবলম্বন করেই মার্কিন দেশে মহাকাশবিজয়ের নবোদ্যম সুরু হয়। প্রথমে অধিকৃত জার্মান V-2 এবং পরে ক্রমে ক্রমে তারই উন্নততর সংস্করণ এয়ারোবি, ভাইকিং প্রভৃতি নিয়ে নিউ মেক্সিকোর হোয়াইট স্যাণ্ডস-এ গবেষণা চলে। এ-গবেষণার একটি বিশেষ মূল্যবান দিক ছিল গভীরভাবে ও যত্ন নিষ্ঠা সহকারে বহুপর্যায়ী (Multi-stage) রকেট-চর্চা। এ-জাতীয় রকেটে একটির 'পে-লোড'-এ আর একটি ইত্যাদি ক্রমে পরপর একাধিক রকেট সংযুক্ত থাকে। প্রারম্ভে প্রথম বা সর্বনিম্নটির ক্রিয়ায় অপরগুলি উত্তোলিত বা চালিত হয়; প্রথমটির ক্রিয়াবসানে অর্থাৎ জ্বালানি নিঃশেষে দ্বিতীয়ের ক্রিয়া সুরু ইত্যাদি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ নিঃশেষিত রকেটটি বিচ্ছিন্ন হয়ে অবশিষ্টাংশকে ভারমুক্ত করে। আতসবাজী হিসাবে বৈচিত্র্য বা অধিক আকর্ষণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এ ধরণের রকেট-পরম্পরা ব্যবহার অবশ্য পূর্বেও প্রচলিত ছিল কিন্তু মহাকাশবিজয়ের উদ্দেশ্যে সে-কৌশলের অনেক উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজন ছিল। মহাকাশ-অভিযানে বহুপর্যায়ী রকেট ব্যবহার ঐচ্ছিক বা বাহুল্যকল্প নয়, অপরিহার্য। কারণ, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বন্ধন ছিন্নক্ষম 'মুক্তি বেগ' (Escape velocity)-এর মান ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি খুবই বেশী—সেকেণ্ডে ৭ মাইল বা ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইল; আর এককভাবে এই গতিবেগ সঞ্চারিত করে এমন রকেট এখনও অনাবিষ্কৃত। দ্বিতীয়তঃ, তেমন রকেট নির্মিত হলেও বায়ুমণ্ডলের ঘন নিম্নাংশের মধ্য দিয়ে ঐ গতিবেগে কোন কিছুরই পক্ষেই চলাচল করা সম্ভব নয়—প্রচণ্ড সংঘর্ষজনিত তাপে সব

কিছুই নিমেষের মধ্যে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

প্রাথমিক গবেষণা সম্পূর্ণ করে, প্রাসঙ্গিক নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উত্তরোত্তর সন্তোষজনক ফল লাভ করে, মার্কিন কর্তৃপক্ষ ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে তাঁদের সাধনা ও সঙ্কল্পের কথা ঘোষণা করেন—ঘোষণা করেন ভ্যানগার্ড পরিকল্পনা (Project Vangurd) অনুযায়ী অদূর ভবিষ্যতে কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টির কথা! ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বরে একটি দুঃখজনক ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর, ১৯৫৮-র ফেব্রুয়ারিতে এক্সপ্লোরার-১ উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে মার্কিন এ-ঘোষণা সার্থক হয়।

চঞ্চল, সুদূরের পিয়াসী রকেটের অবশ্য শৃঙ্খলমুক্তি সম্পূর্ণ হয়েছে তার কিছুদিন আগেই—১৯৫৭-র ৪ঠা অক্টোবর। ঐ তারিখেই স্পুট্‌নিক ১-বাহী রুশ রকেট ব্লীপ ব্লীপ কলধ্বনিতে মুক্তির স্বচ্ছন্দ ডানা মেলেছ সুদূর, বিপুল সুদূরে—বায়ুমণ্ডলের অতীতে, মহাকাশের মহাশূন্যে।

নতুন ক্যালেণ্ডার

শিশির নিয়োগী

ক্যালেণ্ডার জিনিসটাই অদ্ভুত। নতুন বছর সুরু হতে না হতেই বাড়ীতে বাড়ীতে, অফিসে, দোকানে সবখানেই দেয়ালে নতুন ক্যালেণ্ডার ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। পুরনো বছরকে বিদায় দিয়ে নতুন বছরকে সাদরে আহ্বান জানানো হয় বিচিত্র ক্যালেণ্ডার সজ্জার মধ্য দিয়ে।

ক্যালেণ্ডার বস্তুটা কিন্তু বেশ পুরনো। দু-হাজার বছর আগে দিগ্বিজয়ী বীর জুলিয়াস সিজার কালের ইতিহাসে তাঁর রাজত্বকালটাকে চিহ্নিত করবার জন্যে খৃষ্টে জন্মের ৪৫ বছর আগে প্রথম সাল তারিখ নিয়ে মাথা ঘামাতে আরম্ভ করেন। সিজারের ক্যালেণ্ডার চলেছিল অনেক দিন পর্যন্ত। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে এই ক্যালেণ্ডারের কিছু কিছু অসুবিধার কথা ভেবে পোপ গ্রেগরী তাঁর নতুন ক্যালেণ্ডারের প্রবর্তন করেন। পোপ গ্রেগরী হিসাব করে দেখলেন যে, তখনকার দিনের হিসাবে বছরের গড় আয়ু ৩৬৫.২৫ দিন ধরে নিলেও আসলে বছর হলো ৩৬৫.২৪২২ দিন। এইটুকু ভুল থেকে গেলে কালে দিনে ভুলের বোঝা বেড়ে যাবে অনেকখানি। তাই তখনকার ১৫৮২ সালের ৫ই অক্টোবর তারিখকে পাল্টে করে দিলেন ১৫৮২ সালেরই ১৫ই অক্টোবর। ভবিষ্যতে যাতে আর ভুল না হয়, সেজন্যে ঠিক করলেন যে, ৪০০ বছরে ৯৭টি বছরকে লিপ ইয়ার বলে গণ্য করা হবে। ১৭০০,১৮০০,১৯০০ ইত্যাদি যেসব বছরগুলি ৪০০ দিয়ে বিভাজ্য নয়, সেগুলি লিপ ইয়ারের আওতা থেকে বাদ যাবে।

পোপ গ্রেগরী প্রবর্তিত ক্যালেণ্ডার কিন্তু সর্বদোষমুক্ত নয়। বছরের বারো মাসের মধ্যে ফেব্রুয়ারী মাসটাকে খাটো করা হয়েছে। তাই লিপ ইয়ার ছাড়া অন্য বছরগুলিকে তিন মাস করে ভাগ করলে জানুয়ারী থেকে আরম্ভ করে প্রথম ভাগে পড়বে ৯০ দিন, ২য় ভাগে পড়ে ৯১ দিন, তৃতীয় ভাগে ৯২ দিন, চতুর্থ ভাগেও তাই ৯২ দিন। অর্থাৎ

বছরটাকে দু-ভাগ করলে প্রথম ভাগে পড়ছে ১৮১ দিন, দ্বিতীয় ভাগে ১৮৪ দিন।

গ্রেগরীর ক্যালেণ্ডারের এই নীতিবৈষম্য ভারতবর্ষ প্রথম ১৯৫৩ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ইকনমিক অ্যাণ্ড সোশ্যাল কাউন্সিলের কাছে পেশ করে। ভারত যে ক্যালেণ্ডারের প্রস্তাব আনলো তাতে বছরকে সমান চারভাগে ভাগ করা হলো, প্রতি ভাগে থাকবে ৯১ দিন। প্রতি ভাগের তিন মাসের মধ্যে একটিতে থাকবে ৩১ দিন, বাকী দুটিতে ৩০ দিন করে। এই হিসাবে দেখা গেল বছরে ৯১ × ৪ = ৩৬৪ দিনের হিসাব মিলছে, অথচ বছরে তখনও ১টা দিন বাকী থাকে। এই একটা দিনকে কোন মাসের অংশ হিসেবে গণ্য না করে ডিসেম্বর মাসের শেষে জুড়ে দেবার প্রস্তাব করা হলো। লিপ ইয়ারের বাড়্‌তি দিনটাকে জোড়ানো হবে জুন মাসের শেষে। এই ক্যালেণ্ডারের নাম প্রস্তাব করা হলো 'বিশ্ব ক্যালেণ্ডার'। ডিসেম্বরের শেষের বাড়্‌তি দিন ও লিপ ইয়ারে জুনের শেষের বাড়্‌তি দিন দুটিকে আখ্যা দেওয়া হবে 'বিশ্বদিবস' হিসাবে।

ভারতের এই প্রস্তাবে বিরোধিতা করলেন অনেকে। করবার কারণও ছিল। 'বিশ্বদিবস' দুটি ক্যালেণ্ডারের অংশ না হওয়ায় ও কোন মাসের সঙ্গে যোগ না থাকায় দিন দুটি যেন অনাথের মত থাকবে। ইহুদি কাউন্সিল ও খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীরা রবিবারটাকে এভাবে হেরফের করাতে চাইলেন না আর অন্যেরা বছরটাকে চার ভাগে ভাগ করাবার মধ্যে কোন লোভনীয় যুক্তিও খুঁজে পেলেন না। ভারতের প্রস্তাব প্রস্তাবই রয়ে গেল।

এই সব আপত্তি কাটিয়ে ভারত আর একটি নতুন প্রস্তাব আনবার চেষ্টা করছে। তাতে বিশ্ব ক্যালেণ্ডারের সব চরিত্রই থাকবে, কেবল ডিসেম্বরের শেষের বাড়্‌তি দিনটাকে অনাথ না রেখে ডিসেম্বরের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে ডিসেম্বরের অংশ হিসাবে। লিপ ইয়ারে জুনের বেলাতেও তাই-ই করা হবে।

এই নতুন পদ্ধতিতে বছরকে যে চার ভাগ করা হলো তাতে প্রতি ভাগে পর পর ৯১, ৯১, ৯১ ও ৯২ দিন থাকছে। লিপ ইয়ারে ৯১, ৯২, ৯১, ৯২ এই পর্যায় হচ্ছে। বছরকে এর থেকে আর সুন্দর করে ভাগ করা সম্ভব নয়।

সপ্তাহে সাতটা দিন আর বছরে ৩৬৫টা দিন। ৩৬৫, ৭ দিয়ে সম্পূর্ণ বিভাজ্য নয়—সাধারণ বছরে একটা দিন ও অন্যান্য বছরে দুটি করে দিন বাড়্‌তি থেকে যায় সপ্তাহের সাতদিনের হিসাবে। তাই 'চিরন্তন' ক্যালেণ্ডার করবার একটা বাধা রয়েছে আমাদের। অথচ এটা করতে পারলে বছর বছর নতুন ক্যালেণ্ডার দেয়ালে টাঙাবার প্রয়োজন হতো না। বছরকে যদি ৩৬৫ দিন না ধরে ৩৬৪ দিন ধরা যেত, পাঁচ বছর অন্তর লিপ ইয়ার করা হতো আর ৪০ বছর বাদের লিপ ইয়ারটি থেকে বাড়্‌তি দিনটাকে ছাঁট্ দেওয়া হতো, তবে চিরন্তন ক্যালেণ্ডার খানিকটা রূপ নিতে পারতো। কিন্তু এসব করলে ধর্মীয়, অর্থনৈতিক নানান ধরণের জটিল সমস্যা জড়িয়ে পড়ে, তাই এপথে অগ্রসর হওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। বিশেষ করে ক্যালেণ্ডার জিনিস পৃথিবীর জিনিস, ভারতের একার সম্পত্তি তো নয়!

প্রাচীন রোমান ক্যালেণ্ডার সুরু হয়েছিল মহাবিষুব দিন থেকে যেদিন দিন ও রাত্রি সমান দীর্ঘ হয়—দিনটা খুব সম্ভবত ২৫শে মার্চ। তখন বছরের দিনের সংখ্যা সূক্ষ্ম বিচারে কটা আসবে জানা না থাকায়, কয়েক বছর বাদেই বছরের প্রথম দিনটি মহাবিষুব দিন থেকে সরে গেল। জুলিয়াস সীজার সিংহাসনে বসে নিজেই ক্যালেণ্ডার সংশোধনের কাজে মন দিলেন। তিনি হিসাব করে দেখলেন একটা বছর আসলে ৩৬৫·২৫টি দিনের সমষ্টি। চার বছরের মধ্যে

তিনটি বছরকে ৩৬৫ দিন ও একটি বছরকে ৩৬৬ দিন ধরলে হিসাবে মিলে যায়। সিজার বছরের সুরু করলেন ১লা জানুয়ারী থেকে। কেন করলেন তার বৈজ্ঞানিক কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে জেনাস, যাঁর নামে জানুয়ারী মাসের নাম করা হয়েছে, তিনি হলেন গিয়ে স্বর্গরাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার মালিক—তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ স্বর্গে প্রবেশ লাভের অনুমতি পাবে না। স্বর্গে যেতে গেলে প্রথমেই তাঁর সাক্ষাৎ মিলবে। এই হিসাবে বছরের প্রথম মাস জানুয়ারী করা হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন।

৫৩২ খৃষ্টাব্দে রোমের ধর্মযাজক ক্যালেণ্ডার নিয়ে পড়লেন। তিনি আবার ২৫শে মার্চে ফিরে আসতে চাইলেন বছরের গোড়ার দিন হিসাবে। এই হিসাবে যীশুখৃষ্টের জন্মদিন অনুমান করা হলো ২৫শে ডিসেম্বর।

বর্তমান দিনের ক্যালেণ্ডার সুরু করেছিলেন পোপ গ্রেগরী ১৩। তিনি ভালভাবে হিসাব করে দেখেছিলেন যে, জুলিয়াস সিজার বছরের দিন গণনায় খানিকটা স্থূল হিসাব করেছিলেন। একটা বছরকে তিনি ধরেছিলেন ৩৬৫·২৫ দিনের হিসাবে। আসলে একটা বছরের সমান হলো ৩৬৫·২৪২২ দিন। এই হিসাবে প্রতি ১২৮ বছরে পুরো একটা দিনের এদিক-ওদিক হয়ে যাবে। তখন ১৫৮২ খৃস্টাব্দ। জুলিয়াস সিজারের আসল হিসাব যেটা তখন পর্যন্ত তাতে মোট প্রায় দশদিনের গরমিল হয়ে যায়। তিনি ১৫৮২ খৃস্টাব্দের ৫ই অক্টোবর শুক্রবারকে সরাসরি ১৫ই অক্টোবর শুক্রবার করে দিলেন আর বছরের সুরু ধরা হলো ১লা জানুয়ারী থেকে।

পোপ গ্রেগরীর ক্যালেণ্ডারে ১লা জানুয়ারীকে প্রথম দিন হিসাবে ধরে নেবার মধ্যে কোন জ্যোতির্বিদ্যার হিসাব-নিকাশের ব্যাপার নেই, অথচ পৃথিবীর বছরটাকে জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবে সুন্দরভাবে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যদি আমরা মহাবিষুব দিনকে অর্থাৎ যেদিন দিন-রাত সমান দীর্ঘ হয়, সেই দিনকে বছরের প্রথম দিন বলে ধরে নিই, তবে বছরের সবচেয়ে বড় দিন, দিন-রাত্রি সমানের দিন আবার সবচেয়ে বড় রাত্রির দিন—এই কটা দিনকে চিহ্নিত করাতে পারলে বছরটা মোটামুটিভাবে চারটি সমান ভাবে ভাগ করা সম্ভব। এই ভাগগুলি আর কিছুই নয় পৃথিবীর আকাশে সূর্যের অবস্থান ও বছরের বিভিন্ন সময়ে এই অবস্থানের পরিবর্তনের সঙ্গে পূর্বে বর্ণিত চারটি দিনকে মিলিয়ে নেওয়া।

সূর্যের দক্ষিণ অয়নান্তের দিনে অর্থাৎ বছরের সবচেয়ে ছোট দিনে সূর্য বিষুবরেখার সবচেয়ে বেশী দক্ষিণে চলে যায়। এই তারিখটা হলো ২২শে ডিসেম্বর। এক হিসাবে এই দিনটাকে বছরের শেষ দিন অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বর ধরলে মন্দ হয় না। ২৩শে ডিসেম্বর হবে ১লা জানুয়ারী। এই হিসাবে চলে আসতে গেলে আমাদের নয়টা দিন দান করে দিতে হবে! ২১শে নভেম্বরের পরেই চলে আসতে হবে ১লা ডিসেম্বরে; অর্থাৎ নভেম্বর মাসের কপালে সে বছরে ২১টা দিন হবে।

এটা হয়ে গেলে খৃস্টানরা পড়বেন কিন্তু মহাফাঁপরে। তাঁরা বড়দিন উৎসব করবেন কোন্ দিনে? হিসাবে সবই বেরিয়ে আসবে ঠিকই। কিন্তু আমার মত আপনিও হয়তো বলবেন ২৫শে ডিসেম্বরেই বড় দিন হোক, কারণ যুগ যুগ ধরে চলে আসছে তারিখটা, ওটাকে হট্ করে পাল্‌টে দিলে বড় দিনের মাধুর্যটাই হয়তো বা নষ্ট হয়ে যাবে।

একটি সাধারণ বছরের বিশ্ব ক্যালেণ্ডার লিপ ইয়ারে জুন মাস ৩১ দিন হবে

জানুয়ারী

র	সো	মং	বু	বৃ	শু	শ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
২৯	৩০	৩১				

জুন

র	সো	মং	বু	বৃ	শু	শ
					১	২
৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

ফেব্রুয়ারী

র	সো	মং	বু	বৃ	শু	শ
			১	২	৩	৪
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		

জুলাই

র	সো	মং	বু	বৃ	শু	শ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
২৯	৩০	৩১				

মার্চ

র	সো	মং	বু	বৃ	শু	শ
					১	২
৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

অগাষ্ট

র	সো	মং	বু	বৃ	শু	শ
			১	২	৩	৪
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		

এপ্রিল

র	সো	মং	বু	বৃ	শু	শ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
২৯	৩০	৩১				

সেপ্টেম্বর

র	সো	মং	বু	বৃ	শু	শ
					১	২
৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

মে

র	সো	মং	বু	বৃ	শু	শ
			১	২	৩	৪
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		

অক্টোবর

র	সো	মং	বু	বৃ	শু	শ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
২৯	৩০	৩১				

নভেম্বর

র	সো	মং	বু	বৃ	শু	শ
			১	২	৩	৪
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		

ডিসেম্বর

র	সো	মং	বু	বৃ	শু	শ
					১	২
৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

রাজযক্ষ্মা নিরাময়কল্পে মল্লসিন্দুর

শ্রীসূর্যকান্ত রায়

আয়ুর্বেদ মহাসমুদ্রের তলদেশে ঔষধরূপী কতই না চমকপ্রদ রত্নরাজী আজও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। এইসব রত্ন, চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক-কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে সমস্যাবহুল কতকগুলি রোগের নিরাময়কল্পে চিকিৎসাক্ষেত্রে যখন প্রকাশ পাবে, তখন নিশ্চয়ই এরা বলিষ্ঠ ও সুষ্ঠু জীবন-যাত্রা গড়ে তোলবার পক্ষে নিঃসন্দেহে বিরাট অবদানরূপে গণ্য হবে। এই রত্নরাজির অন্যতম মল্লসিন্দুর আজো মানব-কল্যাণে নিযুক্ত চিকিৎসক সম্প্রদায় ও বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানের অপেক্ষায় রয়েছে। আয়ুর্বেদ-সংশ্লিষ্ট কোন্ প্রামাণ্য গ্রন্থে এই ঔষধের উল্লেখ আছে আমাদের সঠিক জানা নেই, কিন্তু মল্লসিন্দুরই বাংলা দেশের কিছু সংখ্যক কবিরাজ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ঔষধরূপে দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এই ঔষধ ঐ নামে বা অন্য নামে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না বা হলেও তাদের প্রয়োগক্ষেত্র সম্বন্ধে আমাদের সঠিক জানা না থাকায় আলোচ্য প্রবন্ধে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা সম্ভব হলো না। এর গুণাগুণ ও আময়িক প্রয়োগ, এই ঔষধের পৃথক পৃথক উপাদানের গুণাগুণ বিচার করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই সামগ্রিক ঔষধটির ব্যবহারিক প্রয়োগ স্থির করতে হবে।

উপাদান ও প্রস্তুত-প্রণালী

খনি থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্ত সুপরিচিত শঙ্খিয়া বা দারমুষরূপী সাদা আর্সেনিক নামক যৌগিক পদার্থের অপর নাম গৌরীপাষাণ। এর অন্যান্য নামের মধ্যে মল্ল অন্যতম। পারদ ও গন্ধকের সংমিশ্রণে প্রস্তুত সুপ্রসিদ্ধ রসসিন্দুরকে সংক্ষিপ্ত অথবা সাঙ্কেতিক অর্থে সিন্দুর বলা হয়। অতএব সহজেই একথা অনুমান করা যায় যে, মল্ল ও সিন্দুরের পদার্থ থেকে উদ্ভূত এই যৌগিক পদার্থকে মল্লসিন্দুর নামে অভিহিত করা খুবই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। এর প্রস্তুতিতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি: (১) শোধিত পারদ ৮ তোলা (আনুমানিক ৯৬ গ্রাম), (২) শোধিত আমলাসা গন্ধক ৮ তোলা, (৩) শোধিত মল্ল ১ তোলা (১২ গ্রাম)। একটি সুদৃঢ় প্রশস্ত প্রস্তর-খলে পারদ, গন্ধক ও মল্ল একত্রে ধীরে ধীরে মর্দন করে সূক্ষ্ম ধূলার মত কৃষ্ণ বর্ণ চূর্ণে (কজ্জলী)

পরিণত করতে হবে। অতঃপর বাইরের দিকে কাদার পুরু প্রলেপ দেওয়া একটি কাচকূপীর ভিতর এই চূর্ণ স্থাপন করতে হবে। কাচ-কূপীটি একটি সমউচ্চতাসম্পন্ন মাটির হাঁড়ির মধ্যে রাখতে হবে। হাড়িটির তলদেশের মধ্য ভাগে একটি ছিদ্র থাকা প্রয়োজন। তার পর ঐ কাচকূপীর গলদেশ পর্যন্ত হাঁড়ির শূন্যাংশ বালুকা পূর্ণ করে হাঁড়িটি চুল্লীর উপর স্থাপন করবার পর রসসিন্দুর ও স্বর্ণসিন্দুর প্রস্তুতের ন্যায় কাঠের তীব্র আঁচে অবিরাম জ্বাল দিতে হবে। আগুনের তাপ ঠিকমত বজায় রাখতে পারলে ৬ থেকে ৮ ঘন্টার মধ্যে পাক নিষ্পন্ন হয় এবং পাক শেষে যা পাওয়া যায় তা দৃশ্যতঃ অবিকল মকরধ্বজ বা রসসিন্দুরের ন্যায়—পার্থক্য কেবল এই যে, এটি মকরধ্বজ অপেক্ষা অধিক কঠিন। চূর্ণ করলে উভয়েই সিন্দুরের ন্যায় লাল সূক্ষ্ম ধূলিবৎ পদার্থে পরিণত হয়। মল্ল ও সিন্দুরের সংমিশ্রণে পাকবিশেষে উৎপন্ন এই পদার্থই মল্লসিন্দুর নামক ঔষধরূপে বাংলা দেশের কবিরাজ সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

গুণ ও চিকিৎসার্থে ব্যবহার

ঔষধটির গুণাগুণ বিষয়ে আলোচনার পূর্বে এর মৌলিক উপাদানগুলির পৃথক পৃথক গুণাগুণ নির্ণয় করতে পারলে হয়তো ঔষধটির গুণাগুণ নির্ণয়ে সহায়তা হতে পারে।

পারদ ও গন্ধকের সংমিশ্রণে প্রস্তুত রস সিন্দুরের গুণাগুণ ও আময়িক প্রয়োগ (চিকিৎ-সার্থ ব্যবহার) সকলেরই সুবিদিত। সুতরাং এর বিস্তারিত আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। রস-চিকিৎসার প্রামাণ্যগ্রন্থ 'রসেন্দ্র সার সংগ্রহে' মল্লের গুণাগুণ বিষয়ে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। 'রসরত্ন সমুচ্চয়ে' তিন প্রকার গৌরী-পাষাণের উল্লেখ দেখা যায়; যথা—পীত, বিকত ও হতচেতনক। এদের মধ্যে হতচেতনকই শুভ্র, শ্রেষ্ঠ এবং অধিক ফলদায়ক। একেই সাদা আর্সেনিক বলা যেতে পারে। কিন্তু এই গ্রন্থে গৌরী পাষাণের অপর নামগুলির মধ্যে মল্ল শব্দের উল্লেখ দেখা যায় না। এর গুণ বিষয়ে বলা হয়েছে যে, এটা স্নিগ্ধ, ত্রিদোষ-নাশক (বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রকোপের হ্রাস) এবং পারদের শক্তিবর্ধক। কিন্তু রোগনিরাময়ের ক্ষেত্রে এর ব্যবহারের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। কবিরাজ নরেন্দ্রনাথ মিত্র বিরচিত 'রসতরঙ্গিনী' নামক গ্রন্থে গৌরীপাষাণ বা শঙ্খবিষের বহুবিধ পর্যায়ের শব্দগুলির মধ্যে মল্লের উল্লেখ দেখা যায়। এই গ্রন্থে এর গুণাগুণ ও রোগনিরাময়-শক্তির যেরূপ বিশদ আলোচনা দেখা যায়, তা অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। রোগনিরাময়ে এর বহুল ব্যবহারের মধ্যে দেখা যায় যে, তা তমকশ্বাস (হাঁপানি), কুষ্ঠ, শ্লীপজোৎপিত জ্বর (ফাইলেরিয়া জ্বর), সন্ধিবাত, ফিরঙ্গ (সিফিলিস ও সিফিলিসজনিত রোগ-সমূহ), বিষমজ্বর ও জীর্ণজ্বর, হৃৎশূলজ জ্বর, হৃৎ-দৌর্বল্য বিনাশ করে থাকে এবং এটি কাম-শক্তি বর্ধক। তাছাড়া বলা হয়েছে—'অতিসারম নিহন্ত্যাশু' অর্থাৎ অতিসার রোগ শীঘ্র নিরাময় হয় এবং 'দ্রুতমারন্ত বেলায়াম যক্ষ্মানামপি নাশয়েৎ' অর্থাৎ যক্ষ্মারোগের সূচনাতেই প্রয়োগ করলে তা যক্ষ্মারোগ বিনাশ করে। বহির্দেশে প্রলেপের দ্বারা এটি উত্তম ক্ষারকর্মের কাজ করে।

পূর্ববর্ণিত বহুবিধ রোগনিরাময় ব্যবস্থার উল্লেখ থাকলেও, কবিরাজ সম্প্রদায়ের নিকট এর ব্যবহার বেশ সীমাবদ্ধ। দেখা যায়, কেউ এটি গ্রহণীরোগে, আবার কেউ বা এটি ফিরঙ্গ ও ফিরঙ্গজনিত রোগে ব্যবহার করে থাকেন।

হাসপাতালে এটি বহুকাল যাবৎ শ্বাস (হাঁপানি) রোগে সফলতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়েছে

যে, এটি ইউসিনোফিলিয়া অ্যাস্‌মা (হাঁপানি) রোগেই বিশেষ ফলপ্রদ। এর প্রয়োগে খুব অল্পসময়ের মধ্যে রক্তের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ইউসিনোফিলিয়া কমে আসে। বাতব্যাধির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করে বেশ আশাপ্রদ ফল পাওয়া গেছে।

যক্ষ্মারোগে এটির যেরূপ উৎসাহব্যঞ্জক উপকারিতার কথা বলা হয়েছে, তাতে মনে হয় যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারলে এটি যক্ষ্মারোগের জ্বর, শ্বাসকষ্ট, অতিসার এবং অগ্নিমান্দ্য দূরীকরণে বিশেষ সহায়ক হবে। আরও অনুমান করা যায় যে, যক্ষ্মারোগের বীজাণুনাশ বা তাদের স্থানান্তরে বিস্তারলাভ প্রতিরোধ করতে এটি শক্তিশালী হবে—অবশ্য তা বিশদভাবে অনুধাবনসাপেক্ষ। যক্ষ্মারোগ নিরাময়ে এর এরূপ শক্তির পরিচয় লাভের পর যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায় তা প্রয়োগের বিষয় মনে আকাঙ্খা জাগা খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং এর গুণবত্তার সন্ধান লাভের পর এটি কতিপয় রোগীর উপর প্রয়োগ করা হয়। এই পরীক্ষাকার্য পাতিপুকুর যক্ষ্মা হাসপাতালে দশটি রোগীর উপর করা হয়। ফলাফলে দেখা যায়, ৪টি রোগীর ক্ষেত্রে জ্বরের তীব্রতা কমে তা স্বাভাবিক অবস্থায় আসে, শ্বাসকষ্ট প্রশমিত হয় এবং ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়; ১টি রোগীর ক্ষেত্রে জ্বরের তীব্রতা কমে আসে, শ্বাসকষ্ট প্রশমিত হয় কিন্তু শেষ ফলাফল নির্ণয়ের পূর্বেই রোগীর রক্তবমন থেকে মৃত্যু হয়; আর ১টি রোগীর জ্বরের তীব্রতা তত বেশী ছিল না, তবে ক্ষুধামান্দ্য, কাশি প্রভৃতি উপসর্গগুলি বেশ বিদ্যমান ছিল। এর ক্ষেত্রে সামান্য ক্ষুধার উদ্রেক ব্যতিরেকে আর কোন উন্নতি লক্ষিত হয় নি; অন্য ১টি রোগীর অত্যন্ত রক্তশূন্যতা, সন্ধিসমূহে বেদনা ও ক্ষুধামান্দ্য ছিল; বেদনা এত তীব্র ছিল যে, রোগী শয্যা থেকে উঠতে পারতো না—ছয় সপ্তাহ এই ঔষুধ সেবনের পর তার বেদনার অনেক উপশম হয় এবং চলাফেরা করতে সক্ষম হয়। অন্য ৩টি রোগীর ক্ষেত্রে এর পরীক্ষাকার্য চালানো সম্ভব হয় নি: কারণ এদের মধ্যে শরীরে কোঠ (চুলকানি—Rash) উৎপন্ন হয়; অপর দু-জনের চিকিৎসার ফলাফল বিচার করবার পূর্বেই তারা হাসপাতাল ত্যাগ করে। এদের মধ্যে একজনের তীব্র অতিসার বহুলাংশে প্রশমিত হয়। প্রথমোক্ত চারটি রোগীর মধ্যে একজনের রক্ত-পরীক্ষায় ইওসিনোফিলিয়া ৩৫ শতাংশ ছিল, এই চিকিৎসায় তা নেমে ৪ শতাংশে দাঁড়ায়। একটি রোগীর তীব্র জ্বর ছিল। 'প্রেড্‌নিসোলন' নিয়মিত ব্যবহার করে জ্বরের তীব্রতা হ্রাস করে রাখা হতো। প্রেড্‌নিসোলন বন্ধ করে কেবলমাত্র মল্লসিন্দুর প্রয়োগের দ্বারা তার জ্বরের উপশম হয় এবং অন্যান্য উপসর্গগুলি কমে আসে। আর একটি রোগীর ক্ষুধাবৃদ্ধিও বেশ লক্ষিত হয় এবং অপর একজনের রাজযক্ষ্মাসহ সন্ধিসমূহে তীব্র বেদনা অনুভূত হতো। মল্লসিন্দুর প্রয়োগে সেই সন্ধিবাত বহুলাংশে প্রশমিত হয়।

আলোচনা

উপরে লিখিত চিকিৎসার আলোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, আনুষঙ্গিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এটি উপযুক্তভাবে প্রযুক্ত হলে রাজযক্ষ্মা রোগের জ্বর, শ্বাসকষ্ট, ক্ষুধামান্দ্য, অতিসার এবং কাশি প্রশমনে বিশেষ কার্যকর হবে। এর মাত্রা নিরূপণ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। রোগীর পক্ষে সঠিক মাত্রা নিরূপণ পরীক্ষাসাপেক্ষ। ঐ সকল রোগীর মধ্যে এই ঔষধের মাত্রা $\frac{1}{16}$ গ্রাম থেকে $\frac{1}{8}$ গ্র্যামের মধ্যে সীমিত রাখা হয়েছিল। এই ঔষধ প্রয়োগকালে রোগীর পথ্যের দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। প্রধানত নিরামিষ আহার করাই বাঞ্ছনীয় এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ, ঘোল ও ঘৃত সেবন বিধেয়। পিত্তবর্ধক সকল পথ্য বর্জন করা উচিত।

আশা করা যায় যে, উপযুক্ত গবেষণার মাধ্যমে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে করাল ব্যাধি রাজযক্ষ্মা নিরাময়ে এই ভেষজ এক বিশেষ অবদান হিসাবে পরিগণিত হবে।

[এই প্রবন্ধে রচনার সাহায্য ও সহযোগিতার জন্যে পাতিপুকুর যক্ষ্মা হাসপাতাল (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর), শ্রীমাধবেন্দ্র নাথ পাল, কবিরাজ শ্রীরবীন্দ্রমোহন গোস্বামী, ডাঃ মদনপ্রসাদ চৌধুরীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।—লেঃ]

সঞ্চয়ন

অন্ধজনের জন্যে অভিনব যন্ত্র

মানুষ আজ গ্রহান্তরে যাবার পথ তৈরি করছে, অদৃশ্য আলোকে লক্ষ যোজন দূরের তারকারও আলোকচিত্র গ্রহণ করতে পারছে। আর এমন যন্ত্র সে আবিষ্কার করছে যা অশ্রুত ধ্বনিতেও সাড়া দেয়; কিন্তু এই পৃথিবীতে যে মানুষেরা দৃষ্টিহীন, তারা যাতে দেখতে পারে এরকম কোন বিকল্প ব্যবস্থা আজও উদ্ভাবন করতে পারে নি।

কোন ব্যবস্থা না হলেও এক্ষেত্রেও বিজ্ঞানীরা এগিয়ে চলেছেন—অন্ধজনকে আলোর সন্ধান দেবার জন্যে বহু রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। তারা যাতে একলা পথ চলতে পারে, পড়াশুনা করতে পারে, তারই জন্যে বহু যন্ত্রপাতি ও ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছে।

অন্ধজনেরা ব্রেল পদ্ধতিতে যে পড়াশুনা করেন তা সকলেই জানেন। এই পদ্ধতিতে কাগজের উপর ফুট্‌কি দিয়ে অক্ষর বোঝানো হয়। এই ফুট্‌কিগুলি কাগজের উপরে উঁচু হয়ে থাকে। তাদের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে অন্ধজনেরা লিখিত বিষয়ের মর্ম উপলব্ধি করে।

আমেরিকার লাইব্রেরী অব কংগ্রেস ১৯৩১ সাল থেকে ব্রেল পদ্ধতিতে মুদ্রিত হাজার হাজার বই নানা দেশের অন্ধজনকে দিয়ে আসছে এবং রেকর্ড ও টেপ পাঠাচ্ছে। ঐ গ্রন্থাগার থেকে অন্ধজনদের জন্যে ৩০টি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রতি বছর বহু নূতন পুস্তকও তারা প্রকাশ করে থাকে।

প্রথম যুগে টাইপিষ্টগণ ব্রেল পদ্ধতিতে পুস্তক টাইপ করতে হলে তা পান্‌চিং মেশিনের সাহায্যে করতেন। তাতে অনেক সময় লাগতো। বর্তমানে এই কাজটি অতি দ্রুত কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যে হয়ে থাকে। কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যে ঘণ্টায় ৩০০ পাতা পর্যন্ত ছাপা হতে পারে।

টেনেসির ন্যাশভিলস্থিত জর্জ পীবডি কলেজ কর্তৃক আরও শক্তিশালী যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে এবং ম্যাসাচুসেট্‌স্-এর ওয়াটার টাউনস্থিত হাওয়ে প্রেস ফর দি ব্লাইণ্ড অন্ধদের পুস্তক ছাপাবার একটি শক্তিশালী কম্পিউটার যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে।

অন্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা সকল প্রকার স্কুলপাঠ্য পুস্তক যাতে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের মতই পেতে পারে এবং স্কুলের পাঠ তাদেরই সঙ্গে অনুসরণ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করাই হবে এই যন্ত্রের প্রধান কাজ।

ম্যাসাচুসেট্‌স্ ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজী অন্ধজনদের পুস্তক মুদ্রণের আরও উন্নত ধরণের

পন্থা উদ্ভাবন করেছেন। ঐ ব্যবস্থায় অটোমেটিক পদ্ধতিতে মিনিটে ১৯০টি শব্দ ছাপা হতে পারে।

ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারগণ একটি স্বয়ংক্রিয় রিডিং মেসিন উদ্ভাবনে ব্রতী হয়েছেন। ঐ ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় পুস্তকের পাতায় অক্ষর সমূহকে ব্রেল পদ্ধতিতে অথবা শব্দে রূপান্তরিত করা যাবে। যে সকল বৃদ্ধ ব্রেল পদ্ধতিতে পড়তে চান না—তারা কানে শুনেই সব কিছু আয়ত্ত করতে পারবেন। এছাড়া অন্যান্য ছাত্রদের মতই অন্ধ ছাত্ররাও যাতে গড় গড় করে পড়ে যেতে পারে, তারই জন্যে যন্ত্রাদি উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছে। নিউইয়র্কের বেল টেলিফোন লেবরেটরিজ এবং নিউইয়র্কের ইনফরট্রনিক সিস্টেমস কোম্পানী এই বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে।

অন্ধজনেরা যাতে সহজে পথেঘাটে চলাফেরা করতে পারে তারই উদ্দেশ্যে নানা প্রকারের যন্ত্র উদ্ভাবনেরও চেষ্টা হচ্ছে। নিউ-জার্সির প্রিন্সটনস্থিত আর. সি. এ লেবরেটরিজ এবং পেনসিলভ্যানিয়ার বায়োনিক ইনস্ট্রুমেন্টস কোম্পানী 'লেসার কেন' নামে এক প্রকার যান্ত্রিক লাঠি নির্মাণ করেছেন। এই যষ্টির হাতলে থাকবে ছোট ছোট পিন। অন্ধেরা এই লাঠি নিয়ে যখন পথে চলবেন তখন তাদের সামনে কিছু পড়লে ঐ সকল পিনে কম্পন শুরু হবে। ঐ কম্পনের মাত্রা থেকেই তারা কি ধরণের বাধা তাদের সামনে রয়েছে, তা জানতে পারবেন, তাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন। ঐ ধরণের আর এক প্রকার যন্ত্রে অশ্রুত শব্দ উৎপন্ন হয়; অর্থাৎ শব্দ-তরঙ্গের কম্পন এত দ্রুত হয়ে থাকে যে, তা শ্রুতিগোচর হয় না। এই সকল যষ্টি ব্যবহারে অভ্যস্ত অন্ধজনেরা এর সাহায্যে কেবলমাত্র কোথায় পথের বাধা রয়েছে, তার সঠিক স্থান নির্দেশই নয়—কি ধরণের বাধা অর্থাৎ তঁ'র স্বরূপ ও আকৃতি-প্রকৃতির কথাও তারা বলে দিতে পারবেন।

মহাকাশ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণার ফলেই অন্ধজনদের জন্যে এই ধরণের যন্ত্রপাতি এবং উন্নত ধরণের কম্পিউটার যন্ত্রাদির উদ্ভাবন সম্ভব হচ্ছে।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে যন্ত্রপাতির সাহায্যে অন্ধ-জনদের দৃষ্টিহীনতার দুঃখ মোচনের নূতন সম্ভাবনা যেমন দেখা যাচ্ছে, তেমনি শল্য-চিকিৎসা দ্বারাও তাদের চক্ষুদান নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এই বিষয়টি পর্যালোচনা করে দথবার জন্যে ইউ. এস. ন্যাসন্যাল ইনষ্টিটিউট অব নিওরোলোজিক্যাল ডিজিজ অ্যাণ্ড ব্লাইণ্ডনেস একটি কমিশন নিয়োগ করেছেন। বোষ্টনের সোশ্যাল অ্যাণ্ড টেকনিক্যাল ইনোভেশনের উপর এই কাজের ভার দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া ওয়াশিংটনের ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমি, ন্যাশন্যাল রিসার্চ কাউন্সিল এই বিষয়ে তথ্যানু-সন্ধানের জন্যে একটি সাব কমিটি নিয়োগ করেছে। তারপর অন্ধজনদের জন্যে যে সকল যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হয়েছে, সেগুলির কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখা ও মূল্যায়নের জন্যেও মার্কিন স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জনকল্যাণ দপ্তরের বৃত্তিমূলক পুনর্বাসন সংস্থা একটি কেন্দ্র স্থাপন করেছে।

রসায়ন-বিজ্ঞান পড়াবার নূতন পদ্ধতি

পৃথিবীর বহু উন্নতিশীল রাষ্ট্রেই রসায়ন-বিজ্ঞানের পড়াশুনা কেবলমাত্র বইয়ের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই কোন গবেষ-ণাগার না থাকায় মাষ্টারমশায়দের হাতে-কলমে বোঝাবার সুযোগ হয় না, তাঁরা বক্তৃতা দিয়েই রসায়ন-বিজ্ঞানের সকল বিষয় বোঝাবার চেষ্টা

করে থাকেন। অর্থাভাবেই এই সকল বিদ্যালয়ের পক্ষে গবেষণাগার গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

আমেরিকার জনৈক অধ্যাপক সম্প্রতি এই অভাব পূরণের জন্যে অতি অল্প খরচে হাতে-কলমে গবেষণার মাধ্যমে রসায়ন-বিজ্ঞান চর্চার উপায় উদ্ভাবন করেছেন। একটি বিদ্যালয়ের একটি ক্লাসের এই বিষয়ে সারা বছরের পড়াশুনা বা গবেষণার মাধ্যমে রসায়ন-বিজ্ঞান চর্চার জন্যে পাঁচ ডলারের বেশী খরচ পড়বে না। এই খরচে বছরে কয়েক-শ' গবেষণাই করা যাবে। যে সকল বিদ্যালয় অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল, শিক্ষাদানের ব্যাপারে এই নূতন পদ্ধতি তাদের পক্ষেও সহায়ক হবে।

এই নূতন পদ্ধতির উদ্ভাবক নিউজার্সির প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ হিউবার্ট এন. আলেয়া ইতিমধ্যেই পৃথিবীর ৪০টিরও বেশী রাষ্ট্রে এই নূতন শিক্ষণ-পদ্ধতি দেখিয়ে এসেছেন।

এই পদ্ধতিতে রসায়ন-বিজ্ঞানের মূল নীতি-সমূহ হাতে-কলমে গবেষণা করে ছাত্রদের দেখানো হয়, কেবলমাত্র বক্তৃতা দিয়ে বোঝানো হয় না। প্রত্যেকটি ছাত্রেরই গবেষণা দেখে ও তাতে অংশ গ্রহণ করে রসায়ন-বিজ্ঞান চর্চার সম্পর্কে কৌতূহল ও আগ্রহ উদ্দীপিত হয়। ডাঃ আলেয়াও এই প্রসঙ্গে বলেছেন—কেবল-মাত্র পাঠ্যবই নয়, টেষ্ট টিউব, বীকার ও গবেষণার মাধ্যমে ছেলে-মেয়েদের রসায়ন-বিজ্ঞান শেখাতে হবে। গবেষণাগারে একটি বিস্ফোরণ দেখলেই শিক্ষার্থীরা এই বিষয়ে জানবার জন্য কৌতূহলী হয়ে ওঠে। তাদের আগ্রহের জন্যে অধীত বিষয়ে আগ্রহ জন্মাতে পারলেই শিক্ষকগণ ছাত্রদের এগিয়ে যাবার ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

এই পদ্ধতিতে 'ইউনিসেল' নামে প্লাস্টিকে তৈরী তিনটি খোপসমন্বিত একটি বাক্স ব্যবহৃত হয়। এটিকেই গবেষণাগার বলা যেতে পারে। বাক্সটি উচ্চতায় ১ ইঞ্চি, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৫ ইঞ্চি। অতি সস্তায় যে কোন জায়গায় এই ধরণের একটি বাক্স তৈরি করেও নেওয়া যেতে পারে।

বাক্সের এই তিনটি ভাগেই টেস্ট টিউব রাখা যায়। ঐ সকল টেস্ট টিউবে অথবা তিনটি খোপেই অতি অল্প পরিমাণে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ঘটে, বাক্সটি প্লাস্টিকে তৈরী বলে তা বাইরে থেকে দেখা যায় এবং একটি বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি পর্দার উপরে বর্ধিত আকারে তা প্রতিফলিত হয়। এই ব্যবস্থা অতি অল্প খরচে নিজেই তৈরী করে নেওয়া যেতে পারে।

ইউনিসেলের বিভিন্ন খোপে রাসায়নিক পদার্থসমূহের মধ্যে যখন বিক্রিয়া ঘটে তখন কখনও হয়তো তরল পদার্থ গ্যাসে রূপান্তরিত হয় অথবা রঙীন পদার্থের রং পাল্টে যায়। এ সকলই ছাত্র-ছাত্রীরা পর্দার উপরে দেখতে পায়। ছোট্ট একটি বুদ্বুদ একটি কমলা লেবুর মত দেখায়।

এই সকল গবেষণার জন্যে ৬১ রকম রাসায়নিক উপাদানের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া থার্মোমিটার, রুলার, ল্যাম্প প্রভৃতি উপকরণের সাহায্যও নিতে হয়। এই সকল উপকরণ রাখা হয় আর একটি ছোট্ট বাক্সে।

এই ৬১ রকম উপাদানের প্রায় অর্ধেকই অধিকাংশ সহজেই পাওয়া যায়। বাকী কঠিন উপাদানসমূহ বাজার থেকে সস্তায় কিনে নেওয়া যেতে পারে। রাসায়নিক পদার্থ সমূহ ২ আউন্সের বোতলে ভর্তি করে রাখলে তাতে সারা বছরেরই কাজ চলতে পারে।

বহু বিদ্যালয় একত্রিত হয়ে যদি এই সকল উপকরণ ও সাজসরঞ্জাম ক্রয় করে, তবে প্রাথমিক খরচের পরিমাণ খুবই কম হবে। তারপর এই ক্ষুদ্র গবেষণাগারটি গঠিত হবার পর সারা বছরে গবেষণা চালাবার জন্যে রাসায়নিক উপকরণের খরচ পাঁচ ডলারের বেশী পড়ে না। কারণ ব্যক্তি

গতভাবে গবেষণায় অতি অল্প পরিমাণ উপকরণ ব্যবহার করা হয়।

ডাঃ আলেয়া সম্প্রতি রাসায়নিক গবেষণা সম্পর্কে চিত্রসম্বলিত একটি পুস্তক ও প্রকাশ করেছেন। এতে কোন শব্দ নেই, কথা নেই, আছে মাত্র ছবি। প্রত্যেকটি গবেষণা ধাপে ধাপে কিভাবে করে যেতে হবে, তারই ড্রইং বা চিত্র। যে কোন ছাত্র বা শিক্ষক এই সকল চিত্র দেখেই কোন্ গবেষণাটি করবে তা স্থির করতে পারে। ডাঃ আলেয়া তাঁর গবেষণা-পদ্ধতির নামকরণ করেছেন 'টেস্টেড ওভারহেড প্রোজেকশন সিরিজ'।

যেখানে পয়সা-কড়ির অভাব, সেখানে মাষ্টার-মশাই নিজেই ঐ পদ্ধতিতে গবেষণা চালিয়ে ছাত্রদের পঠিতব্য বিষয় বুঝিয়ে দিতে পারেন। অথবা কোন একজন ছাত্রকে দিয়ে তিনি গবেষণা করিয়েও নিতে পারেন—অন্যান্য ছাত্র সেই গবেষণা নিরীক্ষণ করবে। তবে যে সকল বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল তারা গবেষণার জন্যে ঐ সকল সাজসরঞ্জামের একটি করে বাক্স বিদ্যার্থীদের দিতে পারেন।

এই পদ্ধতিতে রসায়ন-বিজ্ঞান পড়ানোর সুবিধা এই যে, ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যেখানে এক-শ'র মধ্যে, সেখানে পর্দার ৭৫ ফুট দূরে থেকেও ছাত্র-ছাত্রীরা প্রত্যেকটি গবেষণার প্রত্যেকটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে দেখতে পারবে এবং গবেষণার প্রত্যেকটি পর্যায় সম্পর্কে প্রশ্নাদি করতে পারবে। টেবিলের উপর গবেষণা করে ছাত্রদের দেখালে প্রত্যেকটি ছাত্রের পক্ষে প্রত্যেকটি বিষয়ে পুঙ্খানু-পুঙ্খানুভাবে নিরীক্ষণ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু ঐ পদ্ধতিতে পর্দায় এক একটি টেস্ট টিউব দেখায় যেন ৬ ফুট লম্বা।

এই ধরণের গবেষণায় অতি অল্প পরিমাণে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। স্কুল-কলেজের রসায়নাগারে বহু ছাত্র-ছাত্রী একসঙ্গে গবেষণা করে, ফলে যে ধোঁয়া, দুর্গন্ধ, দমবন্ধ করা গ্যাস দেখা দেয় ও বিস্ফোরণাদি ঘটে, সে সকল ঘটবার সুযোগ এতে নেই, এই সকল সমস্যাও এতে দেখা দেয় না।

তারপর গবেষণাগারের কাজকর্মে সাহায্য করবার জন্যে এবং গবেষণার পর গবেষণাগার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবার জন্যে যে অতিরিক্ত লোক-জন রাখবার প্রয়োজন হয়ে থাকে, ডাঃ আলেয়া কর্তৃক উদ্ভাবিত এই ব্যবস্থায় তারও কোন প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া অতি অল্প পরিমাণ উপকরণ ব্যবহৃত হয় বলে গবেষণাসমূহ অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়ে থাকে। এতে জটিল সাজসরঞ্জাম দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভ্রান্ত করা হয় না—তাদের শেখানো হয় রসায়নশাস্ত্রের মূল কথা, রাসায়নিক পদ্ধতি। ইউনিসেলের ৬টি খোপে দুটি করে মোট ৬টি টেস্ট টিউবে রাখা হয়। একই সঙ্গে এক একটি টিউবে একটি করে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে মোট টি গবেষণা চালানো যেতে পারে।

বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া না গেলে মোটরগাড়ীর ব্যাটারীর সাহায্যে প্রোজেক্টরসমূহ চালু করা যেতে পারে।

রসায়নশাস্ত্র-চর্চার ক্ষেত্রে পৃথিবীর নানা দেশের হাজার হাজার শিক্ষক এই প্রণালীতে শিক্ষা দিচ্ছেন।

ফেজ-কনট্রাষ্ট মাইক্রোস্কোপ

শ্রীভাগবতচন্দ্র মাইতি

ছোট বস্তুকে বড় আকারে দেখবার যন্ত্রকে বলে মাইক্রোস্কোপ বা অণুবীক্ষণ যন্ত্র। সাধারণতঃ লেখা প্রভৃতি বড় করে দেখবার জন্যে আতসী কাচ ব্যবহৃত হয়। এই আতসী কাচকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে উত্তল লেন্স। অবশ্য পরীক্ষাগারে যে সব অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করা হয় সেগুলি খুবই জটিল।

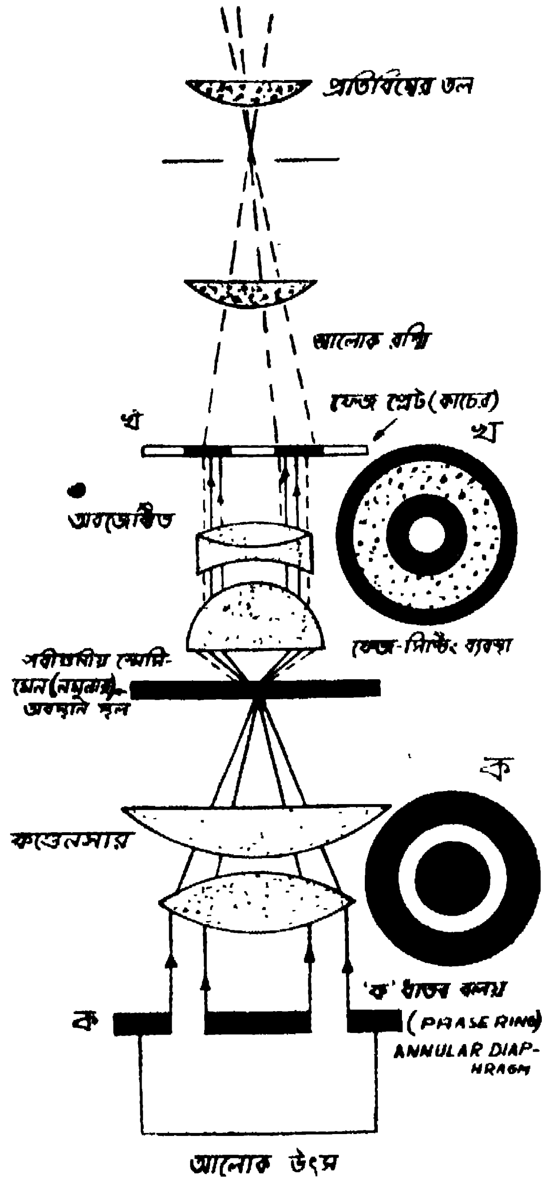
অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রধান কার্যকরী নীতি হলো—যে বস্তুকে দেখা হবে তাকে সাধারণ দৃশ্য আলোকের দ্বারা আলোকিত করা দরকার। ঐ বস্তু থেকে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে কয়েকটি উত্তল লেন্সের সাহায্যে গঠিত অবজেকটিভ ও আই-পিসে বড় প্রতিবিম্ব উৎপন্ন করবে। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অনেক উন্নতি হয়েছে সন্দেহ নেই। এই যন্ত্রে কোন বস্তুকে যতগুণ বড় দেখায় তাকে ঐ যন্ত্রের বিবর্ধন ক্ষমতা (Magnifying power) বলে। কোন কোন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা কোন বস্তু হাজার গুণ বা আরো বেশী বড় আকারে দেখা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তা কাজের হয় না—কারণ হাজার গুণের বেশী বিবর্ধন ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্রে কোন বস্তুর বিভিন্ন অংশগুলির কোন বৈশিষ্ট্য পৃথকভাবে ধরা পড়ে না, শুধু একটি উজ্জ্বল অংশ ধরা যায় মাত্র, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় ব্ল্যাঙ্ক ইমেজ বলা হয়।

সুতরাং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিবর্ধন ক্ষমতা বেশী হলেই যন্ত্রটি ভাল, এই ধারণা ভুল। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আর একটি বড় গুণ থাকা দরকার, তা হলো বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা (Resolving power)। বিশ্লেষণ ক্ষমতার দ্বারা কোন বস্তুর অভ্যন্তরের সঠিক তথ্য জানা যায়। দৃশ্য আলোর দ্বারা সাধারণ মাইক্রোস্কোপে প্রতিবিম্ব গঠন করা হয়। ফলে কোন বস্তুর বিভিন্ন অংশ থেকে একই উজ্জ্বলতার আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে এলে তার বিভিন্ন অংশগুলির স্বকীয় ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে উঠতে পারে না। তাই বিভিন্ন অংশের ক্রিয়াকলাপ (যদি বস্তুটি জীবন্ত হয়) সনাক্তকরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অল্প সময় পূর্বে আবিষ্কৃত হয় এক নূতন মাইক্রোস্কোপ। এই শক্তিশালী যন্ত্রের নাম ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ। এই যন্ত্রে দৃশ্য আলোক-তরঙ্গকে প্রতিবিম্ব সৃষ্টির কাজে লাগানো হয় না। এখানে খুব সূক্ষ্ম ইলেকট্রন রশ্মিকে প্রয়োগ করা হয় এবং প্রতিবিম্ব লেন্সের পরিবর্তে চৌম্বক কুণ্ডলীর সাহায্যে ইলেকট্রনিক প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করা হয়। এতে কোন বস্তুকে পঞ্চাশ হাজার থেকে লক্ষ গুণ বড় আকারেও দেখা যেতে পারে। এই যন্ত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতাও খুবই বেশী, কিন্তু অসুবিধা দেখা গেল জীবন্ত কোষের অভ্যন্তরের ক্রিয়াকলাপ দেখবার ব্যাপারে। বড় সমস্যা এই যে, যখন কোন জীবন্ত কোষকে এই যন্ত্রে দেখবার ব্যবস্থা করা হয় তখন এই যন্ত্রের ইলেকট্রন রশ্মির প্রভাবে কোষগুলি মৃত কোষে পরিণত হয়, ফলে কোষের অভ্যন্তর ভাগ খুব স্পষ্ট ও বড় আকারে প্রত্যেকটি উপাদানকে স্ব স্ব জায়গায় দেখতে পেলেও তাদের ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া এই যন্ত্র প্রত্যেক গবেষকের পক্ষে রাখাও সম্ভব নয়, এর

জন্যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, সকল গবেষণাগারেও রাখা সম্ভব হয় না।

এই সব অসুবিধা দূর করেন ডাচ্ বিজ্ঞানী ফ্রিট্স্ জার্নিক (Frits Zernik)। তাঁর উদ্ভাবিত



ফেজ-কনট্রাষ্ট মাইক্রোস্কোপের গঠন-কৌশল

ফেজ-কনট্রাষ্ট মাইক্রোস্কোপ আজ সকল প্রকার গবেষণার ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা করেছে। এই যন্ত্র উদ্ভাবনের জন্যে তাঁকে ১৯৫৩ সালে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। জার্নিকের মূল্যবান গবেষণার ফলে আজ বিশ্বের চিকিৎসক, জীববিদ্যা-বিশারদ, জীবাণুতত্ত্ব-বিশারদ ও গবেষকগণের পক্ষে সম্ভব হয়েছে জীবন্ত তন্তুর ক্রিয়াকলাপ এবং সর্বোপরি জীবনের মূল রহস্য উদ্ঘাটনে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো।

এই ফেজ-কনট্রাষ্ট মাইক্রোস্কোপ সম্পর্কে সামান্য কিছু আলোচনা করছি।

জার্নিক রসায়নের ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁর জমানো পয়সা থেকে একটি টেলিস্কোপ কিনে আনেন। এই টেলিস্কোপের পিতলের চোঙের মধ্যে যে রহস্য আছে, তা ঐ আমষ্টারডাম শহরের কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। এই টেলিস্কোপটাকে বারবার খোলা এবং লাগানোই ছিল তাঁর হবি। এই যন্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন অংশগুলির সমন্বয়ের মধ্যে যে রহস্য লুক্কায়িত আছে, তা জানবার জন্যে তাঁর কৌতূহল ছিল অদম্য। তাই তিনি লেন্স ও আলোক সম্পর্কে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করেন। ফেজ-কনট্রাষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কার্যপদ্ধতি বুঝতে হলে ফেজ (Phase) কথাটার অর্থ বোধগম্য হওয়া দরকার। এই ফেজ কথাটার বাংলা প্রতিশব্দ হলো দশা বা অবস্থা। কোন গতিশীল কণা বা তরঙ্গের ক্ষেত্রে কম্পনশীল কণার গতির কোন বিন্দুতে কোন এক মুহূর্তের দশা বলতে বিজ্ঞানের ভাষায় বোঝায়—গতিশীল কোন একটি কণার কোন এক মুহূর্তের গতিবেগ, ত্বরণ, সরণ ও গতির অভিমুখ। পুকুরের জলে ঢিল ছুঁড়লে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তা চতুর্দিকে বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ে। এই তরঙ্গের উৎসমুখের সমান দূরত্বে অবস্থিত কণাগুলির দশা একই বলা হয়, কিন্তু বিভিন্ন বৃত্তের মধ্যের কণাগুলির দশা বিভিন্ন বা একই রকম হতে পারে।

আলোকরশ্মি এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাবার সময় উভয় মাধ্যমের সীমাতল থেকে দিক পরিবর্তন করে চলে। এই ঘটনাকে

আলোর প্রতিসরণ বলা হয়। বিভিন্ন স্বচ্ছ পদার্থের প্রতিসরণ করবার ক্ষমতাও বিভিন্ন। এই ধর্মকে কাজে লাগিয়ে জার্নিক এই অভিনব ফেজ-কনট্রাষ্ট-মাইক্রোস্কোপ তৈরি করতে সক্ষম হন।

কোন বস্তুর বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন উপাদান থেকে দৃশ্য আলোক-তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে বিভিন্ন আলোক ঘনত্ববিশিষ্ট (Optical density) মাধ্যমের মধ্যে বেশী বা কম বেঁকে গিয়ে পরস্পরের মধ্যে দশা-পার্থক্য দেখা দিতে পারে। আলোক তরঙ্গসমূহের পরস্পরের মধ্যে যে পরিমাণ বক্রতা-পার্থক্য দেখা দেয়, সেই পার্থক্য সাধারণ যন্ত্রে দেখা সম্ভব নয়। তাই জার্নিক বিশেষ রকমের লেন্স দিয়ে তৈরি আইপিসের সাহায্যে বস্তুর প্রত্যেক অংশের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করবার ব্যবস্থা করেন। এই প্রতিবিম্ব গঠনের ব্যাপারটা খুবই জটিল। এই জটিল দশা-পার্থক্য একটি সহজ উদাহরণের দ্বারা কতকটা সহজবোধ্য হতে পারে। ধরা যাক, চারজন এন, সি, সি, ছাত্রের একটি দলকে একই লাইনে মার্চ করতে নির্দেশ দেওয়া হলো। এই চারজন প্রত্যেকেই একই গতিবেগে একটি পাকা রাস্তার উপর দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পাকা রাস্তার পরে একটা কর্দমাক্ত পিচ্ছিল রাস্তা পড়লো, কিন্তু দলের অধিনায়কের কড়া নির্দেশে তাঁরা সামনে এগিয়ে যেতে লাগলো। ১নং ক্যাডেট প্রথমে কাদার সম্মুখীন হওয়ায় তার গতিবেগ হ্রাস পাবে এবং ৪নং ক্যাডেটটির গতিবেগ পূর্বের মত থাকায় সে ১নং ক্যাডেট থেকে এগিয়ে আসবে। সুতরাং এই মার্চে প্রত্যেকের অবস্থানগত পরিবর্তন সাধিত হবে, অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে দশা-পার্থক্য সৃষ্টি হবে। যদি কাদা মাটির রাস্তা ও পাকা রাস্তার রং এক হয়, তবে উড়োজাহাজ থেকে কোন পর্যবেক্ষক ঐ চারজন ক্যাডেটকে লক্ষ্য করলে তিনি অবশ্যই বুঝতে পারবেন কিভাবে তাদের মধ্যে দশা-পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে। এই দশা-পার্থক্যের দ্বারা তিনি নিশ্চয়ই নীচের ক্যাডেটদের গতিবেগের পরিবর্তন ও রাস্তার প্রকৃতির পার্থক্য সম্বন্ধে সঠিক মন্তব্য করতেও সক্ষম হবেন।

উপরের উদাহরণ থেকে আশা করি ফেজ-কনট্রাষ্ট (Phase contrast) অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে প্রতিসরণ ও দশা-পার্থক্য সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা হবে।

জার্নিকের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রধান উপাদান দুটিকে আলোকরশ্মির গতিপথে রাখা হয়। এই দুটি উপাদান হলো—একটি ধাতব বলয় (Metal ring) ক (চিত্র দ্রষ্টব্য) এবং অন্যটি একটি আলোক-স্বচ্ছ কাচ, যা জার্নিক অসীম ধৈর্য ও অধ্যাবসায়সহকারে ঘষে ঘষে তৈরি করেন। কাচখণ্ডের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এর কেন্দ্রভাগ প্রান্তীয় ভাগ অপেক্ষা মোটা বা সরু। এই মোটা ও সরুর মধ্যে পার্থক্য এক মিলিমিটারের এক হাজার ভাগের একভাগ।

কোন সূক্ষ্ম বস্তুর বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে যে অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্য পার্থক্য আছে, তাকে দৃশ্য পার্থক্যে পরিণত করবার সুযোগ প্রত্যেক গবেষকের হাতে তুলে দিলেন বিজ্ঞানী ফ্রিট্‌স্ জার্নিক। এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্য আলোর দ্বারা বস্তুকে আলোকিত করা হয়। বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মিকে জার্নিক তাঁর তৈরি ধাতব বলয় ও কাচের ফেজ-প্লেট যুগলের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে প্রতিসরিত করে আই-পিসের এই দৃশ্য পার্থক্য ও বস্তুকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত করে তোলেন।

সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে আমাদের ঘর্মগ্রন্থিগুলির (লোমকূপ) ছবি দেখলে মনে হবে কতকগুলি অস্পষ্ট রেখার সমন্বয় ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এই ঘর্মগ্রন্থিগুলিকে ফেজ-কনট্রাষ্ট মাইক্রোস্কোপে দেখলে মনে হবে পাহাড়-পর্বত সমন্বিত উপত্যকা।

এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সঙ্গে আজকাল ইলেক-ট্রনিক মুভি ক্যামেরা সংযোগ করে জীবন্ত কোষের বিভাজন-ক্রিয়ার ছবিও তোলা হচ্ছে। ক্যামেরার গতি নিয়ন্ত্রিত করে—যে ঘটনা বাস্তবে বিভাজিত হতে সারাদিন বা রাত্রি লাগে, তাকে পর্দায় দশ মিনিটে দেখানো সম্ভব হতে পারে। গ্রাফ কাগজের স্ক্রিনে এই ফিল্ম যখন দেখানো হয়, তখন প্রতিটি সূক্ষ্ম কণিকা. এক লক্ষ থেকে দশ লক্ষ গুণ পর্যন্ত বিবর্ধিত আকারে দেখা যায়। এই ছবি তোলবার পদ্ধতিকে টাইম ল্যাপ্‌স্‌ মোশান পিক্‌চার বলে।

আজকাল এই ফেজ-কনট্রাষ্ট মাইক্রো-স্কোপের উন্নতি সাধন করে আর এক ধরনের অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, যাকে বলে ইন্টারফিয়ারেন্সিয়াল ফেজ-কনট্রাষ্ট মাইক্রো-স্কোপ। এই যন্ত্রের দ্বারা জীবন্ত কোষের ক্রিয়া-কলাপের ছবি টেক্‌নিকলার মুভি-ফিল্মে তোলা হয়। এই ব্যবস্থায় কোন রাসায়নিক রং ব্যবহার না করেই জীবন্ত কোষের বিভিন্ন উপাদান বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত অবস্থায় দেখা সম্ভব হয়েছে; যেমন—নিউক্লিয়াস একবর্ণের, ক্রোমোসোম অন্য রঙের, সাইটোপ্লাজম আর এক বর্ণের। এর ফলে এদের বৈশিষ্ট্য, আয়তন, গতিবেগ আরও ভালভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে। ফ্রিট্‌স্‌ জার্নিক উদ্ভাবিত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই এই বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

ক্রোম্যাটোগ্রাফি

মিহিরকুমার কুণ্ডু

সাম্প্রতিককালের একটি অত্যন্ত সহজ, অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং বিস্তৃত প্রয়োগক্ষমতাসম্পন্ন বৈপ্লবিক পদ্ধতি হলো ক্রোম্যাটোগ্রাফি। বিগত ২০ বছরের মধ্যে বিশ্লেষণ-বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হিসাব ক্রোম্যাটোগ্রাফি আজ স্বীকৃত। ক্রোম্যাটো-গ্রাফি কোন মিশ্রণ, যথা—ফ্যাটি অ্যাসিডের মিশ্রণ, অ্যামিনো অ্যাসিডের মিশ্রণ, অজৈব আয়নের মিশ্রণ, অ্যাসিড-অ্যালকোহল-এস্টার প্রভৃতির মিশ্রণ থেকে উপাদানকণাগুলির পৃথকীকরণের একটি অত্যন্ত সহজ ও বিশিষ্ট পদ্ধতি। মিশ্রণটি সাধারণত কোন দ্রাবকে দ্রবীভূত করা হয়। অতঃপর নির্দিষ্ট আয়তনের দ্রবণ উপযুক্ত নিশ্চল স্তরে (Stationary phase) ন্যস্ত করা হয়। এর-পর দ্রবমিশ্রণ আর একটি বহমান স্তরের (Mobile phase) সংস্পর্শে আসে, ফলে মিশ্রণের উপাদান-কণাগুলি গতিশীল হয়। কিন্তু উপাদানকণাগুলির গতিশীলতার হার এক নয়—কেউ দ্রুত গতি-সম্পন্ন, কারোর বা গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর। স্বভাবতঃই গতিশীলতার হারের তারতম্যানুসারে উপাদানকণাগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে নিশ্চল স্তরের বিশেষ বিশেষ স্থানে বিন্যস্ত হয়। আবার এও সম্ভব, কোন বিশেষ পরিবেশে বা বিশেষ অবস্থায় দুই বা ততোধিক উপাদানকণার গতিশীলতার হার এক। ফলে এরা যুগপৎ একই স্থানে বিন্যস্ত হয়, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় না। এদের বলা হয় সঙ্কটযুগল বা সঙ্কটসাথী (Critical pair বা Critical partner)। পরিবেশ বা অবস্থার পরিবর্তন করে এদের গতিশীলতার তারতম্য ঘটানো হয়, ফলে কণাগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

জার্মান রাসায়নিক এফ. রুঙ্গে সর্বপ্রথম (১৮৫০ খৃঃ) ক্রোম্যাটোগ্রাফির পদ্ধতির বাস্তব সম্ভাবনা উপলব্ধি করেন। তিনি প্রমাণ

করেন সচ্ছিদ্র স্তর, যেমন—কাগজের উপর কৈশিক ক্রিয়ার মিশ্রণ থেকে অজৈব ধনাত্মক আয়ন যথা—Ca^{++}, Mg^{++} প্রভৃতির পৃথকীকরণ সম্ভব; কিন্তু ক্রোম্যাটোগ্রাফির উদ্ভাবনের সম্মান সাধারণতঃ রুশ উদ্ভিদ্‌বিদ মাইকেল টিসোয়েটকে (১৮৭২—১৯২০ খৃঃ) দেওয়া হয়। তিনি এই বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণা করেন এবং ক্রোম্যাটোগ্রাফি নামও তাঁর দেওয়া। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে আর. কুহ্‌ন এবং ই. লেডেরার ক্রোম্যাটোগ্রাফির পদ্ধতির বিপুল সম্ভাবনা সম্পর্কে বিজ্ঞানী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁরা রঞ্জক পদার্থ, যথা—জ্যান্‌থোফিল ও ক্যারোটিন জাতীয় পদার্থের বিচ্ছিন্নকরণে ক্রোম্যাটোগ্রাফির পদ্ধতির সফল প্রয়োগ করেন। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক, বিশেষতঃ রাসায়নিক গবেষণার ক্ষেত্রে ক্রোম্যাটোগ্রাফি অপরিহার্য।

ক্রোম্যাটোগ্রাফির পদ্ধতির শ্রেণীবিভাগ—বহমান এবং নিশ্চল স্তরের উপর ভিত্তি করে ক্রোম্যাটোগ্রাফির পদ্ধতিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে।

বহমান স্তর	নিশ্চল স্তর	
	চূর্ণিত কঠিন পদার্থ	চূর্ণিত কঠিন পদার্থ-ধৃত তরল পদার্থ
গ্যাস	গ্যাস-অ্যাড্‌জরপশন ক্রোম্যাটোগ্রাফি বা গ্যাস-কঠিন ক্রোম্যাটোগ্রাফি	গ্যাস-তরল পার্টিশন ক্রোম্যাটোগ্রাফি বা গ্যাস-তরল ক্রোম্যাটোগ্রাফি (জি. এল. সি. নামে সমধিক খ্যাত)
তরল	তরল-অ্যাড্‌জরপশন ক্রোম্যাটোগ্রাফি বা অ্যাড্‌জরপশান ক্রোম্যাটোগ্রাফি	তরল-তরল পার্টিশন ক্রোম্যাটোগ্রাফি বা পার্টিশান ক্রোম্যাটোগ্রাফি
দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ	আয়ন-বিনিময় ক্রোম্যাটোগ্রাফি	ইলেক্‌ট্রো-ক্রোম্যাটোগ্রাফি
কলয়ডীয় দ্রবণ	ইলেক্‌ট্রো-ক্রোম্যাটোগ্রাফি	পার্টিশন ক্রোম্যাটোগ্রাফি, ইলেক্‌ট্রো-ক্রোম্যাটোগ্রাফি

গ্যাস-অ্যাড্‌জরপশন ক্রোম্যাটোগ্রাফির ব্যবহার তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে জি. এল. সি-র সাফল্য ও বহুধাবিস্তৃত প্রয়োগ একে এক নতুন মর্যাদা দিয়েছে। জি. এল. সি-র ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শনের কৃতিত্ব বিজ্ঞানী এ. জে. পি. মার্টিন, আর. এল সিন্‌জ এবং এ. টি. জেমসের। বর্তমান নিবন্ধের বিষয়বস্তু বহমান স্তররূপে তরলের ব্যবহারে মুখ্যতঃ সীমিত থাকবে। অনুসৃত প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে উক্ত পর্যায়ের ক্রোম্যাটোগ্রাফিকে আবার তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে, যথা—কলাম ক্রোম্যাটোগ্রাফি, পেপার ক্রোম্যাটোগ্রাফি এবং থিন লেয়ার ক্রোম্যাটোগ্রাফি।

কলাম ক্রোম্যাটোগ্রাফি—এই প্রক্রিয়ায় একটি ফাঁপা নলের মধ্যে নিশ্চল স্তর ন্যস্ত থাকে। নলের ব্যাস সাধারণতঃ ৮-৪০ মিমি.। দৈর্ঘ্য ১০-৮০ সেমি. এবং ব্যাস দৈর্ঘ্যের অনুপাত—১ : ১০—১ : ৪০ রাখা হয়। নলের মুখ অনেকটা ব্যুরেটের মত সরু করা হয় এবং দ্রাবকের (বহমান স্তর) প্রবাহ-হার নিয়ন্ত্রণের সুবিধার জন্যে নলের মুখে সাধারণতঃ একটি স্টপ কক্‌ সংযুক্ত থাকে। বিশ্লেষ্য পদার্থ ঘন দ্রবণরূপে নিশ্চল স্তরের

উপরে ঢালা হয় এবং উপযুক্ত দ্রাবকসমষ্টি যথোচিত অনুপাতে নিশ্চল স্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করানো হয়। কখনো কখনো প্রবাহের হার এত হ্রাস পায় যে, প্রবাহ-হার বৃদ্ধি করতে বা অক্ষুণ্ণ রাখতে নলের মাথায় নিশ্চল স্তরের উপরে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের সাহায্যে চাপ প্রয়োগ করতে হয়।

এই প্রক্রিয়ায় ০.১ গ্র্যাম থেকে কয়েক গ্র্যাম পদার্থ বিশ্লেষণ করা সম্ভব। অত্যন্ত বিশুদ্ধ পদার্থ (বিশুদ্ধতা, ৯৯+%) তৈরি করতে এই পদ্ধতির বহুল প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য।

পেপার ক্রোম্যাটোগ্রাফি—এই ক্রোম্যাটোগ্রাফির জন্যে বিশেষভাবে তৈরি কাগজ ব্যবহার করা হয়। কাগজ দেখতে অনেকটা শোষক কাগজের মত, কিন্তু অনেক দৃঢ় ও সুনিয়ন্ত্রিত ছিদ্র-বিশিষ্ট। এই কাগজ নিশ্চল স্তরের কাজ করে। এর উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ বিশ্লেষ্য পদার্থ ন্যস্ত করে কাগজটি একটি আবদ্ধ জারে ঝুলানো হয়, যেন এর কিয়দংশ জারে অবস্থিত দ্রাবকসমষ্টিতে (বহমান স্তর) নিমজ্জিত থাকে।

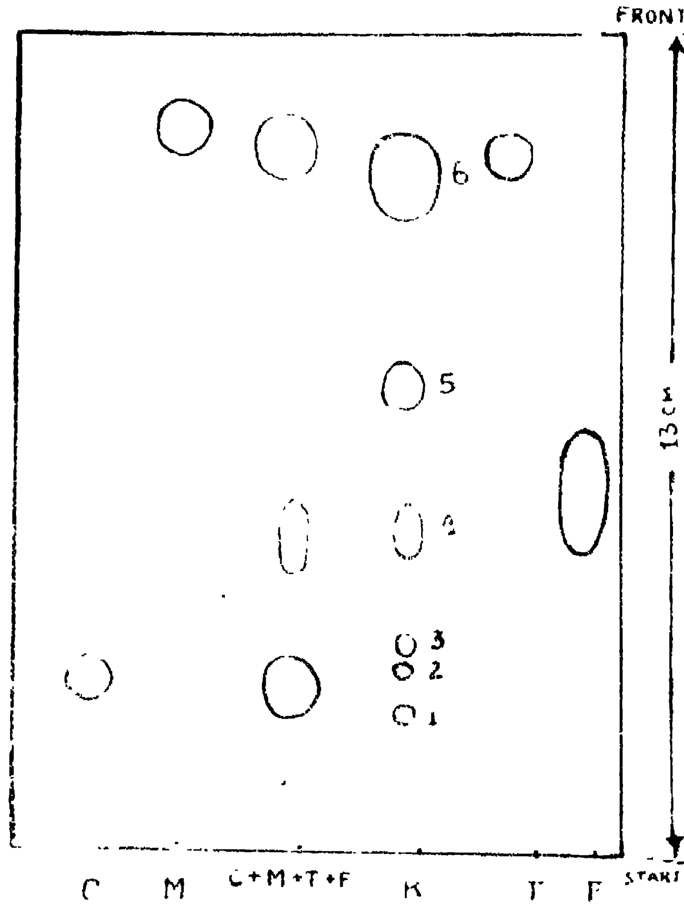
এই প্রক্রিয়ায় সাধারণত ১-১০০ মাইক্রোগ্র্যাম (১ মাইক্রোগ্র্যাম = $১০^{-৬}$ গ্র্যাম) পদার্থ ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন পদার্থের সনাক্তকরণ সহজে ও দক্ষতার সঙ্গে করা সম্ভব।

থিন লেয়ার ক্রোম্যাটোগ্রাফি—এই প্রক্রিয়াটি টি. এল. সি. নামে সমধিক খ্যাত। তরল ক্রোমাটোগ্রাফির পদ্ধতির মধ্যে টি. এল. সি. নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক ব্যবহৃত। এই প্রক্রিয়ায় অনেক সহজে, দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে যৌগ মিশ্রণের বিশ্লেষণ করা সম্ভব। প্রক্রিয়াটি সাধারণতঃ কয়েক মাইক্রোগ্র্যাম থেকে ১-২ মি.গ্রা. পদার্থের জন্যে উপযোগী।

নিশ্চল স্তররূপে সিলিকা জেল, অ্যালুমিনা, কিসেলগুর প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। জৈব পদার্থের বিশ্লেষণে সিলিকা জেলের ব্যবহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। নির্দিষ্ট পরিমাণ সিলিকা জেল উপযুক্ত আয়তনের পাতিত জলে মিশিয়ে পাতলা লেই তৈরি করা হয়। লেইটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় কাচের প্লেটের (১০×২০ সেমি. বা ২০×২০ সেমি.) উপর বিস্তৃত করা হয়। প্রয়োজনানুসারে স্তরটি ০.২৫-০.৮ মিমি. পুরু করা হয়; স্তরটি অবশ্যই মসৃণ হবে। স্তরটি বাতাসে ১০-১৫ মিনিট রেখে সাধারণত ১০৫±৫° সেন্টিগ্রেডে ১ ঘণ্টা রাখা হয়। এর পর শোষকাধারে ঠাণ্ডা করা হয়। অতঃপর বিশ্লেষ্য মিশ্রণ নিশ্চল স্তরের উপর ন্যস্ত করে প্লেটটি জারের মধ্যে প্রায় খাড়া করে সামান্য হেলিয়ে রাখা হয়। জারের তলদেশে প্রায় ১ সেমি. গভীর যথোচিত পরিমাণে উপযুক্ত দ্রাবকসমষ্টি (বহমান স্তর) থাকে। কৈশিক ক্রিয়ায় দ্রাবক সাধারণতঃ ১০-১৫ সেমি. ওঠবার পর ক্রোম্যাটোপ্লেটটি বের করে নেওয়া হয়। ক্রোম্যাটোপ্লেটটি এবার বাতাসে এবং অবস্থানুসারে গরম করে শুকিয়ে উপযুক্ত নির্দেশক দ্রব্যে সিক্তিত করা হয়। বিচ্ছিন্ন উপাদানকণাগুলি এর ফলে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। ১নং চিত্রে এই প্রক্রিয়ায় তোলা একটি ক্রোম্যাটোগ্রাম দেখানো হয়েছে।

নিশ্চল স্তরের উপাদানকণার প্রকৃতি, আকৃতি সুষ্ঠু বিশ্লেষণের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিশ্চল স্তরের পৃষ্ঠদেশে কতকগুলি সক্রিয় বিন্দুর (Active centre) অস্তিত্ব কল্পনা করা যেতে পারে। নিশ্চল স্তরের উপাদানকণার প্রকৃতি, আকৃতির উপর সাধারণতঃ এদের ক্রিয়াশীলতা নির্ভরশীল। দ্রবের উপাদানকণা সাধারণতঃ এই সকল বিন্দুতে অন্তর্ধৃত (Adsorped) হয়। অবশ্য সব কণা সমানভাবে অন্তর্ধৃত হয় না। কোন্ কণা কত সহজে অন্তর্ধৃত হবে, তা ঐ কণা কত বেশী পোলার (Polar), তার উপর নির্ভরশীল। কোন্ কণা কত বেশী পোলার হবে, তা আবার এর সক্রিয় পুঞ্জের (Functional

group) উপর নির্ভরশীল। যে কণা যত সহজে অন্তর্ধৃত হবে, তার গতিশীলতার হার তত হ্রাস পাবে। সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন অ-পোলার (Non-polar) সহজে অন্তর্ধৃত হয় না, ফলে বেশ উপযোগী, কিন্তু সমগোত্রীয় পদার্থের সুষ্ঠু বিচ্ছিন্নকরণ এই পদ্ধতির সাহায্যে সম্ভব নয়। কয়েকটি যথোপযোগী পরিবর্তন করে এই সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।



১নং চিত্র

অ্যাড্‌জরপশন ক্রোম্যাটোগ্রাফির সাহায্যে তোলা স্টেরল (C), এস্টার (M), তেল (K), বিশুদ্ধ গ্লিসারাইড (T) এবং ফ্যাটি অ্যাসিডের (F) ক্রোম্যাটোগ্রাম।

এর গতিশীলতা অত্যন্ত বেশী। পক্ষান্তরে, কার্বক্সিল পুঞ্জ বেশ পোলার, অন্তর্ধৃত হয়। ফলে এর গতিশীলতা বেশ কম এবং হাইড্রোকার্বনের বেশ নীচে থাকে।

আলোচিত তিনটি প্রক্রিয়া অ্যাড্‌জরপশন ক্রোম্যাটোগ্রাফির অন্তর্ভুক্ত এবং উপরিউক্ত নীতি অ্যাড্‌জরপশন ক্রোম্যাটোগ্রাফির পদ্ধতির পক্ষে সাধারণভাবে সত্য। অ্যাড্‌জরপশন ক্রোম্যাটোগ্রাফি ভিন্ন-গোত্রীয় দ্রবমিশ্রণ পৃথকীকরণে

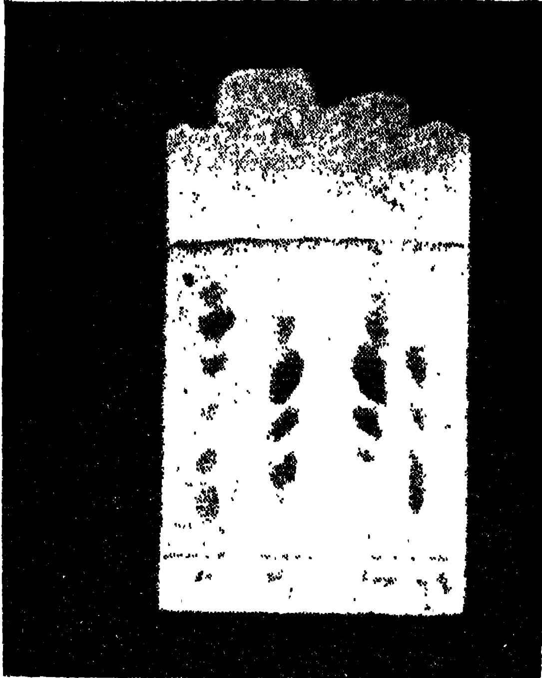
পার্টিশন ক্রোম্যাটোগ্রাফি—এই প্রক্রিয়াটি অ্যাড্‌জরপশান ক্রোম্যাটোগ্রাফির অনুরূপ, শুধু নিশ্চল স্তরের উপর অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্ফুটনাঙ্কের একটি অ-পোলার তরল বিস্তৃত থাকে। অ-পোলার তরলটিই বস্তুত এখানে নিশ্চল স্তরের কাজ করে, আর কঠিন পদার্থটি তরলের অবলম্বনরূপে কাজ করে। বিশ্লেষ্য যৌগ মিশ্রণ বহমান স্তর ও নিশ্চল স্তর (দুটিই তরল) দুটির মধ্যে বিতরিত হতে থাকে। বিতরণের তারতম্যানুসারে গতিশীলতার

হারের পার্থক্য ঘটে, ফলে উপাদানগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গতিশীলতার হার সম্পর্কে অ্যাড্‌জরপশন ক্রোম্যাটোগ্রাফির ক্ষেত্রে যা বলা হয়েছে, এখানে তার বিপরীতটাই সাধারণভাবে সত্য; যে দ্রব যত গোলার, তার গতিশীলতার হার তত বেশী।

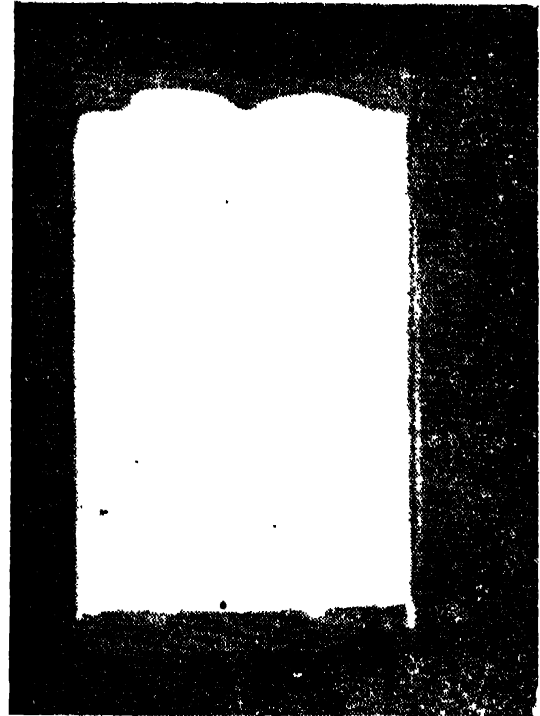
২নং এবং ৩নং চিত্রে পার্টিশন ক্রোম্যাটোগ্রাফির সাহায্যে বিশ্লিষ্ট তেলের (গ্লিসারাইড) আলোকচিত্র দেখানো হয়েছে।

বেশী হবে যৌগের গতিশীলতার হারও তত হ্রাস পাবে।

নিশ্চল স্তরের উপর একটি বিশুদ্ধ দ্রব কতটা উঠবে, তা দ্রবের স্বরূপ (অর্থাৎ এর সক্রিয় পুঞ্জ এবং অণু-ভার), নিশ্চল ও বহমান স্তরের প্রকৃতি, বায়ুর আর্দ্রতা, তাপমাত্রা প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। পরিবেশ সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকলে দ্রব কতটা উঠবে তা নির্দিষ্ট এবং এই মান R_F-এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়; যথা—



২নং চিত্র



৩নং চিত্র

পার্টিশন ক্রোম্যাটোগ্রাফির পদ্ধতিতে তোলা ফ্যাটি অ্যাসিডের (চিত্র—২) এবং তেলের (চিত্র—৩) ক্রোম্যাটোগ্রামের আলোকচিত্র।

আরজেন্টেশন ক্রোম্যাটোগ্রাফি—এটিও অ্যাড্‌জরপশন ক্রোম্যাটোগ্রাফির অনুরূপ, কেবল সিলভার নাইট্রেট নিশ্চল স্তরের মধ্যে সমান ভাবে বিস্তৃত থাকে। দ্রবমিশ্রণের উপাদান-কণার পৃথকীকরণ প্রধানতঃ অসম্পৃক্ত বন্ধনীর উপর নির্ভরশীল। অসম্পৃক্ত বন্ধনীর সংখ্যা যত

$$R_F = \frac{\text{(দ্রবের) প্রয়োগবিন্দু থেকে দ্রবের সরণ}}{\text{(দ্রবের) প্রয়োগবিন্দু থেকে দ্রাবকের সরণ}}$$

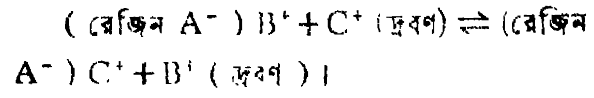
সুতরাং অপরিবর্তিত পরিবেশে R_F-এর মান থেকে অজানা পদার্থের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা করা যায়, তবে সঠিক জানবার জন্যে অনুমিত যৌগেরও পাশাপাশি ক্রোম্যাটোগ্রাফি করা

উচিত। যদি R_F অজানা যৌগের সঙ্গে মিলে যায়, তবে বুঝতে হবে ওটি একই ধরণের যৌগ। অবশ্য যৌগের স্বরূপ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে হলে অন্যান্য উপযুক্ত পদ্ধতিও প্রয়োগ করা আবশ্যক। দ্রব সম্পর্কে একটি বিষয় স্মর্তব্য। সমস্ত ক্রোমাটোগ্রাফির পদ্ধতিতেই দ্রবের অণু-ভার যত কম হবে, গতিশীলতার হার তত বৃদ্ধি পাবে।

আলোচিত পদ্ধতি কয়টি ছাড়া আরো দুটি ক্রোমাটোগ্রাফির পদ্ধতি উল্লেখ্য, দুটি পদ্ধতিই আয়নক্ষম দ্রবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আয়ন-বিনিময় ক্রোম্যাটোগ্রাফি—এই প্রক্রিয়া কলাম ক্রোম্যাটোগ্রাফির অনুরূপভাবে সম্পাদিত করা হয়। অ্যাডজরপশন বা পার্টিশন ক্রোমাটোগ্রাফি থেকে এর পার্থক্য আয়ন-বিনিময়-কারী পদার্থের ধর্মের বিভিন্নতার দরুণ। এই ধরণের পদার্থের দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এরা দ্রাবকে অদ্রবণীয় অথচ এদের মধ্যে বিনিময়ক্ষম আয়ন থাকে। বহমান স্তরের সঙ্গে আগত একই রকম আধানসম্পন্ন আয়নের সঙ্গে এই সব আয়নের বিনিময় হয়, অথচ বিনিময়কারী পদার্থে ভৌত ধর্মের কোন পরিবর্তন হয় না। ধনায়ন বিনিময়কারী পদার্থে বিনিময়ক্ষম আয়ন ধনাত্মক আধানসম্পন্ন এবং সমপরিমাণ ঋণাত্মক আধান-সম্পন্ন আয়ন বিনিময়কারী পদার্থে আবদ্ধ থাকে। অনুরূপভাবে ঋণায়ন বিনিময়কারী পদার্থে বিনিময়ক্ষম আয়ন ঋণাত্মক আধানসম্পন্ন এবং সমপরিমাণ ধনাত্মক আধানসম্পন্ন আয়ন পদার্থে আবদ্ধ থাকে। আয়ন-বিনিময়কারী পদার্থ সাধারণত কৃত্রিম উপায়ে তৈরি উচ্চ অণু-ভারবিশিষ্ট জটিল জৈব রেজিন। এরা নিম্নোক্ত উপায়ে ক্রিয়া করে।

মনে করা যাক, একটি ধনায়ন বিনিময়কারী রেজিনের সঙ্কেত (রেজিন A^-) B^+। ধনায়ন B^+ বিনিময়ক্ষম। দ্রবণের C^+ ধনায়নের সংস্পর্শে B^+ ও C^+-এর মধ্যে বিনিময় হবে এবং C^+ রেজিনের গায়ে আটকে থাকবে :



(রেজিন A^-) $B^+ + C^+$ (দ্রবণ) $\rightleftharpoons$ (রেজিন A^-) $C^+ + B^+$ (দ্রবণ)।

এবার ধরা যাক, একাধিক ধনায়ন দ্রবণে, যথা—C^+, D^+, E^+ প্রভৃতি আছে। এদের সকলের প্রতি রেজিনের সমান আসক্তি নাও থাকতে পারে। ফলে এর গায়ে কোন আয়ন দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে, কোন আয়ন অপেক্ষাকৃত শিথিলভাবে যুক্ত হয়। এবার কোন উপযুক্ত অপসারক দ্রবণ এই রেজিনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করালে অপেক্ষাকৃত শিথিলভাবে যুক্ত আয়ন আগে বিযুক্ত হবে এবং দ্রবণের সঙ্গে বেরিয়ে আসবে। এইভাবে বিভিন্ন আয়নের পৃথকীকরণ সম্ভব। রেয়ার আর্থ (বিরল ধাতু) এই প্রক্রিয়ায় বিচ্ছিন্ন করা হয়।

ইলেক্‌ট্রো-ক্রোম্যাটোগ্রাফি—তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চালিত করে এই প্রক্রিয়ায় আয়নকণার গতিশীলতার হারের পরিবর্তন করানো হয়। এই ভাবে প্রোটিন (এন্‌জাইম) পৃথক করা হয়।

বিশ্লিষ্ট কণা অবলোকন—বিশ্লিষ্ট পদার্থের অবলোকনের জন্যে প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন নির্দেশক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। জৈব পদার্থের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে সালফিউরিক অ্যাসিড বা সালফিউরিক/ক্রোমিক অ্যাসিডের ব্যবহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তবে সাধারণতঃ বিশেষ বিশেষ পদার্থের জন্যে বিশেষ বিশেষ নির্দেশক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়, যথা—অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্ষেত্রে নিনহাইড্রিন, অ্যালডিহাইড ও কিটোনের ক্ষেত্রে ২ : ৪-ডাই-নাইট্রোফিনাইল হাইড্রাজিন প্রভৃতি।

বিশ্লিষ্ট পদার্থের পরিমাণ নির্ণয়—উপযুক্ত নির্দেশক দ্রব্যের সাহায্যে রঞ্জিত করে বিশ্লিষ্ট পদার্থের পরিমাণ আলোকঘনত্বমিতির (PhotoJensitometry) সাহায্যে বের করা যেতে পারে। এছাড়া বিশ্লিষ্ট পদার্থ নিশ্চল স্তর থেকে যথো-

পযুক্ত দ্রাবকে নিষ্কাশিত করে উপযুক্ত পরিবেশে বিশেষ নির্দেশক দ্রব্যের সাহায্যে রঞ্জিত করে দ্রবণ অবস্থায় আলোকমিতি (Photometry) পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যেতে পারে।

ক্রোম্যাটোগ্রাফির পদ্ধতির সাহায্যে প্রায় সকল রাসায়নিক দ্রব্যের বিশ্লেষণ অনেক সহজ ও দ্রুত করা সম্ভব। এই পদ্ধতির বহুধাবিস্তৃত ব্যবহারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রয়োগ—কৃষিক্ষেত্রে কীট-পতঙ্গনাশক পদার্থের বিশ্লেষণে, রাসায়নিক ক্ষেত্রে পদার্থের পরিমাণ ও বিশুদ্ধতা নিরূপণে, অপরাধ-বিজ্ঞানে, অনুমিত দ্রব্যের দ্রুত ও নির্ভুল সনাক্তকরণে, সুগন্ধি দ্রব্যের সনাক্তকরণ ও পরিমাণ নির্ণয়ে, পেট্রোলিয়াম-শিল্পে, চিকিৎসা-ক্ষেত্রে ইত্যাদি।

পুস্তক পরিচয়

জ্ঞানের আলো জ্বাললো যাঁরা : শ্রীমৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ। প্রকাশক : ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ ৭। পৃঃ ৯৪, মূল্য তিন টাকা।

সরল ভাষায় বিজ্ঞানের বিষয় পরিবেশনে লেখক সিদ্ধহস্ত। আলোচ্য পুস্তকখানিতে লেখক কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বহুবিধ গুরুতর রোগের উৎপত্তির কারণ নির্ণয় ও প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনে যাঁরা আজীবন অক্লান্ত সাধনা করে গেছেন, তাঁদের কয়েকজনের জীবনকাহিনী ও গবেষণার ফলাফলের কথা সংক্ষিপ্ত হলেও অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। লাভেনহুক, পাস্তুর, কক্, জেনার, রুক্স, বেহরিং, মেচ্নিকফ, ফ্লেমিং, রস্, গ্র্যাসী, ল্যাভিরার, ডাঃ মর্টন প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের কর্মপ্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত,সরল ও সুন্দর বর্ণনা পাঠকদের আগ্রহী করে তুলবে। চার্লস ডারউইন ও তাঁর অভিব্যক্তিবাদের উপর রচনাটিও সুন্দর একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা হিসাবে গণ্য হবার দাবী রাখে। অনেক ছবি ও সুন্দর মুদ্রণ উল্লেখযোগ্য। পুস্তকটির বহুল প্রচার প্রয়োজন।

সান্ধ্য আসরের গল্প : শ্রীপ্রভাতকুমার দত্ত। প্রকাশক : মায়ামঞ্চ, ২১বি, গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিঃ-২৫। পৃঃ ১০০, মূল্য তিন টাকা।

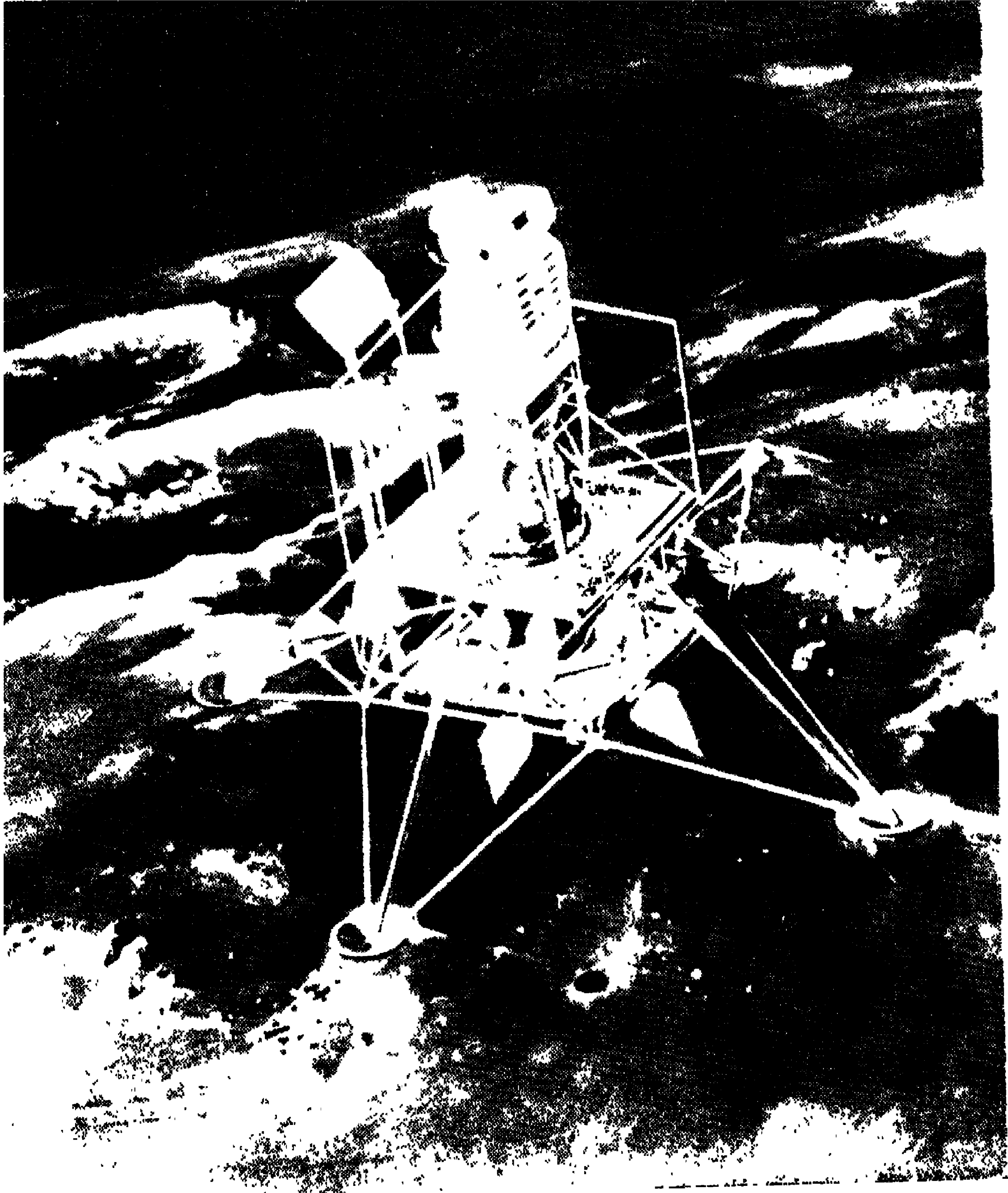
আলোচ্য পুস্তকটি বৈঠকী গল্পের ভঙ্গীতে নানা বিষয়ে লেখা কিশোর-কিশোরীদের পাঠযোগ্য একটি রচনা সঙ্কলন। গণিত ও বিজ্ঞানের বিষয়ের সঙ্গে স্থান পেয়েছে, নামের ইতিহাস, কিছু কিছু শব্দের ইতিহাস, কলকাতার বেশ কয়েকটি রাস্তার নামকরণের ইতিহাস, ম্যাজিকের কৌশল প্রভৃতি। মোট চৌদ্দটি রচনার মধ্যে বিদ্যুৎ ও তার ব্যবহার, ঘড়ি-সমস্যা, ম্যাজিক স্কোয়ার, অঙ্ক আর তাসের ম্যাজিক প্রভৃতি রচনা কিশোর পাঠকদের ভাল লাগবে বলে মনে হয়।

কিশোর বিজ্ঞানীর
দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ডিসেম্বর — ১৯৬৯

২২শ বর্ষ — ১২শ সংখ্যা



চন্দ্রপৃষ্ঠে পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে একজন মানুষ বহনের উপযোগী 'ফ্লাপ' নামক (পরীক্ষামূলক উড্ডয়মান চান্দ্রমঞ্চ বা প্লাটফর্ম) চান্দ্রমঞ্চের নমুনা। ভার্জিনিয়ার ল্যাংলি রিসার্চ সেণ্টারে পরীক্ষার জন্যে নর্থ আমেরিকান রকওয়েল কোম্পানী এটি নির্মাণ করছে।

ধূমকেতু

ইকেয়া-সেকি-কে তোমাদের মনে পড়ে? এইতো ১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাসে সে আমাদের চোখে ধরা দিয়েছিল। ২১শে অক্টোবর (ভারতীয় সময় সকাল ১০টা ৩৪ মিনিটে) জাপানের এক মানমন্দির থেকে দেখা গেল আকাশে আলোর ছটা। কাওরু ইকেয়া (Kaoru Ikeya) আর ৎসুতোম সেকি (Tsutom Seki) নামে দু-জন সখের আকাশ পর্যবেক্ষক অনুসন্ধান করে আবিষ্কার করলেন যে, এ হলো একটি ধূমকেতু তাঁদের নামানুসারে এর নাম দেওয়া হলো ইকেয়া-সেকি। কলকাতা, মাদ্রাজ আর বোম্বের আকাশেও তাকে দেখা গিয়েছিল।

রাত্রির কালো আকাশে কখনও কখনও হঠাৎ একটা জ্যোতিষ্কের আগমন ঘটে। প্রথমে সে থাকে প্রায় অদৃশ্য, পরে স্পষ্ট হয়, শেষে আবার ম্লান হতে হতে মিলিয়ে যায়। মহাশূন্যে এরাই ধূমকেতু নামে পরিচিত।

এদের মাথার কেন্দ্রস্থলটা তারার মত দেখায়, যদিও তাকে আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। এটাই হলো নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসের চারিদিকে কোমা নামে গ্যাসীয় মণ্ডল। কোমা শব্দটার মানে মাথার চুল, কমেট (Comet) শব্দটা এর থেকেই এসেছে, যার বাংলা হলো কেশযুক্ত তারা। সূর্যকে নির্দিষ্ট পথে পরিক্রমা করবার সময় এরা যখন তার কাছাকাছি এসে পড়ে, তখন তার আলো ও তাপ এর উপাদানকণাসমূহকে উত্তেজিত করে তোলে, তখন ধূমকেতু হয় উজ্জ্বলতম। এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখি যে, সূর্যোদয়ের আগে পূর্বাকাশে আর সূর্যাস্তের পর পশ্চিমাকাশে ধূমকেতু দেখা যায়।

এবারে এদের আকার ও উপাদান সম্পর্কে কিছু বলবো। সাধারণতঃ এদের মাথার ব্যাস হয় ২৯০০০ কি.মি. থেকে ১৮½ লক্ষ কি.মি. আর কোন কোন কেশযুক্ত তারার লেজের দৈর্ঘ্য হয় ১৬ কোটি কিলোমিটার। যে ধূমকেতু ১৮৪৩ সালে আমাদের চোখে ধরা দিয়েছিল তার লেজের দৈর্ঘ্য ছিল ৩২ কোটি কি.মি. আর মাথার ব্যাস ছিল ৫০০ কি.মি.। কল্পনা কর তো কত বড় চেহারা! দেখতে এত বড় হলে কি হবে, এর ভর কিন্তু খুবই সামান্য। সৌরজগতের সমস্ত ধূমকেতুর সম্মিলিত ভর চাঁদের চেয়ে সামান্য বেশী। তাই ধূমকেতু যদি পৃথিবীকে ধাক্কা মারে তাহলে নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে। অনেক সময় সূর্য বা গ্রহরাজ বৃহস্পতির সঙ্গে মিতালী পাতাবার জন্যে এরা যখন ওদের খুব কাছে গিয়ে পড়ে, তখন ভেঙ্গে টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে যায়। আমাদের পৃথিবী প্রত্যেক বছর ধূমকেতুর চূর্ণ অংশের সামনে গিয়ে পড়ে, আর তখনই ঘটে উল্কাপাত। অনেক সময় তোমরা দেখেছ যে,

আকাশ থেকে একটা তারা যেন খসে পড়লো, আবার কিছুক্ষণ পর কোথায় যেন মিলিয়ে গেল—এরাই উল্কা।

ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া গ্যাস দিয়ে ঢাকা মহাজাগতিক ধূলিকণা দিয়ে ধূমকেতুর কেন্দ্রস্থল গঠিত। যে সমস্ত গ্যাস মহাজাগতিক শৈত্যে জমে যায়, তারা হলো অ্যামোনিয়া, মিথেন ইত্যাদি। ধূমকেতুর খণ্ডিত অংশ যখন পৃথিবীতে এসে পড়ে, তখন আবহমণ্ডলের সঙ্গে ক্রমাগত ঘর্ষণ হতে থাকে। এই সংঘর্ষের ফলে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হয়। সেই তাপের প্রভাবেই ধূমকেতু থেকে লোহা ও পাথরজাতীয় জিনিসগুলি পৃথিবীর উপর পড়বার সময় তার অনেকটাই জ্বলে যায়। বর্ণালী-বিশ্লেষণে ধূমকেতুর মধ্যে হাইড্রোজেন ও হাইড্রোকার্বনের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন যে, কয়েকটি বিশেষ ধূমকেতু প্রতি-বস্তু* দিয়ে গঠিত। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বিজ্ঞানীরা কেন এই সিদ্ধান্ত করলেন? এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের প্রধান কারণ হলো এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আগমন। ১৯০৮ সালের ৩০শে জুন ভোর ৭ টায় সাইবেরিয়ার তুঙ্গুস্কা নদীর কাছে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। এর আগেই স্থানীয় লোকেরা আকাশে এক বিরাট আগুনের গোলা প্রত্যক্ষ করে, তার ঔজ্জ্বল্যে ম্লান হয়ে যায় সূর্যের জ্যোতি। এই আগুনের গোলাটিকে অনেকে পথভ্রষ্ট ধূমকেতু বলে মনে করেন। কয়েক জন বিজ্ঞানী বলেন যে, এটা হলো প্রতি-বস্তু দিয়ে তৈরি। তাই জাগতিক বস্তুর সংস্পর্শে আসা মাত্র বিস্ফোরণ ঘটেছে আর এর ফলে উদ্ভূত হয়েছে শক্তি (এনার্জি)। ওয়াশিংটনের ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ক্লাইড কাওয়ান, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অ্যাট্‌লুরি ও নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী উইলার্ড লিবি বলেছেন যে, তুঙ্গুস ধূমকেতু প্রতি-বস্তু দিয়ে তৈরি। এই মতবাদের স্বপক্ষে তাঁরা অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন। এই যুক্তিগুলি তোমাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হতে পারে, তাই আর সে সম্পর্কে আলোচনা করলাম না। তবে জেনে রাখ যে, এখনও এই সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নি। কিন্তু আশা করা যায় আগামী দশকের মধ্যে বিজ্ঞান আমাদের জানিয়ে দেবে প্রতি-বস্তু দিয়ে গড়া ধূমকেতুর ইতিহাস। কারণ, মানুষ আজ চাঁদের মাটি পেয়ে গেছে, যার তলায় লুকানো আছে

---

*প্রতি-বস্তু সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে। তোমরা জান যে, সাধারণ বস্তু অর্থাৎ যে বস্তু পৃথিবীতে পাওয়া যায়, তার পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রক। নিউক্লিয়াসের মধ্যে পজিটিভ তড়িৎযুক্ত প্রোটন আর নিরপেক্ষ নিউট্রন থাকে। নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘুরতে থাকে এক বা একাধিক নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত ইলেকট্রন, যেমন—আমাদের পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। যে পদার্থের কেন্দ্রে নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত অ্যান্টি-প্রোটন থাকে আর তাকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে পজিটিভ তড়িৎযুক্ত অ্যান্টি-ইলেকট্রন, তাকেই প্রতি-বস্তু বা অ্যান্টি-ম্যাটার বলা হয়। আরও আবিষ্কৃত হয়েছে যে, সমভরসম্পন্ন বস্তু ও প্রতি-বস্তুর মধ্যে সংঘর্ষ হলে উভয়েই ধ্বংস হবে আর পাওয়া যাবে কিছুটা শক্তি। এই শক্তির মান কখনো কখনো সাধারণ হাইড্রোজেন বোমার শত শত গুণ বেশী হয়।

ধূমকেতুর রহস্যে ভরা গল্প। সেই মাটি নিয়ে আমেরিকায় চলছে জোর গবেষণা। কয়েক বছরের মধ্যে সে বলে দেবে ধূমকেতুর নানা তথ্য।

এবার শোন ধূমকেতুর পরিক্রমা-পথের কাহিনী। সাধারণতঃ এরা সূর্যকে উপবৃত্তকার (Elliptical) পথে পরিক্রমা করে। বড় গ্রহের কাছে এলে অনেক সময় আবার অধিবৃত্তাকার (Parabolic) পথ বেছে নেয়। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে ৩·৩ বছর থেকে সহস্র বছর বা আরোও বেশী। তাহলে বুঝতে পারছো যে, কত বড় এদের পরিক্রমা-পথ। অনুমান করা হয় যে, সৌরজগতে প্রায় আড়াই লক্ষ ধূমকেতু আছে। প্রত্যেক বছর গড়ে পাঁচটি করে অজানা অতিথি, অর্থাৎ ধূমকেতু আমাদের আকাশে বেড়াতে আসে। এই পর্যন্ত মোট এক হাজার ধূমকেতু আমাদের চোখে ধরা পড়েছে।

এদের মধ্যে হ্যালীর ধূমকেতু সবচেয়ে বিখ্যাত। এর আবির্ভাব হয় ৭৬ বছর অন্তর। ১৯১০ সালে শেষ বারের মত এই ধূমকেতু আমাদের চোখে ধরা দিয়েছিল। একে আবার আমরা দেখতে পাবো ১৯৮৬ সালে। খৃষ্টপূর্ব ২৮০ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত মোট ২৮ বার হ্যালীর ধূমকেতুকে দেখা গেছে।

আর এক জাতীয় ধূমকেতু বৃহস্পতি গ্রহের প্রবল আকর্ষণে পূর্বের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। এদের বলা হয় বৃহস্পতির ধূমকেতু পরিবার। এই পরিবারের একটি সভ্যের কথা বলে আজকের আলোচনা শেষ করবো। এর নাম বায়েলার ধূমকেতু, প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৮২৬ সালে। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে এর সময় লাগে ৬·৬ বছর। ১৮৪৬ সালে বায়েলার ধূমকেতুকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখা যায়। ছয় বছর পর এই দুই অংশ শেষ বারের মত আমাদের চোখে ধরা পড়ে। তার পর কোথায় হারিয়ে গেছে, কে জানে! ১৮৭২, ১৮৮৫ ও ১৮৯৮ সালে পৃথিবী যখন এই লুপ্ত ধূমকেতুদ্বয়ের পরিক্রমা-পথ অতিক্রম করে, তখন প্রচণ্ড উল্কাপাত হয়। তার পর থেকে এই উল্কাপাত আর দেখা যায় নি।

ধূমকেতু নীল আকাশের আগন্তুক। অজানা রহস্যের ভাণ্ডার নিয়ে সে বার বার ধরা দিয়েছে বিশ্বের মানুষের চোখে। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ তাকে দেখে ভয়ে শিউরে উঠেছে, ধ্বংস আর যুদ্ধের পূর্বাভাস মনে করেছে, অশুভ ও অকল্যাণের প্রতীক হিসেবে তাকে কতই না অভিশাপ দিয়েছে। আবার কত কবি এদের নিয়ে লিখে গেছেন কত গান, কাব্য আর কবিতা।

কিন্তু বর্তমান কালে ধূমকেতুকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানীরা নানা রকম গবেষণা চালিয়ে অনেক নতুন রহস্যের সন্ধান পাচ্ছেন এবং এ থেকে আরও অনেক অজ্ঞাত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

শ্রীঅলোককুমার সেন

অতীতের সাক্ষী

প্রাগৈতিহাসিক যুগের দৈত্যাকৃতির একটা ডায়নোসোরকে যদি এখন কোন দিন কোন শহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়, তবে সেটা সাধারণ মানুষের মনে যতই ভীতির সঞ্চার করুক না কেন, বিজ্ঞানীরা কিন্তু এই ভেবেই বিস্মিত হবেন যে, বিবর্তনের চক্র এড়িয়ে জন্তুটি আজও নিজের পূর্বতন দৈহিক আকৃতি বজায় রেখেছে কেমন করে। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হবে, কিন্তু এর ব্যতিক্রম এবং বোধহয় একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে শিলাকান্থ্ মাছ। সত্যই এ এক মহাবিস্ময় যে, ৩০ কোটি বছর আগেকার ডিভো-নিয়ান উপযুগের অধিবাসী এই শিলাকান্থ্ তার বাইরের আকৃতি ও সেই সঙ্গে দেহাভ্যন্তরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবিকৃত রাখতে পেরেছে; বিগত কয়েক কোটি বছরের বিবর্তনের ঢেউ তাদের শরীরে কোন পরিবর্তনই আনতে পারে নি, প্রাকৃতিক দুর্যোগে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। বিবর্তন-চক্র থেকে ছিট্‌কে পড়া এই প্রাণীটি-সম্বন্ধে জীব-বিজ্ঞানীদের তাই কৌতূহল ও গবেষণার অন্ত নেই।

আজ পর্যন্ত জীবন্ত অবস্থায় ৫।৬টির বেশী শিলাকান্থ মাছ ধরা সম্ভব হয় নি। প্রথমে মাছটি ধরা পড়ে ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলে। জালে আট্‌কান ৫ ফুট লম্বা মণখানেক ভারী অদ্ভুত আকৃতির এই মাছটিকে দেখে সেখানকার জেলেরা অবাক হয়ে গিয়েছিল; তাই তারা তৎক্ষণাৎ সেটিকে পাঠিয়ে দিল স্থানীয় যাদুঘরে। যাদুঘরের তৎকালীন অধ্যক্ষা শ্রীমতী ল্যাটিমোর বিচিত্র আকৃতির মাছটি দেখে বুঝতে পারলেন, সচরাচর যে সব মাছ দেখা যায়, এটি মোটেই সে রকমের নয়, সুতরাং তিনি সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠালেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী রোডস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্মিথের কাছে। কিন্তু নানা কারণে তাঁর আসতে দেরী হওয়ায় মাছটি পচে নষ্ট হয়ে গেল। কয়েকদিন পরে স্মিথ যখন এসে পৌঁছলেন, সেই পচা ও গলা মাছটি দেখে তাঁর বাক্যরোধ হয়ে গেল, এখন আপশোষ করা বৃথা। সুতরাং মাছটির ভিতরকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করা আর সম্ভব হলো না, উপরের চামড়া ও কঙ্কালটিই সংরক্ষিত হয়েছিল। স্মিথ কিন্তু হতাশ হলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন জীবন্ত অবস্থায় যখন একটা মাছ ধরা সম্ভব হয়েছে তখন চেষ্টা করলে আরও এই রকম মাছ হয়তো ধরা যাবে। সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকার সেই বিশেষ অঞ্চলটি তোলপাড় করে তিনি অনুসন্ধান চালালেন। ইংরেজী, ফরাসী ও পর্তুগীজ ভাষায় অসংখ্য প্রচারপত্র বিলি করে সেখানকার সমস্ত মাছ-ধরা প্রতিষ্ঠানের কাছে এর সম্বন্ধে সন্ধান রাখবার জন্যে তিনি আবেদন জানা-

লেন। প্রত্যেকটি মাছের জন্যে হাজার পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করলেন, এমন কি তিনি নিজেও জেলে ডিঙ্গি চড়ে সেখানকার সমুদ্র অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর প্রচেষ্টা তৎক্ষণাৎ সফল না হলেও এর প্রায় চৌদ্দ বছর পরে ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে আকস্মিকভাবে আর একটি শিলাকান্থের সন্ধান পাওয়া গেল। মাদাগাস্কারের নিকটবর্তী কমোরো দ্বীপপুঞ্জের এক জেলে একদিন অদ্ভুত আকৃতির একটি মাছ স্থানীয় বাজারে নিয়ে আসে বিক্রির উদ্দেশ্যে; আর একটু হলে মাছটি বিজ্ঞানীদের হাতছাড়া হয়ে যেতো, কিন্তু সেখানকারই এক ক্রেতা মাছটি দেখে বুঝতে পারে যে, এটা শিলাকান্থ্ মাছ। তিনি স্মিথের মোটা পুরস্কারের কথা জেলেটিকে জানান। এতদিন পরেও সেই প্রচারপত্রের কথা তাঁর স্মরণ ছিল। জেলেটিও আর বিন্দুমাত্র দেরী না করে মাছটি নিয়ে যায় স্থানীয় ডেপুটি অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের কাছে। এর জন্যে জেলেটি এক শত পাউণ্ড পুরস্কার লাভ করে। এরপর অধ্যাপক স্মিথ যখন মাছটির খবর পেয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হন। শুনতে পাওয়া যায়, আনন্দ ও সাফল্যের আতিশয্যে তিনি নাকি শিশুর মত কাঁদতে সুরু করেন। মৃত হলেও অবিকৃত অবস্থায় এই প্রথম শিলাকান্থ্ মাছ বিজ্ঞানীদের হস্তগত হয়।

এর কয়েক মাস আগে জনৈকা পেশাদার মহিলা শিল্পী অস্বাভাবিক আকৃতির একটি মাছের আঁশ গবেষণার জন্যে ওয়াশিংটন ন্যাশনাল মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দেন। শিল্পকাজের ব্যাপারে বাজার থেকে বিভিন্ন রঙের ও আকারের মাছের আঁশ সংগ্রহ করাই ছিল মহিলাটির সখ। মিউজিয়ামের বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন, এটি শিলাকান্থ্ মাছেরই আঁশ, সেই মহিলার আর কোন সন্ধান না পাওয়ায় এই সম্বন্ধেও আর কিছু জানা সম্ভব হয় নি। এর পরে বিজ্ঞানীদের প্রাণপণ চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে ১৯৫৩ এবং ১৯৫৪ সালের মধ্যে আরো শিলাকান্থ্ ধরা পড়ে আফ্রিকা ও আমেরিকার বিভিন্ন সমুদ্র অঞ্চল থেকে। প্রত্যেকটি মাছই প্রচুর পয়সা খরচ করে সংরক্ষিত করা হয়েছে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্যে।

এখানে তোমরা প্রশ্ন করতে পার—শিলাকান্থের বৈশিষ্ট্য কী বা কোন্‌খানে, যার জন্যে এর সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের এত কৌতূহল ও আগ্রহ? সেই বিষয়েই এখন কিছু আলোচনা করা যাক। আগেই বলেছি, শিলাকান্থ্ হচ্ছে ৩০ কোটি বছর আগেকার ডিভোনিয়ান উপযুগের মাছ। সুতরাং মাছটির বিষয়ে কিছু জানতে হলে সেই যুগের প্রাকৃতিক পরিবেশের কথাও কিছু জানা দরকার। যখনকার কথা বলা হচ্ছে, সেই সময়ে পৃথিবীর জলবায়ু ছিল চরম—বৃষ্টি আরম্ভ হলে এক নাগাড়ে অবিরত চলতে থাকতো দীর্ঘদিন ধরে, বৃষ্টি থামলে হয়তো দেখা যেতো সর্বত্র বেশ কয়েক ফুট জল দাঁড়িয়ে গেছে। আবার শুক্‌নো আবহাওয়ার পালা সুরু হলে মাসের পর মাস প্রচণ্ড গরম পড়তো, সমস্ত স্থলভূমি তো বটেই, এমন কি অধিকাংশ সমুদ্রও শুকিয়ে খট্‌খটে হয়ে যেত। এই চরম জলবায়ুর

মধ্যে কেবলমাত্র সেইসব প্রাণীই নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল, জলে ও স্থলে যারা সমান দক্ষতায় চলাফেরা করতে পারতো। শুধু জলবায়ুর ব্যাপারেই নয়, ভৌগোলিক আকৃতির দিক থেকেও তখনকার পৃথিবীর আকার ছিল অন্যরকম—আট্‌লান্টিক মহাসাগরের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না; তার পরিবর্তে দেখা যেতো উত্তর আমেরিকা, আট্‌লান্টিক মহাসাগর এবং ইউরোপের কয়েকটি অংশ নিয়ে এক বিরাট ভূখণ্ড। হাজার হাজার মাইলব্যাপী এই স্থলভাগের নীচের দিকে ছিল একটা প্রায় অগভীর সমুদ্র। সেখানে বিচিত্র আকৃতি ও বিচিত্রতর শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট যে সব মাছ বা সামুদ্রিক প্রাণী বাস করতো, শিলাকান্থ্‌ তাদেরই অন্যতম। এদের জীবনের কিছুটা অংশ কাট্‌তো ডাঙ্গায়, বাকীটা জলে। বলা বাহুল্য, একমাত্র শিলাকান্থ্‌ ছাড়া এই প্রাণীদের সবগুলিই পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কোটি কোটি বছরের বিবর্তনকে এড়িয়ে এই মাছটি তার দৈহিক গঠন অবিকৃত রাখতে পেরেছে আশ্চর্যজনকভাবে। সুতরাং বলা যেতে পারে, শিলাকান্থ্‌ হচ্ছে জলচর ও উভচর প্রাণীর ক্রমবিবর্তনের সেতু, সেই জন্যেই মাছটির বিষয়ে জীব-বিজ্ঞানীদের এত আগ্রহ ও কৌতূহল।

সাধারণ মাছের পাখ্‌নাগুলি আমরা সকলেই দেখেছি, তাতে আছে কতকগুলি সরু কাঁটা আর সেগুলি পাত্‌লা জালের মত একটি জিনিষ দিয়ে পরস্পর আট্‌কান থাকে। কিন্তু শিলাকান্থের দেহের উপরে বাঁ-দিকের প্রথম পাখ্‌নাটি ছাড়া অন্যগুলির কোনটিই সাধারণ মাছের মত নয়; এগুলির গোড়ার দিকে আছে একটা মাংসপিণ্ড, যেটি দেখলে মনে হবে সরাসরি মাছের শরীরের অভ্যন্তর থেকে বেরিয়েছে। এদের শেষ প্রান্তে আছে কতকগুলি কাঁটা। এই পাখ্‌নাগুলির মধ্যেও একটা আশ্চর্য জিনিষ লক্ষ্য করা গেছে—এদের অভ্যন্তরে আছে তিনটি হাড়, ঠিক যেমনটি দেখা যায় মানুষের হাতে, এই হাড়গুলির গঠন ও কার্য-প্রণালী অনেকটা মানুষের হাতের মতই। এই পাখ্‌নাগুলির সাহায্যে মাছটি ডাঙ্গায় স্থলচর প্রাণীর ন্যায় হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াতো এবং সেক্ষেত্রে এগুলি মানুষের পায়ের মত কাজ করতো। বিজ্ঞানীদের মতে, এই সব ক্রোসো-প্টেরিজিয়ান অর্থাৎ পায়ের মত পাখ্‌নাবিশিষ্ট মাছই হচ্ছে স্থলচর প্রাণীর আদিপুরুষ, ক্রমবিবর্তনের ধারায় এরাই পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে মানুষের মধ্যে।

মাছটির শরীরের অভ্যন্তরের গঠনও কম কৌতূহলজনক নয়। অন্যান্য জলচর জীব তাদের নাকের সাহায্যে কেবল ঘ্রাণই গ্রহণ করতে পারে, নিঃশ্বাস নেওয়া এদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ এদের নাসারন্ধ্র দুটির সঙ্গে গলার সরাসরি যোগ নেই। শিলাকান্থের দেহে এর ঠিক বিপরীত জিনিষটাই চোখে পড়ে। মাছটির নাসারন্ধ্র দুটি শ্বাসনালীর সাহায্যে সরাসরি যুক্ত হয়েছে ফুস্‌ফুসের সঙ্গে, ঠিক যেমনটি দেখা যায় স্থলচর প্রাণীদের ক্ষেত্রে। এর ফলে ডাঙ্গায় উঠে নাকের সাহায্যে নিঃশ্বাস নিতে এদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না; অর্থাৎ জলের মধ্যে আপন ফুল্‌কোর সাহায্যে জলে

দ্রবীভূত অক্সিজেন যেমন টেনে নিতে পারে, তেমনি ডাঙ্গায় উঠে নাক দিয়ে বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করতেও এদের একটুও অসুবিধা হয় না। সুতরাং বলা যায় শিলাকান্থ এমন একটা যুগের জীব, যখন জলের প্রাণী ডাঙ্গায় উঠে বিশ্বের বিবর্তনধারায় এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করতে চলছে। শিলাকান্থ্ যে যুগের মাছ, বিশ্বের বিবর্তন-চক্র সেখানে এসে আদৌ থেমে থাকে নি, তাকে পিছনে রেখে সে অনেকখানি পথ এগিয়ে গেছে। কিন্তু শিলাকান্থ্ তার প্রাচীনত্ব আঁকড়ে এখনও পড়ে রয়েছে এই পৃথিবীর বুকে, এইখানেই মাছটির বৈচিত্র্য।

মিনতি সেন

তুলা থেকে প্লাস্টিক

১৮৬৪ সালে বার্মিংহামের প্রখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার পার্কস উদ্ভিদের দেহকোষের অন্যতম উপাদান সেলুলোজ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তুলার কাজে-না-লাগা ছোট ছোট আঁশগুলি সেলুলোজের বিশুদ্ধতম প্রাকৃতিক উৎস। পার্কস এই সেলুলোজের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে নাইট্রো-সেলুলোজ নামক একটি দাহ্য পদার্থ পেলেন। অ্যাসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে একটি বিস্ফোরক বস্তু (গান কটন) পাওয়া যায়, কিন্তু অ্যাসিডের পরিমাণ কম হলে দাহ্য অথচ বিস্ফোরক নয়, এরূপ নাইট্রো-সেলুলোজ উৎপন্ন হয়। পার্কসের এই আবিষ্কারের কাছাকাছি সময়ে নিউইয়র্কের বিখ্যাত শিল্প-প্রতিষ্ঠান ফেলান ও কোলেণ্ডার একটি ঘোষণা করেছিলেন। প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে বলা হয়েছিল বিলিয়ার্ড বল প্রস্তুতের জন্যে যে আইভরি বা হাতির দাঁত ব্যবহৃত হয়, যদি কোন বৈজ্ঞানিক তার বিকল্প কোন বস্তু আবিষ্কার করতে পারেন, তাহলে তাঁকে ১০,০০০ ডলার নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে। এর কারণ হলো, সে সময় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে হাতির দাঁতের অভাব দারুণভাবে প্রকট হয়ে উঠেছিল। জন ওয়েসলি হায়াট হাতির দাঁতের বিকল্প বস্তু আবিষ্কারের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করলেন, কিছুদিন পরে তাঁর ভাই ইসাইয়া হায়াটও তাঁর গবেষণায় যোগদান করেন। দু-ভাই দীর্ঘদিনের গবেষণায় পার্কসের আবিষ্কৃত সেলুলোজ নাইট্রেটের সঙ্গে কর্পূর মিশ্রিত করে একটি অর্ধ-তরল পদার্থ পেলেন, তাঁরা এটির নাম দিলেন সেলুলয়েড (জাইলোনাইট নামেও এটি পরিচিত)। আবিষ্কারের প্রথম দিন থেকেই স্বচ্ছ, সাদা বা রঙীন সেলুলয়েড আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বস্তু নির্মাণে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে সেলুলয়েড-নির্মিত দ্রব্যাদি ব্যবহারের মুখ্য

অসুবিধা হলো—এটা দাহ্য পদার্থ বলে ব্যবহারের সময় আগুনের সংস্পর্শে যাতে না আসে সে সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। পরবর্তী বহু বৈজ্ঞানিক সেলুলয়েডের সঙ্গে অন্যান্য রাসায়নিক বস্তু মিশ্রিত করে এর দাহ্য প্রকৃতি পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হতে পারেন নি। তাই আজও সেলুলয়েডের বস্তুসমূহ আগুনের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে সাবধানে ব্যবহার করতে হয়।

১৮৬৯ সালে আমেরিকার হায়াট ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক সেলুলয়েড আবিষ্কারই পৃথিবীতে প্লাষ্টিক-যুগ আরম্ভের সূচনা।

অগ্নিসহ সেলুলোজ জাতীয় বস্তু আবিষ্কারের জন্যে দীর্ঘদিনের গবেষণায় অবশেষে আবিষ্কৃত হলো সেলুলোজ অ্যাসিটেট প্লাষ্টিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই সেলুলোজ অ্যাসিটেট আবিষ্কৃত হয়, সেলুলোজ নাইট্রেটের মতই এর প্রস্তুত-প্রণালী ; অর্থাৎ নাইট্রিক অ্যাসিডের পরিবর্তে অ্যাসেটিক অ্যাসিডের সঙ্গে সেলুলোজের বিক্রিয়া ঘটিয়ে সেলুলোজ অ্যাসিটেট উৎপন্ন হয়। যুদ্ধের সময় এই সেলুলোজ অ্যাসিটেট অ্যাসিটোনে দ্রবীভূত করে সেই দ্রবণ এরোপ্লেনের ডানায় মাখানো হতো। বর্তমানে সেলুলোজ অ্যাসিটেট প্লাষ্টিক আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য বহু বস্তু নির্মাণে বিপুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং সেলুলয়েডের স্থান অধিকার করে নিয়েছে। বিভিন্ন যন্ত্রপাতির হাতল, চিরুণী, ফিতা, ছবির ফ্রেম, সানগ্লাসের কাচ, ফাউন্টেন পেন, মাছ ধরবার সরঞ্জাম, সুচ, স্বচ্ছ প্যাকেট, খেল্‌না প্রভৃতি নির্মাণে এই প্লাষ্টিক অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এই প্লাষ্টিকেরও একটা সামান্য ত্রুটি আছে, তা হলো বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প শুষে নেওয়া। এই ত্রুটি দূরীকরণের জন্যেও রসায়ন-বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করেছেন এবং আবিষ্কৃত হয়েছে জলীয় বাষ্প-নিরোধক প্লাষ্টিক সেলুলোজ অ্যাসিটেট-প্রোপিওনেট (Cellulose Acetate-Propionate, সংক্ষেপে CAP বলা হয়) এবং সেলুলোজ অ্যাসিটেট-বিউটিরেট (Cellulose Acetate-Butyrate, সংক্ষেপে CAB বলা হয়)। CAP প্লাষ্টিক প্রস্তুত হয় সেলুলোজের সঙ্গে অ্যাসেটিক অ্যাসিড ও প্রোপিওনিক অ্যাসিডের মিশ্রণের বিক্রিয়া ঘটিয়ে এবং CAB প্লাষ্টিক প্রস্তুত হয় অ্যাসেটিক অ্যাসিড ও বিউটিরিক অ্যাসিডের মিশ্রণের সঙ্গে সেলুলোজের বিক্রিয়া ঘটিয়ে। এই CAP ও CAB প্লাষ্টিককে যান্ত্রিক উপায়ে সূক্ষ্ম তন্তুতে পরিণত করে খুব সুন্দর অ্যাসিটেট রেয়ন প্রস্তুত করা হয়।

সেলুলোজ গোষ্ঠীর নবতম প্লাষ্টিক হলো সেলুলোজ প্রোপিওনেট। সহজেই বোঝা যাচ্ছে, এটি সেলুলোজের উপর প্রোপিওনিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। তূলা থেকে উৎপন্ন অন্যান্য প্লাষ্টিক অপেক্ষা কয়েকটি ব্যাপারে এই সেলুলোজ-প্রোপিওনেটের উৎকর্ষ উল্লেখযোগ্য। এটি ঘাতসহ, চাপ প্রয়োগে আয়তন হারায় না, বিরক্তি-উৎপাদক গন্ধ নেই, অন্যান্য প্লাষ্টিকের ন্যায় হাইড্রোকার্বন ও খনিজতেলসমূহ এর কোন ক্ষতি করতে পারে না। এই প্লাষ্টিকের সবচেয়ে বড়ো সুবিধা হলো—এর উপর কালির

দাগ ধরে না। রেডিও ক্যাবিনেট, টেলিফোন, শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি নির্মাণে এই প্লাস্টিক ব্যবহৃত হয়।

১৯৩৫ সালে হারকিউলিস পাউডার কোম্পানি ইথাইল সেলুলোজ নামে আর একটি উৎকৃষ্ট প্লাস্টিক প্রস্তুত করেন। প্রথমে তুলার আঁশসমূহকে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করিয়ে সোডা-সেলুলোজ উৎপন্ন করা হয় এবং তারপর সোডা-সেলুলোজের সঙ্গে ইথাইল সালফেটের বিক্রিয়া ঘটালে ইথাইল সেলুলোজ উৎপন্ন হয়। অনুরূপ পদ্ধতিতে ইথাইল সালফেটের পরিবর্তে মিথাইল সালফেট ব্যবহার করে মিথাইল সেলুলোজ প্রস্তুত করা হয়। কোন বস্তু বা যন্ত্রে কৃত্রিম কাঠিন্য প্রদানে, জানালার ফ্রেম নির্মাণে, আইসক্রীম প্রভৃতির কাঠামো প্রস্তুতিতে এবং আঠা হিসাবে এই প্লাস্টিক ব্যবহৃত হচ্ছে।

সেলোফেন সেলুলোজগোষ্ঠীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্লাস্টিক। ক্ষারীয় সেলুলোজ বা সোডা সেলুলোজের সঙ্গে কার্বন-ডাই-সালফাইড মিশ্রিত করলে সেলুলোজ জ্যান্থেট নামক একটি নতুন যৌগ উৎপন্ন হয়। পরিস্রাবণের সাহায্য উক্ত মিশ্রণ থেকে অপেক্ষাকৃত ভারী ও আঠালো সেলুলোজ জ্যান্থেটকে পৃথক করা হয় এবং তারপর সেটিকে সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে বের করে নিয়ে এসে অতি দ্রুত অ্যামোনিয়াম বা সোডিয়াম সালফেট ও সালফিউরিক অ্যাসিডের মিশ্রণে পূর্ণ একটি পাত্রে ফেলা হয়। এই ভাবে উৎপন্ন সেলুলোজ ফিল্মকে পর পর কয়েকটি পাত্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে পরিশোধিত ও সালফার-বিমুক্ত করা হয়। অতঃপর গ্লিসারলের পাত্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় পদার্থটি ৭% গ্লিসারল শোষণ করে নমনীয় হয়ে ওঠে। অবশেষে প্ল্যাস্টিসাইজার, রজন, মোম প্রভৃতির সাহায্যে বস্তুটি হয়ে ওঠে আশ্চর্যজনক সুন্দর আবরণের কাগজ—সেলোফেন।

শ্রীজ্যোতির্ময় হুই

ফাইবার অপ্‌টিক্স

একথা তোমাদের নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলতে হবে না যে, আলোক রশ্মি সরল রেখায় চলে। এই সরল গতির জন্যে আমাদের মাঝে মাঝে অসুবিধায় পড়তে হতে পারে। মনে কর, একটা উঁচু পাঁচিলের একধারে দাঁড়িয়ে তুমি আলো জ্বাললে। যতক্ষণ না তুমি পাঁচিলে একটা গর্ত বা ঐ ধরণের কিছু করছো, ততক্ষণ তোমার আলো পাঁচিলের ওধারে যেতে পারছে না অথচ তুমি একটা ঘণ্টা বাজালে সেটা অনায়াসেই পাঁচিলের অপর প্রান্ত থেকে শোনা যাবে; অর্থাৎ আলোক রশ্মি কোন বাধার সম্মুখীন হলে শব্দের মত সে বাধাকে অতিক্রম করে যেতে পারে না।

কিন্তু অল্প কয়েক বছর আগে এমনই একটা জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে, যার সাহায্যে আলোক রশ্মিকে কোন বাধার চারপাশে ঘুরিয়ে আনা যায়। সোজা কথায় আলো-কে বক্রপথে পরিভ্রমণ করানো সম্ভবপর হয়েছে। এটা অবিশ্বাস অবিশ্বাস্য মনে হলেও ফাইবার অপ্‌টিক্স বা তন্তুজ আলোকবিদ্যার এটা হলো মূল ভিত্তি।

আলো সরলরেখায় ভ্রমণ করলেও এটা পরীক্ষাগারে প্রমাণিত হয়েছে যে, খুব সরু স্বচ্ছ পদার্থের একধারে আলো ফেললে আলো সরলপথে ভ্রমণ না করে ঐ স্বচ্ছ তন্তুর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং তন্তুর অপর প্রান্ত আলোকিত হয়। এই ঘটনার উপরই ভিত্তি করে ফাইবার তৈরি করা হয় এবং তা দিয়ে নানা ধরণের কাজ করা হয়।

এই তন্তু বা ফাইবার দু-ধরণের। এক রকমের নাম হলো কোহেরেন্ট (Coherent)। এই ধরণের তন্তু শুধুমাত্র আলোই বহন করে না, এদের সাহায্যে প্রতিবিম্বও (Image) প্রেরণ করা সম্ভব। আর এক ধরণের নাম হলো নন-কোহেরেন্ট (Non-coherent), এরা শুধুই আলো প্রেরণ করে।

সাধারণতঃ কাচ এবং প্লাস্টিক দিয়েই এই তন্তু তৈরি করা হয়। কাচের তন্তু প্লাস্টিকের চেয়ে অনেক বেশী সরু করা সম্ভব। এগুলি প্রায় এক ইঞ্চির এক হাজার ভাগের দুই অথবা তিন অংশের মত মোটা হয়ে থাকে। এদের বলা হয় ২—৩ মিল সাইজ (১মিল = $\frac{১}{১০০০}$ ইঞ্চি)। এই কারণে কাচের তন্তু দিয়েই কোহেরেন্ট ধরণের ফাইবার পাইপ তৈরি হয়। প্লাস্টিকের তন্তু মোটা হয় বলে তা দিয়ে শুধু আলোক প্রেরণ করা হয়। অনেকগুলি তন্তুকে একসঙ্গে গুচ্ছ করে একটি পাইপের আকার দেওয়া হয়—যাকে বলা হয় ফাইবার পাইপ।

এই ফাইবার পাইপ আজকাল নানা কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটির খুব বেশী ব্যবহার দেখা যায় নানা ধরণের (যেমন মোটর এবং কম্পিউটরের) ডায়াল আলোকিত

করবার জন্যে। ডায়ালের মধ্যে ছোট বৈদ্যুতিক ল্যাম্প বসাবার পরিবর্তে একটি জোরালো বাতির আলো এই পাইপের সাহায্যে অনেকগুলি ডায়ালে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। জটিল বৈদ্যুতিক সার্কিটের বদলে ফাইবার পাইপ আজকাল অনেক কম্পিউটারে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া ডাক্তারীর কাজে যেখানে অতি ক্ষুদ্র অংশ আলোকিত করা দরকার, সেখানে অতি সূক্ষ্ম ফাইবার পাইপ বিশেষ সুবিধার জন্যে লাগানো হয়। দাঁতের চিকিৎসায় এবং অতি ক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক যন্ত্র মেরামতিতে এটি ইতিমধ্যে স্থান করে নিয়েছে।

এই শিল্পটির বয়স দশ বছরও পার হয় নি। এরই মধ্যে আমেরিকায় এটির বিশেষ প্রসার লাভ হয়েছে, দামও কমে এসেছে। আমাদের দেশে এখনও এটির প্রচলন হয় নি, তবে শীঘ্রই হবে আশা করা যায়।

বাণীকুমার মিত্র

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নঃ ১। ট্রেস এলিমেন্ট কি এবং এদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
মেদিনীপুর
রাধাশ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়
কলিকাতা-১৪
বিজলী বসাক
আসানসোল

উঃ ১। প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহে এবং তাদের খাদ্যের মধ্যে আমিষ, স্নেহ ও শর্করাজাতীয় পদার্থ ছাড়াও অনেকগুলি মৌলিক ধাতু অত্যন্ত অল্প মাত্রায় থাকে। এদের বলা হয় ট্রেস এলিমেন্ট। আজ পর্যন্ত গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, এগুলি জীবদেহের অপরিহার্য বস্তু। ভিটামিনের মত এরা জীবনধারণ ও দেহের পুষ্টিলাভের সহায়ক। আমাদের দেহের মধ্যে অনবরতই যে রাসায়নিক বিক্রিয়া চলছে, তার ক্ষেত্রে এসব এলিমেন্ট অনুঘটকের মত কাজ করে থাকে। এদের অভাব হলে নানারকম অপুষ্টিজনিত অসুখ দেখা দেয়। দুধ, রক্ত, দেহরস, দেহতন্তু প্রভৃতির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের প্রায় ২৩।২৪টি ট্রেস এলিমেন্টের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়েছে। পুষ্টি-বিজ্ঞানে তামা, দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ, কোবাল্ট—এই চারটি ট্রেস এলিমেন্টের প্রয়োজনীয়তা ও এদের অভাবজনিত অসুবিধার ব্যাপারে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে।

রক্ত, দেহতন্তু, দুধ ইত্যাদির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তামা আছে বলে জানা গেছে—যা প্রাত্যহিক খাদ্যদ্রব্য থেকে সরবরাহ হয়ে থাকে। রক্তের লোহিত কণিকা ও হিমোগ্লোবিন তৈরি হতে তামার প্রয়োজন হয়। বিপাক-ক্রিয়ায় (মেটাবলিজ্‌ম্) তামার অভাব হলে কম শক্তি উৎপন্ন হয়, ফলে প্রাণীরা কমজোরী হয়ে পড়ে। চুলের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে তামাও একটি উপাদান। তামার অভাবে চুলের রং পাল্‌টে যায়, চুল উঠে যায়। দেহের চামড়ার মসৃণভাব নষ্ট হয়ে যায়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের জন্যে দৈনিক প্রায় ৩ মিলিগ্র্যাম তামার প্রয়োজন হয়। সন্তানসম্ভবা মহিলা বা সন্তানের জননীর আরও বেশী লাগে। তামার মত দস্তাও প্রাণীদেহের প্রায় সব জায়গাতেই অল্পমাত্রায় থাকে। দাঁতে ও হাড়ে দস্তা বেশী পরিমাণে থাকে। শরীর গঠনে দস্তার যথেষ্ট ভূমিকা আছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

দেহের মধ্যে হাড় তৈরির কাজে ফস্‌ফরাস অপরিহার্য। ফস্‌ফেটেজ নামে এক প্রকার এন্‌জাইম এই ফস্‌ফরাস সরবরাহ করে। জানা গেছে, দেহে ম্যাঙ্গানিজ কম পড়লে এই ফস্‌ফেটেজের সরবরাহ-ক্ষমতা কমে যায়। এর ফলে ঠিকমত হাড় তৈরি হতে পারে না। ম্যাঙ্গানিজের অভাবে অনেক সময়ে বন্ধ্যাত্ব দেখা যায়।

রক্তের লোহিত কণিকা তৈরির কাজে তামার মত কোবাল্টও যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। কোবাল্টমিশ্রিত ভিটামিন বি-১২ দেহের পুষ্টিসাধন করে।

শ্যামসুন্দর দে

বিবিধ

১৯৬৯ সালে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

১৯৬৯ সালে বিজ্ঞানের তিনটি বিষয়ে সর্বসমেত পাঁচজন বিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ভেষজ-বিজ্ঞানে দেওয়া হয়েছে তিনজনকে যৌথভাবে, রসায়ন-বিজ্ঞানে দু-জনকে যৌথভাবে এবং পদার্থ-বিজ্ঞানে একজনকে।

ভেষজ-বিজ্ঞানে যে তিনজন বিজ্ঞানী যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাঁরা হলেন—ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেক্‌নোলজির অধ্যাপক ম্যাকস্ ডেলব্রুক, ওয়াশিংটনের কার্নেগী ইনস্টিটিউশনের ডাঃ আলফ্রেড হার্‌শে এবং ম্যাসাচুসেট্‌ অফ টেকনোলজির অধ্যাপক সাল্‌ভাডর লুরিয়া। অধ্যাপক ডেলব্রুক জন্মসূত্রে জার্মান এবং অধ্যাপক লুরিয়া জন্মসূত্রে ইটালীয়। কিন্তু তিনজনেই এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। যে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার জন্যে তাঁদের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে—ভাইরাসের প্রজননগত আকৃতি এবং প্রতিরূপণ পদ্ধতি সংক্রান্ত আবিষ্কার। ব্যাক্‌টিরিয়োফাজ সক্রান্ত তাঁদের গবেষণা একটি নতুন দিক খুলে দিয়েছে। এই ভাইরাস সাধারণ কোষ অপেক্ষা ব্যাক্‌টিরিয়াকে সহজে আক্রমণ করে। তাঁদের এই

গবেষণার উপর ভিত্তি করে আধুনিক আণবিক জীববিদ্যা সুদৃঢ়ভাবে গড়ে উঠেছে। বর্তমানে এই বিষয়ে যে দ্রুত অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা তাঁদের অবদান ছাড়া সম্ভব হতো না।

রসায়ন-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বৃটেনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ সায়েন্স অ্যাণ্ড টেক্‌নোলজির অধ্যাপক ডার্ক বার্টন এবং নরওয়ের অস্‌লো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওড্‌ হ্যাসেলকে। রসায়ন-বিজ্ঞানে অনুরূপণ (কন-ফরমেশন) মতবাদ গড়ে তোলা ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁরা দু-জনে স্বতন্ত্রভাবে যে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন, সেই গবেষণার স্বীকৃতিতে তাঁদের এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। তাঁদের কৃতিত্ব হচ্ছে জৈব অণুসমূহের ত্রিমাত্রিক আকৃতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা এবং এমন একটি সূত্র উদ্ভাবন, যার সাহায্যে জটিল জৈব যৌগিক পদার্থের সংশ্লেষণে কি কি পরিবর্তন ঘটবে, সে সম্পর্কে সঠিক পূর্বাভাস দেওয়া যায়।

পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এককভাবে মার্কিন বিজ্ঞানী মারে গেলম্যান। সমস্ত বস্তুর মৌলিক উপাদান যে কণিকগুলি, তাদের সুসংহত শ্রেণীবিন্যাস এবং এই সব মৌলিক কণিকার পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্যে অধ্যাপক গেলম্যানকে এই পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়বার মানুষের চাঁদে পদার্পণ

তিন মার্কিন নভোযাত্রী চার্লস কনরাড, রিচার্ড গর্ডন এবং অ্যালান বীন ফ্লোরিডার কেপ কেনেডি থেকে ১৪ই নভেম্বর চন্দ্রাভিযানে যাত্রা করেন। ভারতীয় সময় রাত্রি ৯টা ৫২ মিনিটে অ্যাপোলো-১২ মহাকাশযানকে অগ্রভাগে নিয়ে স্যাটার্ন-৫ রকেট উৎক্ষিপ্ত হয়। এই অভিযানের নেতা, মূলযান 'ইয়াঙ্কি ক্লিপার' এবং চান্দ্রযান ইন্‌ট্রিপিড-এর পরিচালক হলেন যথাক্রমে কনরাড, গর্ডন এবং বীন। অ্যাপোলো ১২-এর মূল মহাকাশ-যানের নাম ইয়াঙ্কি ক্লিপার এবং মূলযানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চান্দ্রযানের নাম ইন্‌ট্রিপিড।

প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল মহাকাশ পাড়ি দিয়ে ১৯শে নভেম্বর চাঁদে পদার্পণে তৃতীয় ও চতুর্থ মানুষ হলেন চার্লস কনরাড এবং অ্যালান বীন। পৃথিবীর মানুষের এই দ্বিতীয়বার চন্দ্র বিজয় অভিযানে চান্দ্রযান বা ভেলা ইন্‌ট্রিপিড থেকে নেমে আসেন নভোযাত্রী কনরাড ভারতীয় সময় বিকাল ৫টা ১৪ মিনিটে, তার সঙ্গে অ্যালান বীন এসে যোগ দেন আধ ঘণ্টা পরে ভারতীয় সময় বিকাল ৫টা ৪৪ মিনিটে।

কনরাড ও বীন তাঁদের চান্দ্রযানটিকে ঝটিকা সমুদ্রে যথানির্দিষ্ট স্থানে নামান। এর আগে চাঁদের ঝটিকা-সমুদ্র অঞ্চলে কোনও মানুষ পদক্ষেপ করে নি। গোড়ার দিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দূরবীক্ষণ যন্ত্রে এই অঞ্চলকে দেখে জলপূর্ণ মনে করেছিলেন—তাই তাঁরা চন্দ্রপৃষ্ঠের এই এলাকাকে ঝটিকা সমুদ্র নাম দিয়েছিলেন।

চাঁদে নামার কয়েক মুহূর্ত পরেই কনরাড এবং বীন চন্দ্রপৃষ্ঠে তাঁদের সমগ্র প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ-ভাবে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের কাজে নিয়োগ করেন।

২৪শে নভেম্বর রাত ২টা ২৮ মিনিটে অ্যাপোলো-১২-এর মূল মহাকাশযান ইয়াঙ্কি ক্লিপার তিন বিজয়ী নভোযাত্রী কনরাড, অ্যালান বীন ও রিচার্ড গর্ডনকে নিয়ে নামে মার্কিন স্যামোয়া দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে। হেলিকপ্টারে করে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় মার্কিন বিমানবাহী জাহাজ হর্নেটে।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। জগৎজীবন ঘোষ
জৈব রসায়ন বিভাগ
বিজ্ঞান কলেজ
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

ও

অমলকুমার মৈত্র
শারীরতত্ত্ব বিভাগ
বিজ্ঞান কলেজ
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

২। বিদ্যুৎকুমার নাগ
গোয়েন্দা বিভাগ
ভবানী ভবন (৪র্থ তল)
কলিকাতা-২৭

৩। রমাতোষ সরকার
৪৫, অবিনাশ শাসমল লেন
কলিকাতা-১০

৪। শ্রীকমলেন্দুবিকাশ দাস
বেঙ্গল ভেটেরিনারী কলেজ
৩৭, বেলগাছিয়া রোড
কলিকাতা-৩৭

৫। শিশির নিয়োগী
সি. এম. পি. ও
১, গার্স্টিন প্লেস
কলিকাতা-১

৬। শ্রীসূর্যকান্ত রায়
৩এ, হরি বোস লেন
কলিকাতা-৬

৭। শ্রীভাগবতচন্দ্র মাইতি
মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর হাইস্কুল
পোঃ মুগবেড়িয়া
জেলা মেদিনীপুর

৮। মিহিরকুমার কুণ্ডু
৯১এ, ভি. জে. রোড, নন্দন বাগান
পোঃ ভদ্রকালী, জেলা হুগলী

৯। শ্রীঅলোককুমার সেন
৪।২, মধু গুপ্ত লেন
কলিকাতা-১২

১০। শ্রীজ্যোতির্ময় হুই
পোঃ বুনিয়াদপুর
জেলা পশ্চিম দিনাজপুর

১১। মিনতি সেন
অবধায়ক/শ্রীপরেশনাথ সেন
মণ্ডলপাড়া, ব্যারাকপুর
২৪ পরগণা

১২। বাণীকুমার মিত্র
১৪, বাদুড়বাগান লেন
কলিকাতা-৯

১৩। শ্রীশ্যামসুন্দর দে
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স
বিজ্ঞান কলেজ
কলিকাতা-৯

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত